প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৫৪

মূল্য : দশ টাকা

পিতৃদেব ৺ধীরেন্দ্রনাথ রায় ও
মাতাঠাকুরানী ৺নবদুর্গা দেবীর
স্মরণে

এই লেখকের :

বিদেহী

দম্পতি

মণ্ডকন্যা

জয়-জয়ন্তী

এক মুঠো আকাশ

কালো হরিণ চোখ

ভংগুর মাটির পাত্রে

নুনের পুতুল সাগরে

॥ এক ॥

তখনও শহরের ঘুম ভাঙেনি।

সবেমাত্র ভোর হয়েছে। শীতকালের দীর্ঘ রাত্রির অবসানে কুয়াশার পাতলা চাদরে ঢাকা অতি ঝাপসা প্রভাতী আলো। দু'একটা কাক ডাকছে, শোনা যাচ্ছে রাস্তায় জল দেবার শব্দ আর সেই সঙ্গে জমাদারদের ঝাড়ুর আওয়াজ।

রাস্তায় আলো জ্বলছে। ভিড় এড়ানোর পক্ষপাতী কয়েকজন বস্তির লোক, বোধ হয় রিকশাওয়ালা, টিউবকল থেকে জল ভরছে বালতিতে। কোন রকম যানবাহন তখনও চলতে শুরু করেনি।

ঠিক এমনি সময় রমলা বউদির আচমকা ঘুম ভেঙে গেল।—যা আশঙ্কা করেছিল তাই সত্যি, পাশে অনাদিপ্রসাদ শুয়ে নেই, কখন নিঃশব্দে উঠে গেছে। মানুষটা আজকাল যেন ঘুমুতেই চায় না।

পাশের ঘরে আলো জলছে, হয়তো লিখতে বসেছে। একটা ক্ষীণ আশার আলো মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে নিবে যায়। রমলা বউদি পাশের ঘরে গিয়ে দেখে টেবিলের উপর অনাদিপ্রসাদের ডায়েরীটা খোলা; তার উপর লেখবার কলম, পাশে উজ্জ্বল টেবিল-ল্যাম্প, কিন্তু লেখক সেখানে নেই।

—তবে কি কলঘরে? ছেলেদের কাছে? কিংবা নীচের বৈঠকখানায়?

না, কোথাও অনাদিপ্রসাদকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

বারান্দায় আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে বুড়ি ঝি শুয়েছিল, ঘুমন্ত গলায় বললে, মনে তো হলো বাবু নীচে নামলেন।

—কতক্ষণ আগে?

—তা ঘণ্টাখানেক হবে।

রমলা বউদির গলার আওয়াজ শুনে চাকর নরেন উঠে পড়েছিল, বললে, বাবু বেরিয়ে গেছেন।

—কোথায়?

—তা তো কিছু বললেন না। নীচে নেমে এসেছিলেন, আমাকে ডাকলেন, দরজা খুলে দিলাম, উনি চলে গেলেন।

রমলা বউদির চিন্তা আরও বাড়ে। গায়ে গরম জামা পরেছিলেন?

—অত খেয়াল করিনি। তবে মনে হচ্ছে গায়ে আলোয়ানটা ছিল, যেটা রাতে পরে থাকেন।

রমলা বউদি জুতোর র‍্যাকে চোখ বুলিয়ে নেয়, সব জোড়া সাজানো

রয়েছে। তার মানে অনাদিপ্রসাদ বাড়িতে পরার চটি পায়ে বেরিয়ে গেছেন।

রমলা বউদি ওপরের ঘরে ফিরে এসে ডায়েরীর পাতাটা ভাল করে দেখে; সেখানে লেখা রয়েছে :

"বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। শুধুই কি খাওয়া-পরা-ঘুম আর হাসি-কান্না! খুঁজতে ইচ্ছে করছে সেই জগৎটাকে যা কঠিন বাস্তব। নাগালের মধ্যে থেকেও যার হদিস আমরা পাই না' শুধু খুঁজছি আর খুঁজছি—"

লেখা অসমাপ্ত। বোঝা যায় অনাদিপ্রসাদ ডায়েরী লিখতে লিখতে উঠে গেছেন। আগের পাতাগুলোও রমলা বউদি উলটে দেখে, বেশির ভাগই সাদা পাতা। কয়েক জায়গায় অসংলগ্ন মন্তব্য।

সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। যে লোকটা বছরের পর বছর ডায়েরী লিখে আসছে, প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে আগের দিনের ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করে রাখে, সেই লোকটা হঠাৎ বদলে গেল কি করে!

মনে আছে বিয়ের পর, সেও প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। রমলা বউদি ঠাট্টা করে বলেছিল, ডায়েরীতে যে সব কথা লিখে রাখ যদি অন্য কেউ পড়ে!

যুবক অনাদিপ্রসাদ নির্ভীক উত্তর দিয়েছিল, পরস্ত্রীর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকানোর মতই অন্যের ডায়েরী পড়া পাপ।

—কেউই যদি পড়বে না, তবে ডায়েরী লেখা কার জন্যে?

—যদি একবার বুঝতে পারতে রমলা আমরা প্রতিদিন কতখানি বদলে যাই, তা হলে ডায়েরী লেখার তাৎপর্য বুঝতে পারতে। আজকের আমির সঙ্গে দশ বছর পরের আমির হয়তো মিল খুঁজে পাবে না। কথার চটকে মানুষকে ভোলানো যায় কিন্তু আমি নিজেকে ভোলাতে চাই না, আমি যা, তাই যেন থাকি।

সেই অনাদিপ্রসাদ, যাকে রমলা বউদি দেখেছে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে একঘেঁয়ে ডায়েরী লিখে যেতে, সেই মানুষটা প্রায় এক মাস হলো ডায়েরীর পাতায় আঁচড় কাটে না। আজ অনেকদিন বাদে কয়েকটি ছত্র লিখেছে যার অর্থ বোঝা সহজ নয়।

এক অজানা আশঙ্কায় রমলা বউদির বুক কেঁপে ওঠে, মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে বলে, ঠাকুর, ওঁকে তুমি আগের মত স্বাভাবিক করে দাও, যদি কোন অপরাধ করে থাকে তার শাস্তি আমাকেই দাও—

এ প্রার্থনা কিন্তু ওপরে উঠতে পারে না, উনুনের ধোঁয়ার মত মাঝপথে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

রমলা বউদি চাকরকে নির্দেশ দেয়, দেখে আয় তো বাবু সামনের মাঠে বেড়াতে গেছেন কিনা।

যদিও মনে মনে সে জানে অসম্ভব, মর্নিংওয়াকের কোন অভ্যাস অনাদিপ্রসাদের নেই। তবু বলা যায় না, যদি পার্কেই গিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ বাদেই খবর এল অনাদিপ্রসাদ সেখানে নেই।

রমলা বউদি বিনীতাদের ফোন নম্বর ডায়াল করে, খেয়াল থাকে না অত সকালে কেউ ঘুম থেকে ওঠে না, অনেকক্ষণ রিং করার পর অন্য দিক থেকে ঘুমে-জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

—হ্যালো, কে?

—আমি রমলা কথা বলছি।

—কে রমলা?

—রমলা বউদি।

—ও, হ্যাঁ, কি ব্যাপার, এত সকালে?

এতক্ষণে রমলা বউদির হুঁশ হয়, আর একটু বাদে ফোন করলেই ভাল হতো। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলে, জিজ্ঞেস করছিলাম, উনি তোমাদের ওখানে গেছেন কিনা।

অপর প্রান্তে আরও বিস্ময়, অনাদিদা, এখানে? কেন? আসবার কথা আছে বুঝি?

রমলা বউদি কিছুক্ষণ নীরব, তারপর অন্যমনস্ক স্বরে বলে, কাল রাত্রে বলেছিলেন তোমাদের ওখানে যাবো, তাই—

—সে তো খুব ভাল কথা, কতদিন আসেননি, আপনিও আসুন না।

কোন সাড়া না পেয়ে বিনীতাই বলে, অনাদিদা এলে কি আপনাকে ফোন করতে বলব?

এ প্রশ্নেরও কোন জবাব নেই। বিনীতার মনে হলো হয়তো গোলমালে লাইনটা কেটে গেছে।

দুই ছেলে ঘুম থেকে উঠল। চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, বাবাকে দেখছি না?

রমলা বউদির ছোট্ট উত্তর, বেরিয়েছেন।

—কোথায়?

—জানি না।

ছেলেদের এ-উত্তর দিলেও নিজেকে রমলা বউদি কিছুতেই বোঝাতে পারে না। কোথায় যেতে পারে মানুষটা! কেন এক মাস ধরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম? ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে যে লোকটা ঘুম থেকে ওঠে, সকাল ন'টা পর্যন্ত পিঠ সোজা করে পড়ার ঘরে বসে লেখে, চান-খাওয়া সেরে একটার সময় প্রকাশক

মহলে কিংবা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। প্রতিদিন বিকেলে পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরে সকলের সঙ্গে চা খায়, সন্ধ্যেবেলা রমলা বউদিকে নিয়ে গাড়ি করে বেড়াতে যায় লেক কিংবা ভিক্টোরিয়ায়, সেই মানুষটার এ কী পরিবর্তন! ঘড়ি থামেনি, চলছে দ্রুত, আরও দ্রুত। তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে অসম্ভব দ্রুতছন্দে অনাদিপ্রসাদের জীবনযাত্রা বইছে। কিন্তু রমলা বউদি কিছুতেই তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না।

পাছে ছেলেরা উদ্বিগ্ন হয়, রমলা বউদি তাদের কাছে মনের কথা ব্যক্ত না করে অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকাল ঢুকে পড়ে কলঘরে। চান সেরে, চুল না আঁচড়ে সব ঘরগুলো আবার একবার দেখে যায়। না, অনাদিপ্রসাদ তখনও ফেরেনি। পুজোর ঘরে ঢুকে অসহায়া নারী অবিরাম চোখের জল ফেলে। নিত্যক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে নামজপ করতেও ভুলে যায়। পাষাণদেবতা অবিচল, নিষ্পলক। সেখানে সমবেদনা নেই।

উদ্‌ভ্রান্ত রমলা বউদি কোন রকমে প্রণাম সেরে আবার ওপর-নীচে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তখনও অনাদিপ্রসাদ ফেরেনি।

বুড়ি ঝি কি রান্না হবে জিজ্ঞেস করতে এসে বকুনি খেয়েছে, যা ইচ্ছে রাঁধ না, কেন আমাকে বিরক্ত করছ?

ড্রাইভার পেট্রলের টাকা চেয়েছিল, তার উত্তরে রমলা বউদি বলে, কে গাড়ি করে বেরবে তার ঠিক নেই, পেট্রল ভরে কি হবে?

—স্টার্টটা দিয়ে রাখতাম।

—যা ইচ্ছে করুন। আমাকে জ্বালাবেন না।

রমলা বউদির মনের মধ্যে যে ঝড় বইছে কেউ তার হদিস পেল না। কিছুক্ষণ শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে খাটে শুয়ে রইল মনকে শান্ত করার জন্যে, পারল না। টেলিফোনের কাছে গিয়ে বসল, বারবার ভাবল উচিত হবে কিনা। শেষ পর্যন্ত মনের দ্বন্দ্বকে জয় করে ডায়াল করল বাপের বাড়ির নম্বর। ভাগ্য ভাল, সরাসরি রমলা বউদির দাদাই টেলিফোন ধরেছিল। কিরে রমি, কি হয়েছে? এত গম্ভীর?

রমলা বউদি কোন রকমে উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ সামলায়, তুমি একবার এস।

—এখন?

—পারবে না?

—কোর্টে যেতে হবে যে।

—তা' হলে বিকেলে এস।

দাদা উদ্বিগ্ন হন, কেন কি হয়েছে বল, বাড়ির সব খবর ভাল তো? ছেলেরা কেমন আছে? অনাদি—

রমলা বউদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, হাতে সময় নিয়ে এস, অনেক কথা বলবার আছে। বাড়িতে আর কাউকে কিছু বলো না।

—না, না, ঠিক আছে। কোর্ট থেকে সোজা আমি তোর কাছেই যাব।

তবু একটু স্বস্তি বোধ করল রমলা বউদি। আর কিছু না হোক, এক মাস ধরে যে চিন্তার বোঝা তাকে পিষে মারছে অন্তত দাদার কাছে সব কথা খুলে সে বলতে পারবে। তারপর ভাল-মন্দ যাই হোক।

পার্ক স্ট্রীটের একটি অভিজাত রেস্তরাঁ। এ সময় বিশেষ ভিড় থাকে না, অফিস যাবার পথে কেউ হয়তো ব্রেকফাস্ট খেয়ে যায়, নয়তো মার্কেট-ফিরতি মহিলারা কফি খান, দুধ-চিনি না দিয়ে। বেয়ারারা ভেতরে জিরোয়, খদ্দের দেখলে ম্যানেজার ঘণ্টি বাজিয়ে তাদের ডাকে। অনেক রাত পর্যন্ত এরা ডিউটি দেয়, তাই লাঞ্চের আগে পর্যন্ত কুঁড়েমি করলেও তারা রেহাই পায়।

এক কোণায় বসে সৌরভ সেন খুব নীচু গলায় কথা বলছে মোহনচাঁদের সঙ্গে।

মোহনচাঁদ সুদর্শন, অবাঙালী। নিখুঁত বিলিতী পোশাক, চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে বলে, মিঃ সেন, আপনি বলেছিলেন পঁচিশ হাজার টাকা যদি আমি দিই আপনি ছবি শেষ করে ফেলবেন, আমি কাল হিসেব করে দেখেছি, প্রায় বিশ হাজার আমি দিয়ে দিয়েছি, ছবির কতটুকু কাজ হয়েছে বলুন।

চিত্রপরিচালক সৌরভ সেন মৃদু হাসে, সবই তো হয়ে গেছে, নায়ক-নায়িকা ঠিক হয়ে গেছে, দু' রীল ছবি তুলে ফেলেছি, তিনটে গান রেকর্ডিং হয়ে গেছে, এই কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করাতে গেলে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা পড়ত।

—আমি করাতে যেতাম কেন? আপনিই তো আমাকে টেনে আনলেন।

—টেনে এনে তো খারাপ কিছু করিনি, খুব বেশি হলে আর পনের হাজার আপনাকে ফেলতে হবে। ব্যস, বাকি টাকা ডিস্ট্রিবিউটারদের কাছ থেকে নিয়ে নেব। ছবি রিলিজ হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আপনি ফেরত পেয়ে যাবেন। তারপর ছবির যা মেরিট, হৈ হৈ করে সিলভার, গোল্ডেন, ডায়মণ্ড জুবিলী।

মোহনচাঁদ নিজের মনেই মাথা নাড়ে, যাই বলুন, মিঃ সেন, আপনাদের এই ফিলিমের লাইনটা অন্য ব্যবসার মত নয়, বড় ধোঁয়াটে—

সৌরভ সেন হা হা করে হাসে, আপনি নতুন লোক, তাই বলছেন ধোঁয়াটে, পরে বলবেন অন্ধকার। আর তাই তো চাই, চিত্রজগৎ হলো আলো-আঁধারির খেলা। কালো-সাদা।

মোহনচাঁদ ইংরিজী প্রতিশব্দ ব্যবহার করে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট।

—ঠিক তাই, স্রেফ ভেলকিবাজী, কালো টাকা সাদা হয়ে যাবে। তা' না হলে আপনারাই বা এ-লাইনে আসবেন কেন?

এবার মোহনচাঁদও হাসে, কি করে কথা বলতে হয় আপনি জানেন। শুধু বলা নয়, কথা বেচতেও পারেন।

—ওইটেই আমার মূলধন। এখন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট্-এ ছবি তুলছি, রিলিজের পর আপনার কালো টাকাকে রুপোলী বানিয়ে রঙীন ছবি তুলব। টেকনিকলার, বম্বের হিরো হিরোইন, আপনি তখন চোখে রামধনু দেখবেন।

—চায়ের পেয়ালায় উচ্ছ্বাসটা বড় বেশি মনে হচ্ছে না? সন্ধ্যেবেলা রঙীন পানীয়ের সঙ্গে হজম করতে সুবিধে হতো।

মোহনচাঁদ লক্ষ্য করে, সৌরভ সেন অন্যমনস্ক হয়ে কাকে যেন দেখছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করতেই নজরে পড়ল পায়জামা পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক গায়ে চাদর, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি রেস্তরাঁয় ঢুকে এক কোনায় গিয়ে বসলেন।

—ভদ্রলোক কে?

—বিখ্যাত সাহিত্যিক, অনাদিপ্রসাদ।

—হাঁ নাম শুনেছি, আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—আলাপ মানে, ওর দু'খানা গল্প আমি ছবি করেছি, একটা হিট, অন্যটা সুপার হিট।

মোহনচাঁদ-এর গলায় বিস্ময়—তাই নাকি? আপনি হাত নাড়লেন অথচ—

সৌরভ সেন বিব্রত বোধ করে, ভাবরাজ্যের মানুষ, বোধ হয় ঠিক খেয়াল করতে পারেননি। তাছাড়া আমরা অন্ধকারের মধ্যে বসে রয়েছি, ভদ্রলোক বাইরের আলো থেকে ঢুকলেন—

মোহনচাঁদ সকৌতুকে হাসে, আবার সেই আলো আর অন্ধকার।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওরা ছবি নিয়ে কথা বলল বটে, কিন্তু দুজনেরই নজর পড়ে হইল এক কোনায় বসা একক ভদ্রলোকটির উপর। নিশ্চল পাথর। চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছেন, বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেল, কিন্তু খাবার আসা পর্যন্ত ভদ্রলোক অপেক্ষা করলেন না, সিগারেটটা শেষ হতেই ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। ম্যানেজার এগিয়ে গেল তার দিকে বোধ হয় আর একটু বসবার জন্যে অনুরোধ করতে। কিন্তু ভদ্রলোক আঙ্গুল দিয়ে টেবিলটা দেখিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে রেস্তরাঁ থেকে

বেরিয়ে গেলেন।

টেবিলের উপর একটা দশ টাকার নোট।

মোহনচাঁদ মন্তব্য করল, কিছু না খেয়ে লোকটা পয়সা দিয়ে গেল। ওরও কালো টাকা নাকি?

সৌরভ সেন চিন্তিত স্বরে বলে, সবটাই কেমন অদ্ভুত লাগছে, অনাদিপ্রসাদ সাজপোশাকের ব্যাপারে খুব ফিটফাট, এ রকম চেহারায় তাঁকে ভাবাই যায় না।

—এমনও তো হতে পারে উনি অনাদিপ্রসাদই নন, অনেকটা একরকম দেখতে।

—বোধ হয় তাই। তবু যখন মনে খটকা লেগেছে ওঁর বাড়িতে একবার টেলিফোন করে দেখব।

রাজাবাজারের যে অঞ্চলটায় দপ্তরীপাড়া তারই একটা সরু গলির ভেতর দাঁড়িয়ে অশোক জানা এক নতুন মক্কেলের সঙ্গে আলাপ করছে। অশোকের নিজস্ব ছোট প্রেস আছে। নানা রকম কাজ করে। দপ্তরী পাড়ায় এসেছিল সদ্য ছাপা কোন কোম্পানীর বিল বইএর ক্রমিক নম্বর লেখাতে। পেছন থেকে এক ভদ্রলোক ডাকলেন, অশোকবাবু শুনছেন?

—আরে কি খবর মিঃ ডাট। অশোকের চোখ দুটো নেচে ওঠে শিকারী বেড়ালের মত। ক'দিন আগে এই দত্ত সাহেব মোটর সাইকেল চালিয়ে তার প্রেসে গিয়েছিল ভিজিটিং কার্ড ছাপাবার অর্ডার নিয়ে, মাত্র পঞ্চাশখানা কার্ড, তার জন্যে দিয়েছে কুড়ি টাকা। নিশ্চয় দিলদরিয়া মেজাজের লোক। নয়তো বাজার যাচাই না করে এতগুলো টাকা দিয়ে দেবে কেন।

—এখানে কি ব্যাপার।

দত্ত উত্তর দেয়, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, একটা অর্ডার আছে, চিঠির কাগজ ছাপাতে হবে। ওই একশখানা হলেই হবে। বিল করবেন হাজারের।

—তার মানে?

—খুব সোজা, আপনার ছাপার খরচ একশ'তেও যা হাজারেও তাই, শুধু কাগজের বাড়তি দামটা আমার কমিশন, কি রাজী?

অশোক জানা ঘুঘু ব্যবসাদার, বোঝে জালে মাছ পড়েছে, বলে, নিশ্চয়, আমার তো আর ক্ষতি নেই, আপনি যত অর্ডার এনে দেবেন, তার জন্যে নিন না কমিশন।

দত্ত খুশী হয়ে বলে, আমার হাতে অনেক পার্টি আছে, ছোটখাট একটা ভাল প্রেস খুঁজছিলাম, আপনাদের কাজ চমৎকার, দেখবেন কত অর্ডার এনে দিই। অশোক জানা নতুন মক্কেলকে খাতির করার জন্যে দুখিলি মিঠে পান কিনবে কিনা ভাবছিল এমন সময় দেখল সামনে দিয়ে অনাদিপ্রসাদ হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে। আজকের স্বনামধন্য লেখক, বহুদিনের পুরোনো বন্ধু অনাদিপ্রসাদকে হঠাৎ এইভাবে এ অঞ্চলে দেখতে পেয়ে অশোক চেঁচিয়ে ডাকে, এই অনাদি, শোন। অনাদি—

পায়জামা পাঞ্জাবি পরা খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক কোন সাড়া না দিয়ে ডান দিকের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মিঃ দত্ত না জিজ্ঞেস করে পারে না, কি ব্যাপার অশোকবাবু, কে উনি? আপনি এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন কেন?

অশোক জানা শশব্যস্তে বলে, আরে মশাই চিনতে পারলেন না? অনাদিপ্রসাদ।

—উনি! তা হবে, চাক্ষুষ কখনও দেখিনি।

অশোক জানা নিজের মনেই বিড় বিড় করে, অনাদি এ পাড়ায় কি করছে? ও এখন মস্ত বড়লোক, বালীগঞ্জে বিরাট বাড়ি, গাড়ি।

—দূর মশাই, এ তাহলে সে অনাদিপ্রসাদ নয়।

—উহুঁ, আমার ভুল হতে পারে না। আমরা দুজনে সহপাঠী, দুজনে একসঙ্গে লিখতাম। ও পরীক্ষায় ভাল করতে পারল না, কিন্তু লেখক হলো। আমি এম এ পাশ করে বেরলাম, কিন্তু লিখতে পারলাম না। সেই অনাদিকে আমি কখনও ভুলতে পারি? কিন্তু—।

একটা বিরাট কিন্তু অশোক জানার মনের ভেতর হাতুড়ি পেটাচ্ছে, কিন্তু অনাদিপ্রসাদ এখানে কেন?

যারা এই শহরের বহুদিনের বাসিন্দা তাঁরা বুঝতে পারে না কেন বাইরে থেকে লোক এলে কলকাতাকে বলে আজব শহর। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ প্রাচুর্য আর দারিদ্র্যের এমন সহ-অবস্থান নীতি আর কোন শহরে বোধ হয় কেউ দেখেনি। এখানে গগনভেদী সুরম্য অট্টালিকার পাশে জরাজীর্ণ দারিদ্র্যপীড়িত খোলার চালের বস্তি। যখন শোনা যায় দেশব্যাপী খাদ্য সংকট তখনও এই আজব শহরে বিয়ে বাড়িতে দেখা যায় রাশি রাশি সুখাদ্যের অপচয়। এখানকার নিউ মার্কেটে পাওয়া যায় না এমন কোন জিনিস নেই,

কথায় বলে টাকা থাকলে বাঘের দুধও কেনা যায়। কিন্তু আশ্চর্য, পাওয়া যায় না বাচ্চা ছেলেমেয়েদের টিনের দুধ, রুগীর পথ্য হরলিকস, আরও অনেক কিছু যার প্রয়োজন নিত্য। দামী রেস্তরাঁয় আলো কমিয়ে রেখে এক আবছা স্বপ্নালু পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য। আবার অন্যদিকে সূর্যের আলোর অভাবে অন্ধকার আস্তানায় কোনরকমে দিনগত পাপক্ষয় করছে অভাবী মানুষ। এই আজব শহরের বিরাট হোটেলে 'যাদের আছে' তাদের জন্যে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভনীয় আয়োজন, আর 'যাদের নেই', হোটেলের বাইরে ফুটপাথের উপর শয্যার ঢালাও ব্যবস্থা। দু-দলের মাঝখানে উঁচু প্রাচীর, লোহার গেট, সশস্ত্র গালপাট্টা, উর্দিপরা দারোয়ান।

লোকটা নির্বোধের মত শুধু দেখে, হয়তো অসতর্ক মুহূর্তে মনটা টন টন করে ওঠে, কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। নয়তো নাটকের চাণক্য পণ্ডিতের মত বলে ফেলত 'শহরের সর্বাঙ্গে ঘা।'

কথাটা মনে ধরত না, মাথা নাড়ত, শিখা দুলত, বেরিয়ে আসত দীর্ঘ-শ্বাস, সমাজের সর্বাঙ্গে ঘা। পুঁজ পড়ছে।

এই আজব শহরেরই একটি অতি পরিচিত অঞ্চল। তখনও অফিস ছুটি হয়নি। শীতকালের বিকেল, নিস্তেজ সূর্যের আলো। ট্রাম চলছে, একটু এগুলেই বাঁদিকে বেঁকে চলে যাবে ডালহাউসি। উল্টোদিকের ফুটপাথে বড় বড় হোটেল; নীচে সারি সারি দোকান। রাস্তায় ট্যাক্সি, গাড়ি, আর বাসের অবিরাম যাতায়াত। মানুষের স্রোত বইছে, উত্তরে দক্ষিণে, পুবে-পশ্চিমে। চৌরাস্তার মোড়ে উঁচুতে দাঁড়িয়ে পুলিস হাত ওঠাচ্ছে নামাচ্ছে। মানুষ যন্ত্র হয়ে গেছে। একদিকে স্রোত থামে, আর একদিক চলতে শুরু করে।

চলা আর থামা। নিয়মের কড়াকড়ি।

এরই পাশে এক অনিয়মের রাজত্ব বসেছে। বিরাট পুকুরের ধার ঘেঁষে খেলার মাঠ পর্যন্ত বিস্তৃত যে অঞ্চল, যার আর এক সীমানায় এসপ্লানেডের হকার্স কর্নার, সেইখানেই ভোজবাজির খেলা দেখাচ্ছে এক নাম-না-জানা যাদুকর। সেই আদ্যিকালের 'লাগ ভেল্কি লাগে'র খেলা, সকলের সামনে হাত সাফাই, ঝুড়ির ভেতর থেকে রূপসীর অন্তর্ধান। মানুষকে ভেড়া বানানো। এই একই খেলা সাজিয়ে গুজিয়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মঞ্চে দেখালে বিজ্ঞাপনের ভড়কিতে চার সপ্তাহ টিকিট পাওয়া যেত না। এখানে কিন্তু দর্শনী নেই। বিনা পয়সার দর্শক। খেলা দেখে খুশী হলে কয়েকটা পয়সা থালার উপর ফেলে দেয়।

বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে খেলা দেখছে। ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। আখ মাড়াই-এর কলগুলোয় একঘেয়ে টুংটাং ঘণ্টার শব্দ। গাছের তলায়

ল্যাংড়ার চায়ের দোকানও সরগরম। একজন ফুচকাওয়ালা ভিড় দেখে সেইখানে তার মালপত্র নিয়ে বসেছে। যে লোকটা কাটা ফল বিক্রি করছিল সেও কাছে এগিয়ে এল, দেখতে দেখতে চারদিকে ফেরিওয়ালার ভিড়। ভিড় দেখলেই খদ্দেরের আশায় এরা ছোটে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ যেন একটা মেলা বসে যায়।

—এও তো এই আজব শহরেই সম্ভব।

টুকরো কথাবার্তা শোনা যায়। ভিড়ের মধ্যে একজন আর একজন সমবয়সীকে বলছে, ওই যে মেয়েটা দেখ না একটা পুরোনো ব্যাটারীর সেলের উপর বসে আছে।

—তুই ঠিক চিনতে পেরেছিস।

—আমার সহজে ভুল হয় না। ও মেয়েটা সেদিন ছাড়িয়ে না দিলে আমাকে ওরা হয় মেরে ফেলত, নয়তো জখম করে ফেলে দিত ঐ পুকুরের মধ্যে।

আর এদের কথা শোনা গেল না। যাদুকর শেষ খেলা ঘোষণা করছে। যে মেয়েটির বিষয়ে এরা কথা বলছিল সে উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলে, জোরে জোরে হাততালি দেবেন বাবু মশায়রা, নয়তো ওস্তাদের খেলা জমবে না।

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে হাততালি পড়ল।

মেয়েটির নির্দেশ, একবার নয় আরও দুবার।

তিনবার হাততালি। বাজিকরের খেলা শেষ, আবার হাততালি। ভিড় ভেঙ্গে গেল। ছত্রভঙ্গ হয়ে কেউ বসল চায়ের দোকানে। কয়েকজন ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে দাঁড়ায়। আর কেউ বা কাটা ফলের কাছে। দুটো ছোঁড়া ভিমটো পাইন-অ্যাপেলের শিশি নিয়ে ঘুরছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারে না। কারণ তেষ্টা পেলে এরা আখের রসই খায়।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল বিকাশ। ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ভোজবাজি দেখতে। খেলার শেষে বাড়ি যাবার জন্যে ট্রামে উঠবে, না বাসে উঠবে ভাবছিল, এমন সময় নজরে পড়ল ল্যাংড়ার চায়ের দোকানে দুখানা ইটের উপর বসে অনাদিপ্রসাদ ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছেন আর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সেই লাস্যময়ী মেয়েটির দিকে হঠাৎ দেখলে যার জাত বোঝা যায় না, চেনা যায় শুধু ভারতীয় বলে।

বিকাশ অনাদিপ্রসাদের ছোট ছেলের বন্ধু, এক পাড়ায় বাড়ি। কাছে এগিয়ে গিয়ে হেসে কথা বলার চেষ্টা করে, কাকাবাবু, আপনি এখানে?

অনাদিপ্রসাদ ফিরে তাকালেন, কিন্তু বিকাশকে চিনতে পারলেন বলে মনে হলো না, কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন।

বিকাশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সেখান থেকে সরে যায়।

অনাদিপ্রসাদ নিজের মনেই চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করেন। মেয়েটা উঠে গিয়ে বড় গাছটার পিছনের ছায়ায় দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে মস্করা করছে যাদুকর আর তার দুই সঙ্গী। মেয়েটা ওদের সঙ্গে সিগারেট ধরাল, পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞেস করল, আজ কত হলো?

ওস্তাদও রসিকতা করতে ছাড়ে না, বেলাক না বাইট?

—তার মানে?

—থালায় পড়েছে সাড়ে তিন টাকা।

—আর বেলাক?

—কাল্লু পকেট মেরেছে বার টাকা, আর জোনস দুটো ফাউণ্টেনপেন।

মেয়েটা খিল খিল করে হাসে, লোকগুলো সত্যি বেয়াকুফ, হাততালি দিতে গিয়ে পকেট সামলাতে ভুলে যায়।

ওস্তাদ মুখভঙ্গী করে বলে, হাততালি কি আর খেলা দেখে দেয়, সব তোমার মুখের দিকে চেয়ে, তাই না তুমি 'মিস কলকাত্তা'।—সকলেই হেসে ওঠে। মিস কলকাত্তা সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে বলে, আমার কমিশন?

কমিশন নয়, বল নজরানা, ওস্তাদ নির্দেশ দেয়, এই কাল্লু, মিস কলকাত্তাকে তিনটে টাকা দিয়ে দে।

ঠিক এই সময় ঝপ করে অন্ধকার নেমে এল। জ্বলে উঠল বিজ্ঞাপনের সাইনগুলো। ঝলমল করছে চৌরঙ্গীর রাস্তা। আরও ঝলমলে দোকানের আলো। সেদিকে একবার তাকালে আর কি কেউ অন্ধকারের দিকে চোখ ফেরাতে পারে!

অন্ধকার নামার আগেই পরেশচন্দ্র হাইকোর্ট থেকে সোজা গিয়েছিলেন রমলা বউদির কাছে। সারাদিনের দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তির ছাপ রমলা বৌদির মুখের উপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। দাদাকে দেখে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

পরেশচন্দ্র প্রথমটা হকচকিয়ে যান. ভাববার চেষ্টা করেন এমন কি গুরুতর ঘটনা ঘটতে পারে যার জন্যে তাঁর বোন এতখানি বিচলিত হয়েছে।

পরেশচন্দ্রের বিস্ময়ের মাত্রা আরও এই জন্যে বাড়ে যে তাঁদের পরিবারে সুখী সাধ্বী স্ত্রী ও পুত্র গর্বে গর্বিতা মায়ের আদর্শ চরিত্র হলো রমলা। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সুখী দাম্পত্য জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দ গতি কোথায় আজ বাধা পেল।

বোনের মাথায় হাত রেখে সহানুভূতিভরা গলায় বললেন, কি হয়েছে আমায় খুলে বল।

রমলা বউদি যেন এইটুকু বলারই অপেক্ষা করছিল। এ কদিন যে কথা কাউকে খুলে বলতে পারেনি, নিজের মনেই ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছে, পুঞ্জীভূত দুর্ভাবনা যা মনের গহনে আবদ্ধ হয়েছিল তার আগল সে খুলে দিল। দুর্বার জলস্রোতের মত সে উচ্ছ্বাস শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ল কান্নায়।

কৌঁসুলী পরেশচন্দ্র আর একবার প্রশ্ন করে আসল ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করেন, এ রকম কতদিন হয়েছে?

রমলা বৌদি ভাববার চেষ্টা করে, মাসখানেকের ওপর; যতদূর মনে হচ্ছে ওঁর জন্মদিন থেকে।

—সে তো গত মাসেই আমরা খেয়ে গেলাম সকলে।

—সারাদিন ঠিক ছিল, বিকেলে বেড়াতে গেল, আমি সঙ্গে যাইনি রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, ফিরে এল কেমন যেন অন্যমনস্ক। তখন অবশ্য লক্ষ্য করিনি, এখন পেছনে ফিরে দেখতে গেলে মনে হয় সেইটাই সূচনা।

—তারপর থেকে আর লিখছে না?

—না। লেখার টেবিলে বসে, দু' একটা বই-এর পাতা ওল্টায়, যদি জিজ্ঞেস করি লিখছ না কেন, বলে তাড়া কি। অনেক তো লিখেছি, ক'দিন না হয় বিশ্রাম নিলাম।

পরেশচন্দ্র গম্ভীরভাবে চিন্তা করেন, সারাক্ষণ কি করে?

—কিছু ঠিক নেই। কখনও দেখি নিজেরই লেখা পুরনো বইগুলো পড়ছে। কখনও ছাদে গিয়ে ফুলের টব নিয়ে কাজ করে। আগে গাছ গাছড়ার শখ ছিল না। আমিই ওগুলো মালিকে দিয়ে লাগিয়েছিলাম। আজকাল খোন্তা খুন্তি নিয়ে গাছের পরিচর্যা করে।

—আর কিছু?

রমলা বউদি ঘরের কোণের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই যে লাল মাছ রাখার অ্যাকোয়ারিয়ামটা দেখছ—

—ওটা তো তোর ছোট ছেলেকে আমিই কিনে দিয়েছিলাম কোন একটা জন্মদিনে—

—হ্যাঁ, ছোট খোকা বড় হবার পর ও জিনিসটা অকেজো হয়ে গুদোম ঘরে পড়ে ছিল। ক'দিন হলো ওটাকে টেনে বার করেছে, জল ভরে বাজার থেকে মাছ এনে ছেড়েছে। রাত্রিবেলা আলো জ্বালিয়ে চুপচাপ ওইদিকে তাকিয়ে থাকে।

পরেশচন্দ্র চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করেন, আশ্চর্য ব্যাপার। অনাদি হঠাৎ এরকম করতে শুরু করল, কিছু বুঝতে পারছি না।

—সবচেয়ে দুশ্চিন্তা যাতে বেড়েছে, না বলে কয়ে হঠাৎ হঠাৎ বাড়ি থেকে চলে যায়। কোথায় যে এত ঘোরে জিজ্ঞেস করলেও বলতে চায় না। কিন্তু

আমি পকেটে দেখেছি ট্রেনের টিকিট, বাসের টিকিট বিভিন্ন জায়গার।

এতদূর শুনে পরেশচন্দ্র রমলা বউদিকে প্রশ্ন না করে পারলেন না, হ্যাঁরে অনাদির ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট সম্বন্ধে কিছু জানিস? মানে কোন শেয়ার টেয়ার কিছু কিনেছিল না বা হঠাৎ আর কোন ব্যাপারে লোকসান হয়েছে কিনা।

রমলা বউদি মাথা নাড়ে, ওসব তো আমার কাছেই থাকে, কোন গোলমাল নেই। বই-এর বিক্রি ক্রমশ বাড়ছে।

—তা তো আমরা সবাই জানি, বরাবর ও গোছান ছেলে, বাড়ি করেছে, ভাড়া দিয়েছে, প্রত্যেক ছেলের নামে আলাদা ইনসিওরেন্স করে রেখেছে। কিন্তু আর কি হতে পারে? একটু থেমে বলেন, আমার মনে হয় ডাক্তার দেখানো দরকার।

রমলা বউদির মুখ ভয়ে শুকিয়ে যায়, কেন দাদা, তোমার কি মনে হচ্ছে—

কথা শেষ করা গেল না, ব্যস্ত হয়ে বিকাশ ঘরে ঢুকল, কাকীমা—

রমলা বউদি নিজেকে সামলে নেয়, কি বাবা!

—কাকাবাবু কোথায়?

—উনি বাড়িতে নেই।

বিকাশ ইতস্তত করে, একটা কথা বলবার ছিল—

রমলা বউদি ভরসা দেয়, বল না, উনি আমার বড়দা।

—মানে, মনে হলো যেন কাকাবাবুকে দেখলাম—

ভাইবোন দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—কোথায়?

কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিকাশ ময়দানে বাজিকর-এর আড্ডায় যে অবস্থায় অনাদিপ্রসাদকে ভাঁড়ে চা খেতে দেখেছিল তার বর্ণনা দিল।

রমলা বউদির বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়, তোমাকে উনি চিনতে পারলেন না?

—না।

রমলা বউদি অসহায়ভাবে পরেশচন্দ্রের মুখের দিকে তাকায়, তাহলে কি হবে দাদা!

সংসারে অভিজ্ঞ পরেশচন্দ্র বোঝেন এসময় আরও শক্ত না হলে চলবে না, বিকাশকে বলেন, ঠিক আছে, তুমি এখন বাড়ি যাও। যদি আমরা ওঁকে খুঁজতে যাই তোমাকে নিয়ে নেব।

বিকাশ চলে যায়। পরেশচন্দ্র আপন মনে বলেন, ছেলেটির কথা যদি সত্যি হয় আমাদের কি যাওয়া উচিত হবে? বলা যায় না আমাদের দেখলে হয়তো অনাদি লজ্জা পাবে, হয়তো বিরক্ত হবে—

রমলা বউদির আশঙ্কা অন্যরকম, বলে যদি চিনতে না পারে?

ভাইবোনে অনেকক্ষণ পরামর্শ করেও কর্তব্য স্থির করতে পারে না। ভয়ের

কারণ আরও এই জন্যে, এই প্রথম অনাদিপ্রসাদ এতটা সময় বাইরে রয়েছেন, ভোর থেকে সন্ধ্যে। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁরা ঠিক করলেন গাড়ি করে ময়দানের ওই চত্বরটায় ঘুরে আসবেন, নীচে নামতে যাবেন, দেখলেন অনাদিপ্রসাদ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন। দুজনেই সবিস্ময়ে থমকে দাঁড়ান।

সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েও অনাদিপ্রসাদের চেহারায় কিন্তু ক্লান্তির ছাপ নেই, শুধু মাথার চুলগুলো রুক্ষ। পরেশচন্দ্রকে দেখে উজ্জ্বল হেসে বললেন, আরে কি ব্যাপার? বড় কুটুম্ব যে? কতক্ষণ আসা হয়েছে?

পরেশচন্দ্র বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলেন, এইতো কোর্ট থেকে আসছি।

অনাদিপ্রসাদ ওপরে উঠে এসে গায়ের আলোয়ানটা খুলতে খুলতে স্ত্রীকে বলেন, কিগো, দাদাকে ভাল করে খাইয়েছ, নয়তো আবার বাড়ি গিয়ে শালাজের কাছে নিন্দে করবে।

পরেশচন্দ্র বললেন, আমার জন্যে ভাবতে হবে না, ওরে রমি, আগে অনাদির খাবার ব্যবস্থা করে দে।

অনাদিপ্রসাদ নিশ্চিন্তভাবে কোচের ওপর বসে বলে, বাথরুমে গরম জল দিতে বল তো, বেশ শীতের আমেজ পড়েছে, ভাল করে চান করা যাক। আর বুড়ির যদি হাত খালি থাকে গরম গরম খান কয়েক লুচি ভাজতে বল। পরেশদা আর আমি দুজনেই খাব।

রমলা বউদি এতক্ষণ একদৃষ্টে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিল, এতটা সহজ অনাদিপ্রসাদকে সে বহুদিন দেখেনি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তোমরা বসে গল্প কর, আমি এখুনি সব করে ফেলছি।

প্রথম সুযোগেই পরেশচন্দ্র কথা পাড়েন, তারপর এখন কি লেখা হচ্ছে?

অনাদিপ্রসাদ সহজ উত্তর দেয়, নতুন কিছু না।

—তাহলে?

—তাহলে কি?

পরেশচন্দ্র কি বলবেন ভেবে পান না, কথার মোড় অন্য দিকে ফেরান, কখন বেরিয়েছিলে?

—সকালে। কয়েকটা কাজ ছিল। এমন আটকে গেলাম বাড়িতে যে খেতে আসব না তাও জানাতে পারলাম না। আপনার বোন নিশ্চয় খুব ভাবছিল।

—তা তো ভাববেই।

কলঘরে বালতিতে জল ঢালার শব্দ শুনেই অনাদিপ্রসাদ উঠে পড়ে। —আমি চট করে স্নানটা সেরে আসি, আপনি বসুন, পালাবেন না।

অনাদিপ্রসাদ স্নানের ঘরে ঢুকতেই পরেশচন্দ্র রমলা বউদিকে কাছে ডাকেন, মৃদু ভর্ৎসনা করে বলেন, কি যে তোরা আবোল তাবোল বকিস।

এতক্ষণ অনাদি আমার সঙ্গে কথা বলল, কই কোন গোলমাল তো দেখলাম না।

রমলা বউদি তখনও যেন ঘোরের মধ্যে। বলে, আমিও কিছু বুঝতে পারছি না দাদা, অন্যদিন কিন্তু এরকম থাকে না। তাছাড়া সকাল থেকে কোথায় গিয়েছিল—

—কাজে গিয়েছিল, কাজে।

—কি কাজ?

পুরুষ মানুষের হাজার রকম কাজ থাকতে পারে। মিছিমিছি অত ভাবিস না। শেষপর্যন্ত তোর জন্যে না ডাক্তার ডাকতে হয়।

এতক্ষণে রমলা বউদি ম্লান হাসে, তাহলে তো দুঃখ নেই, ওঁর কিছু না হলেই বাঁচি।

কিছুক্ষণের মধ্যে স্নান সেরে পরিষ্কার জামা কাপড় পরে অনাদিপ্রসাদ বেরিয়ে এলেন। হাসিমুখে গল্প করতে করতে সম্বন্ধীর সঙ্গে আহার করলেন, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আজ একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়ব।

পরেশচন্দ্র সায় দিয়ে বলেন, হাঁ, হাঁ, তুমি শুয়ে পড়, আমি এবার উঠি।

—আমি আর নীচে নামছি না, রমলা তুমি দাদাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এস।

—না, না, কারুর আসতে হবে না, আমার সঙ্গে আবার ফরম্যালিটি!

—আহা নামুক না, একটু এক্সারসাইজ হবে।

তিনজনেই হা হা করে হাসলেন।

নীচে নামতে নামতে পরেশচন্দ্র রমলা বউদির কাঁধে হাত রেখে বললেন, না রে ভাবনার কিছু নেই, সব ঠিক আছে। তবু যদি দরকার মনে করিস আমাকে তখুনি খবর দিবি। একলা ভেবে ভেবে তিলকে তাল করেছিস।

রমলা বউদি স্বীকার করেন, সত্যি, চিরকালই আমি একটু বেশি ভাবি, তাই না দাদা?

পরেশচন্দ্র সস্নেহে বলেন, এখনও সেই ছোট খুকিটি, ওপরে যা। ঝগড়াঝাটি করবি না। ওর সঙ্গে ভাল করে গল্প কর। আজকের রাতটা ভাল করে ঘুমতে দে, কাল আমি টেলিফোনে খোঁজ নেব অখন।

দাদার গাড়ি রওনা করিয়ে দিয়ে রমলা বউদি ওপরে উঠে শোবার ঘরে যায়। দেখে অনাদিপ্রসাদ বিছানায় শুয়ে পড়েছে, গায়ের ওপর একটা পাতলা কম্বল। চোখ বন্ধ। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

রমলা বউদি স্বামীর কাছে গিয়ে বসে, শান্ত সৌম্য মুখ। চওড়া কপালের ওপর আস্তে আস্তে হাত রাখে।

শীতল করস্পর্শে অনাদিপ্রসাদ চোখ মেলে তাকান। খুশী হয়ে বলেন,

আঃ তোমার হাতটা কি নরম। এখন বেশ আরাম লাগছে। মানুষের সবচেয়ে বড় বদ অভ্যাস নিজের বিছানায় না শুলে ঘুম আসতে চায় না। ছেলেদের দেখতে পেলাম না, ওরা বাড়িতে নেই বুঝি? আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন অনাদিপ্রসাদ। রমলা বউদি অনেকক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর সারাদিনের দুশ্চিন্তার জ্বর এতক্ষণে ছেড়ে গেল। নিজের স্বামী, নিজের সংসার, এতদিনের সুখের নীড়, যা মনে হচ্ছিল বুঝি ভেঙে গেল—এতক্ষণে বোঝা গেল সেটা শুধু দুঃস্বপ্ন। তার কিছুই হারায়নি, সব আছে।

স্ত্রী রমলা নিশ্চিন্ত হতেই মা রমলা ব্যগ্র হয়ে পাশের ঘরে চলে গেল ছেলেদের খবর করতে।

যদি পাঁচ মিনিট বাদে রমলা বউদি ফিরে আসত, দেখতে পেত অনাদি-প্রসাদ আবার খাটের উপর উঠে বসেছেন। খুঁজছেন বালিশের তলায় রাখা নতুন ডায়েরীখানা, যার পাতায় তিনি হিজিবিজি কাটেন, ছবি আঁকেন, কিন্তু কিছু লেখেন না।

যে মানুষ হঠাৎ জেগে উঠে খুঁজতে শুরু করে, সে কি পরিণামের কথা ভাবে? ভাবে সেই নুনের পুতুলের কথা যে সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল?

॥ তিন ॥

খুঁজতে একবার আরম্ভ করলে খোঁজার নেশা ক্রমশ পেয়ে বসবে। যা কখনো দেখিনি তা দেখতে পেলে যত না আনন্দ তার চেয়েও বেশি আনন্দ যা দেখেও দেখিনি তাকে নতুন করে দেখতে পেলে, খুঁজে পেলে তার নিহিত অর্থ। যে দার্শনিক জীবন-মৃত্যুর ভারসাম্যের মান খুঁজছে, যে বিজ্ঞানী খুঁজছে বিশ্বরহস্যের চাবি, তারা সকলেই সেই চিরকেলে ক্ষ্যাপা,—যে পরশ পাথর খুঁজতে অজস্র নুড়ি কুড়িয়ে বেড়ায়, পেয়েও ভ্রূক্ষেপ করে না, খোঁজার আনন্দে মশগুল হয়ে পরশ পাথর ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে নুড়ি খুঁজতে শুরু করে।

এমনি করেই খুঁজতে খুঁজতে অনাদিপ্রসাদ একদিন এসে পড়লেন বই-পাড়ায়। কলেজ স্কোয়ার পেরিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং, আশেপাশের ফুটপাথ, মুদির দোকানের মত ছোট ছোট প্রকাশক ভবন। ছাত্র অনাদিপ্রসাদ এই ফুটপাথ থেকেই সস্তায় কলেজের বই কিনতেন, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন নামকরা লেখকদের গল্প উপন্যাসের মলাটগুলো। সাহিত্যিক হওয়ার

বাসনা ছিল। স্বপ্ন দেখতেন তাঁর বই ছাপা হচ্ছে, পাঠকরা কিনছে, সমালোচনা বার হচ্ছে কাগজে। স্বপ্ন সকলেই দেখে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবে তা পরিণত হয় না। ব্যতিক্রম অনাদিপ্রসাদ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস সাহিত্য জগতে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। ভাগ্যবান তিনি, লেখক হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বেড়েইছে, কমেনি একরতি।

লেখক অনাদিপ্রসাদ এ বইপাড়ায় এলেও রেলিং বা ফুটপাথের দিকে বড় একটা নজর দিতেন না, সোজা গিয়ে ঢুকতেন বিভিন্ন প্রকাশ ভবনে। সর্বত্রই তাঁর অবারিত দ্বার। সকলেই খাতির করে, আর করবে নাই বা কেন, অনাদিপ্রসাদের বই ছাপলে পাঁচ ছ'টি সংস্করণ হবে নির্ঘাত, সে বিষয়ে কারও সংশয়ের অবকাশ নেই।

প্রথম জীবনে আসতেন ট্রামে বাসে, এখন আসেন গাড়িতে। ফুটপাথ আর রেলিং-এর বই-এর সঙ্গে সম্পর্ক কেটেই গিয়েছিল বলতে গেলে। আজ আবার এতদিন বাদে সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে মনে হলো বহুকাল আগে যে ছোট বাসায় ভাড়া ছিলেন সেইখানে যেন ফিরে এসেছেন।

অনেকক্ষণ ধরে ফুটপাথে পায়চারী করে রেলি-এ টাঙানো বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখে বিশ বছর আগের দেখা চিত্রের সঙ্গে আজকের খুব একটা পার্থক্য খুঁজে পেলেন না। সেদিনের মত আজও সচিত্র মোটা মোটা রামায়ণ মহাভারত ঝুলছে, রয়েছে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী, সেইরকমই সায়েন্স আর আর্টস-এর দামী দামী টেকসট বুক, কিছু ডিকসনারী, বহু বছর-এর পুরোন এনসাইক্লোপিডিয়ার সেট। সেই রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ, হয়তো তার আধুনিক সংস্করণ। নতুন সংযোজন-এর মধ্যে দেখা গেল কিছু কিছু সদ্য প্রকাশিত বইও রেলিং-এ শোভা পাচ্ছে। হয় দপ্তরীর কারসাজী, না হয় তো বাজারে বিক্রী হচ্ছে না বলে প্রকাশকই ভার লাঘব করতে কমদামে বই ফুটপাথে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে নূতন ও পুরাতনের সহ অবস্থান নীতি।

বই-এর মেলায় পার্থক্য নজরে না পড়লেও বিশ বছরে এই অঞ্চলের পরিবেশ যে অনেক বদলেছে তা বুঝতে বেশি দেরী হল না। হঠাৎ একটা হল্লা উঠল, চীৎকার, চেঁচামেচি, শ্লোগান।

—কি ব্যাপার মশাই?

—কলেজের ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে।

—কি নিয়ে?

—একদল ক্লাস করতে চায়, আরেক দল তাদের করতে দেবে না।

দেখতে দেখতে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সোডার বোতল ফাটছে। উপর থেকে সশব্দে পড়ছে থান ইঁট। বন্ধ দরজায় দুমদাম আওয়াজ।

দোকানীরা এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রেলিঙের বই ঝুপঝাপ ঢুকে

গেল ট্রাঙ্কের মধ্যে। বড় বড় দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ট্রাম বাস দাঁড়িয়ে পড়ল দূরে দূরে, যুদ্ধক্ষেত্র বাঁচিয়ে।

সাধারণ লোক ছিটকে পালিয়ে গিয়ে মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বিনা পয়সার হাডুডু খেলার দর্শকের মতো সকৌতুকে দেখতে লাগলো শ্রাদ্ধটা কত দূর গড়ায়। অনাদিপ্রসাদ তাদের সঙ্গ নেননি; পেছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সদ্য বন্ধ হওয়া বই-এর দোকানের সিঁড়িতে।

ইতিমধ্যে জনকয়েক আহত হয়েছে, শোনা যাচ্ছে তাদের আর্তনাদ অন্যদের শ্লাঘা। দু' একটা পটকাও ফাটছে। কোথা থেকে একরাশ ধোঁয়া ভেসে এল। কোন দাহ্য পদার্থে আগুন লাগান হয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি পটপরিবর্তন হওয়া সম্ভব অনাদিপ্রসাদের কোন ধারণা ছিল না। ঠিক যেন পেশাদার মঞ্চে নাটক দেখছেন।

একটি লোক দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে অনাদিপ্রসাদের পাশে সিঁড়ির উপর আশ্রয় নিল। দেখলে বয়েস বোঝা যায় না, ফর্সা রং, চোখের তলায় কালি, মুখে আত্মবিশ্বাসের অহঙ্কার, পরনে প্যান্ট, তার ওপরে ঝোলান সার্ট, হাতে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ, মুখটা জীপ দিয়ে বন্ধ। অনাদিপ্রসাদের দিকে না তাকিয়েই দূরের আগুন লক্ষ্য করে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, কেমন র‍্যালা দেখছেন?

—কিছুই বুঝতে পারছি না।

—স্রেফ্ কেলোর কীর্তি। অ্যামেচার দিয়ে আন্দোলন চালানো হচ্ছে। ব্যাটারা ঠিকমত একটা সোডার বোতল ছুঁড়তে জানে? না, পারে ভড়কি দিয়ে বাস জ্বালাতে? পুলিস এসে টীয়ার গ্যাস ছুঁড়লে পারবে সেই শেল তুলে নিয়ে পুলিসকে মারতে? ভাল মানুষের ছেলেরা কেঁদে কঁকিয়ে মরবে, তবু ব্যাটারা আমাদের ডাকবে না।

অনাদিপ্রসাদের বিস্ময়, কেন?

—আমরা তো আর অ্যামেচার নই, প্রফেশ্যনাল, আমাদের কাজে লাগাতে হলে পয়সা ছাড়তে হবে তো। আমাদের শ্লোগান, ফেল কড়ি মাখ তেল। কত ছেলে চান, চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিন, সারি সারি দাঁড় করিয়ে দেব। ডানপিটে, বেপরোয়া, তারা প্রাণের মায়া করে না। জান লড়িয়ে দেবে।

—কিসের জন্যে?

লোকটি হিহি করে হাসে, সে যেরকমটি চাইবেন, আন্দোলন করতে বললে করবে, আবার যদি কারুর আন্দোলন বন্ধ করাতে চান তাও করে দেবে।

অনাদিপ্রসাদ স্বীকার না করে পারেন না, আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ থাকা ভাগ্যের কথা, কখন কি কাজে দরকার হবে বলা যায় না।

াপনার নাম-ঠিকানাটা জেনে রাখা ভাল।

লোকটি গভীর জলের মাছ, বলে, আপনি সাদা পোশাকে পুলিস নাকি, এত কথা জানতে চাইছেন কেন?

অনাদিপ্রসাদকে জবাব দিতে হলো না। সশব্দে খানতিনেক পুলিসের লরি ঢুকে পড়ল ঐ রাস্তায়। লোকটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, দেখেছেন কাণ্ড, ছোঁড়াগুলোর কোনও আক্কেল নেই, এখুনি তো মার খেয়ে মরবে। ধরুন তো আমার ব্যাগটা, আমি ওদের সাবধান করে দিয়ে আসি।

অনাদিপ্রসাদ ব্যাগটা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করেন, এতে কি আছে?

—রুটি।

পুলিস এসেই বেধড়ক লাঠি মেরে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। যারা লড়তে গেল তাদের অ্যারেস্ট করে তুলে নিল পুলিস ভ্যানে। গাড়ির ভেতর থেকে তারা চীৎকার করে পুলিসী জুলুমের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়।

ইতিমধ্যে একজন পুলিস এসে দাঁড়ায় অনাদিপ্রসাদের সামনে, আপনি এখানে কি করছেন?

অনাদিপ্রসাদের ছোট্ট উত্তর, তামাশা দেখছি।

—রসিক লোক মনে হচ্ছে, হাতে কি?

—একটা ব্যাগ।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি, ভেতরে কি আছে?

—বোধহয় রুটি।

—ঠাট্টা হচ্ছে, নিজের ব্যাগে কি আছে জানেন না? দেখি—,

ব্যাগ খুলতে যা বেরল তা দেখে দুজনেরই আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। খানকয়েক তাজা হাত-বোমা।

অনাদিপ্রসাদ যদিও বোঝাবার চেষ্টা করলেন এ ব্যাগের মালিক উনি নন, আর একজন ধরতে দিয়েছে, তাতে কোন লাভ হলো না, বামাল সমেত পুলিসের ভ্যানে তুলে তাঁকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হলো থানায়।

ভাগ্য ভাল, থানার অফিসার অনাদিপ্রসাদকে চিনতে পেরেছিলেন। সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন, আমি বুঝতে পারছি অনাদিবাবু, আপনার মত একজন বিখ্যাত লেখক এ ধরনের কাজ করতে পারেন না, কিন্তু কেস্‌টা এমন বেয়াড়া দাঁড়িয়েছে, আমি তো আপনাকে ছেড়ে দিতে পারছি না, একজন কাউকে আপনার জামিন দাঁড়াতে হবে, কাকে ডাকবো বলুন।

অনাদিপ্রসাদ নিজের মনে কিছুক্ষণ ভাবলেন, বললেন, বাড়িতে খবর দিয়ে লাভ নেই, আমার স্ত্রী একা আছেন, শুনলে আরও ঘাবড়ে যাবেন। আপনি বরং সুনীল রায়কে খবর দিন, আমার এক পাবলিশার, এই পাড়ায় অফিস। খবর পেলে নিশ্চয় আসবে।

খবর পেয়ে সুনীল রায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বই প্রকাশ করে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ভদ্রলোক নিউ আলিপুরে বাড়ি করেছেন। গাড়ি করেছেন। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। টেকস্ট বুক ছাড়া যেসব লেখকের উপন্যাস তাঁকে বিস্তর পয়সা দিয়েছে, অনাদিপ্রসাদ তাঁদেরই একজন। এঁদের উনি নাম দিয়েছেন রাজহাঁস। হাঁস সরস্বতীর বাহন, সে কারণে নয়, এঁরা সোনার ডিম পাড়ে বলে।

বলাই বাহুল্য, অনাদিপ্রসাদের হয়ে জামিন দাঁড়াতে সুনীল রায় এতটুকু ইতস্তত করলেন না। যেখানে সই করতে বললেন করে পরের দিন অনাদিপ্রসাদকে কোর্টে হাজির করার স্বীকৃতি জানিয়ে পুলিস অফিসারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, অনাদিপ্রসাদকে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়ি করে বাড়িতে পেঁাছে দেবার জন্যে রওনা হলেন।

যদিও সুনীল রায় তাঁর রাজহাঁসের জন্য জামিন হয়ে, পুলিস যে ভুল করে অনাদিপ্রসাদকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তা সদম্ভে ঘোষণা করে চলে এসেছেন, কিন্তু লেখকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কিছুতেই কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। সুযোগ বুঝে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার বলুন তো, আপনি হঠাৎ এই হাঙ্গামার মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন।

অনাদিপ্রসাদের নিস্পৃহ উত্তর, জড়াইনি তো, শুধু দেখছিলাম।

—কি দেখছিলেন?

—জীবন।

—হঠাৎ?

—এতদিন তো শুধু লিখেছি, কিছুই দেখিনি। এখন তাই শুধু দেখছি; খুঁজছি, কিছু লিখছি না।

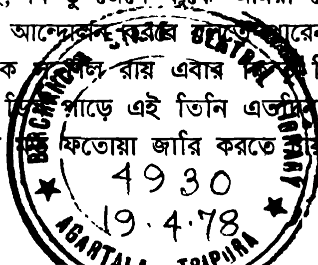
সুনীল রায় আঁতকে ওঠেন, আপনারা না লিখলে আমাদের চলবে কি করে?

অনাদিপ্রসাদ চলমান গাড়ি থেকে রাস্তার দিকে নজর রেখে উত্তর দেন, আপনাদের না চললে আমারও চলবে না, কিন্তু তাই বলে সাহিত্যে আর ভেজাল মেশাতে পারব না।

—কি বললেন?

—তেল ঘিতে ভেজাল দিচ্ছে বলে আমরা প্রতিবাদ করি, ওষুধে ভেজাল বলে আমরা চেঁচাই, কিন্তু জেনে বুঝে আমরা যে সাহিত্যে ভেজাল দিচ্ছি তার বিরুদ্ধে কারা আন্দোলন করবে বলতে পারেন?

বিচক্ষণ প্রকাশক সুনীল রায় এবার দ্বিগুণ শিউরে উঠলেন। সাহিত্যের রাজহাঁসরা সোনার ডিম পাড়ে এই তিনি এতদিন জানতেন, কিন্তু তারা যে আবার ধর্মগুরুদের মত ফতোয়া জারি করতে পারে এ ধারণা তাঁর ছিল না।



এ প্রসঙ্গ থামিয়ে দেবার জন্যে বললেন, সারাদিনে আপনার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আজ বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন, পরে এ নিয়ে কথা বলব।

অনাদিপ্রসাদ কিন্তু শুনলেন না, একটা সিগারেট ধরালেন, নির্ভীক স্বরে বললেন, ময়দানের কাছে গাড়ি থামান, আমার কিছু বলার আছে।

গাড়ি থামল।

ফাঁকা মাঠ। শীতের সন্ধ্যার অন্ধকার, রাস্তায় নিয়নের আলো। দূরে ভিক্টোরিয়ার সামনে গাড়িওয়ালা লোকেদের ভীড়।

অনাদিপ্রসাদ নেমে পড়লেন মাঠের মধ্যে। সুনীল রায় বাধা দেবার চেষ্টা করেন, এ কি করছেন, ঠান্ডা লেগে যাবে, নির্ঘাত হিম পড়ছে।

অনাদিপ্রসাদ ঠাট্টা করে বলেন, গায়ের শালটা দিয়ে মাথায় ঘোমটা দিন। আঃ, এই ফাঁকার মধ্যে এসে একটু আরাম লাগছে।

কিছুক্ষণ দু'জনে নীরবে হাঁটলেন। সুনীল রায় ইচ্ছে করেই কোন কথা বলেননি অনাদিপ্রসাদকে সুযোগ দেবার জন্যে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ইঞ্জিনের হ্যাঁচকা টানে হঠাৎ যেমন রেলগাড়ি চলতে শুরু করে, তেমনি-ভাবেই কথা শুরু করলেন অনাদিপ্রসাদ, শহরে বাস করার এই বোধহয় সবচেয়ে বড় বিপদ, অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র আমরা হারিয়ে ফেলি, নিজের অজান্তে একক হয়ে যাই। ভাবুন তো আপনার আমার কথা। আমরা বাড়িতে থাকি, গাড়ি করে বেরুই, পরিচিত দু'চারজনের সঙ্গে মিশি, নিজেদের কাজ করি। একটা ধারায় চলি, তার এপাশ-ওপাশে কি আছে দেখবার অবকাশ হয় না। এতটুকু জগতের মধ্যে বাস করে একজন লেখকের পক্ষে পাঠককে কি দেওয়া সম্ভব। প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার জাবর সে এখনও কেটে চলে, যত দিন যায় তত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কমে, অথচ জনপ্রিয়তা বাড়ে, ফলে সাহিত্যে ভেজাল না দিলে তার চলে না।

সুনীল রায় মন দিয়ে তাঁর রাজহাঁসের কথা শুনছিলেন, তবে অনেকখানি বুঝতে পারছিলেন না, তাই সরাসরি প্রশ্ন করেন, এসব কথা হঠাৎ আপনার মাথায় এল কি করে? আগে তো এরকম বলতে শুনিনি।

অনাদিপ্রসাদ স্বীকার করলেন, হঠাৎই ঘটে। গত মাসে আমার জন্মদিনে—

সেদিন তো আমি আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। আপনার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। চেক দিয়ে এলাম বৌদির হাতে।

—হ্যাঁ, সেইদিন থেকেই। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, অনেকে এসেছিলেন

দেখা করতে। ফুলের উপহারে পড়ার ঘরটা ভরে গিয়েছিল। বাড়ির সকলেই হাসি খুশী, ফিল্মের জন্যে একটা বইও বিক্রী হলো। মোটা অঙ্কের টাকা অগ্রিম পেলাম। ঘন ঘন টেলিফোন বাজছে। যাঁরা আসতে পারেননি, শুভকামনা জানাচ্ছেন। খানকয়েক গ্রীটিংস্ টেলিগ্রামও এল। নিজেরই বেশ লাগছিল।

অনাদিপ্রসাদ থামলেন, বোধহয় ভাবছিলেন সেই দিনটারই কথা।

সুনীল রায় প্রশ্ন করেন, তার পর?

নাড়া খেয়ে ঘড়ি আবার চলতে শুরু করে, সন্ধ্যের পর বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয়ের খাবার কথা ছিল। সারাদিনই বাড়িতে বসেছিলাম, ভাবলাম বিকেলে একটু বেড়িয়ে আসি। বাড়ির সবাই কাজে ব্যস্ত, একলাই গাড়ি করে এলাম ভিক্টোরিয়ায়, ভেতরে ঢুকলাম। সবে তখন আলোগুলো জ্বলছে, পরের দিন থেকে একটা নতুন লেখা শুরু করার কথা, সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম কিস্তি। গল্পটা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে দ্রুত পায়ে আমার দিকে আসছে। খুব বেশী হলে উনিশ কুড়ি বয়েস হবে। বেশ সুন্দরী, আধুনিক সাজপোশাক।

অনাদিপ্রসাদ আবার থামলেন, মৃদু হেসে বললেন, অহমিকায় সুড়সুড়ি লাগল। ভাবলাম, মেয়েটি নিশ্চয় আমায় চিনতে পেরেছে, নিশ্চয় আসছে আমার অটোগ্রাফ সংগ্রহ করতে। হাতে কাগজ বা খাতা নেই, কে বলতে পারে হয়তো দশ টাকার নোট মেলে ধরবে তার উপর স্বাক্ষর করে দেবার জন্য। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েটি আমার কাছে এসে থামল, মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল। এখন ক'টা বেজেছে?

হাতঘড়ি দেখে সময় বললাম। লক্ষ্য করলাম মেয়েটির হাতেও ঘড়ি রয়েছে, সময় একই, তবে অকারণে সময় জিজ্ঞেস করার কারণ বুঝলাম না।

মেয়েটি আমার সঙ্গে পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল, বলল, আজকের ওয়েদারটা বেশ ভাল, তাই না? ঠাণ্ডা পড়েছে, অথচ খুব বেশী নয়। এইরকম ওয়েদার আমার ভাল লাগে।

কিছু উত্তর দেবার ছিল না। তবু বললাম, সারা বছরের মধ্যে এই দু' একটা মাসই তো কলকাতায় যা ভাল।

—লোকেরা পিকনিকে যেতে পারে, রোদে খেলাধুলা করতে পারে, ক্রিকেট, টেনিস, সবেরই তো এই সীজন।

নিজের মনেই মেয়েটি অনেকক্ষণ বকবক করে হঠাৎ প্রশ্ন করল, আপনার বিকেলে বেড়ানোর অভ্যাস আছে বুঝি?

বললাম, হ্যাঁ, সময় পেলে রোজই কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাই।

মেয়েটি হাসল, কেন তুললাম জানেন? বেড়ানোর অভ্যেস বাঙালীদের

ই। দেখুন এই ভিক্টোরিয়ায় ক'জন বাঙালী বেড়াতে আসে। সবাই ঘরকুনো, বাড়িতে বসে থাকে, না হয় আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যায় আর খুব বেশী হলে সময় কাটায় সিনেমায়। নেচার-এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আই হেট্ ইট্। কথার ধরনে একটু অবাক হয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বুঝি খুব বেড়াও?

—সারাক্ষণ তো ঘুরে বেড়াই। যেখানে সেখানে। কলকাতা, কলকাতার বাইরে। মাঠে, ঘাটে। বাড়িতে থাকতে আমার বিশ্রী লাগে।

কথায় কথায় আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। মেয়েটি হঠাৎ বলল, কিছু যদি মনে না করেন, ঐ গেটটা পর্যন্ত আমাকে একটু এগিয়ে দেবেন?

—কেন?

—সেই তখন থেকে একটা ছেলে আমাকে ফলো করছে।

আমি পেছন ফিরে তাকালাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

মেয়েটি মন্তব্য করল, ঠিক কোথাও লুকিয়ে আছে। আপনার সঙ্গে হাঁটছি বলে বিরক্ত করছে না। প্লীজ, ঐ গেটটা পর্যন্ত এগিয়ে দিন, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব।

অনুরোধমত মেয়েটিকে এগিয়ে দিলাম। গেটের বাইরে থেকে হাসি মুখে সে হাত নাড়ল, অনেক ধন্যবাদ, আবার হয়তো কখনও দেখা হবে।

ট্যাক্সিতে উঠে মেয়েটি চলে গেল।

আমি আবার ভিক্টোরিয়ায় চক্কর দিতে শুরু করলাম। কিন্তু কিছুতেই মেয়েটিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। বার বার নিজের মনকে প্রশ্ন করেছি, এ মেয়েটি কে? কোন সমাজের? কোন যুগের? এদের তো আমি দেখিনি, চিনি না। তবে আমার উপন্যাসে যে সব অষ্টাদশীর কথা লিখি, তারাই বা কারা? তারা কি শুধু আমার কল্পনাপ্রসূত, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন!

ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। আত্মীয়দের খাওয়ার পালা চুকল, কিন্তু ভাল করে কারুর সঙ্গে গল্প করতে পারলাম না। সবাই চলে গেলে বিছানায় গিয়ে শুলাম, কিন্তু ঘুমতে পারলাম না। সারা রাত ছট-ফট করেছি। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন উপন্যাসে যেসব চরিত্র সৃষ্টি করেছি, তাদের সবাইকে দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন সুনীলবাবু পনেরটির বেশি চরিত্র খুঁজে পেলাম না। জীবনের শুরু থেকে এদের আমি চিনতাম, জানতাম। তাদের ভালবেসেছিলাম। তাদের সুখে হেসেছি, দুঃখে কেঁদেছি, তাদের কথা লিখেই সাহিত্যজীবনে আমার স্বীকৃতি। কিন্তু তারপর? আর কোনো নতুন চরিত্রের সংযোজন হয়নি। বিভিন্ন উপন্যাসে তারাই ঘুরে ফিরে এসেছে হয়তো পোশাক বদলে চেহারা পাল্টে। কিন্তু মানুষগুলো সেই এক। যে

আঠার বছরের মেয়ের কথা আমি আজও লিখছি, সে বাস্তবে ছিল, আমার বয়েস যখন পঁচিশ। তার মানে এই দীর্ঘ দিন ধরে জনপ্রিয়তার শিখরে বসে আমি নতুন উপন্যাসের নামে কি ভেজাল সাহিত্য উপহার দিয়েছি পাঠকদের! অনাদিপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, সেই দিন থেকে কলম থামিয়েছি। আর মিথ্যে কথা লিখে নিজের পাপ বাড়াব না, জীবনকে দেখবার চেষ্টা করছি, বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজছি।

বিহ্বল সুনীল রায় অস্ফুট স্বরে বলেন, গত জন্মদিনে?

অনাদিপ্রসাদের ততোধিক অস্ফুট স্বগতোক্তি, কে বলতে পারে ঐ দিন থেকে হয়তো আমার নতুন জন্ম হল।

॥ চার ॥

জন্মদিন পালনের রীতি যদিও আধুনিক সমাজব্যবস্থায় চালু রয়েছে বহু দিন ধরে, তবু কেন যে জন্মদিন পালন করা হয় তার সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়ায় অসুবিধা আছে। আমরা কি জন্মদিনে স্মরণ করতে চাই সেই শুভ বা অশুভ লগ্নটিকে, যে সময় থেকে এই পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক? না, জন্মদিন রাস্তার ধারে মাইলের দূরত্ব লেখা পাথরের মত, জানিয়ে দিয়ে যায়, ক্রমশ বয়েস বাড়ছে, জীবনের পথে চলতে চলতে পথ বন্ধের নিশানা দেখতে পাব—সেই তো মৃত্যু। যে-কোন কারণেই হোক, জন্মদিনকে আমরা ভুলতে পারি না। আনুষ্ঠানিকভাবে যে জন ঐ দিনটিকে স্বাগত জানায় না, তারও মনের মধ্যে খচখচ করে, ঠিক যেন গলায় লাগা কাঁটা বেরিয়ে যাবার পরের অস্বস্তি। তাই বলে অনাদিপ্রসাদের ঘোষণাও সত্য নয় যে, পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন থেকে তাঁর নতুন জন্ম হলো।

নতুন জন্ম, সেই নিষ্পাপ শিশু-মন অনাদিপ্রসাদ কোথায় পাবেন? জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে তিক্ত করেছে, বিরাট ঔদার্যের ভাণ্ডার রিক্ত করেছে। বিনিময়ে উপহার দিয়েছে ধন, মান, যশ। পঞ্চাশ বছরের ভাল মন্দে ভরা অতীতটাকে স্লেটের ওপর কষা অঙ্কের মত মুছে ফেলা যায় কি? যায় না।

তবু নতুন জন্ম সম্ভব না হলেও গভীর ঘুম থেকে মানুষ হঠাৎ জেগে উঠতে পারে। তার জন্যে বেশী ঠেলাঠেলি করার দরকার হয় না। 'বেলা যায়'-এর মত সামান্য দুটি কথা নুনের পুতুল লালাবাবুকে সমুদ্র মাপতে পাঠিয়ে দিতে পারে। আলো যখন জ্বলে বহু যুগের অন্ধকার এক মুহূর্তে সেখান থেকে ছুটে পালায়, চেতনের পরশমণি নির্বোধ জড়ত্বকে অনায়াসে সরিয়ে দেয়।

তেমনি করেই সেই জন্মদিনের রাত্রে জনপ্রিয় লেখক অনাদিপ্রসাদ মোহাচ্ছন্ন ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছেন। নিজের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়েছেন। মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন তাঁকে খোঁচা মেরেছে—আমি কে? সত্যিকারের অনাদিপ্রসাদ কোনজন? যে লোকটা কাগজের উপর কালির আঁচড় কেটে সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে লোকের মন-রাখা উপন্যাস লেখে সে, না, বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত, অথচ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে সদা প্রস্তুত যে সৈনিকটা, সময়ে অসময়ে নীরবে হাজিরা দিয়ে যায়, সেই লোকটা অনাদিপ্রসাদ? অনাদিপ্রসাদ সে রাত্রে বিছানার উপর বসে ভাববার চেষ্টা করেছেন, রমলা বউদির কাছে তিনি কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, ছেলেদের কাছে স্নেহময় পিতা, আত্মীয়দের কাছে হৃদয়বান আত্মীয়, বন্ধুদের কাছে অকৃত্রিম সুহৃদ। সকলের চোখ দিয়েই অনাদিপ্রসাদের একটা আলাদা রূপ আছে। তাকে নষ্ট করা চলে না, যার চোখে যে রকম চেহারা তা স্মরণ রেখেই অনাদিপ্রসাদকে ব্যবহার করতে হয়, অনেক সময় এই ব্যবহারের মধ্যে স্বাভাবিকতা থাকে না, ঢুকে পড়ে অভিনয়।

কি মারাত্মক চিন্তা! আমরা অভিনয় করছি ঘরে বাইরে, ছোট বড় প্রতিটি কাজে, লেখার আসরে, বক্তৃতার সভায়, সমাজের কাজে, রাজনীতির মঞ্চে। দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করতে করতে নিজের সত্তাকে আর চিনতে পারছেন না অনাদিপ্রসাদ। লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একক হতে চেয়েছিলেন, অনেকের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু বুঝতে পারেননি, ক্রমশ তাঁর চার পাশে একটা কঠিন আবরণ তৈরী হয়ে গেছে, অনাদিপ্রসাদ পরিণত হয়েছেন শামুকে।

পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে অনাদিপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, শামুকের খোল ছেড়ে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হবে। নির্জন দ্বীপের মত একলা বেঁচে থাকার মধ্যে হয়তো কাব্য আছে, আছে আভিজাত্যের বড়াই, কিন্তু সত্যিকারের জীবন নেই। বাস্তবকে দেখতে গেলে ঘরের দেয়াল ভাঙতে হবে। এতদিন ধরে মনের আনাচে-কানাচে যত পাঁচিল আমরা তুলেছি, ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। দৃষ্টির প্রসারতা বাড়াতে হবে, বাহাত্তর মিলিমিটার ছবির পর্দার মত। সঙ্কোচ নয়, প্রসার। বন্ধন নয়, মুক্তি। গোষ্ঠী নয়, জনতা।

তাই তো দেখা গেল, কলকাতার শহরে যেখানে জনস্রোত বইছে অনাদি-প্রসাদ সেখানেই গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। হয়তো সে স্রোতের কোন লক্ষ্য নেই, অনির্দিষ্ট পথে বয়ে চলা, তবু সেই স্রোতের মধ্যে ভেসে গিয়ে অনাদিপ্রসাদ আনন্দ পেয়েছেন। নিজেকে চলতে হচ্ছে না, অন্যরা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি—সামনে, পিছনে, পাশে মানুষের চাপ, তাদের দেহের উষ্ণতা, আবেগ-ভরা নিঃশ্বাস। জনতা চলছে। এগুচ্ছে কি পেছুচ্ছে বলা শক্ত,

কিন্তু তার গতি আছে। সেই গতির বেগ আজ অনাদিপ্রসাদকে পেয়ে বসেছে।

চলতে চলতে হয়তো অনাদিপ্রসাদ প্রশ্ন করছেন, এরা কোথায় যাচ্ছে? পাশের জন মৃদু ভর্ৎসনা করে, 'এরা' মানে? বলুন, আমরা। অনাদিপ্রসাদ নিজেকে শুধরে নেন, হাঁ, হাঁ তাই তো জিজ্ঞেস করছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—জানি না।

—তবে কেন এই চলা?

নির্ভীক উত্তর, চলতেই হবে। একবার থেমে গেলে আর চলতে পারব না। অনাদিপ্রসাদ ঘাড় ফিরিয়ে ভদ্রলোককে লক্ষ্য করেন, চোখে-মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সেখানে কঠিন বাস্তবের ছাপ পড়েছে, আধময়লা জামা কাপড়, রুক্ষ চুল, পুরু কাঁচের চশমা।

ভদ্রলোক হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, এ লড়াই বাঁচার লড়াই।

জনতা প্রতিধ্বনি তোলে, এ লড়াই লড়তে হবে। লড়তে হবে।

অনাদিপ্রসাদের বিহ্বল প্রশ্ন, লড়াই কার বিরুদ্ধে?

ছোট জবাব, অন্যায়, অত্যাচার।

কোন্ অন্যায়, কার অত্যাচার, এ কথা বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা হয়তো সে ভদ্রলোকের নেই, নেই সেই বিপুল জনতার। কিন্তু তারা নীরব নয়। কবির বাসনা পূর্ণ হয়েছে, এইসব মূঢ় ম্লান, মূক মুখে ভাষা ফুটেছে। এইসব ভগ্ন বুকে জ্বলে উঠেছে আশার আলো। তাই তো এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় এদের সঙ্গে কদম কদম পা মিলিয়ে চলার মধ্যে অনাদিপ্রসাদের এতটা আনন্দ।

জনস্রোতে গা ভাসাবার ইচ্ছা যখন অভ্যাসের পর্যায়ে উপনীত হয়, তখনই দেখা যায়, মানুষের আর স্রোতের জাতবিচার থাকে না। সেই কারণেই লোকে দেখেছে, ফুটবল মাঠ-ফেরত দর্শকদের সঙ্গে পা মিলিয়ে অনাদিপ্রসাদ হাঁটছেন। শুনছেন পাশের জনের উক্তি, ছ্যা, ছ্যা, বাঙালীদের দ্বারা আর ফুটবল খেলা চলবে না, কোথায় গেল সেই আগের দিকপাল খেলোয়াড়রা, যাদের ভয়ে লালমুখো গোরা সাহেবরাও ঠকঠক করে কাঁপত। ছেড়ে দেব, আর খেলা দেখব না।

অন্যের উত্তর, ক্লাবে ক্লাবে এখন পলিটিকস্, রাজনীতির সংক্রামক ব্যাধি ঢুকেছে খেলার জগতে, নতুন খেলোয়াড়দের কোন সুযোগ নেই। সব রসাতলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রসাল টিপ্পনী, দাদা, ফুটবল তো তবু পদে আছে, রাজার খেলা ক্রিকেট ভাবুন তো, এখন তো স্রেফ নবাবী তামাশা। হাজার হাজার বিদেশী মুদ্রার অপচয়, ছাত্ররা বিদেশে যেতে পারে না। তার বদলে ক্রিকেট টিম গিয়ে দেশের নাম ডোবাচ্ছে।

দ্বিতীয়জনের একই মন্তব্য, সেখানেও রাজনীতি দাদু, চৌকশ খেলোয়াড়রাও চিৎপটাং, সেখানেও খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে।

একটা হাসির কোরাস শোনা যায়।

অনাদিপ্রসাদ এই দর্শকদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ময়দান পার হয়ে যান। চোখে পড়ে সান্ধ্য ভ্রমণে ব্যস্ত প্রৌঢ়, ঘরোয়া খেলায় মত্ত কিশোর-কিশোরীর দল, কোন এক কোণে গিন্নীদের সভা, ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে ঘন হয়ে বসা তরুণ-তরুণী, ভিক্টোরিয়ার প্রান্তরে আলুকাবলি, ফুচকাওয়ালার ভিড় 'ম্যায় ল্যায়ে মজাদার চানাচুর গরম'-এর পরিচিত সুর, সিদ্ধির কুলপি, মঘাই পান, ঠেলাগাড়িতে আইসক্রীম, ফুলের বেণী।

পথ চলতে চলতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ট্রাম বাস ধরে বাড়ি যাবার পালা। আবার অনাদিপ্রসাদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও একক হয়ে গেলেন, ঢুকলেন ভিক্টোরিয়ার মধ্যে।

আশ্চর্য, সেই মেয়েটির সঙ্গে আবার দেখা। সাজপোশাকে পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্যের ছাপ। অনাদিপ্রসাদকে দেখে অনাড়ম্বর গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি বলেছিলেন রোজ ইভনিং ওয়াক-এ আসেন, কই এখানে দেখি না তো?

অনাদিপ্রসাদ স্বীকার করেন, ভিক্টোরিয়ায় আসতে পারিনি। অন্য দিকে গিয়েছিলাম।

—সেদিন আপনি আমার খুব উপকার করেছিলেন। কি খাবেন বলুন, ফুচকা?

—আমি কখনও খাইনি।

—আইসক্রীম?

—দাঁত কনকন করবে।

মেয়েটি হাসল, অত ভেবে চললে চলে না, মসলামুড়ি খাবেন?

—না, থাক।

—আপনি তো আচ্ছা লোক, কি খাওয়াব তা হলে?

—নাই বা খেলাম।

—তা হয় না। আমি আপনাকে এনটারটেন করতে চাই। আপনি জানেন না, যে ছেলেটির হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছিলেন সেদিন, হি ইজ এ রোগ। এক কাজ করলে হয়, পার্ক স্ট্রীটে মে ফ্লাওয়ার রেস্তরাঁয় আসুন না যে-কোন দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে।

—বেশ, আসব।

—কবে?

—কোন একদিন।

—ঠিক আছে, আই উইল লুক ফরোয়ার্ড টু সী ইউ। মেয়েটি হাসতে

হাসতে ফিরে গেল তার দলের মধ্যে।

অনাদিপ্রসাদ আবার হাঁটতে শুরু করলেন। অনেকখানি পথ তাঁকে যেতে হবে, ভবানীপুর, কালীঘাট পেরিয়ে সেই বালিগঞ্জে।

সেদিন অনাদিপ্রসাদ যখন বাড়ি ফিরলেন, রমলা বউদি কিন্তু অন্য দিনের মত ব্যস্তভাবে ছুটে এল না, জিজ্ঞেস করল না অনাদিপ্রসাদ এতক্ষণ কোথায় ছিল। ফিরিস্তি দিল না কোন কোন প্রকাশক টেলিফোন করেছিল, কোন পত্রিকার অফিস থেকে লোক এসেছিল তাগাদা দিতে।

অনাদিপ্রসাদকেও একঘেঁয়ে উত্তর দিতে হলো না, ওদের বুঝিয়ে বলে দাও না কেন আমি এখন লিখছি না।

—বললেই কি ওরা শোনে? না, শুনলে বোঝে? আমাকে মিথ্যে পাগল করে মারে।

—ওরা ব্যবসাদার, নিজেদের স্বার্থে তোমাকে বিরক্ত করে। কিন্তু ওদের মন রাখতে আমিও ব্যবসাদারী লেখক হয়ে যাই তুমি কি তাই চাও?

কথার পিঠে কথা। কিছুক্ষণের জন্যে মান-অভিমান, তারপরই স্নান-খাওয়া সেরে হয় অনাদিপ্রসাদ পড়তে বসেন, নয়তো অ্যাকোয়ারিয়ামে আলো জ্বালিয়ে মাছগুলোকে দেখেন। তাদের খেতে দেন ড্রাই ফুড কিংবা ডাফনিয়া। অক্সিজেনের নলটা চালিয়ে দিয়ে জলের মধ্যে বুদবুদ কাটান। রমলা বউদি সোফায় বসে উল বোনে কিংবা সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা ওল্টায়। আজ কিন্তু রমলা বউদিকে ওপরে কোথাও দেখা গেল না। অনাদিপ্রসাদ তাকে আবিষ্কার করলেন মাঝতলার ভাঁড়ার ঘরে। ঘর অন্ধকার, জানলার গরাদে মুখ ঢুকিয়ে কৌতূহলী চোখে পাশের বাড়িতে উঁকি মারছে, আরও কৌতূহলী কান দুটো স্পর্শকাতর মাইক্রোফোনের মত পেতে রেখেছে ও বাড়ির অন্দরমহলের কথাবার্তা শোনার জন্যে।

অনাদিপ্রসাদ বিস্মিত হন, কি হয়েছে, এরকম করে দাঁড়িয়ে?

রমলা বউদি মুখে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে, চুপ।

স্ত্রীর কথামত অনাদিপ্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, বুঝতে পারেন, পাশের বাড়িতে কি একটা গোলমাল চলছে। তবে ব্যাপারটা কি হয়েছে, ঠিক বোঝা যায় না।

রমলা বউদি জানলার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে উত্তেজিতভাবে অথচ ফিসফিস করে বলে, সেই ছোঁড়াটা ধরা পড়েছে।

অনাদিপ্রসাদের কাছে ধাঁধার মত শোনায়, কোন ছোঁড়া, কে ধরল?

—আহা, বলেছিলাম না, একটা ছেলে মীনার পেছনে লাগে, কলেজের রাস্তায় খালি বিরক্ত করে। সাধনবাবু দু' একবার সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাতে কোন ফল হয়নি। আজ একেবারে ধরে নিয়ে এসেছেন।

—কি করে ধরলেন?

—পাড়ার ছেলেদের দিয়ে। গলাটা আরও নামিয়ে বলেন, আজ নাকি মীনার গায়ে হাত দিয়েছিল।

—কোথায়? রাস্তায়?

—না, কোন চায়ের দোকানে। সাধনবাবু ঠিক ওকে পুলিসে দেবেন। তখন থেকে ঐ বাড়িতে হট্টগোল চলছে।

—আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ।

রমলা বউদির চোখ দুটোয় মেয়েলী কৌতূহল, এখন কি হবে?

অনাদিপ্রসাদের ছোট্ট উত্তর, দেখি।

'দেখি' বলে সত্যিই যে অনাদিপ্রসাদ পাশের বাড়ির তামাশা দেখতে চলে যাবেন এ কিন্তু রমলা বউদি মোটেও ভাবেনি। সাধনবাবু এ পাড়ার বিত্ত-শালীদের একজন। ভদ্রলোক আয়কর সংক্রান্ত কেস করেন। ঐ বিভাগীয় অফিসারদের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম, অনেকেই তাঁর এক গেলাসের বন্ধু, ওঁর হাত থেকে তারা পার্টির হয়ে ঘুষ খায়, একসঙ্গে মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তি করে। অতএব সাধনবাবুর দোর্দণ্ড প্রতাপ। ভগবানে বিশ্বাস না থাকলেও দুরারোগ্য অসুখে পড়লে আমরা যেমন পাণ্ডাদের স্মরণ নিই আমাদের হয়ে ঠাকুরের কাছে ওকালতি করার জন্যে, ঠিক সেইরকম অ্যাসেসমেণ্টের সময় সে যত বড়ো কালোবাজারীই হোক না কেন, এই সাধনবাবুদের স্মরণ নিতে বাধ্য হয়। এরা হিসাবের খাতায় ভোজবাজির খেলা দেখায়, কালোকে করে সাদা, দিনকে করে রাত। তাই কালো টাকার তারাও অংশ পায়, সেই থেকে বাড়ি গাড়ি। সেগুলোর রং কিন্তু কালো নয়, রঙীন।

'প্রফুল্ল'র যোগেশ ভাই রমেশের উদ্দেশে সখেদে সকৌতুক উক্তি করেছিল, 'উকিল কী চীজ রে!' ভদ্রলোকের যুগে সাধনবাবুদের উৎপত্তি হয়নি। জানি না এদের দেখলে বিস্মিত যোগেশ কি বলত।

সাধনবাবু পাড়ার মাতব্বর হলেও নিজের পকেট থেকে কোন ব্যাপারেই চাঁদা দেন না, তবে অনেক টাকা সংগ্রহ করে দেন তাঁর মক্কেলদের কাছ থেকে। সুভেনীরে বিজ্ঞাপন, মূর্তি ভাসানের জন্য লরী, বিচিত্রা-অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পী, প্রয়োজনের সময় সব কিছুই তিনি জুটিয়ে এনে দেন। এক কথায়, তিনি একজন অদ্বিতীয় 'যোগাড়ে'। এ'দেরই স্থান এখনকার সমাজের মাথায়।

অনাদিপ্রসাদ যখন সাধনবাবুর বাড়িতে ঢুকলেন, তখনও ভদ্রলোক রাগে ফুলছেন কুপিত সিংহের মত। এক কোনায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে মেষশাবকের মত একটি যুবক। আশেপাশে দু' চারজন মাতব্বর।

সিংহের গর্জন, তোমাকে আমি চাবকাব, বদমাইশ ছেলে। আমার মেয়ের সঙ্গে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে! আমাদের ঘর জান, বংশ জান? তোমার বাবা তো

অফিসের কেরানী, তার চাকরি খেয়ে দেব। ফের যদি এদিকে ঘুরঘুর করেছ তো জেলে ঢোকাব। উল্লুক, পাজী, ছুঁচো—

অনাদিপ্রসাদকে দেখে সাধনবাবু নিজেকে সংযত করেন, সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ত দেন, আমার মীনাকে তো জানেন কি শান্ত মেয়ে, এই বজ্জাত ছেলেটা—

অনাদিপ্রসাদ গম্ভীর গলায় বলেন, আমি সব শুনেছি, মীনা কোথায়?

—মীনা, কেন? ওপরে আছে।

—আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই, জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে অনাদিপ্রসাদ সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন সোজা মীনার ঘরে।

বছর কুড়ি বয়সের মেয়ে, সাদামাটা চেহারা, একমাথা চুল। চোখে-মুখে কাঁচা বয়সের একটা উজ্জ্বল জৌলুস আছে। খাটের ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিল, ভয়ে আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখে দুর্ভাবনার জল।

অনাদিপ্রসাদকে দেখে মীনা আরও চমকে ওঠে, কাকাবাবু, আপনি!

অনাদিপ্রসাদের শুকনো প্রশ্ন, ছেলেটার নাম কি?

—সমীর।

—তোমাকে মিছিমিছি বিরক্ত করে?

মীনা ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, হ্যাঁ, কলেজের রাস্তায় কিংবা বন্ধুদের বাড়ি গেলে—

—সাক্ষী আছে?

—হ্যাঁ, আমার বন্ধুরা দেখেছে, আমি যত বারণ করি—

—আজ বুঝি তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল?

মীনা আরও ভয় পায়, হ্যাঁ, আমাকে জোর করে—

অনাদিপ্রসাদ ঠাস করে এক চড় মারেন মীনার গালে, মিথ্যে কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না? তুমি প্রশ্রয় দিয়েছ বলেই ঐ ছেলেটা তোমার কাছে আসে, সত্যি কিনা বল।

মীনা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, হ্যাঁ, সত্যি।

—ছেলেটাকে নীচে এইভাবে অপমান করছে দেখেও তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

মীনা আরও অসহায়, কি করব? বাবা যে বোঝেন না, ওঁকে বলার আমার সাহস নেই।

—ছি, ছি, যা সত্যি তাও বলতে পার না, এই তোমাদের চরিত্র। তোমরা কলেজের মেয়ে, তোমাদের উপর দেশের ভবিষ্যৎ। আমি ভাবতেও পারছি না। অনাদিপ্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চান, মীনা ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে, দোহাই কাকাবাবু, এসব কথা বাবাকে বলবেন না। আমাকে উনি জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

অনাদিপ্রসাদ কোন উত্তর না দিয়ে তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন। একটি নাটকীয় মুহূর্ত। ঘরের সকলের দৃষ্টি অনাদিপ্রসাদের উপর নিবদ্ধ। গম্ভীর আহ্বান শোনা যায়, সমীর, আমার সঙ্গে চল।

সাধনবাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনাদিপ্রসাদ বললেন, ওর যা ব্যবস্থা করার আমি করছি।

অনাদিপ্রসাদের পড়ার ঘরে সোফার উপর বসে পড়ে এতক্ষণ বাদে সমীর একটু সুস্থ বোধ করে, অস্ফুটস্বরে প্রার্থনা জানাল, আমাকে একটু জল দেবেন?

অনাদিপ্রসাদ জল এনে দিলেন। ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে অযাচিতভাবে মীনার কাছে যাওনি এ কথা সাধনবাবুকে জানালে না কেন?

সমীর প্রথমটা চুপ করে থেকে পরে উত্তর দিল, ওরা তো আমাকে বিশ্বাস করতো না।

—তা হলেও যেটা সত্যি তা বলবে না?

—বললে ওরা মীনাকে কষ্ট দিত। বেচারী ওর বাবাকে বড় ভয় পায়।

—তাই বলে নীরবে এতখানি অন্যায় অপমান তুমি সহ্য করলে!

সমীর চোখ তুলে অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকায়, সহজ অথচ দৃঢ় গলায় বলে, কি করব, আমি যে মীনাকে ভালবাসি।

অনাদিপ্রসাদ বিরক্ত হন, ভালবাস অথচ তা জোর গলায় বলবার সাহস নেই। তোমরা আমাদের যুবসমাজের প্রতিনিধি? ছি, ছি, ভীতু, কাপুরুষ।

সমীর আহত হলো, কিন্তু লজ্জা পেল না। নির্ভীক গলায় বলল, আমাদের কাপুরুষ করে দিয়েছেন আপনারা। মানুষ করেননি, স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ দেননি, যুবশক্তির কণ্ঠ রোধ করে রেখেছেন।

অনাদিপ্রসাদ এই প্রথম ধাক্কা খেলেন, তোমাদের ভালবাসায় ভেজাল না থাকলে যে-কোন বাধার বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াত।

—হয়তো তাই দাঁড়াবে, শুধু সমাজের নিয়মকানুনগুলো যদি একটু বদলাতেন। যাক গে, তর্ক বাড়বে, মীমাংসা হবে না। আমিও ক্লান্ত, যদি অনুমতি দেন, বাড়ি যাই।

—পাড়ায় চাপা উত্তেজনা এখনও রয়েছে, আমি গাড়ি করে তোমায় বাড়ি পেঁছে দিচ্ছি।

—অনেক ধন্যবাদ।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সমীর পেছন ফিরে অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে নিষ্কম্প কণ্ঠে ঘোষণা করে, আমার ভালবাসা কিন্তু খাঁটি, প্রয়োজন হলে জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে যাব।

অনাদিপ্রসাদের মুখে স্মিত হাসি, আমাকে তোমার পাশে পাবে।

সমীর চলে যেতেই রমলা বউদি অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসে, চোখে আরও বিস্ময়, কই ছেলেটাকে তো তুমি কিছু বললে না!

অনাদিপ্রসাদের ততোধিক বিস্মিত প্রশ্ন, কি বলব?

—আহা ও-বাড়ি থেকে যে ধরে নিয়ে এলে কিছু বোঝাবে তো, একটু বকলেও না। ফলে সাধনবাবু আমাদের ওপর চটে যাবে।

—চটলেই বা, আমি তার কি করব।

—আশ্চর্য কথা, আগে তো অন্যদের ব্যাপারে কখনও থাকতেই চাইতে না, হঠাৎ এরকম গায়ে পড়ে আপদ ডেকে আনার দরকার কি ছিল?

অনাদিপ্রসাদ মৃদু হাসলেন, এটা তুমি ঠিক বলেছ, আগে ঝামেলা পোয়াতে চাইতাম না। বরং কোথাও ঝামেলা দেখলে গল্প-উপন্যাসের খোরাক যোগাড় করতে কৌতূহলী হয়ে উঠতাম। মানুষের নোংরা দিক, সমাজের পঙ্কিল আবহাওয়া, কেচ্ছা আর কেলেঙ্কারির ঘটনার কথা শুনলেই শকুন-সাহিত্যিকের মত তাকিয়ে থাকতাম ভাগাড়ের দিকে। সাহিত্যের নামে কতগুলো নোংরা গল্পের চাটনি পরিবেশন করেছি পাঠকদের। তাদেরও ঠেকিয়েছি, নিজেরাও ঠকেছি।

রমলা বউদি বিরক্ত হয়, কি জানি বাবা, আজকাল কি যে আবোল তাবোল বকো।

—এই আবোল তাবোল কথাগুলোই যদি কখনও লিখি, হয়তো সেই লেখার জন্যেই অনাদিপ্রসাদকে ভবিষ্যতের লোক মনে রাখবে। যেসব বই লিখে এই বাড়ি, গাড়ি, তার একটাও বাঁচবে না—

কথা শেষ হতে পেল না, হন্ত দন্ত হয়ে পাশের বাড়ি থেকে সাধনবাবু এসে হাজির।

—কি ব্যাপার অনাদিবাবু, মনে হলো ছোঁড়াটা আপনার গাড়ি করে গেল।

অনাদিপ্রসাদের ছোট্ট উত্তর, বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়েন, সে কি? আমি যে ছোঁড়াটাকে থানায় নিয়ে যাব ভেবেছিলাম।

—এসব কথা পুলিসের ডায়েরীতে রেকর্ড না থাকাই ভাল।

—কেন?

—ধরুন, ভবিষ্যতে ঐ ছেলেটাই যদি আপনার জামাই হয়।

সাধনবাবু মোরগের মত ফুলে ওঠেন, 'কক্ কক্' করে ঝগড়া করতে গিয়ে কথার খেই হারিয়ে ফেলেন।—ঐ লোফারটা আমার জামাই! খুন করব। ভিটেমাটি চাটি করব। মেয়েকে বিধবা দেখব।

অনাদিপ্রসাদ না হেসে পারেন না।

আগুনে ঘি পড়ে, আপনি হাসছেন?

—নয়ত কি কাঁদব।

—আপনাকে ভাবতাম একজন বিচক্ষণ লোক, সাহিত্যিক মানুষ। আমাদের মান ইজ্জত নিয়ে একটা জীবন মরণ সমস্যা, আর আপনি মশাই হাসিঠাট্টা করছেন? আমার সঙ্গে মজা করবার জন্যে ছেলেটাকে এখানে নিয়ে এলেন! আমি যতক্ষণ ভালো খুব ভালো, একবার খারাপ হলে যে কি করতে পারি—

অনাদিপ্রসাদ নির্বিকার উত্তর, তা আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। আপনার ভালো রূপটি দেখেই আমি শঙ্কিত, অতএব খারাপ হলে যে চেঙ্গিস খাঁর মতো নির্মম হয়ে উঠবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? সুযোগ পেলে আপনার মতো লোক হিটলার, মুসোলিনি কিংবা স্টালিনের মতো যুদ্ধবাজ হতে পারেন তা আমি বিশ্বাস করি।

ব্যস্, আর দেখতে হল না, ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। সাধনবাবু হাত পা ছুঁড়ে পুতুল নাচের অনুকরণ করেন, ঠিক আছে, দেখে নেব। আমার নামে যা-তা বলা। আমি যুদ্ধবাজ? ঠিক আছে, তাহলে আপনাকেই আগে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ঢোকাব। আপনার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ—,

অনাদিপ্রসাদ সংশোধন করে দেন, আমার মেয়ে নেই।

—যে নেই তার কথা বলছি না, যারা আছে তাদের সর্বনাশ করব।

—তা করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনার কপালের শিরটা কাঁপছে, ব্লাড-প্রেসার নেই তো? হঠাৎ হার্টফেল করে মরে গিয়ে নিজের সর্বনাশ করবেন না।

সাধনবাবু আর জবাব খুঁজে পেলেন না, চীৎকার করে গালাগাল দিতে দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনাদিপ্রসাদের মনে হলো, একটা দুর্বল জন্তু আহত হয়ে নিষ্ফল আর্তনাদ করছে।

॥ পাঁচ ॥

ট্রেনটা রানাঘাট লোকাল।

সকালবেলা ছাড়ে, আটটার আগেই। এই গাড়িতেই মেয়েগুলো কলকাতায় আসে। রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, সোদপুর, বেলঘরিয়া, এক একটা স্টেশনে গাড়ি থামে আর মেয়েরা ওঠে। বেশির ভাগ দিনই ওরা বসে এক কামরায়। এরা একদিন ছিল গৃহস্থ। স্বাধীনতার হাঁড়িকাঠের বলি হয়ে এদের আখ্যা হলো বাস্তুহারা। তারপর এই বিশ বছরের চরম উদাসীনতায় ক্রমশ নামতে নামতে এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে যার অস্তিত্ব আগে ছিল না।

মেয়েগুলো কলকাতায় আসে কাজ করতে, যত না নিজেদের ইচ্ছেয়, তার চেয়ে বেশী প্রয়োজনের তাগিদে। লেখাপড়া না জানলেও চলে, কম মাইনের

সামান্য কাজ। রাজাবাজারের দপ্তরীপাড়ায় ফর্মা ভাঁজাই, জুঝ সেলাই, মিছিল টানা, কিংবা ছাঁট কাগজ বাছাই, বড়বাজারে গুঁড়ো মসলার প্যাকিং, দেশলাইয়ের কাঠি ভর্তির কাজ, ইনজেকশানের এম্‌পিউল-এর শিশি তৈরি, প্লাস্টিক পুতুল রং করা—এই ধরনের নানারকম কাজ, যাতে পরিশ্রমের চেয়ে ধৈর্যের দরকার বেশী। অথচ মজুরি অতি সামান্য। ভোরবেলা বেরিয়ে মেয়েগুলো বাড়ি ফেরে রাত্রিবেলা, সেই শান্তিপুর লোকাল। সারাদিনের মধ্যে দীর্ঘ চৌদ্দ ঘণ্টায় শহর কলকাতার বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

তবু ট্রেনে আসার সময় তারা হইহই করে, গল্প করে, নিজেদের বাঁধা গানে সমবেত কণ্ঠে সুর দেয়—

আমরা রানাঘাটে আই
আর শান্তিপুরে যাই
গান গাইতে গান গাইতে মোরা শুধু যাই।
কত কথা বলতে বলতে
স্টেশন দিয়ে চলতে চলতে
তবুও মোদের এ চলার শেষ নাই।

স্টেশনে থামলেই এরা গান থামিয়ে প্ল্যাটফরম-এর দিকে তাকায়, হাত তুলে চীৎকার করে ডাকে, এই মিতা, এই সরযূ, আমরা এই গাড়িতে।

মিতা-সরযূরা ছুটতে ছুটতে এসে ওদের কামরায় উঠে পড়ে। কোন কোন দিন হয়তো কারুর সাজে বৈচিত্র্য দেখা যায়। অমনি অন্যরা টিপ্পনি কাটে, কি রে মিতা, শাড়িটা নতুন মনে হচ্ছে!

মিতা মুচকি হাসে, হ্যাঁ; কিনেছি।

কবিতার গলায় নাটুকে সুর, বাঃ কি সুন্দর, চিঙ্গাপট্টির উপর ছাপা, তাই না! তোকে খুব মানিয়েছে। কত দাম নিল রে?

দাম বলতে গিয়ে মিতা সত্যি থতমত খেয়ে যায়।

নলিনীদি যেন মিতার পক্ষ নিয়ে বলে, আহা বেচারী দাম বলবে কি করে? কেউ উপহার দিলে বুঝি দাম জেনে নেওয়া যায়!

অন্য মেয়েগুলো হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, কে দিয়েছে বল, কে দিয়েছে।

মিতা কিন্তু রাগ করে না; মুখে এক খিলি পান দিয়ে মুচকি হেসে বলে, জানি না।

ট্রেন চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ বদলে যায়, ট্রেনের ছন্দ মিলিয়ে গানের বাকী অংশটুকু শেষ করে,

মনে আমাদের শুধু ভাবনা,
ন'টায় যেতে হবে কারখানা,

আর দেরি হয়ে গেলে কৈফিয়তের শেষ নাই।
বাবুরা বলবে বেরিয়ে যাও,
কেন দেরি হলো কৈফিয়ত দাও,
আমরা বলি আমাদের পেটে ভাত নাই।

গান থামলেও কথা থামে না, কবিতা মিতার পাশেই বসেছিল, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, শাড়িটা বাবু কিনে দিয়েছে?

এদের দুজনের সম্পর্ক মৌখিক নয়, গভীর। দুজনের সুখদুঃখের কথা দুজনেই জানে। তাই কবিতার কাছে স্বীকার করতে মিতা লজ্জা পেল না, হ্যাঁ রে।

—তোর বাবুটা খুব ভালো।

—আজ আমাকে ম্যাটিনীতে একটা সিনেমায় নিয়ে যাবে।

—অন্য কারিগরেরা কিছু বুঝতে পারে না?

—কি জানি। তবে আজ আমাদের দোকান বন্ধ। বাবুদের বাড়িতে কাজকর্ম আছে, সবাই সেখানে যাবে।

কবিতা সহজভাবেই বলে, তাহলে আমার সঙ্গে প্রেসে চল, ঐখান থেকে দুপুরবেলা সিনেমা চলে যাবি।

মিতা সলজ্জে বলে, না রে আজকে থাক, একটু অন্য কাজ আছে। তোকে সব পরে বলব। কিন্তু খবরদার আর কাউকে কিছু বলিস না, ওরা আমাকে ক্ষেপিয়ে মারবে।

পরস্পরের সুখদুঃখের কাহিনী এরা শোনে, অবশ্য সব সময় ঘটনার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকের কথা, আজকের আশা, তার সঙ্গে কালকের মিল পাওয়া শক্ত। প্রতিদিনের রোজগারের উপর যাদের ভরসা, সেই দিনের হাসি আনন্দ সুখ-দুঃখের মধ্যে সীমায়িত রাখাই তাদের উচিত। তবু মন মানে না, বয়সের চাপল্য আছে। চোখে স্বপ্ন, তাইতো কোথাও এতটুকু রুপোলী আলো চিক চিক করলে এদের মনও দুলে ওঠে।

হুড়মুড় করে ট্রেন এসে থামল শেয়ালদায়। তার চেয়েও তাড়াহুড়ো করে মেয়েগুলো অন্য যাত্রীদের সঙ্গে নামল। এখন স্টেশন পেরিয়ে শহরে ঢোকার পালা।

—টিকিট, টিকিট।

এ মেয়েগুলো কোনদিনই টিকিট কাটে না। কাটে না সামর্থ্য নেই বলে। এ লাইনের টিকিট-চেকাররা জানে বলেই এদের বিরক্ত করে না। আজ একটা

উটকো লোক টিকিট দেখছিল, কবিতাকে ধরে, টিকিট দেখান।

কবিতার সহজ উত্তর, টিকিট নেই।

—তাহলে পয়সা দিন।

—পয়সা নেই।

—বাঃ, বেশ কথা, তা হলে ট্রেনে চেপেছেন কেন?

—কলকাতায় আসবার জন্যে।

এই তর্কাতর্কির মধ্যে অন্য মেয়েগুলো কিন্তু গেট পেরিয়ে গেছে।

টিকিট-চেকার কবিতাকে ধমকায়, তা হলে চলুন আমার সঙ্গে।

কবিতা হাসে, কোথায় যাব?

—আমি যেখানে নিয়ে যাব।

কবিতা মুহূর্তের মধ্যে টিকিট-চেকারের হাতটা চেপে ধরে, সঙ্গে সঙ্গে গান জুড়ে দেয়,

আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি তো এপথ চিনি না।

দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েগুলো খিল খিল করে হাসে, অপ্রস্তুত টিকিট-চেকারের কান লাল হয়ে ওঠে, গেট ছেড়ে ভদ্রলোক অন্যদিকে পালিয়ে যায়। কিন্তু বিপদ হয় কবিতার, ইতিমধ্যে মজা দেখবার জন্যে ভিড় জমতে শুরু করেছে, পুরুষ মানুষের ভিড়। এরা কেউ অফিসের কেরানী, কেউ শিক্ষক, কেউ দোকানী, কেউ ছাত্র। কিন্তু এখানে তাদের একটাই পরিচয়—তারা পুরুষ। মাঝখানে একটা কম বয়েসী মেয়ে, তাকে নিয়ে খানিকটা কৌতুক করার নির্লজ্জ বাসনা। চোখে লোভ, মুখে হাসি। এদেরও বাড়িতে স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে, বোন আছে। তবু পরিস্থিতির চাপে পড়ে ঘরের বাইরে কাজ করতে আসা একটি অসহায় মেয়েকে নিষ্করুণ বিরক্ত করতে এতটুকু তাদের বিবেকে বাধে না। এর জন্যে আপিস যেতে দেরি স্বীকার করতেও তারা রাজী।

এই অবস্থায় মেয়েগুলো এসে কিন্তু কবিতাকে বাঁচাবার চেষ্টা করল না, ভিড়ের ভেতর থেকে এগিয়ে এলেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, বললেন, চলো আমার সঙ্গে।

কবিতা মুখ তুলে দেখে, লোকটি অপরিচিত। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে পারল না।

প্রথমটা ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসার সময়ে কিছু কিছু আঁকা-বাঁকা মন্তব্য ওদের কানে এল, তবু গ্রাহ্য না করে ওরা বেরিয়ে পড়ল স্টেশনের বাইরে। সেখানে ব্যস্ত মানুষের স্রোত বইছে, তারই মধ্যে ওরা মিলিয়ে গেল।

পাশাপাশি চলতে চলতে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোথায় যাবে?

কবিতা উত্তর দিল, কাছেই একটা প্রেস আছে, সেখানে ফর্মা ভাঁজাই-এর কাজ করি।

—পৌঁছে দিতে হবে?

—না, আমি নিজেই চলে যাব।

—যদি তোমার দেরি না হয়ে থাকে, চা খাবে?

মেয়েটির সহজ উত্তর, খেতে পারি। অনেক সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তো।

ভদ্রলোক শেয়ালদার চৌরাস্তা পেরিয়ে ডানদিকের একটা রেস্তরাঁয় ঢুকছিলেন, মেয়েটি বাধা দিল, ওখানে গলা-কাটা দাম নেয়, আর একটু এগিয়ে চলুন, একটা ছোট্ট চায়ের দোকান আছে, অনেক সস্তা।

কবিতা তাকে যে চা-ঘরে নিয়ে গেল তা ছোট হলেও অপরিচ্ছন্ন নয়। পাঁউরুটি পাওয়া যায় না, তাই খানকয়েক লেড়ো বিস্কুট আর দু কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন ভদ্রলোক। মেয়েটি জানাল, দুপুরে এখানে ভাত রাঁধে, একটা তরকারি আর ভাজা দেয়। মাঝে মাঝে আমরা এখানে খাই। ওই যে লোকটা চা বানাচ্ছে, ও কিন্তু আসলে বামুন, ভাল রান্না করে।

—আমরা মানে তুমি আর কে?

মেয়েটি হাসল, যে যেদিন খাওয়ায়, নিজের পয়সায় তো খেতে পারি না। আজকে যেমন আমরা বলতে আমি আর আপনি।

কথার ধরনে ভদ্রলোক না হেসে পারেন না, তুমি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পার।

—শিখতে হয়েছে। বাইরে বেরলেই কথা বলতে হয়।

—তোমরা রেফ্যুজি?

মেয়েটি প্রতিবাদ করল, আমি নই, আমার বাবা মা।

—তার মানে?

—আমি জন্মেছিলাম শেয়ালদা স্টেশনে। আমি তো কলকাতার মেয়ে —পশ্চিমবঙ্গের।

ইতিমধ্যে চা দিয়ে গিয়েছিল, মিষ্টি কম, একটু বেশী কড়া।

ভদ্রলোক স্বীকার করলেন, লক্ষ্য করছিলাম তোমার কথায় বাঙাল টান নেই। বাড়িতে কে আছেন?

—বাবা মা, এক পাল ভাই বোন। আমি বড় মেয়ে। একলা আমি রোজগার করি।

—কেন, বাবা?

—অসুস্থ। পি. এল ক্যাম্পে ভর্তি হবার চেষ্টা করেছিলেন তবে ঠিক জায়গায় ঘুষ দিতে পারেননি বলে জায়গা পাননি।

ভদ্রলোক ভুরু কোঁচকান, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কবিতা হাসতে হাসতেই বলে, না বোঝার কি আছে? সরকার লোক দেখিয়ে বাস্তুহারাদের জন্যে টাকা খরচ করে। অফিসাররা আর দালালরা ভাগাভাগি করে খেয়ে নেয়, যে তিমিরে সেই তিমিরে।

—তোমার বয়েস কত?

—ঠিক জানি না। আঠার, উনিশ, কুড়ি, কিছু একটা হবে।

ভদ্রলোক মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকালেন, চোখ দুটি বড় বড়, বেশ ময়লা রং। রোগা, প্রয়োজনমত আহার না পেলে যে অস্বাস্থ্যকর চেহারা প্রকট হয়ে ওঠে মেয়েটি তারই প্রতিমূর্তি।

—তোমার নাম তো কবিতা?

—কি করে জানলেন?

—ট্রেনে তোমায় ডাকাডাকি করছিল যে।

মেয়েটি বিস্ময় প্রকাশ করে, আপনি ঐ ট্রেনে আসছিলেন বুঝি? লক্ষ্য করিনি তো! জানেন, কবিতা নামটা বাবা মা দেয়নি, আমি নিজে রেখেছি। আমি কবিতা লিখি কিনা, গানও বাঁধি।

—যে গানটা তোমরা গাইছিলে, তোমার লেখা?

কবিতার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আরও অনেক গান আমি লিখেছি, সারা দিনে সময় হয় না তো, তাই ট্রেনে যাবার আসবার সময় আমরা গান করি। আপনি এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

—কাঁচড়াপাড়া।

কবিতা ফিক ফিক করে হাসে।

—হাসছ কেন?

—কাঁচড়াপাড়ার আমরা অন্য একটা নাম দিয়েছি।

ভদ্রলোক কৌতুকবোধ করেন।

—ওখানে কতকগুলো চ্যাংড়া ছেলে আছে, মেয়েদের জ্বালিয়ে মারে। আর একটি মারাত্মক স্টেশন বেলঘরিয়া। কখন যে কি ঘটে, সব সময় আতঙ্ক।

—আমি কয়েকদিন থেকে তোমাদের লাইনে যাতায়াত করছি—

—কেন?

—এমনি।

এইবার কবিতার চোখে কৌতূহল, আপনি কে? এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? কোন নেতা-টেতা নন তো?

—নেতা হলে কি হবে?

—ওরে বাপ্, নেতারা হলো ডেঞ্জারাস, যারা সরকারের বিরোধীপক্ষে নেতা, তাদের কাছে আমরা হলাম ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। যে-কোন আন্দোলন

হলেই আমাদের ঠেলে দেবে। কোথাও গুলি চললেই বুক পেতে দাও, কারণ তাঁদের কাছে আমাদের জীবনের তো কোন দাম নেই।

একটু থেমে নিজেই বলে, আবার সরকারী পক্ষের নেতারা যেখানে যা গোলমাল হবে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেবে। জনসভায় বক্তৃতা দেবেন, যত গোলমাল রেফিউজিরা করছে। ওদের নীতি হলো—সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে শালাকে ধর।

ভদ্রলোক এবার হো হো করে হাসলেন, বাঃ, বেশ বলেছ। তবে তোমার ভয় নেই, আমি নেতা নই। হবার ইচ্ছেও নেই, হবও না।

কবিতা ভদ্রলোকের ঘড়িটা দেখে নেয়, আর দেরি করলে কপালে বকুনি আছে। চলুন না, প্রেসটা দেখে যাবেন।

—চল।

বেশি দূরে নয়, দু একটা রাস্তা পেরিয়েই সরু গলির মধ্যে ছোট্ট প্রেস।

ভদ্রলোক বাইরে থেকেই চলে যাচ্ছিলেন, কবিতা ছাড়ল না। বলল, ভেতরে আসুন, আমাদের বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, খুব আলাপী লোক।

দরজা ঠেলে প্রথমে ঢুকল কবিতা, সঙ্গে সঙ্গে আলাপী বাবুর আলাপ শোনা গেল, এই যে, এতক্ষণে সময় হয়েছে। কি, ট্রেন লেট ছিল? না, জনতা ট্রেনের কামরা ছেড়ে লাইনে বসে পড়েছিল। আজ কোন নতুন গান বাঁধছিলে বুঝি?

কবিতা হেসেই উত্তর দিল, ওসব কিছু নয়, মামার পাল্লায় পড়েছিলাম।

—কোন মামা? আবোল তাবোলের গোষ্ঠ মামা?

—না, না, শেয়ালদার টি টি মামা। পাছে আপনি বিশ্বাস না করেন তাই সাক্ষী নিয়ে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে গলা শোনা গেল, আসামী সাক্ষী হাজির কর।

কবিতা দরজা খুলে দিতে ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন। প্রেসের মালিক তাঁকে দেখে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, আরে অনাদি—

অনাদিপ্রসাদেরও মনে হয়, অন্যজন চেনা-চেনা। তবে ঠিক বুঝতে পারছেন না, আউট্ অফ ফোকাস লেন্সের মত চেনা মুখখানা এক একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

—আরে, আমায় চিনতে পারছিস না। আমি অশোক, তোর ক্লাসফ্রেন্ড। অশোক জানা—

আর বলতে হয় না, অনাদিপ্রসাদেরও চোখ দুটো নেচে ওঠে, ছড়া কেটে বলেন, অশোক জানা, বলতে মানা, দু' পিঠে দুই কাব্য-ডানা।

—এইতো মনে পড়েছে, তখন কত কবিতা লিখতাম বল তো, দিস্তে দিস্তে

কবিতা, এখন সেগুলো পেলে ছাঁট কাগজ করতাম। অন্যদের উদ্দেশ্য করে বলে, আরে তোমরা চিনতে পারলে না, বিখ্যাত—

অনাদিপ্রসাদ থামিয়ে দেন, প্লীজ, বিশেষণ আর নয়।

॥ ছয় ॥

অশোক জানা সম্বন্ধে কবিতা যে মন্তব্য করেছিল, তা মিথ্যে নয়—লোকটি সত্যিই আলাপী। তার ওপর অনেকদিন বাদে ছাত্রজীবনের সহপাঠীকে কাছে পেয়ে অশোক জানা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। অনাদিপ্রসাদকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল ক্যাম্বিস লাগান ইজিচেয়ারে। প্রেসের মধ্যে বসবার পক্ষে এইটে সবচেয়ে আরামপ্রদ আসবাবপত্র। অশোক জানা বেশীর ভাগ সময়ে ওই চেয়ারে বসেই প্রুফ দেখে, নিজে লেখে, মক্কেলদের সঙ্গে আলাপ করে। একটা জলচৌকী টেনে নিয়ে সে অনাদিপ্রসাদের কাছে বসে পড়ে বলল, দ্যাখ, কি রকম প্রেস করেছি। দু'খানা মেশিন, কম্পোজিং রুম, বাঁধাই-এর সেক্সান নিজেরা খুলেছি,—রীতিমত প্রেসের মালিক। তুই কখনও ভাবতে পেরেছিলি যে আমি ব্যবসাদার হবো?

অনাদিপ্রসাদ শুক্‌নো হাসলেন, তুমিও কি ভেবেছিলে আমি গল্প উপন্যাস লিখে জীবনটা কাটিয়ে দেব?

অশোক জানা অস্বীকার করল না, তা সত্যি, সে সময় তোর লেখা বড্ড কাঁচা ছিল, দুর্বল ভাষা, আর পড়লেই মনে হতো ব্যাকরণ ভুল।

—আর এখন?

—তোর লেখা? পড়ি না।

—কেন?

—সময় কোথায়? এখন পড়া বলতে ওই প্রুফ পড়া। ভ্রম সংশোধন। মনে আছে ক্লাসে মধুসূদন বানান লিখতে দিলে তুই বরাবর ভুল করতিস?

তারা দুজনেই প্রাণ খুলে হাসে।

ছেলেবেলার কথা একবার শুরু হলে তা আর থামতে চায় না। ফেলে আসা দিনের স্মৃতি রোমন্থন করার মধ্যে কেমন যেন নেশার মাদকতা আছে। কারণ অভিজ্ঞতার তিক্ততা আর থাকে না অথচ সুখের স্মৃতিটুকু সবুজ ঘাসে ভরা জমির মত সজীব হয়ে থাকে।

আশোক জানা মনে করিয়ে দেয়, তুই পত্রিকায় লেখা পাঠাতিস, সঙ্গে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠাবার স্ট্যাম্প অথচ লেখা ছেপেও বেরুত না, ফিরেও আসত না, স্ট্যাম্পগুলো কাজে লাগত বোধ হয় সম্পাদকের দপ্তরে।

অনাদিপ্রসাদ হাসতে হাসতে বলেন, সেই জন্যেই তো কৌশল বদলে ছিলাম, নিজের নামে লেখা ছাপা না হলে আবার সেটা মেয়েদের নাম দিয়ে পাঠিয়ে দিতাম।

—সাধনা সেন, তোকে তখন কে চিনত, সাধনা সেনের কবিতা বেরত, প্রবন্ধ, গল্প, সে মেয়েটা এখন কোথায়?

—জানি না।

অশোক জানা ছাড়বার পাত্র নয়, আরে তোর সঙ্গে তো তখন তার একটু 'ইয়ে' হয়েছিল।

অনাদিপ্রসাদ হাসেন, সে কি আজকের কথা, আমাদের সামনের বাসার ভাড়াটাদের মেয়ে, তোরা আমার লেখা পড়ে হাসতিস, কিন্তু ওই মেয়েটা আমাকে উৎসাহ দিত। ও বলত, আমি একদিন নামকরা লেখক হবো।

—তবে? তার খবর রাখা তোর উচিত ছিল।

—প্রথম উপন্যাস বার হবার পর ওই মেয়েটির কথা আমার মনে হয়েছিল, ওকে এক কপি বই উপহার দিতে পারলে আমি খুশী হতাম। কিন্তু অনেক জনের মত সেও কোথায় হারিয়ে গেছে।

—কিন্তু আমি হারাইনি। দ্যাখ সেই ছাত্রজীবনের আদি ও অকৃত্রিম অশোক জানা আজও বহাল তবিয়েতে বর্তমান। তুই লেখক, আমি প্রেসের মালিক—

অনাদিপ্রসাদ পাদপূরণ করে দেন, দুজনেরই লেখার ব্যবসা, বলেই হা হা করে হাসেন।

—হাসছিস যে?

—ওই তো বললাম 'লেখার ব্যবসা'। তুমি হরফের পর হরফ সাজিয়ে লেখা ছাপছ, আর আমি কথার পর কথা সাজিয়ে লেখা লিখছি। দিব্যি ব্যবসা। ব্যবসায় লাভের অঙ্ক বাড়াতে গেলেই ভেজাল মেশাতে হয়, আমি দেদার মিশিয়েছি, তুমিও নিশ্চয় মেশাও?

—কি?

—দুধে জল, ঘিয়ে চর্বি, চালে কাঁকর—,

অবোধ অশোক জানা বোঝাবার চেষ্টা করে, আমি ওসব ব্যবসা করি না—

—আহা, ছাপার ব্যবসা কর তো? অনাদিপ্রসাদ হাসেন।

ঠিক এই সময় দরজার কাছে মোটর সাইকেলের আওয়াজ পাওয়া গেল, মিঃ দত্ত ভেতরে ঢুকলেন, কি অশোকবাবু, আমার ছাপার কাজগুলো হয়ে গেছে?

অশোকের চটপটে উত্তর, হবে না মানে, আমার যে কথা, সেই কাজ। প্যাকেট বেঁধে রেখে দিয়েছি। বসুন, দিচ্ছি।

—না আজ আর বসব না।

—ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে?

—আরে মশাই, আপিসের তাড়া, আপনারা বুঝবেন কি করে। একটু দেরি হলেই পঁচিশ রকম কথা শোনা। দিন, বিলটা দেখে দিন।

মিঃ দত্ত বিল অনুযায়ী ক্যাশ টাকা পেমেণ্ট করে দিয়ে প্যাকেট নিয়ে প্রেসের বাইরে গিয়ে অশোক জানাকে কাছে টেনে কানে কানে কয়েকটা কথা বলে। অশোক জানা দুখানা দশ টাকার নোট দত্তকে ফিরিয়ে দেয়। অনাদিপ্রসাদ চুপচাপ ওদের লক্ষ্য করছিলেন, অশোক জানা ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, দুজনেই দুজনকে টাকা দিলে, ব্যাপার কি? অশোক জানা কান এঁটো করে হাসে, ও আমাকে দিল বিলের পেমেণ্ট, আর আমি ওকে দিলাম কমিশনের টাকা।

—কিসের কমিশন?

—ভদ্রলোক আমার জন্যে ছাপার অর্ডার এনে দেন, একশখানা ছাপিয়ে হাজারের বিল করতে হয়, বাড়তি নশো কাগজের দামটা ওঁর কমিশন।

এবার অনাদিপ্রসাদের হাসার পালা, পথে এস বন্ধু, তাইতো বলছিলাম, ভেজাল ছাড়া কি ব্যবসা চলে?

—ও, এই ভেজাল। অশোক জানা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে, এ তো কিছুই নয়, এই ধর আমি একটা স্কুলের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপাই। কয়েক বছর থেকে ছাপছি, তার জন্যে হেডমাস্টার মশাইকে কমিশন দিতে হয়, অথচ যে রেটে ছাপি, তা থেকে কমিশন দেব কি করে? আমি বুদ্ধি করে করলাম কি ওই স্কুলের যে সব মাস্টারমশাইরা কোচিং ক্লাস চালান, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। টাকা দিলে কোশ্চেন বলে দেব, তাঁরাও হাতে স্বর্গ পেলেন। সারা বছর ধরে ছাত্রদের কাছে মাইনে নিয়েছেন, অথচ পড়াননি। আবার তাদের পাশ করাতে না পারলে গার্জেন চটে যাবে, ফলে টাকা দিয়ে তাঁরা প্রশ্নগুলো জেনে গেলেন, আমিও হেডমাস্টার মশাইকে কমিশনের টাকা দিয়ে দিলাম।

অনাদিপ্রসাদ তারিফ না করে পারেন না, বা, বা, এ তো সেই নাকের বদলে নরুন পেলামের থিওরী। টাক ডুমা ডুম ডুম। ছাত্ররা না পড়ে কোশ্চেন জেনে পাশ করে গেল। মাস্টাররা না পড়িয়ে মাইনে পেয়ে গেল, তুমি কোশ্চেন বিক্রি করে টাকা পেয়ে গেলে, আর হেডমাস্টার মশাই পেয়ে গেলেন কমিশন, টাক ডুমা ডুম ডুম। ছাত্রসমাজ, এরাই আমাদের আশার আলো, এরাই আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন। টাক ডুমা ডুম ডুম, টাক ডুমা ডুম ডুম।

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, অশোকদা আছেন নাকি?

—কে গো?

—আমি লম্বু।

—ভেতরে আয়।

লম্বুর নামের সার্থকতা আছে, সত্যিই লোকটা লম্বা, ঘাড় উঁচু করে কথা বলতে হয়।

—কি দাদা, লাইসেন্সের জন্যে লোক এসেছিল?

—আজ আসবে।

—আমাদের চাঁদা পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে গেলাম। যতটা বেশি পারেন লাইসেন্স ফী দিয়ে রাখবেন।

—ঠিক আছে লম্বু, আর বলতে হবে না।

লম্বু পঞ্চাশটাকা অশোক জানার দিকে এগিয়ে দেয়।

—হাঁরে লম্বু, আবার গোলমাল টোলমাল হবে নাকি?

—হলেই হলো, আপনার ভাবনা কি, আমরা তো আছি।

—সেই ভরসায় তো এখানে থাকা। জানিস অনাদি, লম্বু বড় ভালো ছেলে, যত যা-ই গোলমাল হোক ও এ পাড়াটাকে ঠিক সামলে রাখে।

লম্বু কিন্তু প্রশংসা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে না, বলে, চলি অশোকদা, পারি তো বিকেলের দিকে আসব।

লম্বু চলে যেতে অশোক জানা ফিস ফিস করে অনাদিপ্রসাদকে বলে, এ পাড়ার নামকরা গুন্ডা, হাতে যে সব দুর্দান্ত ছেলে আছে, একদিনে শহরের চেহারা পাল্টে দিতে পারে।

অনাদিপ্রসাদের বিস্ময়, তাহলে ওরা তোমায় চাঁদা দিয়ে গেল কেন?

—প্রেসের লাইসেন্স ফীটা বাড়িয়ে রাখার জন্যে। যাতে বেশি লোকের জন্যে আদালতে জামীন দাঁড়াতে পারি। যদি লম্বুকে ধরে নিয়ে যায়, আমার জামীনে ও খালাস হয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে। এরাই আমার প্রেস পাহারা দেয়, কোন রকম গোলমাল হতে দেয় না।

—কি সর্বনাশ, গুন্ডা পোষণ!

এ ছাড়া তো টিকে থাকার কোন উপায় নেই। সরকার যখন নিজেই দুর্বল, তখন জোর যার মুলুক তার। অতএব লম্বুর ঘাড়ে চড়ে অশোক জানাকে ভবসিন্ধু পার হতে হবে।

অনাদিপ্রসাদ সকৌতুকে বলেন, ছাত্রজীবনের অশোক জানাকে ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু প্রথম দর্শনেই ব্যবসায়ী অশোক জানাকে বন্ধুত্বে বরণ করে ফেলেছি। শুধু তুমি বন্ধু নও, দেখছি দার্শনিকও বটে। কে বলতে পারে ভবিষ্যতে হয়তো পথপ্রদর্শক হবে। ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইড।

আবার দুজনের প্রাণখোলা হাসির ডুয়েট।

যে প্রশ্নটা প্রথমেই করা স্বাভাবিক ছিল, অশোক জানার এতক্ষণে তা খেয়াল হলো, তুই হঠাৎ এ প্রেসে এসে পড়লি কি করে?

—ওই মেয়েটির সঙ্গে।
—কবিতাকে তুই চিনিস?
—রানাঘাট থেকে এক ট্রেনে আসছিলাম।
—রানাঘাটে কেন?
—আজকাল খুব ঘুরছি।

অশোক জানার ক'দিন আগের কথা মনে পড়ে গেল, তোকে বোধহয় আমি রাজাবাজার-এ দেখেছিলাম।

অনাদিপ্রসাদের শান্ত উত্তর, আশ্চর্য নয়। সব বাজারেই ঘুরে দেখছি। সাদা বাজার, লাল বাজার, কালো বাজার,—রানী বাজার—

অশোক জানা রসিকতা করে, সেই সঙ্গে শ্যামবাজার, বাগবাজার, বড়-বাজার, কি বলিস?

অনাদিপ্রসাদের চোখদুটি হাসে, আসলে কিন্তু আমি ছোট বাজারের লোক, আর পছন্দ করি খোলা বাজার।

—বেশ কথা বলতে শিখেছিস। এবার থেকে নাটক লেখ।

—একবার লেখবার ইচ্ছে হয়েছিল, সে সময় খানকয়েক জনপ্রিয় নাটক দেখেছিলাম, ওই শ্যামবাজারেই, বস্তা-পচা গল্প, সেণ্টিমেণ্টের চচ্চড়ি, আর সেক্সের সুড়সুড়ি। ঘেন্নায় আর নাটক লিখলাম না।

অশোক জানা বিনাভূমিকায় উঠে দাঁড়ায়, চল তোকে বাসাটা দেখিয়ে দিই।

—না থাক, আজ দেরি হয়ে যাবে।

—খুব কাছে, পাঁচ মিনিটের রাস্তা। যখন এদিকে আসবি, হয় প্রেসে না হয় আমার বাসায় চলে আসবি। টেলিফোন আছে, আগে থেকে জানিয়ে দিতে পারিস।

অগত্যা অনাদিপ্রসাদও উঠে পড়েন, চল, বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে নেবো, আজ আর ভেতরে ঢুকব না।

রাস্তায় চলতে চলতে অশোক জানা অনর্গল বকে যায়, খুব খাটতে হয়েছে রে, যতবারই দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি, বিরাট ঝড় উঠে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এক সময় তো প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। বউ ছেলেদের নিয়ে চলে গিয়েছিলাম দেশে।

—ক'টি ছেলেমেয়ে?

—দুই মেয়ে তিন ছেলে। আমি প্রেস চালু করে কলকাতায় আবার বাসা নিলাম, কিন্তু ওরা দেশেই রয়ে গেল।

—কেন?

—কলকাতা ওদের ভাল লাগে না। ওখানে থাকার সুবিধে, চালটা পাওয়া

যায়, টাটকা তরকারি, তাছাড়া খোলা-মেলা জায়গা। স্কুল, কলেজ সবই তো আছে, কলকাতায় এসে আর কি করবে। সাধ ছিল দেশে একটা পাকা বাড়ি করব, এতদিনে করতে পেরেছি। দোতলা, বারখানা ঘর।

বলতে বলতে অশোক জানার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বহুদিনের স্বপ্ন তার সার্থক হয়েছে, আমাদের মত ছোট প্রেস চালিয়ে বাড়ি করা যায় না। গত ইলেকশানের দৌলতে বেশ মোটা টাকা হয়ে গেল।

—কি রকম?

—আরে কত ছাপার কাজ, পোস্টার প্যামপ্লেট, সব নগদ নারায়ণ। রাত দিন মেসিন চালিয়েছি। ঝন ঝন করে টাকা পড়েছে ক্যাশ বাক্সে। পাছে খরচা করে ফেলি তাই লাগিয়ে দিলাম বাড়িতে।

অনাদিপ্রসাদের কাছে এ তথ্য সত্যিই জানা ছিল না। তাই জিজ্ঞেস করেন, ইলেকশানের সময় এত টাকা পাওয়া যায়?

—আরে বোকা, ইলেকশান মানেই তো কালো টাকার খেলা। প্রথমত পার্টির নমিনেশান পেতে হবে, অতএব দলপতিকে ঘুষ দাও। নিজের পাব্লিসিটি করতে হবে, প্রেসে টাকা ঢাল, সংগঠন করতে হবে, অতএব স্বেচ্ছা-সেবকের নামে গুন্ডা পোষো, তারপর জেতবার জন্যে ভোট কিনতে হবে। স্রেফ টাকার খেলা। আগে আগে বোকা ছিলাম, ঠিক কলকে পাইনি, কিন্তু এবার গুছিয়ে নিয়েছি।

—পদ্ধতিটা কি?

অশোক জানার চোখে বেড়ালের মিটমিটে হাসি, কাউকে বলিস না যেন, অনেক কীর্তি করেছি। শুধু তো ছাপার কাজ করিনি, এক একজন ক্যান্ডি-ডেটের হয়ে প্যামপ্লেটও লিখে দিয়েছি, এককালে যে লেখবার হাত ছিল তা আবার প্রমাণ হলো। স্রেফ কলমের জোরে শশধর বোসকে জিতিয়ে দিয়েছি।

—কে শশধর বোস?

—বর্তমানে নির্দলীয় এম. এল. এ, তার আগে আমার অনুগ্রহভাজন। লোকটা ক্যাবলাকান্ত। দু লাইন ভাল করে বক্তৃতাও করতে পারে না। লেখাপড়াও তেমনি। তবে চালকলের মালিক, টাকা ছিল। যে রকম হয়ে থাকে, ওর পয়সায় ক'দিন মজা লোটার জন্যে কয়েকজনে মিলে ওকে নির্দলীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিলে। জেতবার কোন আশাই ছিল না, ওর বিরুদ্ধে বহুদিনের স্ট্যান্ডিং এম. এল. এ, নাম নরেন মণ্ডল। ইলেকশানের দিনকয়েক আগে মাথায় একটা ব্রেন ওয়েভ খেলে গেল। শশধরকে বললাম, যদি জিতিয়ে দিই, সে কত টাকা আমাকে দেবে? লোকটা তখন পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছে। জানে জিতবে না, মোটা অঙ্কের টাকা কবুল করে বসল, ব্যস, আমি রাতারাতি শশধর-এর বিপরীত প্রার্থী নরেন মণ্ডলের আত্মজীবনী লিখে ফেললাম।

নিজে কম্পোজ করে নিজে ছাপালাম, তারপর পোস্টে চলে গেল ভোটারদের বাড়ি বাড়ি, ব্যস, নরেন মণ্ডল কুপোকাৎ।

—কি করে?

—একেবারে একাঘ্নী বাণ ছেড়েছিলাম যে। আত্মজীবনীর বয়ানটা শুনবি? নরেন মণ্ডল যেন নিজে লিখছে,—

“আমি দীর্ঘদিন ধরিয়া আপনাদের এবং দেশের সেবা করিয়া আসিতেছি। আপনাদের সমর্থন শুধু নয়, প্রীতি ও ভালবাসা পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্কালে মনের মধ্যে কেমন যেন সংশয় জন্মিয়াছে। জীবনের অনেকগুলি কথা পূর্বে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, কিন্তু আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অকপটে সব কথা বলিব। সত্য ভাষণের যদি কোন মূল্য থাকে তাহলে আমার এই আত্মজীবনী পড়ার পরও আপনাদের সমর্থন লাভ করিব।

“আমি বিপত্নীক। আপনারা জানেন কয়েক বৎসর পূর্বে আমার স্ত্রী পরলোকগমন করেন। কিন্তু একথা হয়তো জানেন না সেই সাধ্বী স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, কারণ আমি সেই সময় আর একজন রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। যাঁহারা দোষ দেন আমি কালোবাজারে চাল বিক্রয় করিয়া টাকা বানাইয়াছি তাঁহারা পুরো সত্য বলেন নাই। জেলা বোর্ড ও স্কুল বোর্ডের গ্রাণ্টের টাকাও আমি আত্মসাৎ করিয়াছি। মিথ্যা বলিব না, জীবনে জালিয়াতি, বিশ্বাসভঙ্গ, হিসাবে গরমিল, কলমবাজী, মাগীবাজী, গলাবাজী ইত্যাদির পর বর্তমানে আমি আপনাদের প্রিয় নেতা।”

বলতে বলতে অশোক জানা হেসে গড়িয়ে পড়ে। চার পৃষ্ঠা ধরে নিজের জীবনের কেচ্ছা। আর দেখতে হলো না, দুম করে বোমা ফাটল; সারা গ্রামে হৈচৈ, প্রবীণ নরেন মণ্ডল লজ্জায় কোথাও মুখ দেখাতে পারে না, ফলে আমাদের ক্যাবলা শশধর এম. এল. এ. হয়ে গেল। আমারও পাকা বাড়ির স্বপ্ন সফল হলো।

অনাদিপ্রসাদ সবিস্ময়ে কথাগুলি গিলছিলেন, জিজ্ঞেস করেন, নরেন মণ্ডল কি সত্যিই ওই ধরনের লোক?

—তাছাড়া ভয় পেল কেন? ওসব শালা এক ছাঁচে তৈরি।

কথা বলতে বলতে অশোক জানার বাসা এসে গেল। অনাদিপ্রসাদ কিন্তু ভেতরে ঢুকলেন না, বিদায় চেয়ে নিলেন, তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল, আর একদিন আসব।

—সেদিন পড়িয়ে দেব নরেন মণ্ডলের আত্মকথা।

সরু গলি পেরিয়ে ইঁট বার করা সিঁড়ি দিয়ে উঠে কলতলা টপকে দুখানা ছোট্ট ঘর নিয়ে অশোক জানার বাসা। উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি পাড়া। এপাশে

ওপাশে চারিদিকে ছোট ছোট ঘর, এক একটা সংসার। এককালে এগুলো ছিল স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের গৃহ। কিন্তু ক্রমে অর্থনৈতিক চাপে আর রুচির পরিবর্তনে সেই গৃহ রূপান্তরিত হয়েছে ছোট ছোট বাসায়। টুকরো টুকরো নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের মাথা গোঁজার আস্তানায়।

ঘরে ঢুকে অশোক জানা অবাক না হয়ে পারল না, তার জন্যে অপেক্ষা করছে স্বয়ং শশধর বোস এম. এল. এ. যার কথা এতক্ষণ সে বলছিল, অনাদিপ্রসাদকে।

—আরে মশাই আপনি কতক্ষণ?

ভদ্রলোকের চোখ মুখ শুকনো, বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এ...

—বিপদে না পড়লে তো আপনি আমার কাছে আসেন না।

—তা নয়, একটা বেনামী চিঠি এসেছে।

—কি লিখেছে?

—আমাকে খুন করবে।

—সে কি! অশোক জানার কথা আটকে যায়, কেন খুন করবে, আ... কার কি করেছেন?

শশধর বোস থর থর করে কাঁপে, ইলেকশানে জেতাই আমার কাল হয়েছে মশাই। আমার মনে হচ্ছে এর পেছনেও নরেন মণ্ডল আছে। আমাকে মেরে ফেলতে পারলেই ওখানে বাই-ইলেকশান হবে, তখন ও জিতে যাবে।

—এ তো সর্বনেশে কথা। বলে কয়ে খুন? পুলিসে খবর দিয়েছেন?

—কাউকে কিছু বলিনি, প্রথমেই আপনার কাছে এসেছি। পেছনে একটা দল থাকলেও রক্ষে ছিল, নির্দলীয়দের এরা বাঁচতে দেবে না। আমার কি হবে অশোকবাবু, ছেলেমেয়েরা এখনও নাবালক, স্ত্রী যুবতী—,

অশোক জানা ভরসা দেবার চেষ্টা করে, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমার হাতেও লম্বুরা আছে, তারা ওরকম দশটা নরেন মণ্ডলের মহড়া রাখতে পারে, ভাববার কিছু নেই। সঙ্গে টাকা এনেছেন তো?

—তা হাজারখানেক হবে।

—ব্যস্ ব্যস্, ওতেই হবে। অশোক জানার মনে পড়ে গেল, দেশের বাড়ির বাইরে দেয়ালের বালির কাজ আর রং করা এখনও বাকী আছে।

॥ সাত ॥

ইংরাজরা চলে যাবার পর স্বাধীনতার বিশ বছরের ইতিহাসে শহর কলকাতার নতুন সংযোজন পার্ক স্ট্রীটের শীততাপনিয়ন্ত্রিত রেস্তরাঁগুলো। আগে

যা ছিল ছোট ছোট কাফে কিংবা কেবিন, সেখানে পাওয়া যেত বিলিতী রান্নার অনুকরণে মুখরোচক দেশী ডিশ—চপ, কাটলেট, ফ্রাই, যা শুধু এ-দেশ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। দিশী-বিলিতী রান্নার বিচিত্র কক্‌টেল। সেইদিনকার কেবিন-কাফে আজও আছে, কিন্তু আগের সে জৌলুস নেই। কিংবা পার্ক স্ট্রীটের নতুন গজানো রেস্তরাঁর চাকচিক্যের সামনে তারা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

এই বিশ বছরে মানুষের রুচি বদলেছে. বিলিতী কায়দার তিন কোর্সের ঞ্চ-ডিনারে আর কারুর মন ভরে না, তারা ়েয় নানা স্বাদের পাঞ্জাবী রান্না। ব্রেডের বদলে এসেছে নান্‌, রোস্টের বদলে তন্দুরী, চপ-কাটলেটের াবাব, ক্যরির বদলে রোগনজুস্‌। পাঞ্জাবীদের হোটেল আগেও ছিল, াছে—যেখানে পাওয়া যায় তড়কা আর রুটি, লার্ডে রাঁধা মাংসের ন্তু তাদের কোন আভিজাত্য নেই। তাই তো পার্ক স্ট্রীটের পাঞ্জাবী বহুদিনের নাম করা হোটেল, কাফে, কেবিনের বাজার মন্দা করে ছে।

হোটেলের ব্যবসা পাঞ্জাবীরা জানে, সারা ভারতবর্ষে বেশির ভাগ নাম করা হোটেল-রেস্তরাঁর মালিক তারাই। স্বাধীনতা কিনতে দু'টি প্রদেশের লোককেই সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতে হয়েছিল—বাংলা আর পাঞ্জাব। সর্বনেশে দিল্লীর সিংহাসনে বসবার একটা প্রচণ্ড লোভ আছে—আছে মারাত্মক নেশা। যার লোভে ছুটে এসেছিল তৈমুর, এসেছিল নাদির শা, যেখানে চেপে বসল পাঠান, মুঘল, ওই সিংহাসনের জন্যেই ঔরঙ্গজীবের আর্তনাদ—রাষ্ট্রবিপ্লব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর টুপিওয়ালা বণিকরাও দিল্লীর মসনদকে ভুলতে পারল না, ওই একই নেশায় ধরল কুইন ভিক্টোরিয়াকে। তা থেকে পরিত্রাণ পেলেন না আমাদের নেতারাও, সিংহাসনে বসার আর তর সইল না, গান্ধীজীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পাঞ্জাব আর বাংলাকে কেটে ফেলে তাঁরা ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা কিনলেন। নতুন জাতির সৃষ্টি হল—উদ্বাস্তু। একদিন যাদের সব ছিল, ভারতের বাকী প্রদেশবাসীদের জন্যে স্বাধীনতার হাড়িকাঠে বলি হয়ে তারা হল নিঃস্ব। জমি আর লাঙ্গলের ভরসায় যে বাঙালী একদিন বাংলার মাঠে সোনা ফলিয়েছিল, তাদের উদ্বাস্তু করে কলকাতায় টেনে এনে ঢোকানো হল ক্যাম্পে, দেওয়া হল ডোল। কিন্তু দেওয়া হল না জমি-লাঙ্গল। ওস্তাদ জেলেকে মাছ ধরার জাল না দিয়ে বলা হল বাসের ড্রাইভার হও, ফলে বাজারে উঠল না মাছ, অথচ বাসে লাগল ধাক্কা। আজব দেশের আজব নিয়ম। স্যাকরাকে বলা হল, বন্দুক তৈরি কর, তাঁতি বানায় ঘুড়ি। রোজগারের তাগিদে কম্পাউন্ডারকে হতে হল ছুতোর। কতখানি শক্তির অপচয়, যে যা করতে পারত তাকে তা করতে দেওয়া হল না; কারণ,

এ নিয়ে ভাববার লোক নেই। নেতারা এখন হয় এম-এল-এ, নয় এম-পি; আর আত্মত্যাগ নয়, প্রফেশান।

সাবাস পঞ্চনদবাসী! তারা কিন্তু নেহরু-লিয়াকত আলি প্যাক্টে ভোলেনি, ভোলেনি দিল্লীর নেতাদের চোখে কুম্ভীরাশ্রু দেখে। তারা ভিক্ষে নেয়নি, ডোলের বদলে আদায় করেছে কম্‌পেনসেশন—মূলধন, সেই থেকে ব্যবসা। গাড়ির কারখানা, হোটেল, রেস্তরাঁ, দর্জীর দোকান, ছেলেদের খেলনা, ট্যাক্সি, স্কুটার, সারা ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছে। তাদেরই অবদান পার্ক স্ট্রীটের অভিজাত রেস্তরাঁ।

মে ফ্লাওয়ার।

ফুলের মতই সুন্দর ফুটফুটে নিখুঁত মাঝারি আকারের একখানা ঘর, ঠাণ্ডা, রঙচঙে, নীচু টেবিল, নরম সোফা-চেয়ার। আলো খুব কম, নিজের টেবিলের লোক ছাড়া কাউকে দেখাই যায় না বলতে গেলে। মাঝখানটা কাঠের মেঝে, নাচবার উঠোন। উঁচু বেদীর ওপর বাদকদের বসবার জায়গা, তাদের সঙ্গে একটা সাদা চুলের মেয়ে গান করে—সৌন্দর্যের ভাষায় যার নাম ব্লন্ড্‌। বলাই বাহুল্য, এসব জায়গা 'যাদের অনেক আছে' তাদেরই জন্যে। 'যাদের নেই' তারা এ জায়গার খবরও রাখে না, রাস্তা ধরে হেঁটে চলে যায়। দু' দলের মধ্যে পুরু কাঁচের মোটা দেওয়াল, যদিও বা দেখা যায়, শোনা যায় না কিছু। বধির সমাজ।

মে ফ্লাওয়ারে সকালে ব্রেকফাস্ট করতে আসে তারাই, যারা বড় চাকুরে, ন'টার মধ্যে অফিস যেতে হয়, থাকে কোনও ফার্নিশড ফ্ল্যাটে, যেখানে রাঁধবার ব্যবস্থা নেই। খবরের কাগজ পড়া আর ব্রেকফাস্ট খাওয়া প্রায় একই সঙ্গে শেষ করে তারা ছোটে অফিসের দিকে। ভাল-মন্দ খাওয়া নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, তাদের চাহিদা চটপট পরিবেশন করার। এইজন্যেই মে ফ্লাওয়ার রেস্তরাঁ এদের সকলের অতি প্রিয়।

কয়েকজন আছে, যারা এখানে নিয়মমত প্রাতঃরাশ খায়। মুখচেনা হয়ে গেছে, আলাপও হয় মাঝে-মধ্যে, তবে ইংরাজীতে। এ জগতে এখনও রাষ্ট্রভাষা চালু হয়নি।

—আজকে আসতে দেরি হলো যে?

—আর বলবেন না, আমার অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা পাড়ার একটা ছেলেকে তেড়ে গিয়েছিল, সেই নিয়ে এতক্ষণ হাঙ্গামা। আজকাল মানুষ যা হয়েছে —তাদের আবদার, কুকুরটাকে মেরে ফেলতে হবে।

মিঃ নায়ার দক্ষিণ ভারতীয়, কিন্তু এখন কলকাতাই তাঁর ঘরবাড়ি। চমৎকার বাংলা বলেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা মাদ্রাজে, এখানে যাঁর সঙ্গে থাকেন সে ভদ্রমহিলা বাঙালী, মেয়েদের ডাক্তার। তাঁর নিজস্ব রোজগার আছে, তাই

রক্ষিতা আখ্যা দেওয়া যায় না, ইংরেজীতে বলতে হয়, দে লীভ টুগ্যাদার।

নায়ারের বিস্মিত প্রশ্ন, কেন?

অ্যালসেশিয়ান-প্রভু মিঃ মিটার কুচকুচে কালো, আবলুশ কাঠের মত চেহারা, বাবা-দাদার মিত্র উপাধিকে বিকৃত করে মিটার করেছে, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী, সেই অনুপাতে রোজগারের চেয়ে ধার। তবু বাড়িতে দিশী বউ, গোয়ানিজ কুক্, বিলিতী অ্যালসেশিয়ান।

মিটার জবাব দিল, আক্রোশ মশাই। কেন আমার বাড়ি আছে? গাড়ি আছে? কেন আমি পাড়ার লোকদের সঙ্গে বেশী মিশি না? এতদিনের চাপা রাগ গিয়ে পড়ল বেচারি কুকুরের উপর। যেতে দিন ওসব কথা, আপনার চাকরির কন্ট্রাক্ট রিনিউয়ালের কথা কি হলো?

মিঃ নায়ার ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দু' দিকেই মাথা নাড়েন, হ্যাঁ, না, কিছু বোঝা যায় না। বলেন, এখনও পাকা কিছু হয়নি। তবে আপনাকে বলেছি তো, আমার কলিগ্ সুরথ মজুমদারের কথা, প্রত্যেক পার্টিতে ওর সুন্দরী বউটাকে ছেড়ে দেয় ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে, ঝানু ভদ্রমহিলা, সাহেবের সঙ্গে নাচতে নাচতে কি যে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে, মনে হচ্ছে, অপদার্থ স্বামীটিকে ওই টিকিয়ে দেবে। আমার আশা কম।

—তা হলে?

—কলকাতা ছেড়ে যাব না। আমি কাজ জানি, এ কোম্পানীতে না থাকলে অন্য কোথাও যাব। কলকাতা হচ্ছে আমার 'হোম', এখান ছেড়ে এক দিনও বাঁচতে পারব না।

সুরথ মজুমদাররাও এখানে আসে, আসে তাদের বউরাও। অবশ্য আলাদা আলাদা সময় আছে। অফিস যানেওয়ালাদের ভিড় কেটে গেলেই এগারোটা থেকে সাড়ে বারটা এখানে মহিলাদের কফিচক্র বসে। এ'রা সকলেই ধনীর গৃহিণী। স্বামীরা কোম্পানীর মালিক, সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত, ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে গেছে, বাড়ির কাজ দেখতে হয় না, পুরনো ঝি-চাকরে ভরতি। এখন আর চেহারায় যৌবনের চুম্বক নেই, ছেলেরা পেছনে পেছনে ঘোরে না, অগত্যা কফিচক্রের সভ্যা হওয়া। শুধু খাওয়া নয়, সেই সঙ্গে পরচর্চার মুখরোচক তেলেভাজা। এ'দেরও আদান-প্রদানের ভাষা ইংরেজী।

—কি, বলিনি তোমায়, অনিলা কোনদিন ভাল শাশুড়ী হতে পারবে না। অত ঘটা করে ছেলের বিয়ে দিল, এখন তো শুনছি ছেলের বউ-এর সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায়। ক'দিনের মধ্যে ছেলেকে না আলাদা ফ্ল্যাট নিতে হয়।

এমন মুখরোচক সংবাদে তিনবার স্বামী ডিভোর্স-করা হেনা সরকার চনমন করে ওঠে, আমি কিন্তু ভাই ভাবতেই পারি না, অনিলা কি করে এমন অবুঝ হবে। আমার যদি ছেলের বউ আসত মিলিদি—

বাকিটা শোনার কোন অর্থ হয় না, কারণ হেনা সরকারের ছেলেরা তাদের বাবাদের সঙ্গে থাকে।

মিলিদি একজন নামজাদা সমাজসেবী, এঁদেরও উদ্ভব হয়েছে স্বাধীন ভারতে। পৃথিবীর যত্রতত্র এঁদের কনফারেন্স হয়। ছাত্ররা, ডাক্তাররা, বিজ্ঞানীরা সুযোগ না পেলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মতই যখন-তখন এই সমাজসেবীরা বিদেশে যান, জ্ঞান দিতে ও নিতে। সম্প্রতি মিলিদি জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে এসেছেন বেলজিয়ানদের, যারা সন্তান উৎপাদনের জন্য মায়েদের বৃত্তি দেয়। বলাই বাহুল্য, মিলিদি ভারতবাসীর মান রেখেছেন, তিনি সাতটি পুত্র-কন্যার জননী। অবশ্য তাদের দেখার সময় নেই, সমাজসেবীদের তো সংসারের কথা ভাবলে চলে না, সেজন্য মিলিদির স্বামীকে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হয়।

মহিলারা যারা আসে এক জায়গায়ই তাদের মিল, তাদের স্বামীরা বড়লোক। বেশির ভাগই বিগতযৌবনা, বাড়িতে জামাই, ছেলের বউ আসতে শুরু করেছে। খাবার সময় ছাড়া স্বামীর সঙ্গে দেখা হয় না, কিছুদিন আগের স্তাবক অবিবাহিত আঙ্কল, ফ্র্যাঙ্কীরা কমবয়েসী মেয়ের দিকে ঝুঁকেছে, সেই কারণেই এদের এই কফি-মিটিং। মে ফ্লাওয়ারের অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা।

মহিলারা বেরিয়ে যাবার পর আবার অফিসের দিশী সাহেবদের ভিড়। কুইক্ লাঞ্চ। দু'জন, তিনজন—অফিসের ডিরেক্টার বা উঁচুপদের কর্মচারী, সঙ্গে একটি মেয়ে—মক্ষীরানী, আগে এরা হতো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, এখন সেখানে ঢুকেছে ভারতীয়রা, পাঞ্জাবী, বাঙালী, গুজরাটী, যে-কোন প্রদেশের চোস্ত ইংরিজি জানা কেতাদুরস্ত মেয়ে। ঘণ্টাখানেক সরব আলোচনা, মুখরোচক খাবার, শান্ত তরল সেক্স। তিনজন পুরুষই অবিবাহিত, তাই কারুরই ভয় নেই, স্ত্রীর কাছে মেয়ে স্টেনোগ্রাফারের কথা ফাঁস হয়ে পড়ার।

বিকেল থেকে জমতে শুরু করে টীন-এজার্সরা, এদের বয়েস তেরো থেকে উনিশ। এরা জন্মেছে দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়। মাতৃগর্ভ থেকে শুনেছে বোমার আওয়াজ। এদের মধ্যে অনেকেই বাবা-মার অবাঞ্ছিত সন্তান। এরা তা বোঝে, বোঝে বলেই তারা বেপরোয়া। তাদের সাজ-পোশাক বিচিত্র। ছেলেদের মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল। মেয়েদের চুল ছাঁটা পুরুষের মত। এদের জাত বোঝা মুশকিল। মেয়েরা শাড়ি পরে না, ছেলেরা পরে না ধুতি। নিত্য নতুন হাল-ফ্যাশানের প্যাণ্ট, হাঁটু মোড়া, তলা সরু, শরীরটাকে জাপ্টে ধরা জ্যাকেট, আসল উদ্দেশ্য জামা-কাপড়ের মধ্যে দিয়েও দেহটাকে দেখানো।

এদের পয়সার অভাব নেই, বাবা বড়লোক, মা সমাজসেবী, কেউই ছেলেমেয়েদের দেখতে পারেন না বলে নিজেদের দোষ কাটাবার জন্য তারা চাইলেই গাদা গাদা টাকা দেন। তাই এরা বেপরোয়া। স্বল্প-আলো রেস্তরাঁতেও এরা

কালো কাঁচের চশমা পরে। মদ না খেয়েও বাজনা শুনে মাতালের মত নাচে। দ্রুততালের তারতম্য। দেহটাকে যত দূর ঝাঁকানি দেওয়া যায়। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। একজন আর একজনের গায়ে শরীরটাকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। তারই নাম টুইস্ট, শেক, সুইম।

নিজেদের প্রকাশ করার ভাষা এরাও হারিয়ে ফেলেছে। তাই তো বাইরের জগতের কাছে এরা অবোধ্য, তারা মনে করে টীন-এজার্সের আর-এক নাম ছিটেল—পাগলের নামান্তর।

কিন্তু এই টীন্-এজার্সদেরও কিছু বলবার আছে, টাকার অভাব না থাকলেও তারা অসুখী। কি করে সে কথা জানাবে? ভাষা হারিয়ে গেছে। গান, বাজনা, নাচ, ছবি—না, না, কোথাও সুখ নেই, শান্তি নেই, আনন্দ নেই। হৈ হৈ করে এরা কথা বলে, কিন্তু তৃপ্তি পায় না। ঝমঝম করে এরা নাচে, কিন্তু আগুন জ্বলে না। প্রচণ্ড হতাশায় শুয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুম আসে না। এদের আলাপ অন্য ধারায় বয়। ভাষা ইংরিজী।

—ববি, এত মনমরা কেন?

—আর ব'লো না মনুয়া, আজ আবার মিসেস কুশারীকে নিয়ে নাচতে যেতে হবে।

মনুয়ার চোখে কৌতুক, তার জন্যে এত বিমর্ষ কেন? ভদ্রমহিলা তো তোমার জন্যে সব কিছু করেন।

ববি হতাশায় কাঁধ দু'টো ঝাঁকায়, বড় বেশী করেন, ভাল খাওয়ান, যত ড্রিঙ্ক করি সব টাকা উনি দেন, কণ্ডিশান, অন্য মেয়ের সঙ্গে নাচতে পারব না। বোঝ ব্যাপার। আমি নাচতে ভালবাসি, পয়সার জন্যে কতক্ষণ ওইরকম আনাড়ী মেয়ে নিয়ে নাচব। তার ওপর ওর দুঃখ শুনতে হবে।

—মিসেস কুশারীর আবার কিসের দুঃখ? শুনি তো সাদা টাকাই কয়েক লাখ।

—আহা টাকার দুঃখ নয়, মিস্টার কুশারী নাকি এক পাঞ্জাবী মহিলাকে নিয়ে থাকেন, রাত্রে বাড়ি ফেরেন না।

মনুয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে, এই তো সুযোগ, তুমিও মিসেস কুশারীকে ছেড়ো না, অন্তত ওঁর কয়েক লক্ষ টাকা তো তোমার হাতে চলে আসবে।

ববি কিন্তু চটে যায়, এরকম হাসিঠাট্টা আমার ভাল লাগে না, মনুয়া। তুমি জানো, আমি তোমাকে ভালবাসি।

মনুয়া খিলখিল করে হাসে, ববি, প্লীজ, রাগ ক'রো না, পুরুষমানুষের ভালবাসাকে আমি বড় বেশী আমল দিই না, ওই দেখ যে ভদ্রলোক ঢুকলেন, ধুতির উপর লম্বা কোট পরা, উনিও কিন্তু আমাকেই খুঁজছেন, আর আলাপ

হলেই বলবেন উনিও আমাকে ভালবেসে ফেলেছেন, সেইজন্যে—

ববি থামিয়ে দেয়, কে উনি?

—আমিও কি ছাই নাম জানি, ভিক্টোরিয়ার মাঠে আলাপ হয়েছিল। কথাচ্ছলে বলেছিলাম এখানে আসতে, ঠিক এসে হাজির হয়েছেন।

ববির মন্তব্য, বুড়োকে রসিক বলতে হবে।

মনুয়া হাত নেড়ে অনাদিপ্রসাদকে কাছে ডাকল, আপনি আমাকে খুঁজছেন, না আর কাউকে?

অনাদিপ্রসাদের সংযত উত্তর, পার্ক স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম, চোখে পড়ল 'মে ফ্লাওয়ার' নামটা, মনে পড়ল, তুমি বলেছিলে, এই সময় থাকো, তাই—

মনুয়া খিলখিল করে হাসে, এত ভনিতা করার দরকার কি? স্বীকার করলেই তো হয়, আমার জন্যেই এসেছেন।

—তাই বললে যদি তুমি খুশী হও—

—চলুন, নিরিবিলিতে ওই কোণটায় গিয়ে বসি।

ববি জিজ্ঞেস করল, তা হলে আমি কি করছি মনুয়া?

ইংরাজীতে মনুয়ার স্বচ্ছন্দ উত্তর, এ তোমার ভারি অন্যায় ববি, যখন তুমি দেখছ আর একজন পুরুষমানুষকে নিয়ে আমি ব্যস্ত। আশা করি মিসেস কুশারীর সঙ্গে তোমার একটি মধুর সন্ধ্যা কাটবে।

ববি কিন্তু মনুয়ার হাসিতে যোগ দিল না।

অনাদিপ্রসাদের পাশে মনুয়া ঘন হয়ে বসল, কি খাবেন বলুন? চা, কফি, পেস্‌ট্রি বা অন্য কিছু? চীজের পকোড়া এরা খুব ভাল করে।

অনাদিপ্রসাদ মেনুটা মনুয়ার দিকে ঠেলে দেয়, তোমার যা ইচ্ছে অর্ডার দাও, খাওয়াচ্ছি তো আমি।

—কেন?

—বাঃ, আমি তোমার চেয়ে কত বড়!

মনুয়া আবার হাসল, ওসব থিওরী আজকাল চলে না। কার কত বয়েস, কে বড় কে ছোট ওসব পুরনো হিসেব আমরা মানি না।

—তা হলে তোমরা কি মান?

মনুয়ার স্পষ্ট জবাব, আপনি পুরুষ, আমি মেয়ে।

এবার অনাদিপ্রসাদের হাসবার পালা, আমি তো বুড়ো—

মনুয়ার চোখে-মুখে কৌতুক, বুড়োরাই তো সবচেয়ে দুষ্টু হয়, বিশেষ করে আমাদের দেশে। পাকা চুলের লাইসেন্স নিয়ে ছুঁড়িগুলোর কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

—তোমরা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা মারাত্মক কথা বল। বয়েস কত তোমার?

—বললাম তো, সে হিসেব রাখি না। আমরা 'টীন্-এজার'।

এমন সময় নাচের বাজনা শুরু হয়ে গেল। একটি ছেলে এসে মনুয়াকে ডেকে নিয়ে গেল নাচতে। যাবার সময় অনাদিপ্রসাদকে বলে গেল, আপনি ততক্ষণ অর্ডার দিন, আমি নাচটা সেরেই আসছি।

ছেলেমেয়েগুলো জড়ো হয়েছে চৌকো কাঠের মেঝের ওপর, বাজনার তালে তালে দেহের নানারকম অঙ্গভঙ্গী, সুরের ছন্দ দেহের ছন্দকে মাতিয়ে তুলছে, চোখে মুখে নিঃশ্বাসে যৌবনের উষ্ণতা।

অনাদিপ্রসাদের মনে হচ্ছিল, কানে তালা ধরে যাবে। এতখানি হইচই হট্টগোলে তিনি অভ্যস্ত নন, তবু দেখতে দেখতে চোখ সয়ে যায়, শুনতে শুনতে কানেরও আর অসহ্য মনে হয় না।

ঝম করে বাজনা থামল। ছেলেমেয়েগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মনুয়া এসে বসে পড়ল অনাদিপ্রসাদের পাশে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, গ্রেট ফান্।

—দেখতে কিন্তু ভাল লাগে না।

—এ নাচ নাচবার জন্যে, দেখবার জন্যে নয়।

—এসব নাচ বাজনা নতুন হয়েছে, আমি দেখিনি।

মনুয়া হাসল, আপনাকে দেখলে মনে হয়, এখনও ভারতনাট্যম্ আর কথক-এর যুগে আছেন। আর হয়তো দেখেছেন রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে 'হাত ঘুরুঘুর নাড়ু দেব নাচ', মণিপুরীর বদহজম।

অনাদিপ্রসাদও হাসলেন, নাঃ, তোমাদের কাছে অনেক কিছু শিখতে হবে।

—যাক্, এতদিনে একটা সেনসিবল বুড়ো লোক পাওয়া গেল, যে নতুনদের কাছে শিখতে চায়। আমাদের দেশের বুড়োগুলোর মুশকিল কি জানেন, চোখে ঠুলি আর কানে তুলো দিয়ে বসে থাকে, নতুন কিছু দেখতে শুনতে চায় না।

—বেশ, তা হলে আজ থেকে আমি তোমার ছাত্র হলাম।

—আর আমি মাস্টারনী? দোহাই আপনার, স্কুলের দিদিমণি হতে আমি রাজী নই।

—তা হলে?

—আমরা বন্ধু হবো। কি, রাজী?

—রাজী।

—আমরা বয়েস মানব না, সমাজ মানব না, সংস্কার তো নয়ই। আমরা পরস্পরকে বোঝাবার চেষ্টা করব, নতুন আর পুরনোর মধ্যে যে যোগসূত্রটা হারিয়ে গেছে যদি সেটা ফিরিয়ে আনা যায় তাতে দেশের উপকার হবে।

অনাদিপ্রসাদ প্রশংসা করেন, তুমি তো বেশ বুদ্ধিমতী, টীন্-এজার বলে মনেই হয় না।

মনুয়ার চটুল প্রশ্ন, এটা কি কম্‌প্লিমেণ্ট?

ওরা দু'জনেই হাসে। মনুয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনি বিবাহিত?

—কেন? তাতে কি হলো?

নিখুঁত ইংরেজীতে মনুয়ার জবাব, আমি বিবাহিত পুরুষমানুষ বেশী পছন্দ করি। ওরা জানে, মেয়েদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয়, ব্যাচেলারগুলো একেবারে আনাড়ী আর আদেখলা।

—ওরে বাবা, তুমি কি মনস্তত্ত্বের ছাত্রী?

—বই পড়ে বলছি না, অনেক পুরুষমানুষের সঙ্গে মিশেছি কিনা, তাই জানি। বিয়ে-করা লোকগুলো সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে আমরা বউদের জানিয়ে দিই, তাই যা চাই তাই দেয়।

অনাদিপ্রসাদ মাথা নাড়েন, অস্বীকার করছি না, তোমাদের বুঝতে অনেক সময় লাগবে, তোমরা কি চাও?

—বাঁচতে চাই, নিজেদের খুশিমত চলতে চাই, জীবনটাকে দেখতে চাই। বিশ্বাস করুন, আমরা খুব সীরিয়াস, কিন্তু আমাদের কেউ বুঝতে চায় না।

—এ কথা বলছ কেন?

মনুয়ার চোখে গভীর হতাশা, আমরা তো সুখী নই, কিন্তু কেন সুখী নই তা কি কেউ বোঝবার চেষ্টা করেছে?

—আমি করবো, অনাদিপ্রসাদ হাত বাড়িয়ে দেন, তোমার হাত দাও। আমরা বন্ধু।

মনুয়া অনাদিপ্রসাদের হাতে হাত রাখে, বলে, বন্ধু। কিন্তু পাড়ে বসে উপদেশ দিলে চলবে না, আমাদের সঙ্গে জলে নামতে হবে।

॥ আট ॥

সেদিন মে ফ্লাওয়ারে ববিকে দেখে মনুয়ার মনে হয়েছিল বড় মনমরা হয়ে বসে আছে। সেও নিজে অনাদিপ্রসাদের কাছে স্বীকার করেছিল 'আমরা তো সুখী নই।'

কিন্তু কেন?

সেইটেই বড় প্রশ্ন। এরা সমাজের ওপর তলার ছেলেমেয়ে, সুখ দুঃখের সঙ্গে টাকার সম্পর্ক বিশেষ নেই, কারণ নিজেদের না থাকলেও এদের বাপ-মায়ের টাকা আছে, নয়তো যাদের সঙ্গে মেশে তাদের টাকা আছে, বরং বলা চলে এদের ক্ষেত্রে অর্থই অনর্থের মূল।

অনাদিপ্রসাদ উঠে যেতেই ববি এসে দাঁড়াল মনুয়ার কাছে, নাচবে এস, প্লীজ। চোখে তার কাতর অনুনয়, যেন তৃষ্ণার্তের করুণ আকুতি।

মনুয়া এ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতে পারল না। দুজনে গিয়ে দাঁড়াল নাচের মেঝের উপর, সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পড়ল, অন্যরা যারা এতক্ষণ নাচছিল গিয়ে বসল চেয়ারে, তারা সকলেই এদের নাচ দেখতে চায়। বাজিয়েরাও তেতে উঠল, সারা সন্ধ্যে একঘেয়ে বাজনা বাজিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল, মনুয়া আর ববিকে দেখে মেতে ওঠে ড্রামের ছন্দ।

সত্যিই, মে ফ্লাওয়ারে যেসব টীন-এজার্সরা আসে তাদের মধ্যে এরা ওস্তাদ জুটী। ববির তীক্ষ্ম চেহারা, টানা টানা নীল চোখ, জোড়া ভুরু নাচের তালে তালে চুইংগাম চিবোবার মত চোয়ালের হাড় দুটো কেঁপে কেঁপে ওঠে। চাবুকের মত ধারালো শরীর, বাজনার ছন্দ মিলিয়ে যেরকম খুশী সে শরীরটাকে নিয়ে খেলাতে পারে। নৃত্যরত ববিকে দেখলে মনে হয় শরীরে ওর সাপুড়ের বাঁশীর আকর্ষণ, চোখে অজগরের সম্মোহনী দৃষ্টি।

মনুয়ার চেহারা কিন্তু ববির মত ধারালো নয়। বয়সের তুলনায় যুবতীর মাদকতা সে আহরণ করেছে। তাই নাচের ছন্দ দেহের হিল্লোল বয়ে যখন মুখের ওপর প্রতিভাত হয় তখন সেখানে ফুটে ওঠে বিজয়িনীর হাসি। মনুয়া জানে, ববি যত ওস্তাদ নাচিয়েই হোক না কেন, তার যৌবনের উজ্জ্বলতার কাছে ববিকে হার স্বীকার করতেই হবে।

নাচ চলতে লাগল, বাড়তে লাগল ছন্দ, দ্রুত থেকে আরও দ্রুত। তালের নেশায় মত্ত একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, মাতাল হওয়া নাচ। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের উল্লাস, বাজিয়েদের বাহাবা। পরম লগনকে পাওয়ার চরম আনন্দের মুহূর্তে হাততালিতে ভরে গেল ঘর, ক্লান্ত হয়ে দুজনে গিয়ে বসল চেয়ারে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ববি যেন ভূত দেখতে পেল, দরজার গোড়ায় মিসেস কুশারী দাঁড়িয়ে। বুঝতে বাকী থাকে না এতক্ষণ ববির জন্যে অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে নিজেই চলে এসেছে। দামী সাদা শাড়ির প্যাঁচে প্যাঁচে শরীরটাকে আঁট সাঁট করে বাঁধা, মাথায় ল্যাকার দিয়ে সেট করা কালো বব চুল, মালয়েশীয় মেয়েদের স্টাইলে ফোলানো। প্রয়োজন-অতিরিক্ত খানকয়েক মুক্তোর গয়না, তবু সযত্ন প্রসাধনের আশপাশ এড়িয়ে বয়েস উঁকিঝুঁকি মারছে।

ওদের টেবিলের কাছে এসে মিসেস কুশারী হুকুম করে, ববি চল।

ববি কিছু বলতে পারে না, ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ায়, আড় চোখে মনুয়ার দিকে তাকায়। ওর মুখে সেই বিজয়িনীর হাসি।

ওই মেয়েটাকে দেখলেই মিসেস কুশারী বিরক্ত হয়, যেমনি বেয়াড়া তেমনি উদ্ধত, ববিটাকে ওর মায়ায় বশ করে রেখেছে। কথাটা একদিন মিসেস কুশারী তুলেও ছিল, কিন্তু ঐ ফাজিল মনুয়া কথাটা গায়ে না মেখে উত্তর দিয়েছিল,

আর আপনি যে ববিকে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছেন, একটা বকলশ পরিয়ে দেবেন, নয়তো বেচারীর গলায় লাগবে।

কথা শুনে মিসেস কুশারীর গা পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল, হাত নিশপিশ করেছিল, নিজের মেয়ে হলে দু গালে চড়িয়ে দিত, অথচ নিরুপায়।

মিসেস কুশারীর সঙ্গে তার বিরাট গাড়ির পিছনের সিটে উঠে বসল ববি। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব?

মিসেস কুশারী বললেন, গড়ের মাঠের দিকে কোথাও।

কুশারীদের পুরনো ড্রাইভার রসুল মালিকানের এ নির্দেশের অর্থ বোঝে। গাড়ি নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল ময়দানের গাছের তলায়, নির্জন অন্ধকারে।

রত্না কুশারীর প্রশ্ন, তুমি জানতে ববি, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

—জানতাম।

—তাহলে এলে না কেন?

—নাচতে নাচতে—

—ঐ বাঁদরীটা তোমায় শেষ করবে। আমি আজ সকাল সকাল তোমাকে নিয়ে বেরব বলে দুপুরবেলা গিয়ে দোকান থেকে চুল ঠিক করে এসেছি। আমার জন্যে তোমার কোন ফিলিংস নেই।

ববি ভয়ে ভয়ে বলে, তেষ্টা পেয়েছিল।

রত্না সদয়া হয় না, রোজই তো তুমি দুঃখিত হও, রাত্রিবেলা কতরকম প্রমিস কর, তারপর মে ফ্লাওয়ারে ঐ মেয়েটাকে দেখলেই সব ভুলে যাও।

—আর আমি শুনতে পারছি না, ববি নিজে কান দুটো চেপে ধরে।

ইতিমধ্যে রসুল ঝুড়ি থেকে সরঞ্জাম বার করে রত্না কুশারীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। জিন আর টনিক, আর ববিকে জিন-রাম আর কোকাকোলার বিচিত্র ককটেল।

ববির খুব তেষ্টা পেয়েছিল, দু চুমুকে গেলাসটা শেষ করে ফেলে।

তাতেও রত্না চটে যায়, ওকি হচ্ছে, সরবৎ খাচ্ছ নাকি?

ববি ভয়ে ভয়ে বলে, তেষ্টা পেয়েছিল।

—গাঁইয়া কোথাকার, আগে এক গ্লাস জল খেয়ে নিলেই পারতে।

ববি রসুলকে ডেকে বলে, তোমার হাত বড় চমৎকার, যেমনি গাড়ি চালাও, তেমনি ককটেল বানাও, কিছুতেই এ মিক্সচারটা আমি নিজে করতে পারি না। চট করে আর একটা গ্লাস বানিয়ে দাও তো। আমি মেমসাহেবকে বলে দিচ্ছি, উনি বকশীস দিয়ে দেবেন।

উপর্যুপরি দু' গ্লাস তীব্র ককটেল পান করে এতক্ষণে ববি সুস্থ বোধ

করে, পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরায়। এখন আর সে টীন-এজার নয় —পুরুষ।

গাড়ি চলতে চলতে রত্না জিজ্ঞেস করে, ববি, আমরা এখন ক্লাবে যাচ্ছি তো?

ববির পুরুষোচিত উত্তর, না, আজ ক্লাবে যাব না। আজ বড় টায়ার্ড।

—সে তো বুঝতেই পারছি, মনুয়ার সঙ্গে নেচে নেচে—,

মদ ববির লজ্জা কাটিয়ে দিয়েছে, সে হাসতে হাসতে বলল, রত্না, তুমি এত জেলাস কেন? মনুয়ার সঙ্গে আমি কতটুকু থাকি? তোমার সঙ্গেই তো রাত কাটাই।

রত্নার আবদার, তাহলে ক্লাবে চলো।

রত্না কুশারীকে নিয়ে ক্লাবে যাওয়াটা যতটা পারে ববি এড়িয়ে চলে। মিসেস কুশারী বুঝতে না পারলেও ববি জানে, ক্লাবে সবাই ঐ ভদ্রমহিলাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তাই আজও সে কথা ঘোরায়, না, তোমার বাড়িতে চল। রেকর্ডের সঙ্গে আমরা নাচব, ড্রিঙ্ক করব, স্ন্যাকস্ খাব, শোব। শুধু আমরা দুজনে, তুমি আর আমি।

কথা বলার আগেই রত্নাকে কাছে টেনে নিয়ে ববি তার ঠোঁটের উপর চুমু খায়। অগত্যা ক্লাবে যাওয়ার আর প্রস্তাব ওঠে না। পরিবর্তন হলে দেখা যায় রত্না কুশারীর সাজানো বসবার ঘর। রেকর্ড বাজছে, নাচছে দুজনে। তবে, একে নাচের চেয়ে নাচের ক্লাশ বলাই ভাল। তাল রাখতে না পেরে প্রায়ই রত্না কুশারীকে থেমে পড়তে হচ্ছে, ববির কাছ থেকে দেখে নিতে হচ্ছে পায়ের স্টেপিং। তবু কিছুক্ষণ হৈ হৈ, ড্রিংক-এর মাত্রাও বাড়ছে। ফলে নাচের নেশা কমে। কি খাওয়া হয় খেয়াল থাকে না, তারপর দুজনে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

কারুর খেয়াল না থাকলেও হুঁশিয়ার ড্রাইভার রসুল ভোর হবার আগেই ববিকে তুলে পেঁছে দিয়ে আসে বাড়িতে। গাড়িতে কোন কথা হয় না। পেছনের সিটে ঘুমোতে ঘুমোতে ববি বাড়ি পেঁছয়। দরজা খুলে দেন ববির মা, অতি সন্তর্পণে চারদিকে চেয়ে, পাছে কেউ না জানতে পারে, ধরে ধরে ছেলেকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেন বিছানায়। ববি কোন রকমে কোট প্যাণ্ট খুলে ফেলে, মার সঙ্গে কথা বলে না, গভীর ঘুমে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

ববির বিধবা মা ছোট ছেলের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় ভোর রাত্রিটা রোজ জেগেই কাটান। প্রথম প্রথম রাগারাগি হতো, এখন উনি বুঝেছেন তাতে অশান্তি বাড়ে। তাই কাউকে জানতে না দিয়ে মাতাল ছেলেকে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দেন। আর তাঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে রত্না কুশারী, কারণ প্রতিদিন ছেলের পকেট থেকে তিনি পান দুখানি করকরে দশ টাকার নোট। যার খবর ববিও জানে না। এ হলো ছেলের মাকে পাঠানো রত্না কুশারীর ঘুষ। ববি

জানে তার কোটের ভেতরের পকেটে একখানা করে পাঁচ টাকার নোট থাকে, সিগারেট আর ট্যাক্সী ভাড়া। মাঞ্জা করা স্যুট আর পালিশ করা জুতো পরে একবার মে ফ্লাওয়ারে পৌঁছতে পারলেই আর কোন খরচ নেই তার। মে ফ্লাওয়ারে রত্না কুশারীর অ্যাকাউন্ট আছে, তাইতেই ববি সই করে। আর রত্না পাশে থাকলে তো কোন কথাই নেই, নগদ এবং ধার দুইই পাওয়া যায়, শুধু চাওয়ার অপেক্ষা।

ববির মায়ের তিন ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলের ভাল রোজগার, সবটাই ছেলের বউএর চাবির আড়ালে। বাড়ির সকলের খাওয়া দাওয়ার জন্যে একটা মাসোহারা বড় ছেলে দেয় বটে, কিন্তু তার বেশি আর নয়। মেজ ছেলে বেশি লেখাপড়া শেখেনি, সেই অনুপাতে রোজগারও কম, তাই মায়ের অমতে একটি চাকুরে মেয়েকে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে, কখনো-সখনো মাকে বোনকে এক আধখানা শাড়ি কিনে দেয়, ব্যস এই পর্যন্ত। মেয়ে ছোট, এখনও স্কুলে পড়ে, তারও খরচা আছে। অতএব ববির রোজগারের ওপর মাকে অনেকখানি ভরসা করতে হয়। টাকার অংকও কম নয়, দৈনিক কুড়ি টাকা। সেইজন্যে ববিকে আজকাল আর উনি বিরক্ত করেন না, জানতে চান না এত রাত পর্যন্ত সে কোথায় থাকে, কি করে। দিনের বেলা পড়ে পড়ে ঘুমোয়, ঘুমোক, তাতে কার কি ক্ষতি করছে। বরং বাড়ির আর সবাইকে বারণ করেন যাতে ববিকে জ্বালাতন না করে।

তবে পাড়াপড়শী বা আত্মীয়-স্বজনরা জিজ্ঞেস করলে উনি বুক ফুলিয়ে বলেন, আমার ছোট ছেলের নাইট ডিউটি, বেচারী রাত্রে ঘুমোতে পায় না বলে দিনের বেলা শুয়ে থাকে।

এই হলো ববির ছবি। এখন যদি মনুয়ার কথা জানতে হয়, ঘড়ির কাঁটা পেছিয়ে দিয়ে ক্যামেরা ট্রাক ব্যাক করে মে ফ্লাওয়ার রেস্তরাঁয় নিয়ে গেলে দেখা যাবে ববিকে বন্দী করে রত্না কুশারী নিয়ে যাবার পর মনুয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল নিজের টেবিলে। বোধ হয় মনে মনে ববির দুর্দশা উপভোগ করছিল, তারপর দৃষ্টি ফেরাল ঘরের মধ্যে। এক টেবিল থেকে আর এক টেবিল, একজন ছেড়ে আর একজনের উপর। যা আশা করেছিল তাই ঘটল, একটি ছেলে হাত তুলে সম্মতি চাইল মনুয়ার টেবিলে যোগ দিতে পারে কিনা। অন্যদিন হলে মনুয়া কি করত জানা নেই, আজ কিন্তু আপত্তি করল না। ছেলেটি এ মহলে স্বামী নামে পরিচিত, আগে পিছনে কি শব্দ আছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। দক্ষিণ ভারতীয়, তবে না বলে দিলে চেনা যায় না। এদেরই মত আধুনিক সাজপোশাক, মার্কিনী ইংরাজী, বাংলার

উপরও চমৎকার দখল আছে তবে টীনএজার নয়, আর একটু বেশি বয়েস, বাবার অফিসের কাজ দেখে, নিজস্ব গাড়ি করে ঘুরে বেড়ায়, সব সময় পকেট ভর্তি টাকা বলে এ মহলে প্রতিপত্তিও বেশ।

স্বামী মনুয়ার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, ববি তাহলে আর এখন ফিরছে না?

—না।

—ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ, তবু তোমাকে একদিন একলা পাওয়া গেল।

মনুয়া একটা ভুরু তুলে বলল, তুমি যেন রোজ আমার জন্যে বসে থাক। রোজ তো তোমার গাড়িতে দেখি নতুন নতুন মেয়ে, কখনও পেগী, কখনোও রায়না। কবে যেন মিনি বোসকেও দেখেছিলাম।

স্বামী আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে, মেয়েদের নজর থাকে ঠিক। আমি তো ভাবতেও পারিনি মনুয়া লাহিড়ীর কোন কৌতূহল থাকতে পারে আমার সম্বন্ধে।

—কেন? মনুয়া লাহিড়ী কি দোষ করল?

—কলকাতায় এসে পর্যন্ত ঐ একটা নামই তো শুনছি, মে ফ্লাওয়ারের মনুয়া লাহিড়ী। কুইন অফ টীন-এজার্স।

মনুয়া হাসতে হাসতে বলল, এখানেই তুমি ভুল করলে স্বামী, টীন-এজার্সরা রাজা রানী খেতাবে বিশ্বাস করে না, আমরা সবাই সমান। এ একটা নতুন সমাজ গড়ে উঠছে, নতুন গোষ্ঠী, পৃথিবীর যেখানে যাও এই টীন-এজার্সদের অনুভূতি এক, বিশ্বাস এক, ব্যথা এক, আনন্দ এক—।

স্বামী চটুল হাসল, শুনেছি তুমি নাকি খুব গম্ভীর কথা বলতে পার।

—তা জানি না, তবে আমি সত্যি কথা বলি।

—তা হলে সত্যি করে বল এখন কি করতে চাও, কি ইচ্ছে করছে?

মনুয়ার সহজ উত্তর, খিদে পেয়েছে।

—খাবার আনতে বলি, মেনু দেখ।

—এখানে নয়, চীনে খাবার খাব। দুটো দোকান পরে সাংহাইতে চলো।

স্বামীর মনে হলো এ এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ। মনুয়াকে নিয়ে সাংহাই-এর একটা কাঠের পার্টিশান দেওয়া ঘরে গিয়ে বসল। মেনুতে পঞ্চাশ রকম লেখা থাকলেও কয়েকটা ডীশ আছে যা কলকাতার রেস্তরাঁয় খুব বেশী চলে। চীনে খাবারের বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেক দেশে এদের রন্ধন পদ্ধতি আলাদা। আমেরিকার চীনা রেস্তরাঁর খাওয়ার সঙ্গে ইয়োরোপের খাওয়া মিলবে না। লন্ডনের চীনে রান্নার কোন মিল নেই, বোধ হয় দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাদের রান্না করে বলেই পৃথিবীর সর্বত্রই এই চীনা রেস্তরাঁর এত সমাদর।

স্বামী খাবারের অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ড্রিংক আনাব বল।

—তেষ্টা পায়নি, সারাক্ষণ মে ফ্লাওয়ারে চা আর কফি খেয়ে জিভে চড়া পড়ে গেছে, লেমনেডের সঙ্গে টাটকা লেবুর রস খেতে পারি।

—আমি যদি একটা বীয়ার খাই কিছু মনে করবে না তো?

পানীয় এল। খাদ্যও।

সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা মামুলী আলোচনা, কলকাতা শহর, রাজনীতি, মে ফ্লাওয়ারের দুজনেরই চেনা বন্ধুদের কথা।

এক সময় স্বামী হঠাৎ বলল, যদি বিয়ে করি, বাঙালী মেয়ে বিয়ে করব।

মনুয়া হাসল, কথাটা কি আমাকে শুনিয়ে বলা হলো? তাহলে জানিয়ে রাখি, আমার মত মেয়েদের ধাতে বিয়ে সয় না।

—কেন?

—আমরা স্বাধীন থাকতে চাই, কোন ঘাটে বাঁধা পড়তে চাই না। যেখানে খুশী নৌকো ভাসিয়ে চলব, আনন্দ করব, জীবনটাকে দেখব।

স্বামী মন্তব্য করল, বেশিদিন ওরকম ভাল লাগে না, ওগুলো প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস।

মনুয়ার উত্তর, আমার কাছে উচ্ছ্বাসটা এখনও সত্য, যদি কখনও কেটে যায় তখন বুঝতে পারব ওটা শুধু উচ্ছ্বাসই ছিল। চল স্বামী, এবার ওঠা যাক, অনেক রাত হয়ে গেছে, আমাকে আবার ট্যাক্সি ধরতে হবে।

—ট্যাক্সী কেন, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—সত্যি? আমি ভেবেছিলাম পেগী, রায়না এদেরই তুমি শুধু লিফট দাও।

স্বামীর সহাস্য উক্তি, তুমি ভারী দুষ্টু।

মনুয়াকে তাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে 'বাই বাই' করে বিদায় নিয়ে স্বামী চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ফ্ল্যাটের বেল টিপতেই দরজা খুললেন স্বরূপ লাহিড়ী,—মনুয়ার বাবা। গম্ভীর মুখ, মেয়ের হ্যালো সম্বোধনের উত্তরে কিছু না বলে জানালেন, তোমার মা অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে আছেন।

মনুয়া উদ্বেগ প্রকাশ করে, মানির কি হয়েছে?

আরও গম্ভীর উত্তর, জানি না।

কথা না বাড়িয়ে মনুয়া ছুটে গেল মায়ের ঘরে, ভদ্রমহিলা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছেন, ঘরের বাতি কমানো, মনে হলো সবেমাত্র ঘুম এসেছে। সাইড টেবিলে ওষুধ, খাবার জল। ওঁকে বিরক্ত না করে মনুয়া আবার ড্রইংরুমে ফিরে এল। স্বরূপ লাহিড়ী তখনও জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন, হাতে হুইস্কির গ্লাস।

মনুয়া জানাল, মানি ঘুমোচ্ছে।

—ঘুমোতে দাও, কিছুটা শান্তি পাবে।

—কি হয়েছে, সীরিয়াস কিছু?

—ফাস্ট লাইফ লীড করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। সারা জীবন আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে, শেষ বেলাটাও রেহাই দেবে না।

—ডাক্তার এসেছিল?

—আমার কর্তব্য আমি করে যাব, আগেও মুখ বুজে করেছি এখনও করব। কিন্তু মনে প্রাণে ঐ ভদ্রমহিলাকে আমি ঘৃণা করি।

বলাই বাহুল্য, পিতাপুত্রীর কথোপকথনও বেশির ভাগই চলছিল ইংরাজিতে।

মনুয়া যতদূর সম্ভব শক্ত গলায় বলল, মানিও তো তোমাকে ভালবাসে না।

স্বরূপ লাহিড়ীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে, আমি জানি, আমরা দুজনেই দুজনকে ঘৃণা করি। তোমার বোকা মা'র বাঁদরামীর জন্যে সব নষ্ট হয়ে গেল।

মনুয়া না বলে পারল না, মানিও তো দুঃখ করে তার মত সুন্দরী লেখাপড়া জানা একমপ্লিশড মেয়ে তোমার মত রসকষহীন চাকুরের পাল্লায় পড়ে একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

—তোমার মা মিথ্যেবাদী।

—কি জানি।

স্বরূপ লাহিড়ী গ্লাসের পানীয় শেষ করে আবার নতুন করে হুইস্কি ঢালেন। পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকান, তুমিও বা এত রাত করে রোজ বাড়ি ফের কেন?

—গল্প করতে করতে দেরী হয়ে যায়।

—কোথায় যাও?

—তা তো তুমি জান, নতুন করে জিজ্ঞেস করছ কেন?

—যত বড় হচ্ছ ততই মনে হচ্ছে তুমি মার মত দেখতে, চালচলনও তারই মত, তাই ভয় পাচ্ছি তোমাকে নিয়েও না বাকি জীবনটা পস্তাতে হয়।

মনুয়া সদম্ভে ঘোষণা করে, আমাকে নিয়ে অত ভাবনার কিছু নেই, নিজের পায়ে আমি দাঁড়াতে পারব, তোমার উঁচু মাথাও নীচু করে দেব না। অবশ্য তোমার মাথা উঁচু তা আমি বিশ্বাস করি না।

স্বরূপ লাহিড়ী ক্ষেপে ওঠেন, তোমার বাবাকে তুমি এতটুকুও শ্রদ্ধা কর না?

—যাকে তাকে শ্রদ্ধা করা যায় না।

—তোমার মতো বেয়াড়া মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। আমার সঙ্গে যদি এই রকম ব্যবহার কর আমিও তোমাকে ঘেন্না করব।

মনুয়ার মুখে উপেক্ষার হাসি, আমি তো জানি তুমি আমাকে ঘেন্না কর,

মানিও আমাকে ঘেন্না করে, একমাত্র ঐ একটা জায়গায় তোমাদের স্বামী স্ত্রীর মিল, তোমরা দুজনেই আমাকে ঘেন্না কর। কিন্তু মনে রেখ, দোষটা আমার নয়, দোষ তোমাদের। বিয়ে করেছ, মেয়ে হয়েছে, অথচ একবারও তার দিকটা ফিরে দেখনি। চিরকাল নিজেরা ঝগড়া করেছ বস্তীর লোকের মত, আজও করছ। রাতের পর রাত নিজের বিছানায় শুয়ে শুধু কেঁদেছি, ভগবানের কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা করেছি যাতে তোমরা সুখী হও। কালা ভগবান সেকথা শোনেনি। আমি আজ ভগবানে বিশ্বাস করতে পারি না। তোমাদের দেখলে মনে হয় স্বার্থপর বুনো জন্তু, এ ফ্ল্যাটটা একটা জেলখানা। আমার ঘরটা টরচার চেম্বার। জানলায় দরজায় ভণ্ডামীর পর্দা, তাই তো এখানে ফিরতে আমার ইচ্ছে করে না, সকাল দুপুর সন্ধ্যে বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিই, ভিক্টোরিয়ায় ময়দানে, রেস্তরাঁয়। এই হলো আমার মত একটা উনিশ বছরের মেয়ের ট্রাজেডী।

চোখের জল সামলাতে না পেরে মনুয়া ছুটতে ছুটতে চলে গেল নিজের ঘরে।

বিচলিত স্বরূপ লাহিড়ী আবেগভরা গলায় ডাকলেন, মনুয়া, মনুয়া।

সাড়া পেলেন না। মনুয়া ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মনুয়া নিজের শরীরটাকে আছড়ে ফেলল বিছানার উপর। বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদে, অবিরাম চোখের ধারা বয়। উষ্ণ অশ্রু মনের ভেতর পুঞ্জীভূত গ্লানিকে তরল করে বার করে আনে।

কিন্তু এ কান্না কার জন্যে?

এ কি মা-বাবার বিরুদ্ধে এতদিনের জমা অভিমান, না নিজের অসহায় অবস্থার প্রতি অনুকম্পা? তবু কাঁদতে ভাল লাগে, মনটা হালকা মনে হয়। কতগুলো বছর এই ঘরের মধ্যে কেটেছে। তখন মনুয়া কতটুকু মেয়ে! মনে পড়ে, মা তাকে ঘরে শুইয়ে দিয়ে চলে যেতেন; যেদিন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতেন, মনুয়া বুঝতে পারত, তার পরেই বাবা-মার ঝগড়া শুরু হবে, যাতে না মনুয়া জানতে পারে তাই দরজা বন্ধ করার সতর্কতা। কিন্তু বাবা-মার চেঁচামেচি দরজা কেন, দেয়াল ভেদ করে আসত। বাবার হুঙ্কার. মার জিনিসপত্র ভাঙ্গার আওয়াজ।

ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকতো মনুয়া—কখনো বা কাঁদতো, সেই থেকে চোখের জল ফেলা শুরু হয়েছে।

অথচ মনে পড়ে, পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে দুজনের কী আশ্চর্য অভিনয়। বাবার হাতে খবরের কাগজ, মায়ের হাতে বোনার পশম। মনুয়াকে দেখে দুজনেই বলেন, গুড মর্নিং। মনুয়াকেও ভাব দেখাতে হলো যেন সে

কিছুই জানে না, আগের রাত্রের ঘটনা সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

সেই ছোটবেলা থেকে বাবা-মার সঙ্গে অভিনয় করতে হয়েছে মনুয়াকে।

যত বড়ো হতে লাগলো অভিনয়ের মাত্রাও বাড়তে লাগলো।

বাবা অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে ট্যুরে বেরিয়ে গেলে মার কাছে আসতো অনেকে। বড়ো হয়ে মনুয়া বুঝতে পারে তারা সকলেই ছিল মায়ের স্তাবক—আর মনুয়ার আঙ্কল। এরা গাদা গাদা জিনিস উপহার দিত বাচ্চা মনুয়াকে, বেড়িয়ে আনতো চিড়িয়াখানা, দেখাতো সিনেমা, কিনে দিত লজেন্স চকোলেট, খাওয়াতো আইসক্রীম। এ সবই মনুয়াকে ঘুষ দেওয়া, যাতে না বাবা ফিরে এলে মনুয়া এই পাতানো আঙ্কলদের কথা তার কাছে বলে দেয়। ঐটুকু বয়সেই মনুয়া কিন্তু দু-তরফের চালাকিটুকু বুঝে ফেলেছিল।

আরও বুঝেছিল এইজন্যে, বাবাও ট্যুর থেকে ফিরে নানারকম জিনিস কিনে দিতেন মনুয়াকে—সেও ভালবেসে নয়, শুধু জানবার জন্যে, তাঁর অবর্তমানে কারা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।

ব্যাস, আবার ঝগড়া, আবার মারামারি। আবার চোখের জল। বছর দুই হলো এই অস্বস্তিকর জীবনের হাত থেকে মনুয়া রেহাই পেয়েছে। কারণ, আজকাল আর বেশীক্ষণ সে বাড়িতে থাকে না—সকালে বেরিয়ে যায়, রাত করে বাড়ি ফেরে; বলতে গেলে মা বাবার সঙ্গে বড় একটা দেখাই হয় না।

আজ আবার সেই পাঁকের মধ্যে পড়ে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করলো মনুয়া। কান্না থামলো কিন্তু কিছুতেই ঘুম এলো না। মনে হলো কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে হয়তো একটু ভালো লাগতো। ববির বাড়িতে ফোন নেই; তা ছাড়া এখনও হয়তো রত্না কুশারীর কাছ থেকে মুক্তি পায়নি। স্বামীকে ফোন করা যায়; তবে যা পাগল, এখুনি হয়তো গাড়ি করে এসে হাজির হবে। তার চেয়ে নতুন বন্ধু অনাদিপ্রসাদকে ফোন করলে কেমন হয়?

মনুয়া নম্বর ডায়াল করলো। কিছুক্ষণ রিং করার পর অনাদিপ্রসাদের গলা শোনা গেল, কে?

—আমি মনুয়া।

—কি ব্যাপার, এত রাত্রে!

—অনেক রাত হয়ে গেছে বুঝি! আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম!

—কিছু বলবে?

—ঘুম আসছে না। বড় কষ্ট।

—কি হয়েছে?

—টেলিফোনে সব কথা বলা যাবে না। পরে যেদিন দেখা হবে বলবো। সত্যি জীবনে সুখ নেই। ক্রমশ যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে,—আপনাকে

বলছিলাম না, কেউ আমাদের বুঝতে পারে না—কেন এই হতাশা, কেন এই দুঃখ।

একটু থেমে মনুয়া আবার বলে, নিশ্চয় খুব ভয় পেয়ে গেছেন; ভাবছেন, এ কোন পাগলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। কিন্তু আমার খুব ভালো লাগলো কথা বলে—অনেক হালকা মনে হচ্ছে।

—ঠিক আছে মনুয়া, শীগগির তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

মনুয়ার আব্দার—শীগগির নয়, কালই।

—কথা দিতে পারছি না, তবে চেষ্টা করবো।

—গুড নাইট।

—গুড নাইট।

রমলা বউদির ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। রাত্রিবেলা টেলিফোনের আওয়াজ শুনলেই একটা অজানা আশঙ্কায় মন কেঁপে ওঠে, তাই সভয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, এত রাত্রে কে ফোন করছিল?

—একজন।

—কোন বিপদ হয়নি তো?

—হুম্।

রমলা বউদির অনুযোগ, আজকাল তুমি পরিষ্কার করে কোন কথাই বল না। অনাদিপ্রসাদ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, পঁচিশ বছর ধরে এত কথা বলেছি, তার পর এখনও কথা শোনার ইচ্ছে আছে! জান রমি, এখন মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনে যত কথা বলেছি তার অর্ধেক না বললেও চলত। যত কথা শুনেছি তার তিন ভাগ না শুনলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যা দেখেছি তার চেয়ে অনেক বেশী দেখলে ভাল হতো।

এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে রমলা বউদি কাজের কথা পাড়ে, দাদা এসেছিলেন নিমন্ত্রণ করতে।

—কিসের নিমন্ত্রণ?

—বাঃ, সরস্বতী পুজো না? তা ছাড়া বউদি আবার ভেতরে ভেতরে ঠিক করেছে, ছেলের জন্যে যে মেয়েকে পছন্দ করেছে তাকেও নিয়ে আসবে, বাড়িতে কাউকে বলেনি, শুধু আমায় জানিয়েছে। পুজোর সময় তো পাঁচ বাড়ির মেয়ে আসেই, কেউ বুঝতেও পারবে না, অথচ মেয়ে দেখানো হয়ে যাবে।

অনাদিপ্রসাদ তারিফ করেন, বাঃ, যত বয়েস বাড়ছে, আমার শালাদের বুদ্ধি খুলছে দেখছি।

—তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে তো?

অনাদিপ্রসাদের চিরাচরিত ঠাট্টা, নয়তো আর কার সঙ্গে যাবো?

—কি জানি, আজকাল যেরকম গম্ভীর গম্ভীর কথা বলো—

—ভয় নেই, এবার থেকে রকফেলার অর্থাৎ রকে বসা ছেলেদের মতো হালকা হালকা কথা বলব, তা হলে খুশী হবে তো?

দুজনেই হাসে, কিন্তু পরক্ষণেই সরস্বতী পুজোর কথা মনে পড়তেই অনাদিপ্রসাদের হাসি শুকিয়ে যায়।

॥ নয় ॥

সরস্বতী পুজো।

শহর কলকাতার বাসিন্দাদের কাছে এ এক আতঙ্ক। ব্যাঙের ছাতার মত শহরের অলিতে গলিতে বারোয়ারী মন্ডপ। ছোট, বড়, মাঝারি। ডেকরেটার-দের পোয়া বারো, পাড়ার লোকদের দুর্দশার শেষ নেই। পনের দিন আগে থেকে চাঁদার তাগাদা—বালক, কিশোর, যুবক। উভয় লিঙ্গের চাঁদা আদায়কারী। অনুনয়, বিনয়, প্রার্থনা। কিন্তু কথা না শুনলে শেষ পর্যন্ত পাড়ার ভাণ্টদা এসে ছুরি মারে। অতএব খেতে পরতে পাও না-পাও, চাঁদা তোমায় দিতেই হবে। মগের মুলুক।

একটা মন্ডপ, অনেক আলো, মাইকের কর্কশ গান, এগুলো চাই-ই! প্রতিমা একটা না হলে নয়, তাই নিমিত্ত মাত্র করে রিকশা বা টেম্পো করে এনে মাটির মূর্তিটাকে বসিয়ে রাখা।

বারোয়ারী পুজো।

চন্ডীমন্ডপের বুর্জোয়া পরিবেশ থেকে সরস্বতীকে মুক্ত করে আনা হয়েছে জনতার প্রাঙ্গণে। ঘরের মেয়েকে বার করা হয়েছে বাজারে। রকে বসা ছেলেগুলো রক ছেড়ে এ দুদিন হাজিরা দেয় পূজার মন্ডপে। মেয়ে দেখলে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে, টিটকারি কাটে, এই তাদের পৌরুষ। মেয়েগুলো ঠাকুর দেখার অছিলায় যতদূর সম্ভব নিজেদের নগ্ন করে ছেলেগুলোকে উসকে দেয়। অথচ মন্তব্য করতে ছাড়ে না, দেখেছিস ভাই, ছেলেগুলো কী অসভ্য!

ভাগ্যিস প্রতিমা মাটির তৈরী তাই এ প্রগল্ভতা সহ্য করে, রক্তমাংসের মানবী হলে পারত না। সেইজন্যেই বোধ হয় বারমেসে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় পাথরের মূর্তি স্থাপন করতে হয়।

অনাদিপ্রসাদ একবার পাড়ায় বলেছিলেন, আমি একশ' টাকা চাঁদা দেব, কিন্তু তোমরা মাইক বাজাতে পারবে না।

বারোয়ারী পুজোর সম্পাদক উপেক্ষার হাসি হেসে বলেছিলেন, তার চেয়ে

বলুন না আপনি চাঁদা দেবেন না। আমরা তো কিছুই করি না, ও পাড়ার হারুরা একেবারে ফিল্‌ম স্টারের মত সরস্বতী এনে বসাচ্ছে, ভাবতে পারেন সেখানে মেয়েদের কি ভিড় হবে!

—ভিড় নাই বা হলো!

—তবে আর পুজো করে লাভ কি। আপনি তো কোন খবরই রাখেন না, এ বছর লেকে একটা পুজো হচ্ছে, জলের ওপর সরস্বতী ভাসবে। পুরুত নৌকো করে গিয়ে পুজো করবে। মাইকে মন্ত্র শোনা যাবে। লোকেরা পাড় থেকে জলে ফুলের অঞ্জলি দেবে। ভাবুন তো মাইরি কি নভেল আইডিয়া! সেখানে যাবে না তো কি লোকেরা আমাদের এই নিরামিষ পুজো দেখতে আসবে।

সারা জীবন সরস্বতীর আরাধনা করেছেন যে অনাদিপ্রসাদ তিনি কিন্তু কোন জবাব দিতে পারেননি। মুখ নীচু করে শুধু বলেছেন, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। ছেলেরা বড় হয়েছে, আমার স্ত্রী আছেন, তারা যা ভাল বুঝবে করবে। আমি নাই বা রইলাম—

সম্পাদক পাদপূরণ করে দেয়, তাতে কিছু আসে যায় না কাকাবাবু, পুজো আমাদের জাঁক-জমক করে করতেই হবে। আলো জ্বলবে মাইক বাজবে—

হ্যাঁ, অসম্ভবরকম জাঁক-জমক করেই পুজো হলো কলকাতার শহরে। যেমনি আলোর রোশনাই, তেমনি হিন্দী ফিল্‌মের গান আর ঢাকের আওয়াজ। কে বলবে দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, পয়সার অভাব? রঙচঙ-এ, প্যান্ডেল আর আলোর কারসাজিতে মনে হয়, বিগতশ্রী, শীর্ণা নগরী যেন মন মাতানো যুবতীর মেক্‌আপ্‌ নিয়েছে।

ভোরবেলা অনাদিপ্রসাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন পাছে পাড়ার ছেলে-দের বাঁদরামি দেখে মেজাজ খারাপ হয়, পাছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরোধে ঢেঁকি গিলে অঞ্জলি দিতে হয় ঐ বারোয়ারী আড্ডাখানায়। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবার পর অনাদিপ্রসাদের মনে পড়ল অশোক জানার প্রেসের কথা--সেখানেও আজ সরস্বতী পুজো। অশোক জানা নিমন্ত্রণ করবার সময় অভয় দিয়েছিল, নির্ভয়ে তুই আমাদের প্রেসে আশ্রয় নিতে পারিস্‌। বাইরের লোক কেউ থাকে না, শুধু আমরা প্রেসের ক'জন, কোনরকম হৈ চৈ হবে না, ইচ্ছে করলে তুই এখানে বসে লিখতে পারিস, পড়তেও পারিস, ডেকচেয়ারটা আমি তোকে ছেড়ে দেব।

কথাটা মনে পড়তে নিঃসঙ্গ অনাদিপ্রসাদ ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হলেন রাজাবাজারে অশোক জানার প্রেসে। টোকা মারতেই দরজা খুলে দিল কবিতা,

হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল, আসুন, আসুন।

কবিতা আজ বাসন্তী রং-এর একটা শাড়ি পরেছে। সদ্য স্নান সেরে উঠেছে, তখনও চুল আঁচড়ান হয়নি। অদূরে দাঁড়িয়ে আরও দুটি মেয়ে, একটি কিশোরী, তারও পরনে হলদে শাড়ি, অপরটি বালিকা, পরনে হলদে ফ্রক।

কবিতা বলল, এরা আমার ছোট বোন।

অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ?

—ওরা তো কলকাতাতেই থাকে।

—কোথায়?

—কাছেই, এক বড়লোক বাবুর বাড়িতে। কাজ করে, দু'বেলা খেতে পায়। তাছাড়া মাসে দশটা করে টাকাও দেন।

—হুম্।

—বুঝতেই তো পারেন বাসায় অনেকগুলো লোক, একলা আমার রোজগার তাই—,

অনাদিপ্রসাদ প্রসঙ্গ বদলান, আর সবাই কোথায়?

—এখনো কেউ আসেনি।

—এত সকালে তোমরাই বা এলে কি করে?

কবিতা জানাল, আমরা রাত্রে প্রেসেই ছিলাম। রানাঘাটে আর ফিরিনি, সকাল থেকে না লাগলে পুজোর ঝামেলা সামলাব কি করে। আপনি একটু বসুন, আমি চুলটা আঁচড়ে আসি।

অনাদিপ্রসাদ লক্ষ্য করলেন, ফর্মা ভাঁজাই করার ছোট্ট ঘরটিতেই প্রতিমা বসান হয়েছে। আকারে বড় নয়, মাথায় করে নিয়ে আসা যায়, ছোট্ট সাদা মূর্তি। ফুল দিয়ে সাজান হয়েছে, আশেপাশে খানকতক বই। ছোট মেয়ে দুটি গাঁদা ফুলের মালা গেঁথে প্রতিমার গলায় পরাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে বচসা করছে যাতে না অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে কবিতা ফিরে এল সুন্দর করে চুল আঁচড়ে, কপালে একটা টিপও পরে এসেছে। সোজা গিয়ে ভক্তিভরে উপুড় হয়ে সরস্বতীকে প্রণাম করল।

অনাদিপ্রসাদ হেসে মন্তব্য করলেন, এখনও কিন্তু পুজো হয়নি, তোমার ও প্রণাম গ্রাহ্য হবে না।

কবিতা বড় বড় চোখ মেলে চাইল, তাই বুঝি? পুজো না করা পর্যন্ত ঠাকুর ঠাকুর নয়?

—শাস্ত্রে তো তাই বলে।

—আমি তো শাস্ত্র পড়িনি। সত্যিকারের ভক্তি আছে কিনা তাও জানি না। তবে প্রতি বছর মা সরস্বতীর সামনে চোখের জল ফেলি। বড় সাধ

ছিল লেখাপড়া শেখার, এ জীবনে তা হলো না।

—পাস না করলে বুঝি লেখাপড়া করা যায় না?

—কবিতা অন্যমনস্ক স্বরে বলে, কি জানি, বই পড়বার চেষ্টা করি, কিন্তু সব কথা বুঝতে পারি না, তখনই নিজের উপর রাগ হয়, বাবা-মার উপর রাগ হয়, সমাজের উপর রাগ হয়। কি মনে হয় জানেন? গরীবদের জন্যে এ পোড়া দেশে কোন সুযোগ নেই।

কথা বলতে বলতে কবিতার দু' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। হতবুদ্ধি অনাদিপ্রসাদ তাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত রেখে বলেন, ছিঃ, আজ এই পুজোর দিনে কাঁদছ কেন?

—প্রত্যেক বছর শুধু এই দিনটাতেই আমি কাঁদি। আপনি তো জানেন, আমি কবিতা লিখি, গান বাঁধি, কিন্তু লেখাপড়া তো করিনি। যা বলতে চাই তা লিখতে পারি কই, কেন আমার ব্যথা মা সরস্বতী বুঝবে না?

—লিখতে লিখতেই দেখবে কলম সড়গড় হয়ে গেছে, অনেক কথা লিখতে পারবে, যা হয়তো আগে ভাবতেই পারনি।

কবিতা মন্ত্রমুগ্ধের মত অনাদিপ্রসাদের চোখের দিকে চেয়ে রইল, সত্যিই আমি লিখতে পারব! আপনি যেরকম বই লেখেন, আমার বই ছেপে বেরুবে, লোকে পড়বে?

একটু থেমে বলে, জানেন, রাত্রিবেলা শোবার সময় আমি প্রার্থনা করছিলাম আপনি যাতে আজকে আসেন এখানে।

—কেন?

—আপনি ছাড়া কেউ তো আমাকে উৎসাহ দেয় না। কেউ তো বলে না আমিও একদিন লিখতে পারব। সেদিন আপনি স্টেশন থেকে আমাকে নিয়ে গেলেন, রেস্টুরেণ্টে চা খাওয়ালেন, তখন ভেবেছিলাম আপনি আর পাঁচজনের মতই সাধারণ লোক। পরে যখন বাবুর কাছে শুনলাম আপনি বিখ্যাত লেখক অনাদিপ্রসাদ, আপনি বড়লোক, আপনার অনেক টাকা—

অনাদিপ্রসাদ থামিয়ে দেন, ছিঃ কবিতা, এভাবে আমাকে ছোট ক'রো না, আমার একটা পরিচয়, আমি লেখক, অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে আমার জীবন কেটেছে, অভাবের সঙ্গেও প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছি, পয়সা হয়েছে, কিন্তু আজও আমি সুখী নই, তোমার চেয়েও অসুখী।

কবিতার চোখে বিস্ময়, এ কি বলছেন?

—সত্যি কথাই বলছি। দেখলে না, আজ আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই, তাইতো তোমাদের কাছে এসে লুকিয়ে বসে আছি। যত জীবনটাকে দেখবার চেষ্টা করছি ততই জীবন অশান্ত সমুদ্রের মত আমাকে ছুঁড়ে তীরে ফেলে দিচ্ছে। আমরা সব সময় নিজের দুঃখটা বড় করে দেখি বলে অন্যের

দুঃখটা বুঝতে পারি না। আমার তো মনে হয় তুমি সবচেয়ে সুখী কবিতা, তুমি রোজগার করে একটা পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছো, নিজের স্বার্থ ভুলে গিয়ে অন্যদের কথা ভেবেছো, এই তো কর্মযোগের কথা, কে তোমাকে আটকে রাখবে, শেষ পর্যন্ত তুমি সুখী হবেই।

কবিতা জলভরা চোখে বলল, আপনাকে কিন্তু আজ আমি ছাড়ব না, দুপুর বেলা এখানে খেয়ে যেতে হবে।

—কই, সেকথা তো ছিল না।

—আমি খিচুড়ী রাঁধব, আমরা সবাই খাব, আপনাকেও খেতে হবে। আমাদের সঙ্গে।

অনাদিপ্রসাদ বাধা দেন, আমি তো বাড়িতে বলে আসিনি—

—তা জানি না, এ আমার একান্ত অনুরোধ, আপনাকে রাখতেই হবে। কবিতা কাজের অছিলায় অন্যত্র সরে গেল। অনাদিপ্রসাদ ভাবতে লাগলেন, একি আশ্চর্য ব্যবহার। কবিতার সঙ্গে মাত্র ক'দিনের সামান্য পরিচয় কিন্তু এরই মধ্যে মেয়েটির কি অধিকার জন্মেছে তার উপর যার জোরে সে বলে গেল এখানে না খেয়ে অনাদিপ্রসাদ যেতে পারবে না, ভাবতে গেলে সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু কোথা থেকে কেমন করে এই ধরনের একটা আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে কে তার খবর রাখে?

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেসের প্রাঙ্গণ পুজোর আবহাওয়ায় মূর্ত হয়ে উঠল। ধূপ-ধুনো ফুল চন্দনের গন্ধ, ঘণ্টার শব্দ কাঁসরের আওয়াজ। কম্পোজিটার চক্কোত্তি এসেছে মটকার ধুতি পরে, গায়ে আলোয়ান, পৈতেটা দেখা যাচ্ছে। সেই আজ পুরোহিত। মেসিনম্যান নিরঞ্জনও আজ ধুতি পাঞ্জাবী পরে এসেছে। কালিমাখা প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরে অন্যদিন এরা কাজ করে এই প্রেসে তাই ওই নতুন বেশে হঠাৎ যেন চিনতে পারা যায় না। তার উপর বাসন্তী রঙের পোশাকে মেয়েরা কাজ করছে—দেখতে দেখতে অনাদিপ্রসাদের সত্যিই ভালো লাগে।

চক্কোত্তি জানালো, এ পুজো আমরা নিজেদের মধ্য থেকে চাঁদা তুলে করি। দুটো দিনের আনন্দ—প্রেসে আসি অথচ কাজ করতে হয় না।

—তোমাদের বাড়িতে, পাড়ায়ও তো পুজো হয়। সেখানে যাও না।

—পাগল হয়েছেন। বাড়িতে থাকলেই তো সারাক্ষণ শুনতে হবে 'নেই' 'নেই'—শুধু অভাব আর অভিযোগ। এখানে অনেক শান্তি। কবিতারা আসে, নিরঞ্জনরা আসে, বাবুও আসেন—এইতো আমাদের সুখী পরিবার। আমাদের সুখ দুঃখের ভাগ আমরা নিই, আমরা হাসি, আমরা কাঁদি—তখন মনে হয় এ তো আমাদেরই প্রেস।

চক্কোত্তির কথাতেও কবিতারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কবিতাও বলে,

দুঃখকষ্টের মধ্যেই তো আমরা মানুষ, খানিকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে আর খানিকটা ভুলে থাকতে হয় তাইতো 'ঘর' ভালো লাগে না, বাইরে বেরিয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিই।

অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাই বলে তুমি নিজে ঘর বাঁধতে চাও না?

কবিতা উত্তর দিয়েছিল, কি জানি, কখনও ভেবে দেখিনি।

সত্যিই ঘর বাঁধার কথা ভাবেনি, ভাবে না এই কবিতারা, এই মনুয়ারা, সমাজের এরা দুই স্তরের মেয়ে, সামাজিক পরিবেশের আকাশ-পাতাল তফাৎ, কিন্তু দুজনেই ঘরের বাইরে থাকতে চায়। ঘর তাদের কাছে জেলখানা।

অনাদিপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে ভাবেন, সবে যৌবরাজ্যে প্রবেশ করেছে যে নবীনারা তারাও যদি নীড় রচনা করার স্বপ্ন না দেখে তবে কিসের স্বপ্ন দেখে তারা? আর যদি স্বপ্নই না থাকে জীবনে তবে কিসের আশায় বেঁচে থাকা?

অশোক জানা এল, সঙ্গে শশধর বোস। অশোকের উচ্ছ্বাস, আরে অনাদি কতক্ষণ? ইনি শশধরবাবু, আমাদের এম. এল. এ, বর্তমানে আমার অতিথি।

শশধর বোসকে দেখেই অনাদিপ্রসাদের মনে পড়ে গেল অশোক জানা এর সম্বন্ধে যে বিশেষণ প্রয়োগ করেছিলেন তা নির্ভুল—সত্যিই লোকটা ক্যাবলা-কান্ত। পরিচয়পর্বের পর অশোক জানা মন্তব্য করে, অনাদি এসেছে ভালই হয়েছে, ওর সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে, নরেন মণ্ডল কিছু করার আগেই আপনাকে কোন দলে ঢুকিয়ে দেব। মোটা টাকা পাবেন, তাছাড়া আপনার নিরাপত্তা সেই পার্টিই সামলাবে।

অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি?

—বলব, বলব। সে এক রোমহর্ষক কাহিনী, শশধরবাবুকে খুন করতে চায় বলে ভয় দেখিয়েছে।

সে কাহিনী কিন্তু আর তখন শোনা হলো না, অঞ্জলি দেবার ডাক পড়েছে। অনাদিপ্রসাদ আপত্তি করেছিলেন, বহুদিন উনি অঞ্জলি দেননি, কিন্তু কবিতা সে কথা শুনল না, হাতে ফুল ধরিয়ে দিয়ে গেল।

সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অনাদিপ্রসাদও মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। মনে পড়ছিল তাঁর প্রথম জীবনের কথা কত শ্রদ্ধা নিয়ে তখন বাগ্‌দেবীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। ভক্তিভরে প্রণাম করতেন। সেদিনের সুখস্মৃতি আজকের এই পবিত্র পরিবেশের মধ্যে নতুন করে যেন জেগে উঠল।

সেদিনের অনাদিপ্রসাদের মতো আজকের কবিতা হৃদয়ের সবটুকু ভক্তি উজাড় করে প্রতিমাকে প্রণাম করল—মুখে প্রার্থনা, বুকে আশা—সেও বড় হবে, লেখিকা হবে, তার লেখাও অনাদিপ্রসাদের মতো ছেপে বার হবে।

কবিতা অনাদিপ্রসাদের দিকে ফিরে চাইলো—চোখে জল টলমল করছে, আনন্দের জল; স্বচ্ছ অথচ গভীর দৃষ্টি, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না কিন্তু যা সহজেই অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

॥ দশ ॥

বাজনা বাজতে বাজতে যেরকম এক সময় তার ছন্দ, তাল, লয় চরমে ওঠে, ঠিক তেমনি যে কোন অনুষ্ঠান, সে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা পার্বণিক হোক না কেন, তার মত্ততাও সেই রকম কোন না কোন সময়ে শিখরে পৌঁছয়। আবার হয়তো শিখর ছুঁয়ে নেমে আসে। সেদিনের সরস্বতী পূজার বিবিধ বিচিত্র অনুষ্ঠানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। মাইকের গান, ঢাকের বাজনা, আলোর রোশনাই, মণ্ডপের চাকচিক্য, ঝলমলে সাজ পরা মেয়ে পুরুষের ভিড়, ভলাণ্টিয়ারদের অকারণ ব্যস্ততা কলকাতা শহরকে মাতিয়ে তুলল। এক এক অঞ্চলে এক এক রকম তার প্রকাশ। যে পাড়ায় অশোক জানার প্রেস, বিকেল থেকে সেখানে দু' দলের মধ্যে বচসা শুরু হয়েছিল কাদের পুজো লোকে ভাল বলছে তাই নিয়ে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, তারপর এক ধাপ চড়ে দলগত নিন্দা, ক্রমে দু' দিকেই দল ভারী হতে থাকে। এ সময় আগুনে ঘিয়ের ইন্ধন যোগায় ব্যক্তিগত আক্রমণ আর তার পাল্টা জবাব।

—টাকার রোয়াব দেখাস না, চাঁদা তোদের বেশী উঠেছে, কারণ তোরা একটা চোরকে প্রেসিডেণ্ট করেছিস।

—মুখ সামলে কথা বলবি, আমাদের প্রেসিডেণ্টের নামে—

—চোরকে চোর বলবো না তো কি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলবো? শালা রিলিফ ফাণ্ডের টাকা মেরে সাত তলা বাড়ি তুলেছে, আমরা ও চোরের পয়সায় লাথি মারি।

—তোরা সবাই শুনলি তো ফট্‌কের কথা? ও শালা আমাদের প্রেসিডেণ্ট তুলে গালাগাল দিয়েছে, আমরা এর বদলা নেব।

ফট্‌কের দলও গর্জে উঠলো, আমরাও কেউ চুড়ি পরে বসে নেই, ঢিলটি ছুঁড়লে পাটকেল খাবি, হালুয়া বার করে ছেড়ে দেব।

ব্যস, আর বাক্‌যুদ্ধের প্রয়োজন হলো না, ফটাস ফটাস সোডার বোতল ফাটতে লাগল। কারা আগে ছুঁড়তে আরম্ভ করল তা বোঝা গেল না, নিমেষের মধ্যে দু' দল রাস্তার দু' দিকে সরে গেল। দুটো পানের দোকান দখল করে একটার পর একটা সোডার বোতল ছুঁড়তে লাগল। বোতল ফাটার আওয়াজ, কাঁচের ঝনঝনানি, আহত নিরীহ পথচারীদের চীৎকার।

খবর পেয়ে লম্বু তার দুই সাকরেদ নিয়ে যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলো তখন শ্রাদ্ধ অনেক দূরে গড়িয়েছে। সোডার বোতলে আর শানায়নি, ফট্‌কের বিপরীত পক্ষরা হাতবোমা এনে ফেলে এ দলের অনেককে ঘায়েল করেছে। লম্বুকে দেখে ফটিক যেন হাতে স্বর্গ পেল, প্রথমেই তার করুণ আবেদন, লম্বুদা, আমাদের মেরে ফেললে।

লম্বু সত্যিকারের সেয়ানা। এ রণক্ষেত্রের স্ট্র্যাটেজী বুঝে ফেলতে তার এতটুকু সময় লাগল না। দক্ষ সেনাপতির মতো হুকুম করল, কেটে পড়, তার পরে যা করবার বাতলে দেব।

এই নির্দেশটুকুর জন্যেই যেন ফটিকরা অপেক্ষা করছিল, চকিতের মধ্যে সব ভোঁ ভাঁ পালিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য পক্ষের বিজয়োল্লাস, যা রে শালারা, ঘরে গিয়ে শুধু চুড়ি নয়, একখানা করে শাড়িও পরিস।

কোরাসে হ্যা হ্যা হ্যা—হাসির হররা।

যুদ্ধ জিতলে সৈন্যরা যেভাবে উল্লাস করে এদেরও সেই আবদার, আমরা ফূর্তি করবো, মদ খাব, শীগগির বোতল নিয়ে এস।

এদের ওপরই দলের ভরসা, সে কারণ দলপতি এদের চটাতে পারে না, কানে কানে ফিসফিস করে বুঝিয়ে বলে, আজ পুজোর দিন আমরা সবাই মদ খাচ্ছি জানলে পাড়ার লোক চটে যাবে। তার চেয়ে তোমরা পার্কের মধ্যে চলে যাও, আমি মাল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অন্যদের জয়ধ্বনি, থ্রি চীয়ার্স ফর আওয়ার সেক্রেটারী ঘোতনদা, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

নির্জন পার্কের অন্ধকারে ঘোতন অ্যান্ড পার্টির সান্ধ্য মজলিস জমজমাট। একজনের উক্তি, এ না হলে পুজো, কারণবারি পেটে না পড়লে সবই তো নিরামিষ।

—ক্রেডিট ঘোতনদার, বাস্তুঘুঘুকে প্রেসিডেন্ট না করলে এসব আমাদের কপালে জুটত!

ঘোতন মুচকি হাসে, মাইরি, বাস্তুঘুঘু মাইফেলী লোক, একবারের বেশী দু'বার বলতে হলো না, ছ' বোতল রাম ঘর থেকে বার করে দিল।

সমবেত উচ্ছ্বাস, বেঁচে থাক আমাদের রামভক্ত বাস্তুঘুঘু, ওকে নিয়েই আমরা রামরাজত্ব করবো।

যোগাযোগটা কাকতালীয় কিনা বলা শক্ত। কিন্তু রামরাজত্বের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে লাফাতে লাফাতে এক হনুমান এসে হাজির, সমস্বরে ঘোষণা করল, সর্বনাশ হয়েছে, ঘোতনদা, শীগগির এস, আমাদের প্যান্ডেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

—সে কি রে, আগুন, কারা লাগালো!

—নির্ঘাত ঐ ফট্‌কের দল।

—তোরা ঠেকাতে পারলি না?

—প্যাণ্ডেলে তো শুধু বাচ্চাগুলো খেলা করছিল, তোমরা এখানে, আমরা ক্লাব ঘরে বসে তাস খেলছি—

—চল, চল—

টলতে টলতে সৈনিকরা পুজোর মণ্ডপে এসে হাজির। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ইলেকট্রিকের ফিটিংগুলো দাম দাম করে ফাটছে, চারদিকে লোকজন জড়ো হয়েছে, বালতি বালতি জল ছুঁড়ছে আগুন লক্ষ্য করে, যাতে না আশপাশের বাড়িগুলোতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে, সরস্বতী প্রতিমা পুড়ে গিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে বীভৎস কালীমূর্তিতে।

ইতিমধ্যে বাস্তুঘুঘুও এসে পড়েছে। বেঁটে মোটা গোলগাল চেহারা, মুখখানা জলহস্তীর মত। জোড়া ভুরু, কান দুটো দোমড়ান। রেগে ফেটে পড়ে, ছি, ছি, মুখে চুনকালি দিয়ে দিলে, আর তোমরা মাল খেয়ে পড়ে আছ! ওদের দলের ছেলেরা কত সিন্‌সিয়ার। তোমরা পটকা ফাটিয়েছ, প্যাণ্ডেল পুড়িয়ে ওরা তার শোধ তুলল, যেরকম করে পার তোমরা গিয়ে ওদের প্যাণ্ডেল পুড়িয়ে দিয়ে এসো, যত খরচ লাগে আমি দেবো। তা যদি না পার, আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় এস না। তোমাদের মতো অপদার্থদের আমি মুখ দেখতে চাই না।

অপমানিত সেনাপতি ঘোতন তাল ঠুকে উঠে দাঁড়াল। চীৎকার করে স্লোগান দিল, 'এ লড়াই জেদের লড়াই'।

মত্ত সৈনিকদের আস্ফালন, 'এ লড়াই লড়তে হবে, জিততে হবে।'

মুখে আস্ফালন করলেও সমরক্ষেত্রে গিয়ে ঘোতনরা খুব সুবিধে করতে পারল না। দেখল—লম্বুর দল আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে। পুজো মণ্ডপের চারদিকে তাদের সতর্ক পাহারা। কয়েক জনের হাতে লাঠি, জামার তলায় লুকোন ছোরা আছে, এক ধারে সোডার বোতল সুসংরক্ষিত। হয়তো প্রসাদের ঝুড়ির নীচে তাজা হাতবোমাগুলো চাপা দিয়ে রেখেছে।

কিছুটা দূর থেকেই ঘোতন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, ফট্‌কে কোথায়?

—এখানে নেই।

—আমরা তাকে খুঁজছি।

—কেন?

—আমাদের মণ্ডপে ও শালা আগুন লাগিয়েছে।

—বাজে মুখখারাপ ক'রো না। কম পয়সায় ইলেকট্রিক ওয়্যারিং করেছিলে, তার থেকে নিশ্চয় আগুন লেগেছে। আমরা কারুর ক্ষতি করি না।

ঘোতন শাসায়, ঠিক আছে, আমরাও দেখে নেব, ধড়ের উপর মুণ্ডু ওর থাকে কি না।

শুয়োরের মতো ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ওরা সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লম্বুদের দলের টিট্‌কিরি, চুড়ি শাড়িতে শানাবে না দিদি, তোমরা গিয়ে বোরখা পরো।

হি হি হি—অশ্লীল হাসির তরঙ্গ।

সত্যিই ফটিক পুজোর মণ্ডপে ছিল না। লম্বু তাকে নিয়ে গিয়েছিল অশোক জানার প্রেসে। বলেছিল, অশোকদা, আজকের রাতটার মতো এ ছোঁড়াটা আপনার এখানে থাকবে। অশোক জানা জানতে চেয়েছিল, কেন রে, কি হয়েছে?

—ঘোতনদের প্যাণ্ডেলে আগুন লেগেছে না!

—সে কি, কখন?

——এই তো, পুড়ে সব ছাই। ব্যাটাদের রাগ এই ফট্‌কের উপর। আজকের রাতটা গা ঢাকা দিয়ে থাকুক, কালকে সব ঠিক হয়ে যাবে।

অশোক জানার চোখে কৌতূহল, বলিস কি রে, বাস্তুঘুঘুর চুরির পয়সার প্যাণ্ডেল পুড়ে গেল। জানিস অনাদি, সে যা চীজ! আসামী ধরতে না পারলে ভগবানের নামে ফৌজদারী মামলা ঠুকে ভদ্রলোককে জেল খাটিয়ে ছাড়বে।

অনাদিপ্রসাদের প্রশ্ন, ভদ্রলোকের আসল নামটা কি?

—কেউ তার খবর রাখে না, বাস্তুঘুঘু বললেই লোকে এক ডাকে চেনে।

লম্বু ডাকে, চলুন না অশোকদা, মজা দেখবেন, ঘোতনদের বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছি।

অশোক জানার ছেলেমানুষের মতো উৎসাহ, চলুন শশধরবাবু, চলো হে অনাদি, একবার ঘুরে আসি।

অনাদিপ্রসাদ হাতঘড়ি দেখে বলেন, না, আজ থাক। আমাকে একবার শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে।

—এই বুড়ো বয়সে কেউ শ্বশুর বাড়ি যায় না, বউ লজ্জা পাবে।

—না, না, ওখানে একটা কাজ আছে।

—ঠিক আছে বাবা, তোমাকে তো আর সারা সন্ধ্যে ধরে রাখছি না, ওইখানটা হয়ে চলে যেও।

বাস্তুঘুঘু যেই হোক, তার ক্লাবের ভস্মীভূত পুজোর মণ্ডপ দেখে অনাদি-প্রসাদের মন খারাপ হয়ে গেল। পোড়া বাঁশ, পোড়া কাপড়, হতশ্রী পোড়া প্রতিমা।

শ্মশানের মতো পোড়া আর রিক্ত। চারদিকে লোকজনের ভিড়, নিজেদের

মধ্যে বচসা, সেখানেও রেষারেষি।

অনাদিপ্রসাদ মন্তব্য না করে পারলেন না, ছি, ছি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে একটা পুজোর মণ্ডপ পুড়িয়ে দিল, এরা কারা!

অশোক জানা হি হি করে হাসে, মা সরস্বতীর ভক্ত, সকলেই প্রায় ছাত্র, অবশ্য অনেকেই ঝুনো নারকোল, একই ক্লাসে অনেক বছর আছে।

লম্বু খুশিতে ডগমগ করে, ছোঁড়াগুলোর মুখ দেখুন, শুকিয়ে আমসি। কি যে করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

—তোদের পুজোর কোন ক্ষতি করবে না তো?

—চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমাদের তৈরী দেখে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে এসেছে।

—তা হলে?

—হাওয়া থমথমে, ওরাও মতলব আঁটছে, আমাদের চরও লাগিয়ে রেখেছি। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

দু' পক্ষই যখন দ্বিতীয় দফা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে একটা পাতলা লোক ফটিকের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল।

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের প্রশ্ন, কে?

আগন্তুকের জিজ্ঞাসা, ফট্‌কে আছে?

—বাড়িতে নেই।

—ওর বাবা আছেন?

—শরীরটা ভাল নেই শুয়ে আছেন।

—একবার আসতে বলুন, বিশেষ দরকার আছে।

—আপনি কে?

—এই পাড়ারই একজন।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফটিকের অসুস্থ বাবা দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক সরকারী কেরানী, নিরীহ ছাপোষা মানুষ।

আগন্তুক কঠিন স্বরে বলে, আপনার ছেলে তো বেশ লায়েক হয়েছে, লম্বুর সাকরেদ, কোথায় লুকিয়ে আছে, তাকে বেরতে বলুন।

ফটিকের বাবা ত্রস্ত হন, কেন কি হয়েছে, ফটিক কি করেছে?

—বাঃ, চমৎকার! কিছুই জানেন না! বলুন ফটিক কোথায়?

—বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।

আগন্তুক ফটাস করে এক চড় মারে ভদ্রলোকের গালে, বলুন কোথায়?

অকারণে চড় খেয়ে ফটিকের বাবাও রুখে ওঠেন, আগন্তুকের শার্টের কলারটা ধরে জিজ্ঞেস করেন, আমাকে মারলেন কেন?

—বেশ করেছি মেরেছি, আবার মারব। আগন্তুক কিন্তু আর সময় দিল না, ক্ষিপ্র হস্তে জামার তলা থেকে ছোরা বার করে চালিয়ে দিল ভদ্রলোকের পেটে।

আর্তনাদ করে ফটিকের বাবা রাস্তার উপর পড়ে গেলেন। অবিচলিত আগন্তুকের হিংস্র গর্জন, মর শালা, মর, ফট্‌কেকে কোথায় লুকিয়ে রাখবি, তোর মুখে আগুন দিতে ব্যাটা বেরবে না। তখন ওকেও খতম করবো।

ফটিকের বাবার চীৎকার শুনে লোকজন জড়ো হবার আগেই আগন্তুক উধাও হয়ে গেল। ভীড় আর তখন পুজোর মণ্ডপে নয়, ফটিকদের বাড়ির রাস্তায়। ফটিকের বাবাকে বেশিক্ষণ কষ্ট পেতে হয়নি, আঘাতটা গুরুতর রকমের ছিল, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণ বেরিয়ে গেল।

একই পাড়ায় একটি প্রতিমা অগ্নিদগ্ধ হলো আর একটি শোচনীয় হত্যাকাণ্ড। আবার হইচই, আবার চীৎকার। পুলিস ডাক। প্রতিহিংসা চাই। মৃতের পরিবারবর্গের বুকফাটা কান্না। জনতার হুমকি। ফটিকের বন্ধুদের আস্ফালন। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু, সব কিছু নিয়েই চুটকী আলোচনা। কথা বলতে হয় সবাই বলছে, শুনতে হয় সবাই শুনছে, কিন্তু কারুরই বোধ হয় হৃদয়স্পর্শ করছে না। এ যেন পথ-নাটকের একটা দৃশ্য, জীবনের অনুকরণ, কিন্তু জীবন নয়।

শুধু একজন কিছুতেই এই পরিস্থিতিটাকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না, তিনি অনাদিপ্রসাদ। তাঁর কাছে মনে হলো আজকের পঙ্কিল সমাজ, চরিত্রহীন যুবক, মেরুদণ্ডহীন জনতা তাঁর শ্বাসরোধ করে মারছে। এই বর্বর সমাজের তিনি একজন বাসিন্দা, অথচ লেখার পাতায় তিনি বড় বড় ফতোয়া জারি করেন যার সঙ্গে আজকের জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, যা বাস্তব তা হলো ফটিকের বাবা খুন হয়েছেন, ঈর্ষা আর দলাদলির বলি। বেঁচে থাকতে তাঁকে নিয়ে পাড়ার লোক মাথা ঘামাত না, কিন্তু আজ থেকে ঘামাবে। রাজনৈতিক দলেরা শকুনের মতো আকাশে পাক খাচ্ছে। নজর ভাগাড়ের দিকে, যদি ঐ মৃতদেহটাকে কাঁধে তুলে হরিনামের বদলে শ্লোগান দিতে দিতে রাজভবন পর্যন্ত যাওয়া যায়, কে বলতে পারে জনতার চাপে হয়তো সরকার হুমড়ি খেয়ে পড়বে, তখন ঠিকমত দর কষাকষি করতে পারলে হয়তো বসে পড়া যাবে মন্ত্রীর গদীতে।

ফটিকের বন্ধুরাও কোনদিন তার বাবাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু আজ তো ভদ্রলোক শহীদ হয়ে গেছেন, অতএব তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। চোখের বদলে চোখ, নখের বদলে নখ, খুনের বদলে খুন। অতএব আর একটা খুনের জমি প্রস্তুত।

অনাদিপ্রসাদের মনে হলো তা হলে নিরাপত্তা কোথায়, যে-কোন মুহূর্তেই

তো তিনি আর একজনের প্রয়োজনের বলি হতে পারেন। স্বাধীনতার বিশ বছরে এই কি আমাদের প্রাপ্তি? অনিয়ম, হিংসা, অত্যাচার। তবে কেন বিশ্বের দরবারে আমরা মিথ্যে বড়াই করে মরি, আমাদের পথ অহিংস, কেন মিথ্যে তথাগত বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করে তাঁকে কলুষিত করি।

অশোক জানা একবার জিজ্ঞেস করল, কি রে, তুই শ্বশুর বাড়ি যাবি না?

অনাদিপ্রসাদ তখনও রাগে ফুলছেন, না, আমি এর শেষ দেখতে চাই।

শশধর বোস এম. এল. এ-র দার্শনিক উক্তি, শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?

থানা থেকে লোক এল। খাতায় জবানবন্দী লিখল, দু'জন পুলিস বসিয়ে দিয়ে গেল পাড়ায় যাতে না রাত্রে আবার কোন গোলমাল হয়।

—দু'জনে কি করবে মশাই? আরও লোক দিন।

থানার অফিসারের অমায়িক উত্তর, কতো জায়গায় লোক দেব স্যার, সারা কলকাতায় আজ পুজো। চুরি ছিনতাই, রাহাজানি, পকেটমার, আরও কত রকমের কেস, যেখানে যেখানে পারছি লোক বসিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমাদেরও তো শক্তির একটা সীমা আছে. আপনাদের এখানে লোক দিলাম মার্ডার কেস বলে, অন্যদের চেয়ে প্রেফারেন্স।

পাড়ার লোকেরা গর্ববোধ না করে পারল না, পুলিসকেও তারা ভাবিয়ে দিয়েছে, একেবারে নরহত্যা, সোজা কথা নয়।

ভিড়ের মধ্যে অনাদিপ্রসাদ একজনকে আবিষ্কার করলেন, আরে মশাই, আপনাকে তো আমি চিনি।

লোকটি এক চোখ টিপে বলল, কোন পাড়ায় দেখা হয়েছিল দাদু? তোমার চেহারাটা তো খুব মনে করতে পারছি না।

অনাদিপ্রসাদ মনে করিয়ে দেন, কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়ায়, রুটি বলে একটা ঝোলা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, যার জন্যে পুলিস আমায় থানায় নিয়ে গেল।

লোকটা হই হই করে হাসল, ও, বুঝতে পেরেছি। আপনি তো ভ্যাবাগঙ্গারাম দি গ্রেট, রুটি মানে বোমা, তাও বোঝেন না? আপনার পেশাটা কি দাদু? নিশ্চয় কোন সরকারী দপ্তরে কাজ করেন যেখানে বুদ্ধি খরচ করতে হয় না।

—আপনার নামটা জানতে পারি কি?

—আমার খান সাতেক নাম আছে, তবে বর্তমানে যেটায় পরিচিত তা হলো ঝুনুদা।

—পেশা?

—যখন যেমন তখন তেমন। এখন একটা সাংস্কৃতিক ক্লাব আছে, এই নিন

আমার ঠিকানা, একদিন আসবেন সব বুঝিয়ে দেব।

অনাদিপ্রসাদ চোখ ছোট করে ঝুনুদার দিকে তাকান, এ খুনের ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?

ভদ্রলোক নীচু গলায় বলে, খুব জানি, কে খুন করেছে তাও জানি।

—কে?

—আমাকে অতো বোকা ভাববেন না, নামটি বলেছি কি আমি খুন হয়ে যাব, কি দরকার বাবা ঝামেলায় গিয়ে, যে খুন হয়েছে সে তো বেঁচে গেছে। তাকে আর র‍্যাশানের দোকানে গিয়ে ধর্না দিতে হবে না, চাকরি রাখার জন্যে অফিসারের বউ-এর উমেদারি করতে হবে না, ছেলের লেখাপড়ার জন্যে মাষ্টারদের পায়ে তেল দিতে হবে না। আজকের দিনে বেঁচে থাকাটাই তো পাপ, মরতে পারলেই পুণ্য। কিন্তু আপনার নামটা তো বললেন না।

—অনাদিপ্রসাদ।

—কি করেন?

—বই লিখি।

—স্রেফ টেকস্‌ট্‌ বই লিখুন, টাকায় টাকা লাভ, এর চেয়ে মুনাফা আর কোন ব্যবসাতে নেই।

অনাদিপ্রসাদ সংশোধন করে দেন, আমি গল্প, উপন্যাস লিখি।

—তাও চলবে। তবে পর্নোগ্রাফি নিয়ে লিখতে হবে, সাহিত্যের নামে ঐ একটা জিনিসই এদেশে চলে, আট থেকে আশী সবাই লুকিয়ে চুরিয়ে ঐ নোংরা সাহিত্যের চাট্‌নী পড়ে, অচিরে আপনিও এপাড়ায় বাস্তুঘুঘুর মতো বিশাল ফ্ল্যাট হাঁকিয়ে বসবেন।

অনাদিপ্রসাদ অশোক জানার কাছ থেকে হাঁফ ছাড়বার জন্যে প্রেসে ফিরে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন অল্পক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে শালাজের ভাবী পুত্রবধূকে দেখতে শ্বশুরবাড়ি যাবেন। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। পাড়ায় আবার উত্তেজনা শোনা গেল, কর্মরত পুলিসের একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ যে মারাত্মক অপরাধ, পুলিসের লোককে গুম্‌ করা মানে পাড়ার লোক নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে।

অশোক জানা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, তাহলে কি হবে অনাদি?

—ভয় করিস না, আমি তোর সঙ্গে আছি, দেখা যাক না শেষ পর্যন্ত কি হয়।

—প্যান্ডেলে আগুন, একজন খুন, তারপর পুলিস গায়েব। সত্যি করে বল অশোক, আমরা কি সভ্যসমাজে বাস করছি?

অশোক জানা উত্তর দিতে পারে না। তারও মনে ঐ একই প্রশ্ন।

॥ এগারো ॥

লম্বুদের পাড়ার উত্তেজনার ব্যারোমিটারের পারা সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিল ফটিকের বাবার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তার পর থেকেই নামতে শুরু করেছে, ঠাণ্ডায় নয়, ভয়ে। এ ভয় সকলেরই। খুনের বদলে খুন হওয়াও যেরকম স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক কর্মরত পুলিসকে গুম করা। এর ফল বিষময়। পুলিসের কুনজর এ পাড়ার সব ক'জন পাণ্ডার ওপরই পড়বে। যাদের নাম ইতিমধ্যেই থানার ডায়েরীতে লেখা হয়ে আছে, ভোর না হতেই তাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। হয়তো জামিনেও ছাড়বে না, মিছিমিছি কতদিনের দুর্ভোগ, কে বলতে পারে।

সমাধানের একটা পথ খুঁজে বার করার জন্যে দু' দলেরই নেতার শীর্ষসম্মেলন বসল। পার্কের এক কোণায়। লম্বু আর ঘোতন।

ঘোতনের আকুতি, বিশ্বাস কর লম্বু, আমরা ফটিকের বাবাকে খুন করিনি। যতই দলাদলি রাগারাগি আমরা করি না কেন, তাই বলে একটা মানুষকে আমরা মেরে ফেলবো? বাড়িতে মুরগি কাটতে বললে আমি পারি না।

লম্বুর প্রশ্ন, তা হলে মারল কে?

—তা বলতে পারছি না, তবে আমরা নই।

—কে মারার হুকুম দিয়েছে তা আমি জানি।

—সে তো আমিও জানি।

দু'জনেই দু'জনের চোখের দিকে তাকাল, বুঝল তারা দু'জনে একই লোককে সন্দেহ করছে, কিন্তু মুখে বাস্তুঘুঘুর নামটা উচ্চারণ করল না।

ঘোতনের বক্তব্য, জানিস তো মানুষটাকে, একটা শয়তান, যত নোংরা কাজ আমাদের দিয়ে করায়, আবার ইচ্ছে করেই আমাদেরই পুলিসে ধরিয়ে দেয়। কে জানে, ও-ই হয়তো পুলিসটাকে গুম করেছে, যাতে আমরা বিপদে পড়ি।

—তা হলে উপায়?

—যেরকম করে হোক পুলিসটাকে খুঁজে বের করতে হবে, পাড়ার প্রত্যেক বাড়িতে আমরা হানা দেব; এখন আর শত্রুতা করলে চলবে না, আমরা বন্ধু।

বিপদের মুখে পড়ে দু' দলে ভাব হয়ে গেল। দিকে দিকে ছেলেরা বেরিয়ে পড়লো নিরুদ্দিষ্ট পুলিসের খোঁজে। রাত্রি ক্রমশ গভীর হচ্ছে, কিন্তু পাড়ার

কারুর চোখে ঘুম নেই। সকলেই ত্রস্ত, চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। একটা অজানা আশঙ্কায় দরজা বন্ধ করে ভয়ে ভয়ে আলো জ্বালিয়ে সকলে বসে আছে।

হঠাৎ একটি ছেলে এসে ফিসফিস করে লম্বুকে জানাল, মনে হচ্ছে মতিদের বস্তিতে কেউ ঢুকেছে।

—কি করে জানলি?

—কানাঘুষো শুনছিলাম। তা ছাড়া অন্য পুলিসটাকে জেরা করে জানলাম, ঘণ্টা দুই আগে মুখে বসন্তর দাগওয়ালা মাথায় বড় চুল—

লম্বু তখনই চিনতে পারল, কে, চীনে?

—আমারও তাই মনে হচ্ছে, পুলিস দুটোর সঙ্গে গল্প করছিল, ওরই সঙ্গে একজন যায়, সে-ই আর ফেরেনি।

লম্বুর মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো, চুপ, এখন আর এ কথা কাউকে বলিস না। আমি নিজে একবার খবর করে আসছি। ইচ্ছে করলেও লম্বুর মতো দলপতিদের দল ছেড়ে একলা কোথাও যাওয়া মুশকিল। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে সাকরেদরাও চলবে। অগত্যা লম্বুকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। অশোক জানা আর অনাদিপ্রসাদকে উদ্দেশ করে বলে, দাদারা একটু আমার সঙ্গে আসুন, পরামর্শ করবার আছে।

অন্যদের বলে, তোরা এখানে অপেক্ষা কর, কোথাও যাবি না, আমরা আসছি।

লম্বুর সঙ্গে চলতে চলতে অশোক জানা একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কি হয়েছে লম্বু? আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

—কথা বলবেন না, সীরিয়াস ব্যাপার, চুপ।

বড় রাস্তা পার হয়ে একটা পোড়ো জমির ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে তারা গিয়ে পেঁছিল একটা বস্তির সামনে। জায়গাটা ফাঁকার মধ্যে, আশেপাশে খানকয়েক দোকানঘর ছাড়া আর কোন পাকাবাড়ি নেই। পাড়ার উত্তেজনা কিন্তু এ পল্লীতে এসে পেঁছয়নি। প্রায় অন্ধকার, বোধ হয় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু কোণের ঘরে একটা বাতি জ্বলছে। নিষ্কম্প শিখা, বোধহয় হ্যারিকেনের আলো।

লম্বু দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাকল, মতি, মতি।

ভেতর থেকে একটি মেয়ের গলা শোনা যায়, কে?

—আমি লম্বু।

—এখন হবে না, ঘরে লোক আছে।

লম্বুর অনুনয়, সেজন্যে নয়, তুই একবার বাইরে আয়, খুব দরকার আছে।

একটু বাদে দরজা খুলে মেয়েটা বেরিয়ে এলো। কপালে কাঁচপোকার টিপটা জ্বলজ্বল করছে, এক মুখ পান, হাতে একটা জ্বলন্ত বিড়ি। দেখলেই বোঝা যায় নেশা করেছে প্রচুর, কোনরকমে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

জিজ্ঞেস করলো, কি রে, কি হয়েছে?

—ঘরে কে আছে?

—কি জানি। চীনের সঙ্গে এলো, এই তো কিছুক্ষণ আগে। ব্যাটা খুব নেশা করতে পারে, আমাকেও খাইয়েছে, নিজেও খেয়েছে।

—চীনে কোথায়?

—সে ছোঁড়া দালালির পয়সা নিয়ে পালিয়েছে।

দূরে অনাদিপ্রসাদদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লম্বুকে জিজ্ঞেস করল, ওরা কারা?

—আমার বন্ধু।

মতি হেসে অনাদিপ্রসাদদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে, আজকে হবে না, কাল আসবেন। ভাল মাল নিয়ে আসবেন; পয়সা কম নেবো।

লম্বু ধমকায়, আঃ চুপ কর, কাকে কি বলছিস!

মতি অকপটে স্বীকার করে, বেশি মদ খেয়েছি রে লম্বু, ভাল করে তাকাতে পারছি না, ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে পড়ি।

—শোন, তোর ঘরে যে আছে সেটা পুলিসের লোক।

মতি চমকে ওঠে, পুলিস! সে কি রে!

—চীনে তোকে বলেনি?

—কই, না। তারপর একটু কি ভেবে নিয়ে বলে, লোকটার গায়ে চীনের জামা কাপড় ছিল, সঙ্গে একটা পোঁটলা, দেখ তো লম্বু ওর মধ্যে পুলিসের জামা কাপড়গুলো লুকিয়ে রেখেছে কিনা।

লম্বুর পিছন পিছন অশোক জানারাও মতির ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখল একটা লোক বেহুঁশ অবস্থায় উপুড় হয়ে চৌকির উপর পড়ে আছে, গায়ে জামা কাপড়ের কোন ঠিক নেই। অনেকগুলো খালি মদের বোতল, চারদিকে সিগারেটের ছাই ছড়ানো, ঘরের মধ্যে একটা দুর্গন্ধ। পোঁটলার ভেতর থেকে পুলিসের ড্রেসই বেরোল।

মতি সাপ দেখার মতো শিউরে ওঠে, এ জানলে মানুষটাকে আমি কিছুতেই ঢুকতে দিতাম না, হুঁশ ফিরে এলেই ব্যাটা আমাকে হাজতে দেবে, চীনে ছোঁড়াটা বড় হারামী।

লম্বু থামিয়ে দেয়, চুপ, বাজে বক বক করিস না, একে আমি নিয়ে যাচ্ছি, বলবো রাস্তার ধার থেকে তুলে এনেছি। এঁরা গণ্যমান্য লোক, আমার সাক্ষী দেবেন। কিন্তু খবরদার, তুই কারুর কাছে স্বীকার করবি না লোকটা এখানে

রাত কাটিয়েছে। তা হলে তোর হাতে হাতকড়া পড়বে।

আর কাউকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লোকটাকে কাঁধে ফেলে লম্বু হন হন করে মতিদের বস্তি থেকে বেরিয়ে এল।

অশোক জানা কৌতূহল দমন করতে পারে না, মতি মেয়েটা কে লম্বু?

—মেয়েটা ভাল, দু'তিনটে বাবুর বাড়িতে ঠিকে ঝি-এর কাজ করে, আর রাত্তির বেলা...

—এই ব্যবসা।

—সে যাই বলুন, মেয়েটার একটাই দোষ, মদের নেশা। ছোটবেলা থেকে অভ্যেস, ছাড়তে পারেনি। নিজের রোজগারে মদ কিনতে পারে না, তাই—

একটু থেমে লম্বু আবার বলে, কিন্তু মেয়েটা ভাল, দিলটা বড়, পরে একদিন ওর কথা বলবো। দোহাই অশোকদা ও মেয়েটাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না।

মত্ত হলেও জ্যান্ত পুলিস ফিরে পাওয়ায় পাড়ার লোকদের ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। যাক্, তাহলে আর ভাবনা নেই, পাড়াসুদ্ধু সবাইকে থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হবে না।

ভোর না হতেই থানা থেকে অফিসার এসে হাজির, সঙ্গে দলবল। পুলিস গুম হবার খবর পেয়েই তিনি ছুটতে ছুটতে আসছেন, সেই অনুপাতে মেজাজ।

—এসব কি ব্যাপার? আপনাদের সেফ্‌টির জন্য পুলিসের ডিউটি দিয়ে গেলাম, আর তাকেই আপনারা গুম করে ফেলেছেন? শিগগীরি বার করুন, নয়তো এই লিস্ট সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, এ পাড়ার যত অ্যান্টিসোশ্যাল এলিমেন্ট সবাইকে ধরে নিয়ে যাব। চিরুনী দিয়ে আঁচড়ে মেয়েরা যেমন মাথার ময়লা পরিষ্কার করে তেমনি করে এ পাড়ার ঠগ্‌বাজ গুন্ডাগুলোকে আঁচড়ে বার করে নেব। কোথায় সব মাস্তানরা, লম্বু, ঘোতন, দেখি চাঁদ বদনগুলো।

পুলিস সাহেব কিন্তু আশ্চর্য হলেন, এত তর্জন-গর্জনেও পাড়ার লোক-গুলো শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁরই দিকে তাকিয়ে ঠিক যেন তামাশা দেখছে।

ভদ্রলোক চেঁচালেন, কই, আপনারা কথা বলছেন না কেন?

একক কণ্ঠে উত্তর দিলেন অনাদিপ্রসাদ, বলবার কিছুই নেই বলে!

—তার মানে?

—আসুন আমার সঙ্গে।

লম্বুরাও সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, অনাদিপ্রসাদ বাধা দিলেন, একটু পরে। ভদ্রলোককে আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সামনেই একজনের বাড়ির বৈঠকখানায় মাতাল পুলিসটিকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে অনাদিপ্রসাদ অফিসারকে বললেন, মিথ্যে চেঁচামেচি করবেন না, ঐ দেখুন আপনার লোক, কেউ তাকে গুম করেনি, নিজেই মদ খেয়ে—

অফিসার তখনও স্বীকার করতে চান না, নিশ্চয় পাড়ার বদ্ ছেলেরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাদের বে-ইজ্জত করবার জন্যে ওকে মদ খাইয়েছে। অনাদিপ্রসাদ হাসলেন, হয়তো আপনার কথা বিশ্বাস করতাম, যদি না ঐ লোকটিকে তুলে আনতে হতো একটি মেয়েমানুষের আস্তানা থেকে।

—কি বলছেন!

—ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান।

এইবার পুলিস সাহেব ভয় পান, এসব জানাজানি হয়ে গেলে লোকটার যে চাকরি যাবে, বেচারী গরীব মানুষ।

—সে কথা পাড়ার লোকদের বুঝিয়ে বলবেন, হয়তো তারাও চাইবে না একটা লোকের চাকরি যায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিথ্যের সঙ্গে আপোস করে থাকতে হচ্ছে, এঁরাও হয়তো থাকবেন। আপনার কথামত সব ব্যাপারটাই ধামাচাপা দিয়ে দেবেন। আমার ধাতে ঠিক এগুলো সয় না, তাই আগেভাগেই এখান থেকে সরে পড়ছি, পাছে মিথ্যে সাক্ষী দিতে হয়।

অনাদিপ্রসাদ হন হন করে বেরিয়ে গেলেন। অফিসার ভদ্রলোক পিছন থেকে ডাকলেন, শুনুন, আমার কথা শুনে যান।

সে ডাকে অনাদিপ্রসাদ সাড়া দিলেন না দেখে অন্যদের জিজ্ঞেস করলেন, ও ভদ্রলোক কে?

ভীড় ঠেলে অনাদিপ্রসাদ ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলেন। একবারও ফিরে তাকালেন না। এগিয়ে চললেন বরাবর সামনের দিকে। অশোক জানা পেছন থেকে ডাকবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অনাদিপ্রসাদ কোন সাড়া দেননি। এই অসহ্য পরিবেশটা তিনি অতিক্রম করে যেতে চান। তাই এই চলা।

যদিও রাত্রি অনেক তবু শহর অন্ধকার নয়, রাস্তার আলোর সঙ্গে আজ যোগ দিয়েছে বিভিন্ন পূজা প্যান্ডেলের রোশনাই। শহর ঘুমিয়েও পড়েনি; কারণ, প্যান্ডেলের প্রতিমা আগলাতে প্রত্যেক পাড়ায় ছেলেরা বসে গল্প করছে, তাস খেলছে। এ তাসখেলা সব জায়গায় নিরামিষ নয়, কোথাও কোথাও পয়সার লেনদেনও আছে। পাড়ার চায়ের দোকানের ছোঁড়াটাকে জাগিয়ে রাখা হয়েছে যাতে ভলান্টিয়াররা চা বলে চেঁচালেই ভাঁড়ে গরম চা পায়। এ রাত্রে চায়ের দোকান খুলে রাখাটা বাধ্যতামূলক, নয়তো সে পাড়ায় আর চায়ের দোকান চালিয়ে করে খেতে হবে না। গরম চায়ের সঙ্গে অফুরন্ত সিগারেট। রাত্রি বলে মাইকের হিন্দী গান বন্ধ থাকলেও সারা দিন শুনে শুনে ছেলেরা

অনেকটা রপ্ত করে নিয়েছে। মাঝে মাঝেই তাদের ঐকতান শোনা যায়। যে ছেলেটা কোণায় বসে ঘুমে ঢুলতে থাকে অন্যরা তাকে জোর করে তুলে দেয় ওদের গানের সঙ্গে টুইস্ট নাচ করার জন্যে। ঘুমও পালায়, হাসির হররাও ছোটে। সংস্কৃতিবিহীন বাসরঘরের অসভ্যতাও লজ্জা পায় এই বারোয়ারী পুজোর স্বেচ্ছাসেবকদের বেহায়াপনার কাছে।

তবুও, মাটির প্রতিমাকে বসে থাকতে হয়, লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে পারলে বোধহয় শান্তি পেত, কিন্তু উপায় নেই, গঙ্গায় বিসর্জনের জন্যে আরও কয়েক ঘণ্টা এই অত্যাচার সহ্য করতে হবে।

অনাদিপ্রসাদ জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটছেন। এই প্যান্ডেল আর পুজোর পঙ্কিল পরিবেশ থেকে তিনি মুক্তি পেতে চান, কিন্তু মুক্ত হবেন কি করে। যে রাস্তা দিয়েই চলুন না কেন পাঁচ হাত অন্তর ব্যাঙের ছাতার মতো পুজোর প্যান্ডেল। সেই একই দৃশ্য, একই নোংরামী। অনেক দূর এগিয়ে এসে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে পড়ে অনাদিপ্রসাদের মনে হলো এই অঞ্চলটা পুজোর মাতলামীর আওতায় পড়েনি। নানা জাতের বাসিন্দা এখানে, নানা ভাষার লোক। তাই সরস্বতীকে নিয়ে বেশী মাতামাতি করেনি।

রাত্রের কলকাতার একটা অন্য রূপ আছে। সারা দিনের ব্যস্ততার পর হঠাৎ কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায়; রাস্তায় গাড়ির ভীড় থাকে না, ফুটপাথে রিকশাগুলো মুখ নীচু করে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকে। পর পর সাজানো বিছানা হয় খাটিয়ার উপর নয়তো মাটিতে। হাজার হাজার শহরবাসী রাত কাটায়, মাথার ওপরে গাড়ি-বারান্দার আচ্ছাদন। এসময় রাস্তা দিয়ে চললে ওপরে আকাশ দেখা যায়। কলকাতা শহরের ওপরেও যে আকাশ আছে সে শুধু বোধ হয় এই সময় বোঝা যায়। বিরাট উঁচু উঁচু বাড়ির ছাদের মাঝখান দিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর সমান্তরাল আকাশ পথ। দু' চারটে তারা ঝিকমিক করছে। অনাদিপ্রসাদ মাঝে মাঝেই আকাশকে দেখবার চেষ্টা করছিলেন। পায়ে চলা পথটা সত্যিই যদি দিগন্তরেখায় গিয়ে মিলে যেত ঐ আকাশ পথের সঙ্গে তাহলেই বুঝি এই চলার সার্থকতা। যে প্রেরণায় নদী ছোটে সমুদ্রের দিকে, ছোট বড় বহু আলো সম্মোহিত হয় চাঁদের জ্যোৎস্নায়, ঠিক তেমনি নিজেকে বিলিয়ে দিতে চান অনাদিপ্রসাদ, মিলিয়ে দিতে চান আরও বিরাট কোন প্রেরণার সঙ্গে। কিন্তু সেখানেও তো সেই একই প্রশ্ন, নুনের পুতুল সাগর মাপতে গেলে নিজের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তো?

অনাদিপ্রসাদ যখন চৌরঙ্গীর কাছে এসে পেঁছিলেন তখন আকাশ ক্রমশ ফর্সা হয়ে উঠছে। ভোরের আলোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে পাখিদের কলরব। বাসা ছেড়ে গাছের ডালে বসে এদিক-ওদিক দেখছে, নিজেরা তৈরী হচ্ছে সারা দিনের ব্যস্ততার হাওয়ায় উড়ে বেড়াবার জন্যে। ফুটপাথের ধারে সারা গায়ে

চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ কেউ তোলা উনুন ধরাচ্ছে, এখুনি চা তৈরি করতে হবে। ফুটপাথে যারা শুয়ে থাকে তারাই এদের খদ্দের। রাস্তার মোড়ে মোড়ে এই ধরনের যাযাবর চায়ের দোকান। জল দেওয়া শুরু হয়ে গেছে, লম্বা হোস-পাইপ দিয়ে জল ছিটোচ্ছে। ধুলো এতে পরিষ্কার হয় কিনা বলা শক্ত তবু এ বহু দিনের নিয়ম, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ডান দিকে মোড় নিয়ে আকাশবাণী ভবনের পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে এগোলে ইডেন গার্ডেনের ধারে ধারে স্ট্র্যান্ড রোডের মোড় পর্যন্ত সারি দিয়ে ভিখারীরা বসে থাকে। সামনে এক টুকরো কাপড় পাতা, কিংবা ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি—ভিক্ষাপাত্র। তাদের নজর কেবল স্নানার্থীদের দিকে, গঙ্গায় ডুব দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে ফেরবার সময় যদি দু'চার পয়সা দান করে যায়। অন্য সময় এদের পরিচয় এরা ভিখারী, দেখলেই সবাই দূর দূর করে। শুধু পুণ্যার্থীদের কাছে এরা দরিদ্রনারায়ণ বলে কিছুটা স্বীকৃতি পায়।

রাস্তা পার হলেই বহু দিনের ঐতিহ্যময় বাবুঘাট। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখনো স্নানার্থীদের ভিড়। ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য আলাদা কাপড়ছাড়ার প্রশস্ত ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া আছে পাণ্ডাদের ছোট ছোট ঘর। পোর্ট কমিশনারের কাছ থেকে এগুলো ভাড়া নিতে হয়, বিভিন্ন ঘরে নানা দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানে পাওয়া যায় তেল, চিরুনী, গামছা, পুজোর ফুল, প্রসাদ। স্নান ও প্রসাধন সেরে স্নানার্থীরা প্রণামী দিয়ে চলে যায়। পাণ্ডাদের জন্যে খদ্দের জোটাতে সদা ব্যস্ত ছাড়িদাররা ঘাটের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, বাবুদের তেল মাখাবার ব্যবস্থাও করে দেয়। ঘাটের ধাপের উপর চাটাই বিছিয়ে তেল মাখাবার জন্যে এক শ্রেণীর লোক তৈরী থাকে। গঙ্গা-স্নানের আগে এখানে শুয়ে তেল মাখানো বহু মেদবহুল বাবুর বিলাসিতা। রাস্তার উপর ঠেলাগাড়িতে কাটা ফলের দোকান, স্নান ও পুজো সেরে অনেকে ফল খেয়ে চলে যায়। এক ঝাঁক পায়রা চালের ওপর বসে থাকে, কোন ভক্ত তাদের খাওয়াবার ইচ্ছে করলেই, 'আ, আ' করে ডাকলে হুড়মুড় করে তারা ফুটপাথের উপর নেমে আসে, চানা, ছোলা যা পায় খেয়ে আবার চালের উপর উঠে গিয়ে বসে পড়ে কে ডাকবে তারই প্রতীক্ষায়। কয়েকজন নাপিত ঘাটের কাছেই বসে, তাদেরও অফুরন্ত কাজ, স্নান করতে যাবার আগে অনেকেই ক্ষৌরকার্য সমাধা করিয়ে নেয় এদের দিয়ে। স্নান করে ঘাট থেকে উঠে এলেই বাঁ দিকে পড়ে ফুলের দোকান, নানা রকম পুজোর ফুল, বেলপাতা সেখানে পাওয়া যায়। তারই পাশে একটা মাথাঢাকা চত্বরের উপরে চারটি দেবমূর্তি, প্রায় সকলেই স্নানের পর এই মূর্তিগুলির উপরে জল চড়ায়, ফুল, বেলপাতা পুজো দেয় মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করে। অনেক সময় এ জায়গায় নাম কীর্তন হয়, চেনা-অচেনা কয়েকজনে মিলে ভক্তিভরে নাম গান

করে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

ঘাট দিয়ে জলে নামতে গেলে রেল লাইনের তলা দিয়ে যেতে হয়। অনেক-গুলো মোটা মোটা থাম, তারই ভেতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলে গঙ্গার পাড়, খানিকটা কাদামাটি, তারপর জল। মাঝ গঙ্গায় খান দুই বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে, এরা বিদেশ থেকে মাল নিয়ে আসে, আবার এখানকার চটের থলে, চায়ের পেটি, আরও কত রপ্তানির মাল নিয়ে যায় বিদেশে। জাহাজগুলোর চার পাশে মাল বোঝাই গাদাবোট, ছোট ছোট নৌকো, জেটি থেকে জাহাজ পর্যন্ত ছোট ছোট নৌকোয় ঘন ঘন আনাগোনা—অফিসার আর ব্যাপারীদের ব্যস্ততা।

অনাদিপ্রসাদ অন্যমনস্কভাবে এদিক-ওদিক দেখছিলেন, হঠাৎ একজনের সম্বোধন শুনে অবাক হয়ে ফিরে তাকালেন।

—কি গো দাঁড়িয়ে কেন? স্নান করবে না?

—আমি তো স্নান করতে আসিনি।

—গঙ্গার ঘাটে এসেও স্নান করে না এমন লোক আছে নাকি? ভদ্রলোক হা হা করে হাসলেন। গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী, মাথায় কাশের মতো সাদা চুল সামনের দিকে টাক, প্রশান্ত মুখ, পরনে গামছা। বললেন, চলো চলো দেরি ক'রো না, চট করে ডুব দিয়ে আসি।

অনাদিপ্রসাদ আড়ষ্টভাবে বলেন, আমি তো স্নানের সরঞ্জাম আনিনি।

বৃদ্ধ নাছোড়বান্দা। বললেন, তাতে কি হয়েছে?

হাঁক দিলেন, ওরে গোবিন্দ, বাবুকে একটা গামছা দে, যদি মাথায় তেল মাখতে চাও ঐ গোবিন্দই দেবে, চটপট কর, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধের গলায় এমনই একটা আত্মীয়তার সুর, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনাদিপ্রসাদ এই স্নানের নিমন্ত্রণকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। গোবিন্দর সঙ্গে তার ছোট ঘরে গিয়ে, জামা কাপড় ছেড়ে, মাথায় তেল মেখে, গামছা পরে ঘাটে নেমে এলেন। বৃদ্ধ তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। হেসে বললেন, তোমার জন্যে আমার দেরি হয়ে গেল। কেন তোমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছি জান? একবার ডুব দিয়ে দেখবে কি আনন্দ। কিসের এত ভাবনা, কপাল কুঁচকে গেছে যে!

অনাদিপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, জীবনটাকে মত্ত দেখছি—

বৃদ্ধের আবার প্রাণখোলা হাসি, যদি এত কষ্টই পাও, জীবনটাকে নাই বা দেখলে! কেউ তো দেখবার জন্যে তোমায় মাথার দিব্যি দেয়নি।

—তা নয়, আমি, মানে—

'অহম্'-এ সুড়সুড়ি লেগেছে, তুমি না দেখলে জীবনটাকে দেখবে কে? দেখবার লোক ঠিকই আছে, তবে তীরে বসে ঢেউ গুনো না, মাঝনদীতে ডুব দাও।

অনভ্যস্ত অনাদিপ্রসাদ বৃদ্ধের অনুসরণ করে পা টিপে টিপে পিছল মাটি পার হয়ে গঙ্গার জলে নামলেন। অগভীর জল, অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে তবে কোমর পর্যন্ত জল পাওয়া গেল। চারিদিকে লোক স্নান করছে, নানা প্রদেশের নানা জাতের। মেয়েরা ঘাটের বাঁদিকে, পুরুষরা অন্য ধারে। অনাদি-প্রসাদ সব দিক লক্ষ্য করেছিলেন, বৃদ্ধ ততক্ষণে বার কয়েক ডুব দিয়ে উঠেছেন। সহাস্যে বললেন, আরে ভায়া দাঁড়িয়ে কি দেখছ, ডুব দাও, ডুব দাও।

নাক, কান হাত দিয়ে বন্ধ করে অনাদিপ্রসাদও জলে ডুব দিলেন, একবার নয়, তিন বার। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের অজান্তে বললেন, আঃ।

—কেমন, ভাল লাগল না? মনে হলো না সব ক্লান্তি, অবসাদ ধুয়ে গেল?

অনাদিপ্রসাদ আশ্চর্য হলেন, এ বৃদ্ধ কি করে তাঁর মনের কথা বুঝতে পারলেন। সত্যিই আগের দিন শরীর তাঁর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল আর মনের মধ্যে জমা হয়েছিল পুঞ্জীভূত অবসাদ। ঐ অশ্লীল দলাদলি, নিষ্করুণ হত্যাকাণ্ড, কর্তব্যরত পুলিসের মাতলামি, সব কিছু একসঙ্গে মিলে অনাদিপ্রসাদকে যেন দম বন্ধ করে মেরে ফেলতে চাইছিল। যে মানুষের মধ্যে আজও মনুষ্যত্ব আছে, বেঁচে আছে বিবেক, সে কি করে এই উচ্ছৃংখলতা বরদাস্ত করবে? এতখানি জ্বালা নিয়েই অনাদিপ্রসাদ গঙ্গার ঘাটে এসেছিলেন, বৃদ্ধের কথায় স্নান করতে নেমে সত্যিই তিনি অনেকখানি শান্তি পেলেন।

বৃদ্ধ তখনও হাসছেন, যখনই সময় পাবে বাবা, গঙ্গায় এসে অবগাহন স্নান করো। মন ভাল থাকবে, শরীর ভাল থাকবে। তার চেয়ে বড় কথা নিজের দেশটাকে চিনতে পারবে। দেখ দিকি কতজন এখানে স্নান করছে, কেউ ব্যবসাদার, কেউ চাকুরে, কেউ ব্রাহ্মণ। ডাকাত, চোর, পতিতা—সবাই এই একই গঙ্গার জলে ডুব দিচ্ছে। নিশ্চয় শান্তি পাচ্ছে, নয়তো আসছে কেন?

অনাদিপ্রসাদের যুক্তিবাদী মন তর্ক করল, আসছে অন্য কারণে। ভালরা ভাবছে এখানে ডুব দিলে পুণ্য হবে, মন্দেরা ভাবছে পাপ ধুয়ে যাবে। এ তো কুসংস্কার।

—সংস্কার নিশ্চয়, তবে 'কু' না 'সু' তা নিয়ে তর্ক করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। মা গঙ্গার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে সেটা নাই বা করলাম।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চিতসাঁতার কাটলেন। মুখে বিমল আনন্দ, অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করছেন,

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরল-তরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥

রোগং শোকং তাপং পাপং
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে
ত্বমসি গতিম খলু সংসারে॥

সাঁতার থামিয়ে অনাদিপ্রসাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। তাঁর দু কাঁধে হাত রেখে বললেন, শঙ্করাচার্যের এ গঙ্গার স্তোত্রটির কোন জবাব নেই। কি গম্ভীর ধ্বনি, অথচ কি মধুর বাণী। ঠিক এমনিই সুন্দর দ্বিজেন্দ্রলালের গানটি। মনে আছে?

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ তাঁর মিষ্টি স্বরে গান ধরলেন :

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি ধূসরতরঙ্গভঙ্গে!
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণ-যুগ মাঈ,
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি,
বহিছ জননী, এ ভারতবর্ষে—কত শত যুগ যুগ বাহি,
করি সুশ্যামল কত মরুপ্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।

অনাদিপ্রসাদ এক মনে শুনছিলেন, বাহবা দিয়ে বললেন, বাঃ, আপনি তো বেশ সুন্দর গান করেন!

—গান কোথায় শুনলে, কবির বাণী, যা আমার মনের কথা। ভৈরবী সুরে তারই আলাপ। রোজই গঙ্গায় স্নান করতে করতে এই স্তোত্রগুলো আবৃত্তি করি।

—আপনি রোজ এখানে আসেন?

—এখানে ঠিক নয়, তবে গঙ্গায় আসি। ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ি, যে কোন ঘাটে নেমে স্নান করি। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর প্রায় সব ঘাটেই বাবা একবার করে ডুব দিয়েছি। এ আমার একরকম বাতিক বলতে পার। এইভাবে এতগুলো বছর কেটে গেছে, বাকি ক'টা দিন এমনিভাবেই যদি চলে যায় তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? তাই তো বলি,

পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা,
শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব,
বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে,
বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি!
কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

অনাদিপ্রসাদ মন্তব্য না করে পারলেন না, আপনার মতো জীবনটাকে সহজ করে নিতে পারলে ভালই হতো। বেঁচে যেতাম, কিন্তু মানুষ হিসেবে সমাজের প্রতিও তো আমার একটা দায়িত্ব আছে তা এড়িয়ে যাব কি করে? যে দিকে তাকাচ্ছি দেখছি সমাজের সর্বাঙ্গে ঘা, পুঁজ পড়ছে। কতরকম দুরারোগ্য ব্যাধি, কোন বদ্যি হাকিম তার দাওয়াই দেবে? সারা দেশ জুড়ে অশান্তি, যার সঙ্গে কথা বলুন, সেই অসুখী। দিন দিন বিশৃঙ্খলতা বাড়ছে, শুধু হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস, কোথাও এতটুকু আশার আলো নেই। শেষ পর্যন্ত এদেশের কি হবে বলতে পারেন?

অনাদিপ্রসাদের এত গম্ভীর কথা শুনেও বৃদ্ধ প্রাণ খুলে হাসলেন, এ হাসি উপেক্ষা বা ভর্ৎসনার নয়, এ হাসি সমবেদনার। বললেন, আজকাল অনেকেই তোমার মতো বলে, শুনি 'দেশটা রসাতলে গেল', কিন্তু এত সহজেই কি এতদিনের পুরোনো একটা দেশকে রসাতলে পাঠানো যায়। দেশ বলতে তুমি বোধ হয় এই কলকাতার শহরটার কথা ভাবছ! কিন্তু ভারতবর্ষ যে মস্ত বড় জায়গা, লম্বায় চওড়ায় কি বিশাল, কোটি কোটি মানুষ সেখানে, কতদিনের ঐতিহ্য, কত দীর্ঘ ইতিহাস, এসব কি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে দেশটাকে রসাতলে পাঠানো যায়? কত জাত এল গেল, 'শক-হূনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন'। অনেকে এসেছে, এ-দেশের মাটিতে মিশে গেছে, আর ফিরে যায়নি। আবার অনেকে হয়তো না মিলতে পেরে ফিরেও গেছে, 'দেবে আর নেবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

অনাদিপ্রসাদ বললেন, এ তো কবির কবিতা!

বৃদ্ধ দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন, না, এ ঋষির উপলব্ধি। এ সত্য, বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো কলকাতার শহর দেখে ভারতবর্ষ ভেবে ভুল ক'রো না। ক'জন ব্ল্যাক-মার্কেটীয়ার আর সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের দেখে হতাশ হচ্ছ, তাকিয়ে দেখ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর দিকে, যারা এখনও গ্রামে সহজ সুস্থ জীবন যাপন করছে। দিল্লীর মসনদে কে বসছে তা নিয়ে তারা মাথাও ঘামায় না। তারা চাষবাস করে, সুখে ঘরকন্না করে, পূজা-পার্বণের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের চিন্তা করে। তারাই হলো প্রকৃত ভারতবাসী। তারা আজও রামায়ণ মহাভারত পড়ে, প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাস করে। গঙ্গাসাগরের মেলায় লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই নদীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে পুণ্যস্নান করে। কত রকম তাদের ভাষা। কই, তা নিয়ে তো ঝগড়া লাগে না! রাষ্ট্রভাষা কি হবে বলে রাজনৈতিক জিগির তোলে না! বাবা, সংহতি এদেশের ঠিকই আছে, রাজনীতির ধুয়ো তুলে তাকে এখন ভাঙবার চেষ্টা চলছে, সেইজন্যেই তো দুঃখ পাচ্ছ! কিন্তু এও দেখবে দু'দিনের খেলা, মন্দ চলে যাবে, ভালটা থাকবে, যা শাশ্বত যা সত্য।

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখ মুখ উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন, চল, তোমার বোধ হয় অনেক দেরি হয়ে গেল।

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে তিনি ঘাটের দিকে এগিয়ে চললেন, তাঁকে অনুসরণ করলেন অনাদিপ্রসাদ, অস্ফুট স্বরে স্বীকার করলেন, ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে আজ এখানে দেখা হয়েছিল! সত্যি এদিক দিয়ে আগে ভাবিনি। মনে হচ্ছিল আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।

বৃদ্ধ চলতে চলতে বললেন, যে হিন্দুধর্ম আমাদের এত কোটি ভারতবাসীকে একই ঐতিহ্য এবং সংহতির সূত্রে বেঁধে রেখেছে তাকেই আজকের আধুনিক সমাজ একঘরে করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, বাবা, জলেরও তো একটা ধর্ম আছে, বায়ুর ধর্ম আছে—ধর্ম যা ধারণ করে রাখে—তবে এ ভারতবাসীর একটা ধর্ম থাকতে দোষ কি? স্বাধীনতা পেয়েই আমরা ঘোষণা করলাম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। স্কুল-কলেজে গীতা, কোরান, বাইবেল সবই পড়ান বন্ধ হলো। ভাল কথা, ভাল বই পড়লে দোষ কি হতো? বিশ বছর ধরে অধর্মের আবাদ করেছ, তার বিকট ফল ফলছে। এখন ঘাবড়ালে চলবে কেন? তবে বোকামি কোনদিন ধোপে টেঁকে না, এদেশেও টিঁকবে না।

জল থেকে ঘাটের সিঁড়িতে উঠতে একটি বিধবা এসে বৃদ্ধকে গড় হয়ে প্রণাম করল, জিজ্ঞেস করল, অনেকদিন দেখিনি যে গুরুজী।

—এ ঘাটে আসা হয়নি। আজকাল থাকি অনেক দূরে।

—কোথায়?

—দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে, তাহলেও মাসে একবার আসা হয়, সেদিন হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

—আসব একদিন গুরুজী আপনার কাছে, কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

বৃদ্ধ আবার উপরে উঠতে লাগলেন, পিছনে অনাদিপ্রসাদ। কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্রমহিলা আপনার শিষ্যা?

—না।

—তবে 'গুরুজী' বলে ডাকলেন যে!

—কত লোকই তো কত নামে ডাকে। এই গঙ্গারই কি কম নাম? জাহ্নবী, ভাগীরথী, বিষ্ণুপদী—

বলতে বলতে গুরুজী হা হা করে হাসলেন, তোমাদের নেতারাও কিন্তু গঙ্গার উপমা দিতে ছাড়েন না, কথায় কথায় হুমকি দেন, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব। জলের রঙ বদলে গেলে বলা যায় না তখন হয়তো অনেক প্রগতিবাদীরাই লাল-গঙ্গায় ডুব দিতে আসবে, একেই বলে রঙ-মাহাত্ম্য।

গুরুজীর রসিকতায় অনাদিপ্রসাদও হাসলেন, বড় চমৎকার কথা বলেন আপনি।

গুরুজী বললেন, চলো, ভিজে গামছা ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে নেবে। অভ্যেস নেই তো, ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার।

গুরুজী পরলেন গেরুয়া বসন, কপালে আঁকলেন চন্দনতিলক। পেছনের চুলগুলো আঙ্গুল দিয়ে সোজা করে নিয়ে পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো পরতে পরতে বললেন, রামায়ণটা পড়েছ বাবা?

অনাদিপ্রসাদও জামা কাপড় পরে তখন তৈরী। বললেন, পড়েছি।

গুরুজী একদৃষ্টে অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলে যান, রামচন্দ্রের চেহারার বর্ণনা করেছেন নব দূর্বাদল শ্যাম। তিনি বিবাহ করলেন কাকে, না ভূমিকন্যা সীতাকে। রামরাজত্বের পুরো ছবিটা যদি ভাব, দেখবে সবটুকু জোর দেওয়া হয়েছে এগ্রিকালচারের ওপর। কৃষিজাত সভ্যতা। যদিও রাজা আছেন, কিন্তু প্রজারাই সেখানে প্রধান। জনমতের রায় রামচন্দ্র মাথা পেতে নিয়েছেন, সাধ্বী স্ত্রী সীতাকে বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর শত্রু কে? না স্বর্ণলঙ্কার রাজা রাবণ। সেখানে তাল তাল সোনা, সেখানে হৃদয় নেই, সে যেন যন্ত্রের রাজ্য, এ ছবি ইণ্ডাস্ট্রির; শিল্পরাজ্যের শিল্পপতি রাবণের পাপনজর গিয়ে পড়ল পরস্ত্রী সীতার উপর, শুরু হলো রাম রাবণের যুদ্ধ। এগ্রিকালচার আর ইণ্ডাস্ট্রির যুদ্ধ। দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ।

অনাদিপ্রসাদ সোচ্ছ্বাসে বলেন, বা, বা, রামায়ণের এ তো বড় সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন!

—করলে হবে কি, শুনছে কে? তোমাদের নেতারা মুখে রামরাজ্যের বুলি না আউড়ে যদি রামায়ণটা পড়ত, চাযের কাজে মন দিত, তা হলে আর খাবার জিনিসের অভাব হতো না। এত বড় দেশ ঠিকমত চাষ করলে মাঠে যে সোনা ফলত। রামের পথে না গিয়ে আমাদের নেতারা অনুসরণ করলেন রাবণকে। যন্ত্ররাজকে তলব করা হলো, গড়া হলো শিল্পরাজ্য, কিছু লোক হয়তো পয়সা পেলে, যারা ধনী ছিল তারা আরও ধনী হলো, দরিদ্র হলো আরও দরিদ্র। তাদের ঘরে 'দারিদ্র্য অসহ, পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ'।

গুরুজী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, যাদের আছে আর যাদের নেই তাদের মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। এতটা কিন্তু পরাধীন ভারতে ছিল না। ফলে হিংসা বাড়ছে, বাড়ছে পরশ্রীকাতরতা, তারই জন্যে অশান্তি। কিন্তু এও দেখবে বেশীদিন থাকবে না। ভুল নেতৃত্ব ভুল পথে নিয়ে গেছে, আবার কেউ না কেউ তাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে।

অনাদিপ্রসাদ নিজের মনে মাথা নাড়েন, এত সহজে যদি বিশ্বাস করতে পারতাম!

প্রসাদ মুখে দিয়ে, জল খেয়ে দুজনেই বাবুঘাট থেকে বেরিয়ে পড়লেন। অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন দিকে যাবেন?

গুরুজী উত্তর দিলেন, আমার সঙ্গে একটি ছোট রথ আছে, আমাদের পাড়ার এক ভক্তের গাড়ি। যেদিন আমি দূরপাল্লায় স্নান করতে আসি, লোকটি ছাড়ে না। ড্রাইভার দিয়ে রথে করে পাঠিয়ে দেন। নিজে গঙ্গাস্নান করতে না পারলেও গাড়ির তো পুণ্যি হবে, কি বলো?

—তাহলে আমি এখান থেকে বিদায় নিই।

—কেন, চলো না, তোমাকেও না-হয় পৌঁছে দেবো।

—তার দরকার হবে না, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেব।

গুরুজী হাসলেন, ও, তুমি বুঝি পয়সাওয়ালা লোক?

অনাদিপ্রসাদ লজ্জিত হয়ে বলেন, তা নয়, চলুন আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি, আমাকে বরং ট্রাম রাস্তায় নামিয়ে দেবেন।

স্ট্যান্ড রোড ধরে দুজনে দক্ষিণমুখো হাঁটছেন। বাঁ ফুটপাথে ইডেন গার্ডেন, ইংরাজ আমলে সাজানো-গোজান বেড়াবার বাগান ছিল, সন্ধ্যেবেলা ব্যান্ড বাজত, আলোর মধ্যে ফোয়ারার জল ছুটত। সাহেবদের স্ট্যাচু ছিল, ছিল বর্মা দেশের প্যাগোডা, কৃত্রিম লেকের জল। এখনও সবই আছে, তবে এ অনাদরে, অবহেলায় পড়ে থাকা। মোড়ের মাথায় রাজা পঞ্চম জর্জের স্ট্যাচু, বেশী দিনের পুরোনো নয়, ইংরাজ রাজত্বের শেষ আমলের কীর্তি।

গঙ্গার দু-তীরে ঘাট তৈরি করে দেওয়ার রীতি আজকের নয়, বহুদিনের প্রথা। ইংরাজ আমলেও ঘাট তৈরী হয়েছে, সেগুলি সাহেবদের নামেই চিহ্নিত। যেরকম তক্তাঘাটের উত্তরে প্রিন্সেপ ঘাট। বাবুঘাটের দক্ষিণে আউটরাম ঘাট। ক্লাইভ সাহেবের নামেও ঘাট ছিল, তার অস্তিত্ব লোপ পেলেও ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট আজও বর্তমান।

আউটরাম ঘাট থেকে যাত্রীবাহী স্টীমার ছাড়ে, চাঁদপাল ঘাটের মতো ওখানেও যাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে। তা ছাড়া, মালবাহী জাহাজের জন্যও এটি একটি ব্যস্ত জেটি। সারাক্ষণ ছোট ছোট নৌকো যাতায়াত করে।

আউটরাম ঘাট পেরোতেই দেখা গেল, গঙ্গার ধারে বেশ একটা ভিড় জমেছে, বেশির ভাগই অবাঙালী। তাদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা, জলের দিকে লক্ষ্য করে সরব আলোচনা করছে।

কেউ বলছে, আপনা হাতসে উঠা লো।

কারুর উপদেশ, বহুত ধীরেসে, পানিমে না গির্ যায়—

গুরুজী নিজের মনেই বলেন, ব্যাপার কি? জলের মধ্যে কি দেখছে এরা?

একজনকে উদ্দেশ করে ডাকলেন, কি হয়েছে দিত্তারাম, এত হইচই কেন?

দিত্তারামের সাদা গালপাট্টা দাড়ি, মাথায় বাবরি চুল। পরনে ধুতি আর গেঞ্জি, গলায় মালা, কপালে টিপ। গুরুজীকে দেখে প্রণাম করে বলল, সাধুজী, মনে হচ্ছে, একটা বাচ্চা জলে ভেসে যাচ্ছে, তার কান্না শুনতে পাচ্ছি। ঐ যে কাঠের ভেলাটা দেখুন, তিনটে ছেলে গেছে টেনে আনতে।

—সে আবার কি, কাদের ছেলে, কে ভাসিয়ে দিল?

—তা কি করে জানব, সাধুজী। ছেলেটার কপাল ভাল জলে পড়ে যায়নি, কিংবা পাখিতে ঠোকরায়নি।

ব্যস্ত হয়ে গুরুজী আর অনাদিপ্রসাদ গংগার তীরে এগিয়ে গেলেন। ততক্ষণে সাঁতার কেটে ছেলেগুলো কাঠের ভেলাটা টেনে নিয়ে এসেছে। কয়েকজন তীর বেয়ে কাদায় নেমে গেল, বাচ্চা সমেত ভেলাটা তুলে নিয়ে এল ওপরে। বছর তিনচার বয়সের ফুটফুটে ছেলে, ঘুমন্ত অবস্থায় বোধহয় ভেলায় ভাসতে শুরু করেছিল, জেগে উঠে ধারে কাছে কাউকে দেখতে না পেয়ে অসহায়ভাবে কেঁদেছে, এখন আবার চারদিকে ভিড় দেখে অবাক হয়ে চুপ করে গেল। ছেলেটির পাশে খানকয়েক বিস্কুট আর কয়েকটা কলা। সংগে একখানা চিঠি। চিঠিতে কি লেখা আছে, জানবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, কিন্তু বাংলায় লেখা বলে পড়তে পারল না কেউ। অনাদিপ্রসাদ চিঠিটা তাদের হাত থেকে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে, 'যাকে দু'বেলা খেতে দিতে পারি না, নিজের ভাগ্যের সংগে তাকে জড়িয়ে রাখতে চাই না, আশা করে থাকব খোকা রক্ষা পাবে, কেউ তাকে মানুষ করবে। ভগবান তার সহায় হোন। ইতি—হতভাগ্য পিতা'

চিঠির ছত্র দু'টি পড়ে অনাদিপ্রসাদের বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল, কোনো রকমে হিন্দীতে ব্যাখ্যা করে অন্যদের মানে বুঝিয়ে দিলেন। অদূরে নিষ্পাপ শিশুটি মুখের মধ্যে একটা বিস্কুট ভরে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখছে। জনতার মধ্যে আবার গুঞ্জন উঠল। এখন কি কর্তব্য তাদের ভেবে ঠিক করতে হবে।

দম নেবার জন্যে ভিড় থেকে সরে গিয়ে অনাদিপ্রসাদ রেলওয়ে লাইনের ধারে বেড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মনের মধ্যে তোলপাড় করছে একটা চিন্তা, অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে, খাদ্যের অভাবে পিতা পুত্রকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে, এর পর? সে কথা ভাবতে অনাদিপ্রসাদ শিউরে উঠলেন, হয়তো মেয়েদের বিক্রি করবে।

গুরুজী কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, জিজ্ঞেস করলেন, কি ভাবছো?

অনাদিপ্রসাদ অসহায়ভাবে চিৎকার করে ওঠেন, আর কি ভাববো, নিজের চোখেই তো সব দেখলেন। ঐটুকু একটা ফুটফুটে ছেলে, সমাজের কাছে সে

কি অপরাধ করেছে?

গুরুজীর কপালেও চিন্তার রেখা, চিন্তিত স্বর, তবু বললেন, সব ঘটনার ব্যাখ্যা সঙ্গে সঙ্গে করা যায় না, কার্যকারণ সম্বন্ধ একটা নিশ্চয় আছে, কিন্তু তা খুঁজে পাওয়া যায় অনেক দেরিতে। কুন্তী কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল তার জলে ভাসিয়ে দেওয়া কুমারী অবস্থার ছেলে কর্ণ একদিন মহাবীর কর্ণরূপে কৌরবদের ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করবে? সে কি কল্পনাও করেছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে ঐ সূতপুত্র কর্ণের কাছে তীব্র ভর্ৎসনা শুনতে হবে, তারই কাছে অন্য ছেলেদের জন্য প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে?

অনাদিপ্রসাদ ঘন ঘন মাথা নাড়েন, সে হলো কল্পকথা, কাহিনী, আর এ হলো নিষ্ঠুর, বাস্তব সত্য।

গুরুজীও ততোধিক দৃঢ় স্বরে বলেন, তোমরা অন্ধ। কেন ভাবতে পারছ না, এই পরিত্যক্ত শিশু হয়তো একদিন হবে সত্যিকারের দেশনেতা, হবে ভবিষ্যতের নেতাজী, যার জন্য সারা দেশ আজ প্রতীক্ষা করে আছে। শবরীর প্রতীক্ষা।

গুরুজীর দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অনাদিপ্রসাদ আর কোন জবাব দিতে পারলেন না। লক্ষ্য করলেন তাঁর চোখে করুণা, ভালবাসা ও স্বপ্নের ত্রিবেণীসঙ্গম।

ভিড়ের কলরব কাছিয়ে এল। দিত্তারামের আর্জি, সাধুজী, আপনি ফয়শালা করে দিন, আমরা কি করব। পুলিসে খবর দেব?

গুরুজীর শুকনো উত্তর, পুলিস আর কি করবে? ওদের ডায়েরীতে ঘটনাটা লিখে রাখবে।

—তবে কি অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেব?

—সেখানে কি জায়গা আছে?

—একটা মেয়ে বাচ্চাটাকে পালতে চাইছে তাকে দিয়ে দেব?

—সেই তো ভাল। ভালবেসে যে চাইছে তাকেই দাও।

সঙ্গে সঙ্গে একটি নারীকণ্ঠের আনন্দোচ্ছ্বাস শোনা গেল, জয় সাধুজীকা জয়, আমি একে পালব, এ আমার লেড়কা হবে, আমাকে মা বলবে।

অনাদিপ্রসাদ মেয়েটির দিকে তাকালেন, চিনতে পেরে চমকে উঠলেন, এ সেই হোটেলের সামনেকার ময়দানের মিস্ কলকাত্তা। যাকে তিনি দেখেছেন কাল্লু ওস্তাদের সঙ্গে বিড়ি মুখে ভোজবাজির খেলা দেখাতে। আজ তার চেহারার একি পরিবর্তন, কোলে শিশু, চোখেমুখে অপত্যস্নেহের করুণা— মাতৃত্বের চিরন্তনী মহিমাময়ী মূর্তি। এই তো র‍্যাফায়লের ম্যাডোনা, কালী-ঘাটের পটুয়াদের যশোদাদুলাল।

সামান্য কয়েকটা কথা, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কোন অপরিচিত ধ্বনি মানুষের চিন্তার স্রোতকে অন্য পথে বইয়ে দেয়। সাধুজীর সঙ্গে দেখা না হলে অনাদিপ্রসাদ তাঁর বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে হয়তো এদিক ওদিক ছুটে ন, কিন্তু এতটুকু শান্তি পেতেন না। গত জন্মদিন থেকে এপর্যন্ত দেখবার উদ্দেশ্যে প্রায় পাগলের মতো তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। মানুষকে দেখবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সাধুজী আজ তাঁর মনে প্রশ্ন জাগিয়েছেন, এত সহজেই কি জীবনটাকে দেখা যায়? আপাতদৃষ্টিতে যাকে আমরা সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে চাই তাই কি সত্য? আমরা নিজের চোখে কতটুকু দেখি? চোখে আমাদের চশমা পরিয়ে দিয়েছে, রোদ আটকাবার জন্যে কালো চশমা নয়—বংশের চশমা, গোষ্ঠীর চশমা, সমাজের চশমা, শিক্ষার চশমা, রাজনীতির চশমা, অভিমানের চশমা। যখন যে চশমা পরে আমরা জীবনটাকে দেখি সেই চশমা অনুযায়ী ঐ দেখা জীবনের রূপটাও যে আমাদের চোখে অন্য রঙে ধরা দেয়, আর যখন চোখে চশমা থাকে না তখন আমরা আয়না দিয়ে বাইরের জগৎটাকে দেখবার চেষ্টা করি, বুঝি না আয়নায় উল্টো ছবি পড়ে, দূরত্বও ধরা যায় না; তাই যতই বাস্তবতার স্লোগান তুলি না কেন, আমরা দড়িকে সাপ ভেবে ভয় পাচ্ছি, আর কখনও বুঝতে না পেরে আসল সাপকে দড়ি ভেবে গলার ওপরে ফেলে রাখছি।

তা হলে সত্য কোথায়?

গঙ্গায় স্নান সেরে অনাদিপ্রসাদ বাড়ি ফিরলেন। শুনলেন, ছেলেরা গেছে পাড়ার পুজোর মণ্ডপে, রমলা বউদি বাথরুমে স্নান করতে ঢুকেছেন। নিজের বাড়ির অতি পরিচিত পরিবেশের মধ্যে অনাদিপ্রসাদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এই ঘর, ঐ বারান্দা, এত সব বই, লেখবার খাতা সরঞ্জাম, অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ, জানলার ফ্রেমে বাঁধানো আকাশ, বাইরের হইচই শব্দ—সব কিছুর মধ্যে অনাদিপ্রসাদ নিজেকে ফিরে পেলেন, আগেকার সেই নিশ্চিন্ত মানুষটি। বিছানার উপর গা এলিয়ে দিতেই সুখনিদ্রায় নিমগ্ন হলেন।

রমলা বউদি স্নান সেরে চিন্তিত মুখে স্বামীর শিয়রের কাছে বসলেন। মানুষটা সারা রাত কাল ফেরেনি, কোন খবরও দেয়নি। কোথায় রাত কাটিয়েছে কে জানে! তবে চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই। রমলা বউদির জানবার কৌতূহল যেমন প্রবল তেমনি ভেতরে ভেতরে একটা আশঙ্কাও আছে, বেশী পীড়াপীড়ি করলে যদি মানুষটাকে চিরকালের মতো হারাতে হয়, বিস্মৃতি যদি তার চেতনাকে গ্রাস করে।

কিছু পরে অনাদিপ্রসাদ উঠে বসলেন। রমলা বউদিকে দেখে খুশী হয়ে বললেন, আঃ রমী, বড় শান্তি পেয়েছি মনে। ক'দিন ধরে যত রাজ্যের দুঃখ,

কষ্ট, হতাশা, অন্যায় আমাকে চেপে ধরেছিল, বড় যন্ত্রণায় দিন কাটিয়েছি, আজ মনে হচ্ছে আবার বাঁচতে পারব। জীবন আছে, আনন্দ আছে, আলো আছে—

রমলা বউদি বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করেন, এসব কি বলছ?

—সারাক্ষণ আমার মাথার ওপরে যেন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল, বুঝিয়ে দিচ্ছিল 'নেই'—'নেই'—'নেই'—কেউ নেই, কিছু নেই, সব মিথ্যে। আর আজ আমি জোরের সঙ্গে বলছি, 'আছে', 'আছে', 'আছে', তুমি আছ, আমি আছি, সবাই আছে।

—তুমি কাল দাদার বাড়ি এলে না, কোথায় ছিলে?

অনাদিপ্রসাদের ছোট্ট উত্তর, নরকে।

—আর আজ?

—গঙ্গায় স্নান করে এইমাত্র বাড়ি ফিরছি।

রমলা বউদির বিস্ময়ের অবধি থাকে না, তুমি গঙ্গায় গিয়েছিলে?

—আশ্চর্য হচ্ছ, না রমী? কতবার তুমি আমাকে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছো আমি যাইনি; বলেছি, নোংরা জল, ময়লা জায়গা। ও কাদামাখা ধর্ম আমার সইবে না। কিন্তু আজ কে যেন আমাকে কান ধরে সেখানে টেনে নিয়ে গেল। ভাগ্যিস গিয়েছিলাম, তাই তো গুরুজীর সঙ্গে দেখা হলো।

—গুরুজী আবার কে?

অনাদিপ্রসাদ সবিস্তারে গুরুজীর কথা বললেন, তাঁর সঙ্গে স্নান করা, কথা বলা, এমন কি মিস কলকাত্তা আর তার কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের কথাও।

রমলা বউদি একমনে শুনছিলেন, মন্তব্য করলেন, আশ্চর্য মানুষ!

—তার চেয়েও আশ্চর্য তাঁর কথা। যে অবসাদের মেঘ জমা হয়েছিল তা কেটে গেছে শুধু ওঁর কথা শুনে। এখন বুঝতে পারছি, বাস্তবতার নামে যে জীবনধর্মী সাহিত্যের কথা ভাবছিলাম তা বোধ হয় জীবন নয়, তার বিপরীত কিছু। 'নেতি' আর 'নেতি', শুধু 'নেতি' দিয়ে জীবনের ছবি আঁকা যাবে কি করে?

—তা হলে?

—সোজা কথা, শুধু কাঁটা নয়, গাছে ফুল ফোটে ফল ফলে। এখনও নারীর কাছে মাতৃত্ব সবচেয়ে বড় গৌরবের। এখনও পুরুষ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সংসারকে রক্ষা করে, এখনও সন্তান লেখাপড়া শিখে কাজ করে বাপমায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে চায়। সবাই আগের মত আছে, এই বিরাট দেশ আছে, ঐতিহ্যময় ভারতবাসী আছে। যদি বেচাকেনায় ঠকে থাকি, সেটুকু পূরণ করে নিতে হবে। 'আমাদের সব গেছে' বলে কপাল চাপড়ে কাঁদবার কিছু নেই।

একটু থেমে অনাদিপ্রসাদ সহাস্যে বললেন, বউদিকে ফোন কর, আমি কথা বলব। কাল যেতে পারিনি, আজ আমরা যাব।

রমলা বউদির চোখ দুটো খুশীতে নেচে ওঠে, সত্যি বলছ?

—ছেলেদের ডাকতে পাঠাও, ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বল। তুমি শাড়িটা বদলে নাও।

—আর তুমি?

অনাদিপ্রসাদ আয়নায় চেহারা দেখলেন, ছিঃ ছিঃ, একমুখ দাড়ি হয়েছে, একটু গরম জল দিতে বল তো। আমিও তৈরী হয়ে নিচ্ছি। কি দেখছ ওরকম অবাক হয়ে?

—অদ্ভুত লাগছে।

অনাদিপ্রসাদের সহজ সরল উত্তর, এতদিন বাদে কিছু একটা পেয়েছি মনে হচ্ছে, তাই বোধ হয় অদ্ভুত লাগছে।

সংসারে অভিজ্ঞ অনাদিপ্রসাদ কি অর্থে 'পেয়েছি' শব্দটি ব্যবহার করলেন, বোঝা গেল না। এত সহজেই কি কিছু পাওয়া যায়? তবে এ কথা সত্যি, রমলা বউদির মনে হলো, অনেক দিন বাদে আগেকার সেই দরদী অনাদি-প্রসাদকে ফিরে পেয়েছেন। সেই আগের মতই স্বামী তাকে কাছে টেনে নিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে বলছেন, রমী, রমী—শুধু আমার রমী।

॥ বারো ॥

আর যারা 'কী পাইনি'র হিসাব মেলাতে ব্যস্ত তাদের মধ্যে রয়েছে মনুয়া আর ববির মত 'টীন-এজার'রাও। মে-ফ্লাওয়ারের স্তিমিত আলোয় দুটি ফ্যাকাশে মুখ, দুজনে পাশাপাশি বসা, তবু যেন মধ্যিখানে অনেকখানি দূরত্ব। মনুয়া জিজ্ঞেস করল, নাচবে না?

ববির অন্যমনস্ক উত্তর, ভাল লাগছে না।

—কি হয়েছে তোমার?

—জানি না।

—কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?

—এখান থেকে বাড়ি ফিরে গেলাম।

মনুয়ার মেয়েলী কৌতূহল, রত্না কুশারী তোমায় রেহাই দিল যে! কি ব্যাপার?

ববি বিরক্ত হয়, কি করে জানব? দিন তিন-চার ভদ্রমহিলার কোন পাত্তা নেই।

—তাই বুঝি? মনুয়া বেড়ালের মত হাসে, এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার মন খারাপ।

—কেন?

—রত্না কুশারীর নেশা ধরেছে তোমাকে, ওটা কিন্তু মদের চেয়ে মারাত্মক।

ববি কোন উত্তর দিতে পারল না, ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগল।

মনুয়া বলে যায়, আমি কিন্তু প্রথম থেকেই তোমাকে সাবধান করে দেব ভেবেছিলাম। কেন জানি না, আমার ভয় হয়েছিল, একবার রত্না কুশারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে ভবিষ্যতে ঐ রত্না কুশারীদেরই তোমায় খুঁজতে হবে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে না।

ববি ক্ষেপে যায়, অনেক উপদেশ দিয়েছো, আর নয়।

মনুয়া খিলখিল করে হাসল, অনেকগুলো ছবি তুলিয়েছি, দেখবে?

উত্তরের অপেক্ষা না করে খামের ভেতর থেকে বড় বড় কতকগুলো ছবি বার করলো মনুয়া, নানা দিক থেকে তোলা তারই মুখের ছবি। আবার পুরো শরীরেরও।

ববি না বলে পারল না, বাঃ, ছবিতে তোমার চেহারা ভালই আসে। বেশ অ্যাট্রাক্টিভ।

মনুয়া কথায় চিমটি কাটে, রত্না কুশারীর চেয়েও?

—তোমরা মেয়েরা বড্ড হিংসুটে। কি ব্যাপার, এত ছবি তুলেছ কেন?

মনুয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল, রোজগার করতে হবে, বাবার কাছে হাত পাততে আর ভাল লাগে না। মডেল হব ভাবছি।

ববি আড়চোখে মনুয়ার দিকে তাকায়, এ বুদ্ধি কে মাথায় ঢোকাল শুনি!

—কে আবার ঢোকাবে? কেয়া সরকার মডেল হয়ে যথেষ্ট রোজগার করছে. আর কেয়ার চেয়ে আমি যে সুন্দরী তা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে। ভাবতেই মজা লাগছে, সকালবেলা চায়ের সঙ্গে কাগজ পড়তে বসে তুমি হয়তো আমার ছবি দেখবে—মুখে ক্রীম মাখছি, কিংবা নখে রঙ দিচ্ছি, কিংবা—

ববি থামিয়ে দেয়. থাক, আর লিস্ট শোনাতে হবে না। তবে জেনে রাখ, ও লাইনটা খুব সেফ নয়।

মনুয়া আবার হাসল. এর মধ্যে ভয় পেয়ে গেলে? তবে তুমি যে পথে চলছ তার চেয়ে মডেল হওয়া অনেক সেফ।

ববি বিলিতী কায়দায় কাঁধ দুটো ঝাঁকায়, প্রথমে মডেল, তারপরে বিউটি কণ্টেস্ট, মিস অমুক, মিস তমুক, শেষ পর্যন্ত মিস ইন্ডিয়া।

মনুয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে, সে তো ড্রীম, ড্রীম। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তখন আর রোজগারের জন্যে ভাবতে হবে না. ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে কত 'অফার' আসবে। এমন কি, সিনেমাওয়ালারাও পেছনে

পেছনে দৌড়বে। সত্যি, জান ববি, আমার কোমরের মাপ, বুকের মাপ, মাথার মাপ—সব ঠিক আছে। শুধু হাইটটা, কি জানি—অত আশা করা ভাল নয়।

ববি গুম হয়ে যায়, নীরস কণ্ঠে মন্তব্য করে, মা একটা কি যেন ছড়া কাটেন, পিপীলিকার পাখা ওঠে—

মনুয়া কথাটা শেষ করে দেয়, মরিবার তরে। বলেই খিলখিল করে হাসে, ববি, আমি কিন্তু পাখা লাগিয়ে উড়ে বেড়াব, মক্ষিরানী হব।

একটু আগে থেকেই ববি রেস্তরাঁর অন্য প্রান্তে বসা এক ভদ্রমহিলাকে বারবার লক্ষ্য করছিল। মনুয়াকে জিজ্ঞেস করল, গোলাপী শাড়ি পরা ভদ্রমহিলাকে চেন নাকি?

মনুয়া একটা চোখ ছোট করে বলল, নজর ঠিক পড়েছে।

—ক'দিন থেকে এখানে আসছেন দেখছি।

—ভুল দেখনি। ব্যারিস্টার কে. জি-র শালী।

—পরিচয়টা গোলমেলে মনে হচ্ছে।

—এ তো সোসাইটি স্ক্যাণ্ডাল, সবাই জানে। ঠিক যেন রবিঠাকুরের মালঞ্চর গল্প। বউ বেচারী রোগে ভুগে আর হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরে গেল।

ববি শিকারী পাখির মত চোখ দুটো উজ্জ্বল করে বলল, ইণ্টারেস্টিং।

—চেষ্টা করে দেখ, রত্না কুশারীর ভাল সাবস্টিটিউট হবে। ভদ্রমহিলাও নাচতে পারেন না, অথচ শখ আছে, টাকা যথেষ্ট, আর স্ট্রোক হবার পর থেকে ব্যারিস্টার কে. জি. এখন প্যারালিটিক রুগী। চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে ঘুরে বেড়ান। অতএব—

—ক্ষেত্র প্রশস্ত, ববি উঠে দাঁড়ায়, দেখা যাক সন্ধ্যাটা কিরকম কাটে।

মনুয়া ওদের লক্ষ্য করতে লাগল, ঠিক যেন লং শটে তোলা ছবি। ববি গিয়ে দাঁড়াল ভদ্রমহিলার কাছে, আলাপ-পরিচয়-হাসি; কিছুক্ষণ পাশাপাশি বসে গল্প, একসময় হাত ধরে নাচের ফ্লোরে নিয়ে গিয়ে দু'বার পাক খাওয়ানো, তারপর হাসতে হাসতে মে-ফ্লাওয়ার থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

কেন জানা নেই, মনুয়া কষ্ট পেল। এ কি ববির জন্যে, না তার নিজেকে ছোট মনে হলো! তার রূপের যথেষ্ট খ্যাতি আছে, কত ছেলেকে সে নাচিয়েছে, ক'দিন আগে পর্যন্ত ববি তার পেছনে ঘুরে বেড়াত, অথচ আজ কি নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে! হয় রত্না কুশারী, নয়তো কে. জি-র শালী, ওই জাতের আর কেউ। কি আছে ওদের, কি আছে? মনুয়ার চোখ-মুখ জ্বলতে থাকে, এও সেই 'কী পাইনি'র জ্বালা।

॥ তেরো ॥

শহরের আর এক প্রান্তে বসে 'কী পাইনি'র হিসাব মেলাচ্ছে আরও দু'টি নবীন প্রাণ। সমীর আর মীনা। প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাস কেটে গেছে, লুকোচুরির আর অবকাশ নেই, দু' বাড়িতেই জানাজানি হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজনের বিভিন্ন মন্তব্যে তিক্ততা শুধু বেড়েইছে, কারুর কাছ থেকেই কোনো সহানুভূতি পাওয়া যায়নি। তারা ধরে নিয়েছে, মীনা আর সমীর ছেলেমানুষ —এ তাদের প্রেম নয়, ছেলেমানুষি।

কলেজের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মীনা গেল সিনেমায়, ম্যাটিনী 'শো'তে, টিকিট আগে থেকে কেটে সমীর তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে সে গিয়ে সীটে বসল; বুঝল, আগে থেকেই সমীর বসে আছে। আনন্দের চেয়ে ভয় বেশী, কে জানে আশেপাশে কারা বসে আছে, যদি ওদের একসঙ্গে দেখে ফেলে, বাড়িতে জানতে পারলে আবার চেঁচামেচি হবে। হয়তো কলেজে বেরুনো মীনার বন্ধ হয়ে যাবে।

সিনেমার পর্দায় কি একটা ছবি চলছে, সেদিকে এদের কোন খেয়াল নেই।

সমীর খুব চাপা গলায় বলল, আমি একটা বাসা ঠিক করে এসেছি।

মীনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

—গড়িয়ায়।

—অনেক দূর।

—কিছু দিন দূরে থাকাই ভাল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সমীর বলল, বিয়ের রেজিস্ট্রেশন অফিসে দরখাস্ত দিয়ে দিয়েছি।

—তা হলে কবে? মীনার গলা কাঁপছে।

—পাঁজিতেও শুভদিন আছে ফাল্গুনের গোড়ায়, দিন পনেরোর মধ্যে। এ কি, তোমার হাত এতো ঠাণ্ডা কেন, ভয় করছে?

মীনা সহজ হবার চেষ্টা করে। না, কিসের ভয়?

—বাবা, মা, ভাই, বোন—সবাইকে ছেড়ে থাকতে পারবে তো? এখনও ভাল করে ভেবে দেখ।

মীনা নীরব।

সমীর ব্যগ্র, কি, উত্তর দাও?

মীনা কাঁপা গলায় বলে, পারব।

আর কথা হলো না, এইবার ইণ্টারভ্যালের আলো জ্বলবে। সমীর চট করে উঠে বেরিয়ে গেল, যাতে না চেনা লোক দেখে ফেলে।

বিরামের যে ক'মিনিট প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলল, রেকর্ডে গান বাজল, বিজ্ঞাপনের স্লাইড চলল, মীনা একলা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল চেয়ারে। এতদিন পর্যন্ত সমীরের সঙ্গে মেলবার তার একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ছিল। যত বাধা পেয়েছে ততই এই মেলবার ইচ্ছে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। কতবার সে সমীরের জন্যে কেঁদেছে, কিন্তু আজ যখন বিয়ের দিন স্থির হতে চলেছে, মাত্র পনেরো দিনের ব্যবধান, অথচ মন আজ এমন উতলা হয়ে উঠছে কেন! বাবা রাগী মানুষ, বাড়িতে তাঁর হুকুমমত সবাইকে চলতে হয়, এক এক সময় তিনি যুক্তিহীন কাজ করেন। কখনও বা নির্মম, তবু মীনাকে তো তিনি ভালবাসেন, এ বিয়েতে তিনি অসুখী হবেন। হয়তো চিরকালের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে ভাবতেই একটা অজানা আশঙ্কায় মীনার বুক কেঁপে ওঠে।

বাড়িতে মা আছেন, যদিও তাঁর মতামত প্রকাশ করার কোন অধিকার নেই। ছেলেমেয়েদের আঁকড়ে ধরে থেকে এতগুলো বছর তো তিনি কাটিয়ে দিলেন। বাবার বিরুদ্ধে কোন কাজ করার সাহস না থাকলেও ছেলেমেয়েদের অনেক কথাই তিনি লুকিয়ে রেখেছেন, সাধনবাবুকে তিনি জানতে দেননি। সমীরের বিষয় যদি আগে থেকে মাকে জানাতে পারত, তা হলে বোধহয় বাড়িতে এতটা গোলমাল হতো না। বিয়ের পর, কে জানে, মাকেও হয়তো চিরকালের মত হারাতে হবে।

ছোট ভাই দু'টো আজও দিদি বলতে অজ্ঞান, কিন্তু সমীরের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সবাই ছি-ছি দিচ্ছে শুনে তারাও মীনার দোষ ধরতে শুরু করেছে। কিরকম যেন সন্দেহের চোখে তাকায়, সারাক্ষণ পাহারা দেয়। বিয়ের পর ওদেরও বোধহয় ভুলতে হবে।

ভেতর থেকে আর একজন মীনাকে দু' হাত দিয়ে ঝাঁকানি মেরে বারবার জিজ্ঞেস করছে, সত্যিই কি এর দরকার ছিল? এ বিয়েতে তুমি কি সুখী হবে? দাঁড়িপাল্লার এক দিকে সমীর আর এক দিকে বাবা, মা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন। তুমি কি মনে কর এদের সকলের চেয়ে সমীর বড়?

মীনা আর ভাবতে পারে না, এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে তার গলা টিপে ধরছে। আবার অন্ধকার। আবার ছবি শুরু হলো।

সমীর এসে বসল পাশে, হাতে কাগজের আইসক্রীম কাপ। বললে, খাও।

মীনার হাত কাঁপছিল, কোনরকমে চামচে করে মুখে আইসক্রীম দিল। উঃ, কি গরম! মুখের মধ্যে গলে যাওয়া আইসক্রীম গলার ভেতর দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নীচে নেমে গেল। অন্যমনস্ক মীনা জিজ্ঞেস করল, কি এটা?

সমীর অবাক হয়ে উত্তর দেয়, কেন, আইসক্রীম।

—কিন্তু এত গরম কেন?

—কি বলছ মীনা, কি হয়েছে তোমার?

মীনা মাথা নাড়ে, কিছু হয়নি। কিন্তু শরীরটা খারাপ লাগছে। দুপুর থেকেই মাথাটা ধরে ছিল বোধহয়, এই ঠাণ্ডা সিনেমায় ঢুকে—তুমি কিছু মনে ক'রো না, আমি বাড়ি যাই।

সমীর ভয় পায়, তুমি একলা যেতে পারবে? চল, আমি ট্যাক্সি করে পেঁৗছে দিয়ে আসি।

মীনা শিউরে উঠে। না, না, সে আরও গোলমাল হবে। কোন দরকার নেই, আমি একটা রিক্সা নিয়ে চলে যাব, কিংবা ট্যাক্সি করে।

—তোমার কাছে পয়সা আছে? নয়তো এই পাঁচ টাকার নোটটা রাখ।

মীনা সমীরের হাতে আইসক্রীমের কাপটা দিয়ে কোনরকমে টলতে টলতে হল ছেড়ে উঠে চলে গেল।

ভীত, বিস্মিত সমীর, হাতে আইসক্রীমের কাপ, ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে আরও ঠাণ্ডা, জমাট বরফ, প্রাণহীন নিশ্চল কঠিন। জীবনের স্পন্দন নেই। একদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ সব যেন চুরমার হয়ে গেল। মীনাকে সে ভালবাসে, তার পৌরুষ তাকে জাগিয়ে দিয়েছে, প্রয়োজন হলে শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মীনাকে সে জয় করে নিয়ে আসবে, কিন্তু শুভলগ্নের অত্যন্ত নিকটে দাঁড়িয়ে, আজ তার মনে সংশয়ের ঝড় উঠল, এ বিয়ের ফলে মীনা যদি সুখী না হয়?

কে এর জবাব দেবে? ভালো যাকে বাসা যায় তার জন্যে দুঃখ স্বীকার করে সুখ আছে, কিন্তু তাকে তো দুঃখী করা যায় না। মীনার হৃদয়ের কতটা পেয়েছে আর কতটা পায়নি তারই হিসাব কষতে বসল সমীর একলা অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে।

॥ চৌদ্দ ॥

'কী পাইনি'র হিসেব অশোক জানাও মাঝে মাঝে মেলাতে বসে, কিন্তু তাকে আক্ষেপ করতে হয় না। ওজনের পাল্লায় না-পাওয়ার চেয়ে পাওয়ার অঙ্কটাই বেশী ভারী। দেশের কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে অশোক জানা কলকাতায় এসেছিল এম. এ. আর ল' পড়তে। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে থেকেই পড়াশুনো করেছে, সে সময় এত ছাত্র-রাজনীতির কচকচি ছিল না, ছিল না শহরের হাজার রকম প্রলোভন। মনে সাহিত্যিক হবার বাসনা ছিল—কবিতা, ছোট গল্প, প্রবন্ধ লিখে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করত, তখন থেকেই অনাদি-

প্রসাদের সঙ্গে পরিচয়।

ইউনিভার্সিটির গণ্ডী পেরবার আগেই অশোক জানার বিয়ে হয়ে গেল। বউ থাকত দেশের বাড়িতে অশোকের বাবা-মার কাছে, হোস্টেল থেকে নববিবাহিতা বধূকে দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখত অশোক তার সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে, কিন্তু জবাব আসত না। ফলে প্রায়ই শনিবার কোন না কোন ছুতোয় অশোক দেশে যেত, কলকাতা থেকে মাথার গন্ধ-তেল, শৌখিন কাঁটা, চিরুনি, তরল আলতা, কুমকুমের টিপ কিনে নিয়ে। বউ সেগুলো পেয়ে খুশী হতো, ঘোমটার আড়ালে মুখ টিপে টিপে হাসত।

অশোক জানা জিজ্ঞেস করতো, একটাও চিঠির উত্তর দাওনি কেন?

বউয়ের সহজ উত্তর, কখন লিখব, আমাকে কাজ করতে হয় না বুঝি?

—রাত্তির বেলা।

—তখন বড্ড ঘুম পায়!

—বেশ, আমিও আর চিঠি লিখব না।

বউ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, না, না, তুমি লিখবে. কি মজার চিঠি লেখ. ঠিক যেন নভেল।

অশোক খুশী হয়, তোমার ভাল লাগে?

—আমি কেন, যে পড়ে তারই তো ভাল লাগে।

—তার মানে, আমার চিঠি তুমি অন্যদের পড়াও?

—বাঃ, আমার বন্ধুরা ছাড়ে নাকি? তোমার চিঠিলুলো নিয়ে গিয়ে পড়ে, কেউ কেউ মুখস্থ করে। ঐরকম চিঠি ওরাও লিখবে বিয়ের পর, বরকে।

এসব কতদিন আগেকার কথা। সেদিনের নতুন বউ আজ বাড়ির গৃহিণী। দুটি ছেলে তো বেশ বড় হয়ে গেছে। প্রথম জীবনে পাস করে বার হবার পর অশোক জানাকে কিছুদিন চাকরি করতে হয়েছিল। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে, বইয়ের দোকানে, প্রেসে। সে সময় রোজগার বেশী হয়নি, কিন্তু ক্রমশ অভিজ্ঞতা বেড়েছে। বুঝতে পেরেছে কি করে ব্যবসা করা যায়, তার পরেই শুরু হলো সংগ্রাম, চাকরি ছেড়ে ব্যবসা। সাহিত্যিক হবার সাধ ক্রমশ মন থেকে মুছে গেল, মা সরস্বতীর আসন জুড়ে বসল সিদ্ধিদাতা গণেশ, লক্ষ্মীর কৃপালাভে সে বঞ্চিত হলো না।

আজকের অশোক জানার কলকাতায় প্রেস আছে, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যবসা আছে, দেশে বিরাট পাকা বাড়ি আছে, সেই সঙ্গে জমিজমাও। তবে আর সে অভিযোগ করবে কার বিরুদ্ধে! তবু এমনই মানুষের মন, এক এক সময় অনাদিপ্রসাদের ওপর তার হিংসে হয়। লেখক হিসেবে সে স্বীকৃতি লাভ করেছে, তার বক্তব্য লোকে পড়ছে, আজও সে জীবনটাকে খুঁজছে।

অশোক জানার তো খোঁজার কিছু নেই, মনে হয় জীবনের অপর প্রান্তে সে পেঁছে গেছে। আর নতুন করে চলার দরকার নেই, গড়িয়ে গড়িয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় সে পেঁছে যাবে। কেমন যেন একটা একঘেঁয়েমি জীবনে জমতে শুরু করেছে। আর কিছুতেই যেন আগ্রহ নেই, আকর্ষণ কমে গেছে, উত্তেজনার অভাব। বাঁধা কাজ, মোটামুটি ভাল রোজগার, দুশ্চিন্তা কম, আর সেই জন্যেই বোধহয় আনন্দের স্রোতে ভাঁটা পড়ছে।

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়, ফেলে আসা দিনের স্মৃতি রোমন্থন ব্যাহত হয় মিঃ দত্তের আগমনে।

ব্যবসায়ী অশোক জানা খুশী হবার ভাব দেখায়, আসুন মিঃ দত্ত, আপনার কি সেবায় লাগতে পারি বলুন?

মিঃ দত্ত আজ ভাল স্যুট পরে এসেছেন, সঙ্গে চামড়ার পোর্টফলিও ব্যাগ। বললেন, অফিস-পাড়ায় গিয়েছিলাম। জানেন তো নানারকম ধান্দায় ঘুরি, সেই সঙ্গে আপনার জন্যে কিছু ছাপার কাজও নিয়ে এসেছি।

—কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব!

—ওসব ফরম্যালিটি ছাড়ুন। আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে, এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না, বেশ একটা ইন্টিমেট রিলেশান গড়ে উঠেছে। সত্যিই আপনাকে নিজের দাদা বলে মনে হয়।

অশোক জানা হাসে, তা আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

—আমার স্ত্রীর কাছে আপনার গল্প কত করি, একদিন ওকে নিয়ে আসব এখানে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মিঃ দত্ত ব্যাগ থেকে অর্ডারগুলো বার করে অশোক জানাকে বুঝিয়ে দেয় কোনটা কত ছাপতে হবে।

—রেট কি হবে?

—সে নিয়ে আপনি ভাববেন না অশোকদা. যা করবার আমি করব। বলেন তো কিছু এ্যাডভান্স টাকা দিয়ে যাই।

—না, তার দরকার হবে না।

—আজ তাহলে উঠি, সামনের সপ্তাহে আসব।

মিঃ দত্ত উঠে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক স্বরে বলে, আর একটা কাজ ছিল।

—কি কাজ?

—না, আজ থাক, আর একদিন বলবো।

—কেন?

—ব্যাপার আছে, তবে করতে পারলে আপনার অনেক টাকা লাভ হবে। চলি। বলেই হন হন করে বেরিয়ে গেল।

বিচক্ষণ অশোক জানা বুঝতে পারল নিশ্চয় কোন নতুন দাঁওয়ের ব্যাপার, নয়তো লোকটা বলতে গিয়ে থেমে গেল কেন?

অবশ্য এসব নিয়ে ভাববার সময়ও থাকে না, অনবরত প্রুফ দেখে যেতে হচ্ছে। কোন কাজটা আগে মেসিনে চড়বে তার নির্দেশ দিতে হচ্ছে। কোন কাজটাই ভুলে গেলে চলবে না, পাঁচ জনের পাঁচ রকম অনুরোধ, সকলকেই খুশী রাখতে হয়।

বাইরে থেকে গলা শোনা গেল, অশোকবাবু আছেন নাকি?

—কে? আসুন।

হাসতে হাসতে ভেতরে ঢুকল শশধর বোস এম. এল. এ। পরনে ধুতি, হলদে রঙের পাঞ্জাবি, পায়ে পাম্পশু জুতো।

অশোক জানা খাতির দেখাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়, আরে আসুন, আসুন এম. এল. এ সাহেব! আমার কি সৌভাগ্য!

—কাকে সঙ্গে করে এনেছি দেখুন।

পিছনের লোকটিকে দেখে অশোক জানার আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না, স্বয়ং বাস্তুঘুঘু। পরিচয়পর্ব শেষ হতেই বাস্তুঘুঘুর মিটমিটে উক্তি, আপনিই বুঝি শশধরবাবুর লোক্যাল গার্জেন?

—কে বললে?

—ওঁর কথা শুনে তো তাই মনে হলো। ভাল ভাল, কারুর ওপর আস্থা থাকা ভাল। শুনলাম আপনারা এক দেশের লোক, ইলেকশনের সময় ভদ্রলোকের হয়ে খেটেছেনও।

অশোক জানা কি বলবে ভেবে পায় না। জানায়, আমার যতটুকু সাধ্য—

বাস্তুঘুঘু চারদিকটা তাকিয়ে দেখে, বলে, বাঃ, বাঃ, প্রেস করেছেন—ছোট হলেও প্রেস তো বটে! আজকের যুগটা কি জানেন, স্রেফ বিজ্ঞাপনের যুগ, নিজের ঢোল নিজে পেটাও। প্রচার, আর তা করতে গেলেই চাই প্রেস। তাই বলি শশধরবাবু আপনার প্রেমে মজেছেন কেন।

শশধর বোস হিহি হিহি করে হাসে, উনি বেশ মজার মজার কথা বলেন।

বাস্তুঘুঘু থামিয়ে দেয়, আরে ভাই, এত যে রাজনৈতিক আন্দোলন সে তো খবরের কাগজ আছে বলে। যদি প্রেস ফটোগ্রাফার না থাকত, যদি কাগজে ছবি ছাপা না হতো, যদি বিবৃতি না বেরোত, দেখি একবার কোন শালা নেতা আন্দোলন করে, আইন অমান্য করে জেলে যায়, স্রেফ পাব্লিসিটি।

অশোক জানাকে সায় দিতে হয়, তা যা বলেছেন, স্যার।

বাস্তুঘুঘুর মন্তব্য, আমি স্যারও নই, লর্ডও নই, কি বলুন শশধরবাবু, আমার নীতি হলো দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। আমাদের ক্ষেত্রে শশধরবাবু শিষ্ট, অতএব তাকে আমায় রক্ষা করতে হবে।

অশোক জানা কৌতুক করতে ছাড়ে না, কিন্তু দুষ্টটা কে? আমাকে ঠাওর করেননি তো?

ব্রীজের ওপর দিয়ে ট্রেন চলে গেলে যেরকম ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ হয় তেমনি সশব্দে বাস্তুঘুঘু হাসল, তাহলে তো আপনাকে দমন করতাম, যেচে ভাব করতে আসতে যাব কেন।

—তাই তো ভাবছি।

—অত ভাববেন না, ভেবে ভেবে স্বামী ভবানন্দ হয়ে যাবেন। আমার বক্তব্য হলো, আপনার বন্ধু শশধরবাবুকে কারা খালি ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখছে খুন করবে বলে, এখন আমাদের কর্তব্য ওঁকে বাঁচানো।

—তা তো বটেই ।

—ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোন একটা দলে ভিড়িয়ে দিতে হবে।

—আমিও তো তাই বলছি।

বাস্তুঘুঘুর উপদেশ, শুধু কথায় বললে হবে না, কাজে করতে হবে। চলুন আমার সঙ্গে। তিনজনে নির্জনে বসে এই নিয়ে আলাপ করা যাক।

অশোক জানা ব্যস্ত হয়ে বলে, এখানে যদি কথা বলার অসুবিধে হয়, চলুন আমার বাসায়।

—না, বাসা-টাসা নয়, কোন একটা রেস্তরাঁয় চলুন, শুধু কথা বললেই তো চলবে না, গলাটাও তো ভেজাতে হবে! কোন অসুবিধে হবে না, সঙ্গে আমার গাড়ি রয়েছে।

শশধর বোসও আবেদন জানায়, চলুন অশোকবাবু, এ ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখতে চাইছি না, যা হোক একটা এস্পার-ওস্পার করে ফেলি।

—বেশ তো, আপনারা যান না।

বাস্তুঘুঘু খপ করে অশোক জানার হাতটা ধরে ফেলে। হাসতে হাসতে বলে, তাই কখনো হয়! আপনি হলেন শশধরবাবুর লোক্যাল গার্জেন, আপনি ছাড়া নাবালককে নিয়ে যাব কোন ভরসায়?

আবার সেই দজ্জাল হাসি।

অগত্যা অশোক জানা আর আপত্তি তুলতে পারে না, ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

বাস্তুঘুঘুর নতুন গাড়ি, রঙচঙে সাজানো সিটের কভার, তার ওপর ছোট ছোট ডানলোপিলোর বালিশ। কমবয়েসী ড্রাইভার, বেশ জোয়ান চেহারা, হাতে ঘড়ি, পরনে প্যান্ট, টেরিলিনের হাওয়াই শার্ট। ব্যাক ব্রাশ করা একমাথা কালো চুল। অশোক জানাদের উঠতে দেখে বেশ ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিল।

বাস্তুঘুঘু নির্দেশ দেয়, পাইলট, আমাদের সেই ঠাণ্ডা ঘরে নিয়ে চল।

সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

বাস্তুঘুঘু হাসতে হাসতে বলে, ওর নাম দিয়েছি আমি পাইলট। কারণ, প্লেনের মত ও গাড়ি হাঁকায়, তা ছাড়া সার্জেণ্ট পাইলটও বটে। ভি. আই. পি-দের সামনে মোটর সাইকেল চালিয়ে যে দেহরক্ষী যায় সে কাজও এ পাইলট করে। হাতের মাস্‌ল্‌ দেখেছেন তো, দু-দশজনের মহড়া ও একলা রাখে। তা ছাড়া জামার তলায়—

বাস্তুঘুঘু ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ টেপে। বুঝতে বাকী থাকে না, বাস্তুঘুঘুর দেহরক্ষীর কাছে আগ্নেয়াস্ত্রও সব সময় মজুত থাকে।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না পাইলট ওস্তাদ ড্রাইভার। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সজোরে গাড়ি চালিয়ে সে চলল। ট্রাম, বাস, ঠেলাগাড়ি, রিকশা, চারদিকে কিলবিল করছে মানুষ, তার মধ্যে ফেরিওয়ালা। কিন্তু কোন দিকে পাইলটের ভ্রূক্ষেপ নেই, স্টীয়ারিং-এর ওপর তার অসাধারণ দখল।

অশোক জানার কিন্তু ভাল লাগছিল না। এভাবে বাস্তুঘুঘুর সঙ্গে চলে আসা বোধহয় তার উচিত হয়নি। বাজারে লোকটার নামে অনেক কথাই চালু আছে, সত্যি মিথ্যে ভগবানই জানেন। তবে যা রটে তার কিছুটা তো বটে।

শশধর বোসের সঙ্গেই বা বাস্তুঘুঘুর পরিচয় হলো কি করে? অশোক জানার সঙ্গে পরামর্শ না করে শশধর পারতপক্ষে কোন কাজই করে না, তবে আজ একেবারে না বলে কয়ে বাস্তুঘুঘুকে সঙ্গে নিয়ে লোকটা তার প্রেসে হাজির হলো কেন? হয়তো ভেতরে ভেতরে আরও কথা হয়েছে, এখন শুধু অশোক জানাকে সাক্ষী রাখা। কিসের সাক্ষী কে জানে! এর জন্যে না পরে অশোক জানাকে বিপদে পড়তে হয়! ইচ্ছে থাকলেও এখন গাড়ি থেকে নেমে যাবার উপায় নেই, অগত্যা চুপচাপ বসে থাকা।

নীলচে আলোর ঠাণ্ডা ঘরে ছোট্ট পার্টিশন দেওয়া একটা কেবিনে তিনজনে বসে। সামনে নানারকম খাবার। বোধ হয় আগে থেকেই অর্ডার দেওয়া ছিল, তা না হলে এত তাড়াতাড়ি এতগুলো পদ পরিবেশন করল কি করে। তিনটে গেলাসে কোকাকোলা, তাতে অনেক বরফ।

বাস্তুঘুঘু বলল, কাজের কথা শুরু হবার আগে এগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক। চিকেন কাটলেট এখানকার খুব নাম-করা—ফিশ ফিঙ্গার, কাবাব—খেয়ে দেখুন, এমনটি কলকাতায় আর পাবেন না।

বাস্তুঘুঘু যে এখানে আসে তা ম্যানেজার থেকে বেয়ারা পর্যন্ত সকলের ব্যস্ততা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

শশধর বোসের বোধহয় খিদে পেয়েছিল বেশী, চক্ষুলজ্জা না করে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে কোকাকোলার গেলাসেও চুমুক দেয়, রসিকতা করে বলে, বাঃ, ঠাণ্ডা গরম দুরকম ব্যবস্থাই করেছেন, একেবারে হাতে-গরম ভাজা, আর ঠাণ্ডা শরবত।

অশোক জানার কিন্তু গেলাসে চুমুক দিয়েই সন্দেহ জেগেছিল, শুধু কোকাকোলা তো?

বাস্তুঘুঘুর টিপ্পনি, আর বরফ।

—একটু বেশী ঝাঁঝালো মনে হচ্ছে।

—এটা আসল জিনিস, বাজারে যা খান সেটা ভেজাল।

শশধর বোসের উচ্ছ্বাস, আমি খেয়েই বুঝেছি, এ একেবারে খাঁটি জিনিস, বেশ তেষ্টাও পেয়েছিল, এখন বুঝতে পারছি।

কথা চলতে লাগল নানা বিষয়ে, সেই সঙ্গে খাওয়াও চলছে। বেয়ারারাও সব সময় তৈরী, খালি প্লেট সরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ভর্তি প্লেট, শূন্য গ্লাস সরিয়ে পূর্ণ গ্লাস।

এতক্ষণে বাস্তুঘুঘু মুখ খুলল, শশধরবাবু, কম দামে নিজেকে বিকোবেন না। এম. এল. এ. হতে আপনার কম টাকা খরচা হয়েছে!

শশধর বোস গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলে, বিস্তর খরচ মশাই, একটা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়। কতখানি জমি আমায় বিক্রি করতে হয়েছে!

—তাই তো বলছি, এই টাকাটা তুলতে হবে।

—বটেই তো।

—আপনি একটা মোটামুটি হিসেব করে আমায় বলবেন কত খরচ হয়েছে, সে টাকা তো তুলতেই হবে, তার উপর দরাদরি করে যদি কিছু লাভ করা যায়।

অশোক জানা জিজ্ঞেস করে, কোন পার্টির কথা ভাবছেন?

—আরে মশাই, সব পার্টিরই এখন প্রচুর টাকা। যে ব্যাটা বেশী পয়সা দেবে তার দিকে যাব।

—তা হলেও একটা নীতি—

—এই রে, লোক্যাল গার্জেন এখন নীতিকথা শোনাচ্ছেন, এর পর দেবেন হিতোপদেশ। জানেন মশাই, এসব কথা শুনলেই আমার অম্বুলে ব্যথাটা কিরকম চাগিয়ে ওঠে। আরে ও বেয়ারা, শিগ্গীর তিন গেলাস শরবত নিয়ে আয়, তেষ্টা যেন মিটছে না।

অশোক জানা নতুন পানীয়ে চুমুক দিয়েই ভয় পেয়ে গেল। মনে হলো, মাথাটা যেন ঘুরছে। জিজ্ঞেস করল, এটা আবার কি?

—কেন, কোক্—

অশোক জানা রুখে ওঠে, কেন মিথ্যে বলছেন। কোনবারই সাদা শরবত ছিল না, তার সঙ্গে আর কিছু মেশান হয়েছে।

বাস্তুঘুঘু আবার ঘড়াং ঘড়াং করে হাসে, লোক্যাল গার্জেনের তো দেখছি ভারী সন্দেহবাতিক! শশধরবাবু, আপনি খেয়ে দেখুন।

বাহাদুরি দেখাবার জন্যে শশধর বোস চোঁ করে আধ-গেলাস সাবাড় করে দেয়।

—কিছু মনে হচ্ছে?

—কিছু না, কিছু না।

—তবে, অশোকবাবু, হেরে গেলেন তো? ঐ দেখুন, আপনার বন্ধু আর এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে দেবেন।

যেই না বলা শশধর বোস বাকী পানীয়টুকু নিমেষের মধ্যে গলাধঃকরণ করে। পরিষ্কার বোঝা যায়, নেশা তাকে জড়িয়ে ধরছে। চোখ দুটো টেনে আসছে, তবু হাসবার চেষ্টা করে বলে, কই, কিছু হয়নি, আমি ঠিক আছি।

অশোক জানা সভয়ে উঠে দাঁড়ায়, আর দেরি করা ঠিক হবে না শশধরবাবু, চলুন, যাওয়া যাক।

বাস্তুঘুঘু একটা চোখ ছোট করে বলে, আপনি যেতে চান যান না, ওঁকে টানাটানি করছেন কেন?

শশধর বোসের কথা ততক্ষণে জড়িয়ে গেছে, সত্যিই তো, আমাকে কেন টানছেন, আপনি যান না। আমার এখনও অনেক কথা আছে।

—সেই ভাল, আমি চলি।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে অশোক জানা নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। শশধর বোসের জন্যে দুশ্চিন্তা হয় অথচ কিই বা সে করতে পারবে, লোকটা যদি নিজেরই ভাল-মন্দ না বোঝে।

কেবিনের মধ্যে বাস্তুঘুঘু তখন মাতাল শশধর বোসকে বলছে, আপনার বন্ধুটি সোজা লোক নয়, মাল-টাল খাওয়া রীতিমত অভ্যেস আছে।

শশধর তখন বসে বসে টলছে, জিজ্ঞেস করল, কেন, এতে মাল ছিল বুঝি?

—প্রথমগুলোয় ছিল জিন, শেষেরটায় রাম।

—রাম, রাম, শশধর নিজের মনেই বলে, বেশ ভাল জিনিস, এ যেন স্বর্গসুখ র‍্যা। মাইরি বলছি, এম. এল. এ-র সিট জিতেও এত আনন্দ হয়নি। আর এক গেলাস নিয়ে আসতে বলুন।

অশোক জানা রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এলেও বাড়ি চলে যেতে পারেনি। কাছেই একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। শশধর বোসের জন্যে দুর্ভাবনাও যেমন ছিল, তার চেয়েও বেশী ছিল জানবার কৌতূহল, শেষ পর্যন্ত কি হয়।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, দেখা গেল দুটো বেয়ারার কাঁধে হাত দিয়ে জনগণের প্রতিনিধি শশধর বোস এম. এল. এ. টলতে টলতে রাস্তায় বেরিয়ে এল। বাস্তুঘুঘুর নির্দেশে তাকে তুলে দেওয়া হলো গাড়ির পিছনের সিটে।

প্রভু বসলেন পাইলটের পাশে। হুস করে গাড়ি বেরিয়ে গেল।

অশোক জানার এই প্রথম মনে হলো, কত বড় পাপ সে করেছে নির্বাচনের সময় ঐ জন্তুটাকে সমর্থন করে। আহা, ঐ নির্বাচনী কেন্দ্রের ভোটাররা যদি একবার শশধর বোসকে এই অবস্থায় দেখতে পেত তা হলে হয়তো বুঝতে পারত, গণতন্ত্রের নামে এ কি বিরাট প্রহসন।

কথায় বলে 'ঠেকে শেখা'।

অবশ্য ঠেকলেই যে সবাই শেখে তা নয়। তবে অশোক জানার মনে হলো শশধর বোস আর বাস্তুঘুঘুর সঙ্গে রেস্তরাঁয় খেতে গিয়ে সে রীতিমত ঠোক্কর খেয়েছে। জীবনের ঠোক্কর। নীতির বালাই অশোক জানার কোনদিনই বড় একটা ছিল না। নিজেকে দাঁড় করাতে গিয়ে অনেক কাজই সে করেছে যা হয়তো নীতিবাগীশরা করতে বিমুখ হতো। শশধর বোসকে এম. এল. এ. দাঁড় করানো সেই ধরনের একটা কাজ। রাজনীতি নিয়ে সে কোনদিনই মাথা ঘামায়নি, আজও ঘামায় না। তবে ইলেকশনের মরশুমে আরও পাঁচজন যেরকম পয়সা বানায়, অশোক জানাও সেই লোভেই শশধর বোসের হয়ে খেটেছিল, ফলও পেয়েছে। গ্রামের ঐ বিরাট বাড়ির দোতলার ছাদ ঢালাই করা অন্যথায় সম্ভব হতো না।

কিন্তু মাতাল শশধর বোসকে টলতে টলতে গাড়িতে উঠে চলে যেতে দেখে অশোক জানা হোঁচট না খেয়ে পারল না, মনে হলো সত্যিই সে অন্যায় করেছে। এতখানি সুবিধাবাদী হওয়া তার উচিত হয়নি। নিজের স্বার্থ গুছিয়ে নিতে গিয়ে গণদেবতাকে সে ধোঁকা দিয়েছে। অথচ প্রতিকারের এখন তো কোন উপায় নেই। ঐ সঙটার গলায় শিকল পরিয়ে বাস্তুঘুঘু ওকে দিয়ে বাঁদর নাচ নাচাবে। রাজনীতির মুক্ত অঙ্গনে ডুগডুগির তালে তালে শশধর এম. এল. এ. হাত-পা তুলে কোমর দুলিয়ে খেলা দেখাবে। কাগজওয়ালারা ছবি ছাপিয়ে হাততালি দেবে; ব্যস, তখন আর ওকে পায় কে!

নিজের ওপর বিরক্তি ধরল অশোক জানার, মনে মনে ঠিক করল শশধর বোসের বিরুদ্ধে সে লেখালেখি করবে। অবশ্য এ প্রতিজ্ঞা কতক্ষণ টিঁকবে বলা শক্ত। এও হয়তো পানীয়ের ফল, শশধর বোসের সঙ্গে সেও তো না-জেনে

নেশা করেছে, যদিও একেবারে চরম অবস্থায় পৌঁছয়নি। তবে অনেক সময় ভাল কাজ করার বাসনা নেশার সঙ্গেই উবে যায়।

অশোক জানা প্রেসে ফিরে এসে দেখল, মেসিনম্যান নিরঞ্জন ওরই অপেক্ষায় বসে আছে। বলল, বাবু চাবিটা নিন আমার দেরি হয়ে গেল, সেই কত দূর যেতে হবে।

অশোক জানা ভুরু কুঁচকে বলে, আমার জন্যে অপেক্ষা করার তো কিছু ছিল না, চাবিটা দিয়ে গেলেই তো পারতে।

—কাকে দিয়ে যাব?

—কেন, কবিতা নেই?

—সে তো বিকেলবেলাই আপনার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গেল।

—বলেছিল পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসবে। কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেল, তার বুঝি অসুখ করেছে।

নিরঞ্জন বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না, ওসব বাহানা, সাতঘাটের জল খাওয়া মেয়ে নিশ্চয় কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে—

অশোক জানা থামিয়ে দেয়, ঠিক আছে নিরঞ্জন, তুমি তাহলে যাও। আমি প্রুফগুলো দেখে রাখি, একেবারে প্রেস বন্ধ করে বাড়ি ফিরব।

বাবুকে একলা পাবার সুযোগ বড় একটা নিরঞ্জনের হয় না, তাই কান চুলকে বলল, কিছু টাকা অ্যাডভান্স দেবেন স্যার?

—টাকা! কোথায় পাব? দেখছ তো কাজকর্ম নেই বললেই হয়।

—টাকা চাইলেই তো আপনি ঐ এক কথা বলেন। আর খেটে খেটে আমার তো হাড় মাস কালি হয়ে গেল।

অশোক জানা রসিকতা করে, ভালই হয়েছে, আর বাজার থেকে কালি কিনতে হবে না, তোমাকেই এবার মেশিনে চড়াব। প্রত্যেক মাসেই অ্যাডভান্স নেওয়া কি ভাল, মাসের শেষে আর মাইনে কি পাবে তা হলে?

নিরঞ্জন বোঝে অশোক জানার কাছ থেকে ফোকটে টাকা পাওয়া যাবে না। যেদিন বেশী কাজের চাপ পড়বে মোচড় দিয়ে টাকা বের করতে হবে।

এরা দুজনে যখন অগ্রিম টাকার বিষয়ে দর কষাকষি করছে, কবিতা তখন মিতার ঘরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনছে তার কথা।

॥ পনেরো ॥

নিরঞ্জনের অনুমান ঠিক হয়নি। বন্ধুকে দেখতে যাবার অছিলায় কবিতা ছুটি নেয়নি অশোক জানার কাছ থেকে, সত্যিই সে মিতাকে খুঁজতে

গিয়েছিল। কারণ সপ্তাহখানেক হলো মিতা আর রাত্রে রানাঘাটের বাসায় ফিরছে না।

মিতা আর কবিতার বন্ধুত্ব আজকের নয়। রানাঘাটের একই ক্যাম্পে তারা মানুষ। সুখ দুঃখের বিচিত্র অভিজ্ঞতা দুজনকেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। তবু এদের চিন্তাধারা আলাদা, বুদ্ধি আলাদা, বিবেচনা আলাদা। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লক্ষ্য করেছিল, মেয়েরা মিতার বন্ধু হয় না। ও দস্যিপনা করে বেড়াত ছেলেদের সঙ্গে। বড় হবার পরও কিন্তু ওর স্বভাব বদলায়নি। বাড়িতে কত বকুনি খেয়েছে বেশী রাত পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারার জন্যে, তবু সে কিছুতেই দমেনি। অন্য মেয়েরা টিটকিরি কেটে মিতার নাম দিয়েছিল 'ঢলানি'।

মিতা কিন্তু এ বিশেষণে চটত না, উল্টে মন্তব্য করত, ও বাঁদরীগুলোর মুখে বোধহয় আঙুরফল টক লেগেছে। নিজেরা পারিস তো ঢলানী মেয়ে হ না, ছেলেরা তো একবার ফিরেও তাকায় না।

কবিতা থামাত, কেন তুই ওদের সঙ্গে ঝগড়া করিস!

—ওরাই তো আমার পেছনে লাগতে আসে। আগে নিজে দাঁড়াই, তারপর ওদের মুখে ঝামা ঘষে দেব।

নিজের পায়ে দাঁড়াবার পথও কিন্তু মিতাই খুঁজে বার করেছিল। ছোট মেয়েদের মধ্যে ওই প্রথম রানাঘাট-এর ক্যাম্প থেকে কলকাতায় আছে। গুঁড়ো মসলা তৈরীর কারখানায় কাজ নেয়। তারপর আস্তে আস্তে অনেককেই টেনে এনেছিল ওই রাজাবাজারের কর্মক্ষেত্রে। সেইসঙ্গে কবিতাও আসে।

ওরা দুজনে রানাঘাট থেকে এক ট্রেনে আসত, রাত্রিবেলা ফিরতও একই গাড়িতে। গান করতে করতে আসা-যাওয়া, তারই মধ্যে অফুরন্ত গল্প, কলকাতা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। মাঝে মাঝে দেখা যেত মিতার পরনে বাহারে নতুন শাড়ি। কখনও বা হালফ্যাশনের হ্যান্ডব্যাগ, নকশাকাটা চটি, গালার চুড়ি। এসব নিয়ে অন্য মেয়েরা হাসাহাসি করত, কবিতা জানত এগুলো মিতাকে তার বাবুর উপহার। কখনও বলত, তোর বাবুটি খুব রসিক, না রে মিতা?

মিতার চটুল উত্তর, মন্ত্র জানলে সবাইকেই রসিক করা যায়।

—কি করে?

—বোকা মেয়ে, এসব শিখতে হয়।

কিছুদিন হলো মিতা আর সকালের ট্রেনে আসে না, একটু দেরী করে গাড়ি ধরে, সেইজন্যে কবিতার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতও কম হতো। বলত, হাজিরার টাইম্‌টা বদলে নিয়েছি, অত ভোরে আর ঘুম থেকে উঠতে পারি না। তাই দেরীতে আসি।

কবিতা অবাক হতো, বাবু বকে না?

মিতার চটুল হাসি, বকবে কেন? সন্ধ্যেবেলা বাবুর জন্যেই তো আমার ফিরতে দেরী হয়।

—আমাদের চেয়েও বেশি রাত করে ফিরিস?

—তা ছাড়া আর কি!

—ভয় করে না?

—আমি কি ছেলেমানুষ? ভয়, ভাবনা—ও দুটোকেই জলাঞ্জলি দিয়েছি। তবে খুব বেশি রাত হয়ে গেলে আর রানাঘাটের বাসায় ফিরি না।

—তাহলে কোথায় থাকিস?

মিতা একটা চোখ ছোট করে বলে, অত কথা জানতে নেই, তুইও বখে যাবি।

রাত্রে বাসায় না ফেরার সূচনা তখন থেকেই হয়েছিল, তবে সেটা হতো মধ্যে মধ্যে। এখন একনাগাড়ে সাত দিন না ফেরায় মিতার মা চিন্তিত হয়ে ছুটে আসে কবিতার কাছে।

উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে, তুই একবার মিতার খবর নে কবু, একে তো সংসার নিয়ে জ্বলেপুড়ে মরছি, তার ওপর ঐ পোড়ারমুখী মেয়েটা—

কবিতা জানবার চেষ্টা করে, বাড়িতে কোন খবরও দেয়নি?

—কিছু না।

—কি হয়েছিল? কারুর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি—

—ঐ ডাকাত মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে কে? গুরুজন বলে কোন জ্ঞান আছে? সারাক্ষণ গালাগালি, আমাদের জন্যেই যেন ওর জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বাসার কোন জিনিস ভাল লাগে না। যা রাঁধি ওর কাছে সবই বিচ্ছিরি, পচা। তবু মুখ বুজে থাকি। কি করব বল, রোজগেরে মেয়ে—

কবিতা আশ্বাস দেয়, ঠিক আছে মাসীমা, আমি আজ খবর নেব। হঠাৎ কি এমন হতে পারে—

—তোমরাও তো কাজ করছ মা, অসুস্থ বাপ-মা সবাইকে নিয়েই তো ঘর করছ, কই এমন ফোঁসফোঁসানি তো কখনও দেখিনি।

—ঠিক আছে, আপনি যান। আমি দেখছি।

সারাদিনই কবিতা মিতার কথা ভেবেছে। মেয়েটাকে কোনদিন তার স্বার্থপর মনে হয়নি। হয়তো ব্যবহারটা অন্য ধরণের, আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলে না। সত্যিই কি সে জন্মের মত বাসা ছেড়ে চলে এল, না কোনো অসুখ-বিসুখে পড়ে গেছে? মেয়ের যে অসুখ করলেও করতে পারে এ

আশঙ্কা কিন্তু মিতার মা একটিবারের জন্যেও প্রকাশ করেনি। যেখানে তার স্বার্থে ঘা লেগেছে সেইটাই বড় করে তুলে ধরেছে কবিতার সামনে। দারিদ্র্য মানুষকে এমনই একটা স্তরে নামিয়ে নিয়ে যায় যেখানে সব সম্পর্কের গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ে। বাবা-মা ভাই-বোন সংজ্ঞাগুলোকে পয়সার সুতো দিয়ে মালা গেঁথে রাখা হয়, টানাপোড়েনে তা তো ছিঁড়বেই।

প্রেস থেকে ছুটি নিয়ে কবিতা যখন মিতাদের মসলার কারখানায় হাজির হলো তখনও চারটে বাজেনি। কবিতাকে দেখে মিতা সত্যিই আনন্দে লাফিয়ে উঠল, আয় আয় কবু, কতদিন তোকে দেখিনি।

এমনভাবে কথা বলল মিতা, কিছুই যেন ঘটেনি।

কবিতা জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, তুই নাকি আজকাল রাত্রে বাসায় ফিরিস না?

মিতা হাসতে হাসতে বলল, সময় পাচ্ছি কই! রাত্রি একটা দুটোর আগে তো ছুটি পাই না। তারপরে বাড়ি ফিরব কি করে?

—বাড়িতে একটা খবর পাঠাবি তো? মাসীমারা ভাবছেন না?

মিতা ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল, মা ভাববেন আমার জন্যে, বলিহারী বুদ্ধি তোর!

—উনিই তো আমাকে পাঠালেন তোর খোঁজ নিতে।

—দেখতে পাঠিয়েছে পাখী শেকল কেটে পালাল কিনা। যখন শুনবে মাস গেলে পয়সা ঠিক পাবে তখন আর চেঁচাবে না। যাক, চল আমার ঘরে, এখানে বসে গল্প করা যায় না।

মিতা উঠে পড়ে অন্য মেয়েদের উদ্দেশে বলে, বাবু খোঁজ করলে বলিস, আমি ঘরে গেছি। ফাঁকি দিবি না, মন দিয়ে কাজ করবি।

কবিতাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই অন্য মেয়েগুলো নিজেদের মধ্যেই ইশারা করে বলল, দেমাক দেখ, এখন বাবুর পাটরানী হয়েছেন, ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন। নে, দু' দিন করে নে। পরে যখন মারবে লাথি তখন বুঝবি। পাটরানী তো কম দেখলাম না।

ঘিঞ্জি অলিগলি পেরিয়ে রাজাবাজারের মধ্যে দপ্তরীপাড়ার এক কোণের দোতলার একটা ঘরে চাবি খুলে মিতা কবিতাকে ভেতরে ঢোকাল। বলল, এতদিন জানতে চাইছিলি কলকাতায় কোথায় আমি থাকি; এই আমার ঘর। পাশের ছাতটায় একটা টিনের চাল আছে, ওখানে রান্না করি। কেমন ভাল না?

কবিতা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরটা দেখল। খুব ছোট নয়, তক্তপোশের ওপর বিছানা পাতা রয়েছে, তার উপর একটা সুন্দর বেডকভার,

খান দুই চেয়ার, একটা ছোট টেবিল, তারই পাশে একটা জাল আলমারি, ওটাই ভাঁড়ার। দেয়ালে একটা আয়না ঝুলছে, তার পাশে আলনা। শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, চুলের ফিতে ওইতেই টাঙানো।

কবিতার ঘোর তখনও কাটেনি। জিজ্ঞেস করলো, তুই একলা থাকিস?

—একরকম একলাই। তবে সন্ধ্যের পর বাবু আসে।

—ভাল লাগছে?

—কি?

—এই জীবনটা?

মিতা হাসল, খারাপটা তো এখনও বুঝতে পারছি না। রানাঘাটের গোয়ালের চেয়ে তো এ ঢের ভাল। সেখানে গরু-ছাগলের মতো পড়ে না থেকে এখানে যদি মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারি তাতে খারাপটা কি হলো?

—তা বলছি না। বাড়ির লোকদের কথা—

—তারা তো আমাকে চায় না, চায় আমার টাকা। কিছু ডোল পাঠিয়ে দিলেই হবে।

কবিতার রুচিতে বাধে, ছি, ছি, কি বলছিস!

—এখন বুঝতে পারবি না, চোখ খুলে সংসারটা দেখ, দেখবি আমি খাঁটি কথাই বলছি। ভাল খাচ্ছি, পরছি, আনন্দে আছি এই তো যথেষ্ট।

কবিতা কোন কথা বলে না, চুপ করে যায়।

—কি ভাবছিস?

—মানে তোর বাবুরও বউ, ছেলে, সংসার সব আছে!

—তাতে কি হলো? নদীর এক পাড় ভাঙে আর এক পাড় গড়ে।

—তাদের কথা ভাবলে খারাপ লাগে না?

—তুই হাসালি কবু, দুনিয়াসুদ্ধ লোকের কথা কি শুধু আমাদেরই ভাবতে হবে! কারণ, আমরা উদ্বাস্তু, কোন কিছুতেই আমাদের অধিকার নেই? এতটুকু সুখ পেলে বুঝতে হবে কাউকে আমরা বঞ্চিত করছি। তাই যদি সত্যি হয়, হোক। আমাদের অনেক ঠকানো হয়েছে, মুখ বুজে ঠকেছি, এখন যদি দু'-একজনকে ঠকাই তাতে পাপ হবে না।

কবিতা চুপ করে কথা শুনছিল, গম্ভীর গলায় বলল, কি জানি, তোর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। মানে, এই জীবনটার কথা, এ তো ঠিক বিয়ে নয়।

মিতা আবার হাসল, বিয়ে হলেই বুঝি সাত খুন মাফ? সাত পাকে বাঁধতে পারলে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা? বাবুরও তো বউ আছে, তবে লোকটা আমার কাছে থাকে কেন? ওসব সংস্কৃত মন্ত্রের চেয়ে ফুস্‌মন্তরের দাম অনেক বেশি।

একটু থেমে মিতা দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে বলে, তবে এ কথা বলছি না, এ বাবু চিরকাল থাকবে। একজন যাবে আর একজন আসবে। তাতে কিছু আসে যায় না।

কবিতা বলল, বোধহয় পাঁচটা বাজল। আমি যাই, প্রেসে ফিরতে হবে।

—পাগল নাকি, আমি এখন তোকে ছাড়ব ভেবেছিস? এতদিন পরে দেখা হলো, নিজের ঘরে নিয়ে এলাম, তুই এখন আমার সঙ্গে চা খাবি। এখানে ভাল কষা মাংস পাওয়া যায়, এখুনি আনাচ্ছি। তারপর দুজনে মিলে সাজব, বেড়াতে বেরব।

—কোথায়?

—তোকে আমাদের তীর্থে নিয়ে যাব। তারপর রাত্রিবেলা ফিরে আমার সঙ্গে এই ঘরে থাকবি।

—সে কি, রানাঘাটের বাসায় না ফিরলে সবাই ভাববে যে!

—কেউ ভাববে না, তুই আমার কথা রাখ; তাহলে আমিও কথা দিচ্ছি, কালকে তোকে নিয়ে একসঙ্গে রানাঘাটে ফিরব, আমার বাড়িতে দেখাও করে আসব।

কবিতা অবাক হয়, তার মানে কাল প্রেসে যাব না?

—মোটেও না, ছুটি। কি করবে প্রেসের মালিক? একদিনের রোজ কেটে নেবে তো, আমি দিয়ে দেব। ডবল্ রোজ। কথা দে থাকবি?

কবিতা ভাবতে পারেনি মিতা এত সহজে রানাঘাটে ফিরতে রাজী হবে। অন্তত দেখা করার জন্যেও। তাছাড়া আজকের কথাবার্তার পর মিতার বাবুটিকে চাক্ষুষ দেখার কৌতূহলও হচ্ছিল প্রবল। তাই বলল, সত্যি তুই কাল যাবি?

—যাব।

—তা হ'লে আমি থাকতে রাজী আছি।

মিতা খুশী হয়ে কবিতাকে জড়িয়ে ধরল, বোধহয় কোন এক বান্ধবীকে তার সৌভাগ্যের জীবন দেখাতে পারার আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বলল, আমি তোকে খুব ভালবাসি রে কবু।

কবিতার অস্ফুট উত্তর, জানি।

॥ ষোলো ॥

শহর কলকাতার নানা জায়গায় নানা ধরনের আড্ডার আসর বসে। আড্ডাকে বাদ দিলে কলকাতার কালচারকে বোঝা সম্ভব নয়। চায়ের আড্ডা, কফির

আড্ডা, তাসের আড্ডা, ফুটপাথের আড্ডা, মজলিসী আড্ডা, সাহিত্যের আড্ডা, ছুটির আড্ডা, চড়ুইভাতির আড্ডা, গৃহিণীদের আড্ডা, অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের আড্ডা, গুলতানির আড্ডা, তাছাড়া জুয়ার আড্ডা, নেশার আড্ডা, ঘোড়ার মাঠে রেসুড়েদের আড্ডা তো আছেই। সব রকম আড্ডার সমন্বয়ে কলকাতা কালচারের একটা চেহারা ফুটে ওঠে আধুনিক ব্যঞ্জনাময় চিত্রকলার মত।

এক আড্ডার সঙ্গে আর এক আড্ডার কোন মিল নেই, এদের জাত আলাদা, ধর্ম আলাদা, চেহারা আলাদা। ভারতের অন্যত্র এতরকম আড্ডার আসর কোথাও বসে বলে জানা নেই। আড্ডার মর্ম বিদেশীরা বোঝেই না, আড্ডার কোন প্রতিশব্দ নেই, আড্ডার ব্যাখ্যা আড্ডাই। বলা নেই কওয়া নেই কারা আসবে ঠিক নেই অথচ হঠাৎ এক একদিন আড্ডা জমে ওঠে। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আলাপ ক্রমশঃ ঘনীভূত হয় তান আর লয়ের মাধ্যমে। আড্ডা নির্ভর করে মেজাজের ওপর। যারা আড্ডাধারী তাদের দেওয়া আর নেওয়ার ওপর।

এই ধরনের এক মজলিসী আড্ডা বসে ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণে হেস্টিংস অঞ্চলের ময়দানের ওপর। সন্ধ্যার অন্ধকার যত নামে ততই আসতে শুরু করে এই আড্ডার সভ্যরা। রাস্তার ধারে নয়, মাঠের মাঝখানে দুটি দ্বীপের মত দু'খানি আড্ডার আসর। আড্ডাধারীরা রাস্তায় নেমে মাঠের ভেতরে ঢোকে, কিছু দূর এগুলে অন্ধকারের মধ্যে তার ছায়ামূর্তিটা যখন নড়েচড়ে ওঠে কোন একটি আসর থেকে একজন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে সাড়া দেয়, 'মা'।

এটি সাঙ্কেতিক ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে নবাগত আড্ডাধারীও হাত তুলে সঙ্কেত জানায়, 'মা'।

আড্ডার আসর থেকে একজন হাঁক দেন মকরধ্বজ, শিগ্‌গির সতরঞ্চি আর গেলাস দে।

মকরধ্বজ কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। যে লোকটি যখন এই আড্ডার আসরে চ্যাটাই, সতরঞ্চি, সোডা, গেলাস, আর ভিজে ছোলা আদা নুন-এর চাট যোগায় তারই নাম মকরধ্বজ।

দুটি আসর পৃথকভাবে বসে। কারণ এদের পানপ্রথা আলাদা। দু' জায়গাতেই এদের অবশ্য পানীয় বাংলা দু' নম্বর। তবে যে আসরটি আয়তনে বড় তাদের মূলনীতি হলো 'যার যার তার তার'। এরা নিজেরা সঙ্গে করে বোতল নিয়ে যায়, কিন্তু অন্য কাউকে খেতে দেয় না। এই আসরটির নাম 'মরুতীর্থ হিংলাজ'।

অন্য আসরটির সভ্যসংখ্যা সব সময় কম, এখানে একজনের পয়সায় সকলে মিলে পান করে। প্রায় প্রতিদিনই কোন একজনের ঘাড়ভাঙা হয়, সিনেমায় বা থিয়েটারে নামতে চায় এমন কোন যুবক, রেসের বাজি জিতেছে

এমন কোন মধ্যবিত্ত, মেয়েদের সঙ্গ চায় এমন কোনো ধনপতি গাঁইয়া, কালো বাজারের দৌলতে কোন ভুঁইফোড় বড়লোক এই আসরের রসদ যোগায়। আড্ডাধারীদের ভাষায়, 'এরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'। এই আসরটির নাম 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'।

আজ এই আসরের লোকেরা মুখ শুকিয়ে এতক্ষণ বসেছিল, গলা শুকিয়ে তো বটেই। তখনও বলি হবার জন্যে কেউ এসে পৌঁছয়নি, এরা সতরঞ্জি, গেলাস, সোডা চাট্ নিয়ে অধীর আগ্রহে বসেছিল, আর শিকারীর চোখ নিয়ে দেখছিল 'মরুতীর্থ'কে এড়িয়ে ওদের দিকে শেষ পর্যন্ত কেউ আসে কি না।

হঠাৎ ওদের মধ্য থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, এসেছে, এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্কেতিক ধ্বনি, 'মা'।

প্রতিধ্বনি উঠল অন্ধকারের মধ্য থেকে, 'মা'।

দেখা গেল দুটি মেয়ের মাঝখানে এক ভদ্রলোক, পেছনে মকরধ্বজের মাথায় একটা ঝুড়ি। বুঝতে বাকী রইল না সেটা বাংলা দু' নম্বরের বোতলে ভর্তি।

কবিতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, এ আমরা কোথায় যাচ্ছি মিতা?

মিতা কবিতাকে ভরসা দিয়ে বলে, ভয় পাস না, এ হলো 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'। বাবু নিশ্চয় রেসের মাঠে খুব পয়সা পিটেছে, তাই এই উৎসব। অন্যদিন আমরা ওদের দলে বসি। ওখানে খরচ কম।

অন্ধকারের মধ্যে কবিতার কিন্তু ভয় করতে লাগল। আরও ভয় করতে লাগল আড্ডাধারীদের 'মা', 'মা', 'মা', সমবেত চীৎকারে। এ তাদের উচ্ছ্বাস, প্রার্থনা ব্যর্থ হয়নি, মায়ের জন্য বলি পড়েছে।

'উদ্ধারণপুরের ঘাটে' মায়ের জন্য বলি পড়ার উচ্ছ্বাস শুনে 'মরুতীর্থ'র সভ্যরা নড়ে চড়ে বসল, বিশেষ করে তারা, যাদের পানীয় ইতিমধ্যে ফুরিয়ে গেছে। অন্যদের বোতল থেকে পান করার রেওয়াজ এখানে নেই, তা ছাড়া মকরধ্বজ মারফত নতুন বোতল সংগ্রহ করার সামর্থ্যই বা কোথায়। যেমন এককালের নামকরা চিত্রপরিচালক সৌরভ সেন ছবিতে অভিনয়ের লোভ দেখিয়ে একটি কলেজের ছেলের পয়সায় দু' বোতল দু' নম্বর কিনে সন্ধ্যা থেকে মরুতীর্থে আসর জমিয়ে বসেছে। কিন্তু দু' বোতলের আয়ু আর কতক্ষণ, ছেলেটিকেও কিছুটা ভাগ দিতে হয়েছে বইকি। আর বলতে হয়েছে অনর্গল মিথ্যে কথা—

—তাহলে সৌরভ-দা......

—কিচ্ছু ভাবিস না পটল, এই একখানা ছবি দেখাব বাজার তেলপাড় করে দেবে। আর, তোর জন্যে যে সিনারিও লিখেছি, আমি বলে দিতে পারি, ঐ

একটা পার্ট অভিনয় করে তুই বাংলা দেশের হিরো হয়ে যাবি।

—সেই তো আমার স্বপ্ন।

সৌরভ সেন জোর দিয়ে বলে, আর স্বপ্ন নয়, এবার বাস্তব, খুব দেরি হলে সামনের মাস থেকে আমরা ফ্লোরে যাচ্ছি।

পটলের কৌতূহল, প্রোডিউসার ঠিক হয়ে গেছে?

—আরে, তিন ব্যাটা প্রোডিউসার পেছনে পেছনে ঘুরছে—এ হলো সৌরভ সেন। একবার যেই বাজারে রটে গেছে আমি নতুন ছবি করব, ব্যস, আর রক্ষে আছে!

—আর্টিস্ট?

—তারাও পাগল করে মারছে, ফিল্ম লাইনের বোয়াল থেকে চুনোপুঁটি সব আর্টিস্টই তো আমার হাতে তৈরী। এখন সকলেরই ইচ্ছে আমার নতুন ছবিতে নামবার। কতজনকে চান্স দিই বল? শুধু তোকে—

পটল বলে যায়, আপনি আমায় কত স্নেহ করেন তা কি বুঝি না!

স্নেহপ্রবণ সৌরভ সেন পটলকে জানিয়ে রাখতে ভোলে না, এর পরদিন কিন্তু আর এক বোতল বেশী আনবি। কম খেলে কি হয় জানিস, নেশাও জমে না, তেষ্টাও মেটে না।

পটল জানায়, আজকেই আনব ভেবেছিলাম, কিন্তু মা আমাকে দুধের কার্ড করতে টাকা দিলেন না।

—তাহলে কি হতো?

—পকেটমার হতো। এখানকার আসর জমত।

—তাহলে বাড়ির দুধ?

পটল হাসে, মা আমার উপর রেগে গিয়ে পরদিন নিজে টাকা দিয়ে কার্ড করিয়ে আনতেন।

—ভাগ্যিস কলকাতা শহরে পকেটমারগুলো আছে, তাদের দোহাই দিয়ে তবু দু-চার দিন যা ফুর্তি করা যায়।

কেন, জানা নেই, একথা শুনে সৌরভ সেনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তাকে এতটা নামতে হয়েছে। মিথ্যে লোভ দেখিয়ে পটলের নিজের পকেটমারের টাকায় সৌরভ সেনকে 'মরুতীর্থে' আসতে হচ্ছে! অথচ একদিন কত না প্রতাপ ছিল মানুষটার। একসঙ্গে একাধিক ছবি সৌরভ সেনের পরিচালনায় এই কলকাতার স্টুডিওতে উঠেছে, প্রেসের লোকেরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, দর্শকরা অপেক্ষা করত সৌরভ সেনের নতুন ছবির জন্যে। পটলকে সে মিথ্যে বলেনি, অনেক আর্টিস্ট সে তৈরি করেছে, এখন যারা খ্যাতির শিখরে। টালিগঞ্জে শৌখীন বাড়ি করেছিল, সৌরভ সেনের সে বাড়ি এখনও আছে, তারই দু'খানা ঘরে সৌরভ সেনের সংসার। বাড়িটা বাঁধা পড়েছে এক

কোম্পানীর কাছে, আর কয়েক মাসের মধ্যেই বেহাত হয়ে যাবে। কলকাতার বড় বড় হোটেল রেস্তরাঁয় সৌরভ সেনের পানের আসর বসত। সে সময় কলকাতায় কতরকম বিলাতী সুরা পাওয়া যেত, শ্যাম্পেন, ভারমুথ, ওয়াইন—আহা সে-সব স্বপ্নভরা দিন! চারপাশে সুন্দরী মেয়েদের ভিড়, প্রোডিউসার-ডিস্ট্রিবিউটাররা কতভাবে সৌরভকে আপ্যায়ন করত।

অথচ আজ সব ভোঁ-ভাঁ।

গোটা দুই ছবি মারাত্মকভাবে ফ্লপ হবার পর ছবির জগৎ থেকে চিরকালের মত সৌরভ সেনকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু কেন? এখনও তো সৌরভ সেন ছবির জন্যে গল্প ভাবতে পারে, এখনও তো পরিচালনা করার শক্তি তার আছে, তবে কেন তাকে সরে আসতে হলো?

এই একটা প্রশ্নের উত্তর আজও সৌরভ সেন খুঁজে পায়নি। বুঝতে পারেনি সে ফুরিয়ে গেছে, আর তার নতুন করে দেবার কিছু নেই, বলারও কিছু নেই।

হঠাৎ কখন যুগ পাল্টে যায়, ভাষা বদলে যায়, তখন আর চলমান জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা যায় না। নতুন যারা আসে, তাদের কথা বুঝতেও যেমন মুশকিল হয়, ততখানি অসুবিধে হয় তাদের বোঝাতে।

কারণ, নতুন আর পুরোনোর মধ্যে ভাব-বিনিময়ের ভাষা যায় হারিয়ে।

সৌরভ সেন হারিয়ে যাওয়া দিনের সেই খ্যাতি সম্মানকে আঁকড়ে ধরে থাকার যত চেষ্টা করেছে, ততই নিষ্ঠুর বর্তমান তাকে দমবন্ধ করে পিষে মেরেছে। বয়সের তুলনায় তাই সৌরভ সেনের শরীরটা নড়বড়ে। অসংলগ্ন কথাবার্তা, নিজের জীবন দর্শনে আস্থা হারিয়েছে অথচ নতুন দর্শনকেও গ্রহণ করতে পারছে না। এককালের কারুকার্য করা বাসভবন সংরক্ষণের অভাবে ক্রমশ যেন ভেঙ্গে পড়ছে, বালি খসে পড়েছে, ইঁটে ফাটল, চারদিকে আগাছা। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো জঙ্গলে ভরে যাবে।

সৌরভ সেনের নিজেকে কিন্তু আরও মর্মান্তিক মনে হয়। মনে হয়, ফুটো নৌকায় ক্রমশ জল উঠছে, আস্তে আস্তে মাঝদরিয়ায় ডুবে যাবে। অথচ বাঁচবার কোন উপায় নেই, এককালে সাঁতার কাটতে পারত, কিন্তু এখন তাও পারে না। ভুলে থাকার জন্যে সারাদিনের উঞ্ছবৃত্তির পর এখানকার আসরে নিশ্চিন্ত আশ্রয় নেয়। যেদিন অনেক চেষ্টা করেও লোক জোটাতে পারে না, সেদিন গেলাস নিয়ে আসর জাঁকিয়ে বসে থাকে উদ্ধারণপুরের ঘাটে।

আজ অন্য আসর থেকে 'মা', 'মা' ধ্বনি শুনে হাতের গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে সৌরভ সেন উঠে দাঁড়াল, তাহলে ভাই, পটল, আজ তুমি এস, ওই কথাই রইল, ছবি শুরু হবার আগে তোমায় খবর দেব।

পটল জিজ্ঞেস করল, আপনি এখন যাবেন না সৌরভ-দা?

—কি করে যাই বল, ঐদিকে দেখছ না, আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। একবার দেখা না করে গেলে সকলের অভিমান হবে। তুমি ছেলেমানুষ, আর দেরি ক'রো না, বাড়ি ফিরে যাও।

পটলকে কাটিয়ে সৌরভ সেন একরকম টলতে টলতে অন্য আসরের কাছে গিয়ে হাজির হলো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে আহ্বান, চলে এস মক্কেল, আজ পাঁঠা নয়, মোষ বলি পড়েছে।

সৌরভ সেনের প্রশ্ন, ভাগ্যবানটি কে?

—দি গ্রেট হলধরদা, দি ওনলি হলধরদা, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

হলধরদাকে চেনে না এ দুই আসরে এমন লোক নেই বললেই হয়। ভদ্রলোক মোটা-সোটা, গোলগাল, দিব্যি নেয়াপাতি ভুঁড়ি, মাথায় চকচকে টাক, কানের দুপাশে, ওপরে কিছু ছড়ানো চুল আছে, চওড়া গোঁফ, পরনে বেশির ভাগই ধুতি আর পাঞ্জাবি। খুব সহজে আসর জমাতে পারে। পকেটে বেশি রেস্ত না থাকলে নিজেই বোতল এনে মরুতীর্থে বসে। কাউকে আধ আউন্সও ভাগ দেয় না, আবার মাঝে মাঝে আজকের মত এক ঝুড়ি বোতল এনে সবাইকে পান করায়। আড্ডার লোকের বুঝতে বাকি থাকে না হলধরদা রেসের মাঠে টাকা জিতেছে। ভদ্রলোকের আর একটা বৈশিষ্ট্য—আসরে কখনও একা আসে না। সব সময় সঙ্গে মেয়ে থাকে, এরা অপ্সরী কিন্নরী কেউ নয়, একেবারে সাদামাটা চেহারা। এ নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করে, হলধরদা, তোমার স্টকে কি একটিও সুন্দরী মেয়ে থাকতে নেই?

ভদ্রলোক মুচকি মুচকি হাসে, খবরদার ভাই, সুন্দরী মেয়ের দিকে ঝুঁকো না।

—কেন?

—বউ সুন্দরী হলে পালাবে, রক্ষিতা সুন্দরী হলে তোমাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে, আর পরস্ত্রী সুন্দরী হলে তোমার চরিত্র খারাপ করে দেবে। অতএব শত হস্তেন সুন্দরীম্।

—তাই বলে এইসব মেয়ে?

হলধরদার ধ্রুপদী জবাব, তবু মেয়ে তো, পুরুষমানুষ নয়।

—এর পর আর তর্ক চলে না। হলধরদার এ-জাতীয় মেয়ে-বন্ধুদের সকলেই স্বীকার করে নেয়। এ-ছাড়া উপায় তো নেই।

সৌরভ সেন বিনা ভূমিকায় হলধরদের কাছে এসে বসে পড়ে। খোশামোদ করে বলে, তাই বলি, এক ঝুড়ি মাল নিয়ে কে এল, কার এত বুকের পাটা? তা কত টাকা কামিয়েছ আজ? নিশ্চয় হাজারখানেক। নইলে এত লোককে কেউ খাওয়ায়? বেঁচে থাক হলধরদা, বেঁচে থাক তোমার ঘোড়ার মাঠ, চট করে আমার গেলাসটা ভরে দাও দিকিনি।

অমায়িক হলধরদা সৌরভ সেনের গ্লাসে পানীয় ঢালতে ঢালতে বলে, তোমার সঙ্গে আমার তফাতটা কোথায় জানো ডিরেক্টার, তুমি বুইক গাড়ি থেকে ট্রামে নেমেছ, আর আমি বরাবর পা-গাড়িতেই চালিয়ে দিলাম, অবরে-সবরে ট্যাক্সি চাপি। তুমি বিলিতী থেকে ক্রমশ দু'নম্বরে নেমেছ, আমি চিরটা কাল ধান্যেশ্বরীর আরাধনা করেছি। তোমার সঙ্গে ঘুরত প্রজাপতির মত মেয়েরা, আমার এইসব ঘেঁটুফুলই ভাল।

সৌরভ সেন তাকিয়ে দেখল মিতা আর কবিতার দিকে। মিতাকে সে আগেও কয়েকবার দেখেছে। জিজ্ঞেস করল, ঐ মেয়েটি নতুন আমদানি বুঝি।

মিতা জবাব দেয়, ও আমার বন্ধু।

—তোমার তো খুব সাহস!

—কেন?

—নিজের বাবুর সামনে কেউ বন্ধু বার করে?

মিতা খিলখিল করে হাসল, কবিতা অন্য জাতের মেয়ে। এই কবু, তুই খাবি?

কবিতা কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল, এ পরিবেশের সঙ্গে সে মোটেই পরিচিত নয়, বলে, না, থাক; তোরা খা।

হলধরদা কিন্তু সে কথায় কান দেয় না, মন্তব্য করে, তাই কখনও হয়, এক যাত্রায় পৃথক ফল! যখন এ আসরে এসেছ, গেলাসে চুমুক দিতে হবে বইকি। তোমার বন্ধুটি তো আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খায়।

মিতা ইতিমধ্যে পান করতে শুরু করে দিয়েছিল। বলে, আমিও প্রথমটা পছন্দ করতাম না, তবে এখন—

সৌরভ সেন পাদপূরণ করে, ভাল লাগে।

মিতা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

—তা হলে দাওয়াই ধরেছে।

এসব আসরের মত্ততা যত বাড়ে, ততই নানারকম গুঞ্জন শোনা যায় চারদিকে, নানারকম আলোচনা। এক কোণায় বসে দু'জন উঠতি লেখক, একজন আর একজনকে ধন্যবাদ দেয়, ভাগ্যিস তুই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলি। এসব জীবন না দেখলে লিখব কি?

অন্যজনের উত্তর, আমি তো নিজের জন্যে ড্রিঙ্ক করি না, শুধু এদের সঙ্গে মেশবার জন্যে।

বলাই বাহুল্য, অন্যদের সঙ্গে কথা বলার অবস্থা তাদের দু'জনেরই তখন নেই।

—জানিস নির্মল, বাংলা সাহিত্যটা একেবারে জলো হয়ে গেছে, স্রেফ ছেঁদো কথায় ভর্তি। এখনও সেই ড্রইং রুম প্রেম, বিধবার মহত্ত্ব, ধনীর

ব্যভিচার, আদর্শবাদী নায়কের মুখে এলেবেলে বড় বড় কথা, ঘেন্না ধরে গেল।

নির্মলও সায় দেয়, সে তো তোকে আগেই বলেছি, সাহিত্যরথী মহা-রথীদের পিঁজরাপোলে না পাঠালে আর নতুন লেখা বেরুবে না। ওরা করছে কি, নিজেদেরই পুরোনো লেখা থেকে চুরি করছে।

—তুই এ নিয়ে প্রবন্ধ লেখ।

—কেউ ছাপবে না।

—তুই বক্তৃতা দে।

—কেউ শুনবে না।

—তাহলে—

অন্যজনের চিন্তিত স্বর, তাই তো ভাবছি।

—কি ভাবছিস?

ছেলেটি কোনরকমে চোখ দুটো খুলে রাখার চেষ্টা করে। জড়ানো গলায় বলে, কি ভাবছিলাম তাই তো ভাববার চেষ্টা করছি।

অন্যদিকে সৌরভ সেন হলধরদাকে পেড়ে ফেলেছে, তুমি কি করে ঘোড়া জেত, আমাকে দু-একটা টিপ্‌স ছাড়ো না।

হলধরদা ফিসফিস করে বলে, কাউকে যদি না বল তো বলতে পারি।

—এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, কাউকে বলব না।

—আমার একজন গণৎকার আছে।

এত নেশা করেও সৌরভ সেন না চমকে পারে না, গণৎকার! সে কি ঘোড়াদের হাত দেখে?

হলধরদা বুঝিয়ে দেয়, ঘোড়াদের কেন?—আমার হাত দেখে।

—তাহলে কি করে বুঝবে কোন ঘোড়া জিতবে, তুমি তো আর দৌড়বে না।

হলধরদা বিরক্ত হয়, আর খেও না, তুমি একেবারে মাতাল হয়ে গেছ, যা-তা বলছ।

সৌরভ সেন রুখে ওঠে, কে বলেছে আমি মাতাল হয়েছি! জান, গ্র্যাণ্ড, গ্রেট ইস্টার্ন, বম্বের তাজমহলে—

—হলধরদা সংশোধন করে দেয়, তাজমহল বম্বেতে নয়, আগ্রায়।

এইবার সৌরভ সেনের হাসবার পালা, হলধরদা তুমি আউট হয়ে গেছ, আমি বলছি তাজমহল হোটেল। কত ফিলিম আর্টিস্ট নিয়ে সেখানে ফুর্তি করেছি। সেসব কি দিন কেটেছে! হামেশা আউটডোর যাচ্ছি—আউটডোর মানে কি জান তো?

—কি?

—নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে আউটডোরের শ্যুটিং-এর নাম করে প্রোডিউ-সারের পয়সায় ক'দিন হৈহৈ করা। ছবি না তুললেও চলে, আর যদিও বা তোলা হয়, কেটে ফেলে দেওয়া হয় এডিটিং-এর সময়। এ লাইনে ঢুকতে গেলে মেয়েদের এই নজরানাটুকু দিতেই হয়।

হলধরদা উৎসাহ প্রকাশ করে, তাহলে চল ডিরেক্টার, আমরা আউটডোরে যাই। আমি প্রোডিউসার, তুমি নতুন মেয়ে যোগাড় কর, ঐ কথা রইল। ছবি কিন্তু আমরা তুলব না।

—কেন তুলব না! তোমার তো কত টাকা—

—উহুঁ, ফিলিম নয়, আমার সুন্দরীতে দরকার নেই, খেঁদী পেঁচীই ভাল।

অন্যদিনের তুলনায় মিতা বোধহয় আজ অধিক মাত্রায় পান করেছিল। তাই নেশা তাকে চেপে ধরেছে। সৌরভ সেনকে উদ্দেশ করে বলল, বাবুকে দিয়ে ছবি করাতে পারি, যদি আমাকে নায়িকা করেন।

সৌরভ সেন তাল ঠোকে, কেন করব না, কত নায়িকা আমি তৈরী করেছি, তোমাকেও করব। এখন চাই টাকা।

—বাবুর অনেক টাকা।

—নিকুচি করেছে, বাবুর টাকা তো আমার কি! ছবি করতে নামাও—

মিতা জোর দিয়ে বলে, ঠিক নামাব। আজ রাত্রেই কথা আদায় করে তবে ছাড়ব।

কবিতা এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল, কিন্তু মিতার চালচলন দেখে কেমন যেন বিস্মিত হলো, জিজ্ঞেস করল, তুই ঠিক আছিস তো?

মিতা খিলখিল করে হাসে, কেন, আমার কি হয়েছে?

—কিরকম যেন করছিস।

—কি আবার করব, আজ তো কিছুই খাইনি। কত দেরিতে এলাম, তবে একটু ঘুম পাচ্ছে।

কবিতা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তা হলে বাড়ি চল।

—বাবু কি এখন উঠবে?

—তা হলে কত রাত হবে আমাদের ফিরতে?

—কে জানে! বলেই মিতা কবিতার কোলে মাথা দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। বলে, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, তোরা যখন যাবি আমাকে ডেকে দিস।

হলধরদা মন্তব্য করে, তোমার বন্ধু খুব টেনেছে, তুমি আর একটু খাও।

কবিতা কঠিন হয়ে বলে, আমি এক ফোঁটাও খাইনি, মাটিতে ফেলে দিয়েছি।

—প্রথম প্রথম ওরকম সবাই ফেলে দেয়, তারপরে ঐ মিতার মত স্বর্গসুখ উপভোগ করে।

—চলুন আমরা যাই।

—যাব বইকি! মাঠের মধ্যে পড়ে থাকব নাকি, এর পরে পুলিস আসবে।

হলধরদা হাঁক দেয়, ওরে ও মকরধ্বজ, একটা ট্যাক্সী ধরে দে বাবা, এই মেয়েটাকে নিয়ে যেতে হবে।

ট্যাক্সীতে উঠে কবিতা বুঝতে পারল হলধরবাবু জাঁহাবাজ লোক। গাড়ির এক ধারে মিতাকে ধরাধরি করে বসিয়ে দেওয়া হলো। তখনও তার চোখ বন্ধ, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কি বলছে, মধ্যিখানে বসেছে কবিতা, তারই পাশে হলধরবাবু। লোকটা নির্লজ্জ। এমন অসভ্যের মত কবিতার গায়ে সে হাত দিচ্ছে যে, বিরক্তিতে তার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। বলে, কি করছেন?

ঘোড়েল হলধরদা মুখে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে, চুপ। সর্দারজী ড্রাইভার শুনতে পাবে।

গঙ্গার ধার থেকে সুদূর রাজাবাজার পর্যন্ত নিস্তব্ধ কলকাতার বুক চিরে ট্যাক্সী এগিয়ে চলেছে, ঠিক যেন খাঁচাওয়ালা পুলিসের গাড়ি। কবিতা ছটফট করছে, কিন্তু তার নামবার কোন উপায় নেই। একটা মাতাল পুরুষের লালসার থাবার মধ্যে তার যৌবনভরা শরীরটা। সামনে সর্দারজী আর তার সঙ্গী আয়নায় এদের ছবি দেখছে আর পাঞ্জাবী ভাষায় রসাল মন্তব্য করছে। রাতের কলকাতার সঙ্গে তারা অত্যন্ত পরিচিত।

তবু একসময় গাড়ি থামল।

রাজাবাজারের সেই পরিচিত অঞ্চল। দু'জনে ধরাধরি করে মিতাকে নিয়ে গেল তার ঘরে, দরজা খুলে খাটের উপর শুইয়ে দিতেই একতাল কাদার মত বিছানায় নেতিয়ে পড়ল।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হলধরদা জিজ্ঞেস করে, কি খাবে?

কবিতা উত্তর দেয়, কিছু না।

—রাত্রে খালি পেটে থাকতে নেই. আজ প্রথম মাল খেয়েছ—

কবিতা প্রতিবাদ করে, আমি খাইনি।

—তা হলে খাও। এ ঘরে সব সময় মজুত থাকে।

কথা বলতে বলতেই হলধরদা চৌকির তলা থেকে একটা প্যাকিং কেসের বাক্স বার করে চমকে ওঠে, ও মা, সব শেষ করে দিয়েছে। তোমার বন্ধুটিকে সাবধান করে দিও এত বেশী মাল খেতে নেই, শরীর খারাপ হবে। কিন্তু তোমাকে এখন কি খাওয়াই। দোকানগুলো সব বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে। তবে ঐ ঠোঙাটায় ডজনখানেক ডিম আছে, গরম জল করে সেদ্ধ করে নিই, কি বল?

—বললাম তো আমার খিদে নেই।

—তোমার খিদে না থাকলেও আমার তো খিদে আছে।

—আপনি বাড়ি যান না।

—এটাও তো আমার বাড়ি। রাত্তিরটা আমি এখানে থাকি। আজও থাকব। তোমার সঙ্গে, মিতা তো ঘুমুচ্ছে, ও কিছু বুঝতে পারবে না।

হলধরবাবুর শিকারী নেকড়ের মত চোখ মুখ দেখে কবিতা মেষশাবকের মত ভয় পায়। একবার মিতার দিকে ফিরে তাকায়, বেচারী সত্যিই বেহুঁশ। ওকে যদি কেউ কেটেও রেখে দেয়, ও বুঝতে পারবে না।

বিপদের মুখে পড়ে অনেক সময় মানুষের বুদ্ধি খুলে যায়। কবিতা হঠাৎ বলে বসল, মনে হচ্ছে, ঐ মোড়ের দোকানটা এখনও খোলা আছে, যেখানে কষা মাংস পাওয়া যায়!

—তাই নাকি? ক্ষুধার্ত হলধরদার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, করিম শেখের দোকান, কই দেখি। নিমেষের মধ্যে সে বারান্দায় বেরিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে কবিতা দরজায় শেকল লাগিয়ে দেয়।

ওপাশ থেকে বন্য জন্তুর গর্জন, দরজা খোল, দরজা খোল, আমার সঙ্গে শয়তানি! কিছুতেই আমি তোকে রেহাই দেব না। শেষ পর্যন্ত পুলিসে দেব পাজী ছুঁচো।

কবিতা তখন সমস্ত শক্তি দিয়ে কপাট দুটো ঠেলে দাঁড়িয়ে আছে, আর বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে, যদি তুমি সত্যিই থাক ঠাকুর, আমাকে এই মাতালটার হাত থেকে বাঁচাও। তুমি তো জান, আমি ভাল হতে চাই, সৎ থাকতে চাই।

সে প্রার্থনা কারুর কানে পেঁছল কিনা কে জানে!

॥ সতেরো ॥

গুরুজীর সঙ্গে সেদিন গঙ্গার ঘাটে আলাপ হবার পর অনাদিপ্রসাদ চেষ্টা করেছিলেন আগের অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যেতে। এক-আধ দিন তো নয়, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তিনি এক ধারায় জীবন কাটিয়েছেন। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী নিয়ে তাঁর ছোট্ট সচ্ছল সংসার। সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। আত্মীয়স্বজনেরা ঘনিষ্ঠ হতে চায়। স্বনামধন্য লেখক অনাদিপ্রসাদকে নিজেদের আত্মীয় বলে ঘোষণা করতে পেরে তারা গর্ব অনুভব করে। তাছাড়া অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব—কিছু স্তাবক। তার মধ্যে কয়েকজন গুণগ্রাহীও যে নেই তা নয়। প্রকাশককুল, পত্রিকার সম্পাদক, আরও কতজন।

সেই নিশ্চিন্ত জীবনে ফিরে যেতে দোষ কি?

অনাদিপ্রসাদ দু' দিনের জন্য রমলা বউদি আর ছেলেদের নিয়ে বেড়িয়ে এলেন কলকাতার কাছেই এক বন্ধুর বাগানবাড়িতে। উদ্দেশ্য ছিল ক'জনে মিলে অনাবিল আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। প্রথমটা ভালোই লেগেছিল কিন্তু পরে মনে হলো সবটাই যেন সাজানো, তার মধ্যে কোন প্রাণ নেই। ছেলেরা হয়তো খুশী হয়েছিল অনেক দিন পরে বাবাকে কাছে পেয়ে, কিন্তু কথা বলে আনন্দ পেল না। তাদের মনে হলো, অনাদিপ্রসাদ অনেক দূরে সরে গেছেন।

স্বামীর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে রমলা বউদি কিছু দিন থেকেই নানা দেবতার স্থানে পুজো মানত করছিল স্বামীকে আগের মত ফিরে পাবার আশায়। অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে তারও মনে হয়েছিল, পুজোও বোধহয় সার্থক হয়েছে; কিন্তু এক দিন বাদেই ভুল ভেঙ্গে গেল—পরিষ্কার বুঝতে পারলে, মানুষটার অনেক কিছু বদলে গেছে।

কথাটা উঠল বিকেল বেলা চা খেতে খেতে, সঙ্গে মুড়ি আর গরম চিনেবাদামভাজা।

রমলা বউদি ঠাট্টা করে বললে, কলকাতার বাড়িতে তো মুড়ি-টুড়ি খেতে চাও না, অথচ এখানে বাইরে এসে কত আনন্দে খাচ্ছ।

অনাদিপ্রসাদ হেসেই উত্তর দিলেন, আমি খেতে চাই না তা নয়, আসলে তোমরা দাও না।

—কেন?

—বোধহয় ছেলেদের পছন্দ নয়; কেক বিস্কুট ছাড়া কলকাতার ড্রইংরুমে আর তো কিছু দেখি না।

ছেলেরা আপত্তি তুলল, কেন আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ, আসলে মা বাজার থেকে আনায় না।

রমলা বউদি তখুনি উত্তর দেয়, বা, বা, চমৎকার, যত দোষ নন্দ ঘোষ, তোমরা খাও না বলেই আমি আনাই না।

অনাদিপ্রসাদ হো হো করে হাসেন, এ তো সেই ছড়ার মত হলো,

কেন রে নটে মুড়লি? গরুতে কেন খায়?
কেন রে গরু খাস? রাখাল কেন চরায় না।
কেন রে রাখাল চরাস না...ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ তো হলো আমাদের ভারতীয় চরিত্রের এবং সরকারের চার্টার। কাজ না করে কেমন্ করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো যায়, কিন্তু আসল কারণটা আমরা খুঁজে দেখি না।

ছেলেদের জিজ্ঞাসা, তোমার মতে কি কারণ শুনি?

অনাদিপ্রসাদ মৃদু হাসেন, কারণ সত্যি কথা কি জান, আমরা কেউ কাউকেই ঠিক জানি না, কে কি চায় বুঝি না। নিজেদের পছন্দমত জিনিস কিনি, খেতে দিই, ভাবি অন্যেরও পছন্দ হয়েছে। তোমরা যখন ছোট ছিলে তোমাদের অনেক কিছু আমি বুঝতে পারতাম, কিন্তু যত বড় হচ্ছ, যত তোমাদের বুদ্ধি হচ্ছে তোমাদের তত কম আমি বুঝতে পারছি।

রমলা বউদি রসিকতা করতে ছাড়ে না, কিন্তু আমার বেলা কি বলবে। বরাবর তো শুনে এলাম, ভগবান যখন আমায় তৈরি করেন বুদ্ধি জিনিসটা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন।

—যতদিন এ কথা বলতাম ততদিন কিন্তু তোমাকেও আমি বুঝতে পারতাম রমলা, কারণ তখন তোমার একটাই পরিচয় ছিল, তুমি আমার স্ত্রী।

—আর এখন?

—তোমার এখন কত পরিচয়, তুমি মা, দু' ধরনের দুটি ছেলে, দু'জনকে সামলে তোমার চলতে হয়। তুমি গৃহিণী, ঝি-চাকর নিয়ে সংসার চালাও। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়, পোস্টাফিসে কত টাকা রাখবে, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট খুলবে কিনা, গয়নার ভল্টের চাবি, তার হিসাবপত্র, তার উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত স্বামী বর্তমান। অতএব এতদিক সামলাবার জন্যে বুদ্ধি দরকার।

—কিন্তু তুমি তো বল আমার বুদ্ধি নেই।

—তার মানেই কোথাও থেকে তুমি বুদ্ধি ধার করছ, কার কাছ থেকে কত সুদে কে বলতে পারে? কিন্তু ধার যে দেয় সে সুদে-আসলে একদিন উশুল করে নেবেই। তাই তো বলছি রমলা, তুমি সেই আগের রমলা আর নেই, আর এই নতুন রমলাকে আমি পুরোপুরি চিনি না।

রমলা বউদি খুব খুশী হয় না, তোমার সব কথাতেই আজকাল বড় হেঁয়ালী।

অনাদিপ্রসাদ জোর দিয়ে বলেন, ভুল করলে, আজকাল সত্যি কথাটা বলি, আগে বলতাম না। এখন বুঝতে পেরেছি কাঁহাতক আর আপস করে চলা যায়! এইটুকু ভাবলেই আশ্চর্য লাগে নাকি, আমরা চারজন, আমাদের সম্পর্ক অতি নিকট, একই জায়গায় থাকি অথচ কেউই কাউকে ঠিক মত জানি না। এটা যদি সত্যি হয় তা হলে ভাবতো আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, যাদের চিনি মনে করে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াই তাদের কতটুকু জানি আমরা? সবটাই ধাপ্পা।

ছেলেরা আপত্তি করল, সবাই যদি এরকম চিন্তা করে তা হলে সমাজ বাঁচবে কি করে?

অনাদিপ্রসাদের পাল্টা প্রশ্ন, না বাঁচলেই বা ক্ষতি কি?

একসঙ্গে অন্যদের স্বীকারোক্তি, তোমার কথা আমরা বুঝতে পারছি না।

অনাদিপ্রসাদ হাত দিয়ে পায়ে তাল ঠুকে বলেন, এইটেই তো আজকের দিনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ভাব আদান-প্রদানের ভাষা হারিয়ে গেছে, নিজেদের কথা পরিষ্কার করে বলতে পারছি না বলেই পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি। সাহিত্যে, শিল্পে, নাটকে আর আগের ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে না, যে নতুন ভাষার প্রবর্তন হয়েছে তা অনেক সময় বুঝতে পারছে না দর্শক, পাঠক। তাই তো এ যুগ বিচ্ছিন্নতার যুগ, আমরা সবাই একা।

রমলা বউদির ভর্ৎসনা, এ আর নতুন কথা কি বললে?

—কথাটা নতুন নয়, পুরোনো। অনেক পুরোনো কিন্তু আগে বুঝিনি, এখন বুঝতে পারছি। সেইজন্যেই বোধহয় এখানে বেড়াতে এসে আমরা আনন্দ পেলাম না, এর চেয়ে কলকাতায় যে-যার নিজের মত থেকে জীবনটাকে অনেক বেশি উপভোগ করি।

ছেলেদের আবেদন, তা হলে চল কলকাতায় ফিরে যাই।

অনাদিপ্রসাদের ছোট্ট উত্তর, সেই ভাল।

কলকাতায় ফিরে এসেও অনাদিপ্রসাদ সহজে হাল ছাড়েননি। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি দেখা করতে গেছেন, সমাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, সকলেই তাঁকে পেয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেছে, সাগ্রহে কাছে টেনে নিয়েছে, কিন্তু তবু অনাদিপ্রসাদের মনে হয়েছে সেখানেও প্রাণ নেই, সব কিছু বাড়াবাড়ি লোক দেখানো। কোথায় সেই আগের আন্তরিকতা?

রমলা বউদিকে বলতে বাধ্য হয়েছেন, চল, এবার আমরা যাই।

রমলা বউদি তখন মেয়েমহলে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন, স্বনামধন্য লেখকের স্ত্রী, তার ওপর গল্পে রমলা বউদিকে পেয়ে মেয়েমহলের ছোটরা বড়রা ঘিরে বসেছে। এমন রসাল আসর ছেড়ে কি ওঠা যায়?

রমলা বউদির উত্তর, এখনও তো খাওয়া হয়নি।

—কেন, বাড়িতে রান্না করনি বুঝি?

—তা নয়, না খেয়ে গেলে এরা দুঃখ পাবে যে।

—কিন্তু আমার যে আর ভাল লাগছে না! অসহায় অনাদিপ্রসাদ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান। বুঝতে পারেন তাঁর যাবার ইচ্ছে এতটুকু নেই। তাই বলেন, তুমি বরং পরে যেও ছেলেদের সঙ্গে, আমি বাড়ি গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আত্মীয়রা চেপে ধরে, তাই কখনও হয়! বাড়িতে এমন কি কাজ আছে?

—একটা লেখা লিখছি, না শেষ করে চলে এসেছি কিনা, মনটা অস্থির হচ্ছে।

রমলা বউদি বুঝতে পারেন, এ কথা সত্য নয়। কারণ, অনাদিপ্রসাদ এখন কিছুই লিখছেন না।

আত্মীয়দের অনুরোধ, তা হলেও খানকয়েক মাছ ভাজা, দই মিষ্টি—

—রমলার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন, লিখতে লিখতে দিব্যি আরাম করে খাব।

একরকম জোর করেই অনাদিপ্রসাদ নিমন্ত্রণবাড়ি থেকে চলে এলেন। বাড়িতে কোন কাজ ছিল না, চাকর ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিতে গেল, তিনি বারণ করলেন। অন্ধকার ঘরগুলোর মধ্যে পায়চারি করছেন, আশপাশের বাড়িতে আলো জ্বলছে, নজরে পড়ছে কোন পড়ার ঘরে মাস্টার ছাত্রীকে পড়াচ্ছেন, কোন ঘরে খাটের ওপর বসে মেয়েরা তাস খেলছে, কোন ড্রইং রুমে কর্তাদের জোর তর্ক চলছে, বিষয় বোধহয় রাজনীতি। কোন বাড়ির ছাতে অন্ধকারে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, ভীরু প্রেমের অভিব্যক্তি সেখানে। মোড়ের চায়ের দোকানে ছেলেদের হুল্লোড়, দু' তিন বাড়ি থেকে রেডিওতে একই গান বাজছে। নাটকের খণ্ড-খণ্ড দৃশ্য, নির্বাক অভিনয়। দেখা যাচ্ছে কিন্তু শোনা যাচ্ছে না কিছু। অন্ধকার আকাশে তারারা জ্বলছে, রাস্তায় রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট, আরও দূরে কোথাও বিজ্ঞাপনের নিয়ন জ্বলছে নিবছে, হাতছানি দিয়ে শহরের লোককে বলছে, 'আমাদের সিগারেট সবচেয়ে ভাল।'

ওটা সিগারেটের বিজ্ঞাপন নাও হতে পারে, হয়তো চা, কফি, সেলাই-এর কল কিংবা আর কিছু, কিন্তু তাতে কি আসে যায়, ওর কাজ লোভ ধরানো, চোখ ধাঁধানো, বোকা বানানো। ও জ্বলছে নিভছে, আলোয় অন্ধকারে সবাইকে দোলাচ্ছে। এই তো শহরের সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন নির্বাক, কিন্তু প্রকাশক সুনীল রায় সবাক। ক'দিন আগে সে এসে অনাদিপ্রসাদকে ধরেছিল, নতুন বই দিন।

অনাদিপ্রসাদের নিস্পৃহ উত্তর, নতুন কিছু লিখিনি তো।

—এ কি ছেলেমানুষি আপনি করছেন, বাজার থেকে একবার সরে গেলে আর ফিরে আসা যায় না। ঠিক সময়মত নতুন বই-এর যোগান দিয়ে যেতে হয়। আরে মশাই খিদে পেলেই সবাই খাই-খাই করে, সে সময় যা পাবে তাই খাবে। বাজারে বেরিয়ে পাঠকরা যদি আপনার বই না পায়, অন্যদের বই কিনবে, নীরেস জেনেও কিনবে, কারণ তারা যে কিনতে বেরিয়েছে, খালি হাতে তো ফিরবে না।

অনাদিপ্রসাদ শুকনো হাসেন, আমি তার কি করব, লিখতে যখন পারছি না।

—বেশ তো, আউট অব প্রিন্ট হয়ে আছে এমন কোন পুরোনো উপন্যাস দিন, আমি নতুন নামে বাজারে ছেড়ে দিচ্ছি। দেখবেন হু হু করে কাটবে।

—সেকি? পাঠকরা বিরক্ত হবে না, একই লেখা দু' নামে—

—দূর মশাই, আপনিও যেমন, পাঠকরা কিছু পড়তে পেলেই হলো, অতশত ভেবে দেখে না আগে পড়েছে কি পড়েনি। কত লেখকের বই এই করে আমরা চালিয়ে দিলাম। প্রথম প্রকাশ যখন হয়েছিল তখন হয়তো একটা সংস্করণও কাটেনি, আর নতুন নামে বেরিয়ে বাজার মাত করে দিয়েছে।

—তা হলেও, ওসব আমি পারব না।

বিচক্ষণ প্রকাশক সুনীল রায় এবার অন্য প্রস্তাব রাখে, তা হলে এক কাজ করুন, এতদিন যা ছোট গল্প লিখেছেন তার একটা সংকলন বার করুন।

অনাদিপ্রসাদ জানান, সেরকম তো খান দুই বই ছাপা হয়েছে।

—তাতে কি হলো, এ বইটা আরও মোটা হবে আর নাম দেব 'অনাদিপ্রসাদের বাছাই বাছাই ছোট গল্প'। লেখার মধ্যে আপনাকে একটা ভূমিকা লিখে দিতে হবে। পনের থেকে বিশ টাকা দাম করব, স্রেফ চারটি এডিশনে আপনার হাতে বিশ হাজার টাকা তুলে দেব।

অনাদিপ্রসাদ বিরক্তি প্রকাশ না করে পারেন না, মাপ করবেন সুনীলবাবু, এসব প্রস্তাবে আমি রাজী নই। যদি নতুন ছোট গল্প লিখতাম তারও একটা মানে ছিল, এভাবে পাঠকদের ঠকাতে আমি পারব না।

সুনীল রায় ঘন ঘন মাথা নাড়ে, কে যে আপনার মাথায় কি বুদ্ধি ঢুকিয়েছে জানি না, তবে এ হলো একেবারে 'সুইসাইডাল'। আপনি যত বড় লেখকই হন না কেন পূজা সংখ্যায় আপনাকে লিখতেই হবে, যা হোক কিছু, উপন্যাস না পারেন, হয় গল্প, প্রবন্ধ, না হয় কবিতা। আপনি যে বেঁচে আছেন তার প্রমাণ রাখা চাই।

অনাদিপ্রসাদের অসহ্য মনে হয়, আমি মরে গেছি, আমি মরে গেছি, জানিয়ে দিন সবাইকে।

সুনীল রায় বোঝে এভাবে অনাদিপ্রসাদকে বাগে আনা যাবে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার উপদেশ দিতে শুরু করে, আমি বুঝতে পারছি আজকের এই বিভ্রান্তির যুগে আপনার মত চিন্তাশীল বিদগ্ধ লেখক কোন সমস্যা নিয়ে লিখবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। সেই জন্যে আমি বলছি কি আপনি বরং একটা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখুন, বেশি খাটাখাটনি করতে হবে না, ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে গিয়ে বসুন যে-কোন

পিরিয়াডের খানকয়েক বই ঘাঁটলেই একখানা বিরাট ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস বেরিয়ে আসবে। কারুর কিছু বলবার থাকবে না। আপনারও ভয় নেই, আজকের জীবন, আজকের রাজনীতি, তার উপর কোন মন্তব্য করতে হচ্ছে না।

অনাদিপ্রসাদের বিস্ময়, কেন? তার জন্যে ভয় কিসের?

—আহা, আজকের রাজনীতির ক্ষেত্র বড় গোলমেলে, কে কখন গদিতে বসবে, কেউ জানে না। ফস্ করে লেখকদের কিছু মন্তব্য করা ঠিক নয়! কেন মশাই ঝামেলায় যাওয়া! সত্যি কথা বলতে গিয়ে শেষে রবীন্দ্র পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় সম্মান কিছুই পাবেন না।

—তাই বলে মিথ্যে কথা লিখতে হবে?

সুনীল রায় বোঝাবার চেষ্টা করে, সেইজন্যেই তো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে বলছি। আজকের জীবন, আজকের সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারবেন।

তারপর গলাটা নামিয়ে বলে, আরে মশাই দেখুন না আজকালকার যত নামকরা লেখক, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তো এই ধরনের লেখা লিখছে, তাদের নামও হচ্ছে, বই-এর বিক্রিও বাড়ছে আবার সরকারী পুরস্কারও পাচ্ছে। আপনি অত সত্যি কথা বলব বলব করছেন কেন?

অনাদিপ্রসাদের দৃঢ় উত্তর, ওটা আমার স্বভাব। বোধহয় বদলাতে পারব না।

অগত্যা সুনীল রায় উঠে পড়ে, কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়ায়, হাজার দেড়েক টাকার একটা চেক এনেছিলাম। সেটা—

—কিসের জন্যে?

—নতুন লেখার জন্য অগ্রিম বায়না।

—মাফ করবেন, নিতে পারব না।

সুনীল রায় কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময় রমলা বউদির হাতে চেকটি ধরিয়ে দেয়, বউদি এটি রাখুন, দাদার জন্যে এনে-ছিলাম।

রমলা বউদি চেকটি হাতে নিয়ে হেসে বলে, এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল, এইবার ঠিক লিখবে।

—আপনি মাঝে-মাঝে একটু তাড়া দেবেন, অত হাল ছেড়ে দিলে চলে! আমি তো বলি, এরা হলো সেই জাতের হাঁস যারা সোনার ডিম পাড়ে। তোয়াজ করে রাখুন, ভাল ভাল খাবার খেতে দিন, মাছ মাংস, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে কোন টনিক—

—সে তো সবই করছি ভাই, ঠাকুরের কাছে মানতও করেছি, মনে হচ্ছে এতদিনে উনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন।

—নিশ্চয় শুনবেন, একখানা উপন্যাস মানে আপনাদের সারা বছরের খরচা। ছাড়বেন না, কিছুতেই ছাড়বেন না। জোর-জবরদস্তি করে লেখান।

চেকটা রমলা বউদির হাতে দিয়ে আসতে পারায় প্রকাশক সুনীল রায় অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে। গাড়ির সামনের কাঁচে ছবি ফুটে ওঠে রাজহাঁস ডিম পাড়ছে, সোনার ডিম।

কিন্তু এ স্বপ্ন বেশীক্ষণ টিঁকলো না, পাশের গাড়ির কর্কশ হর্নে, বিকৃত স্বর শোনাল রাজহাঁসের গলায়। সন্দেহ জাগল 'ডোনাল্ড ডাক' নয়তো?

আজকেও এ নির্জন বাড়ির বারান্দায় পায়চারি করতে করতে অনাদি-প্রসাদ হয়তো লক্ষ্য করতেন ঐ বিজ্ঞাপনের হাতছানি, ভাবতেন সর্বগ্রাসী দৈত্যটার কথা যে শুধু লোভ দেখিয়ে দুনিয়াটাকে রসাতলে পাঠিয়ে দিল।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

—কে?

—আমি মনুয়া কথা বলছি।

—কে মনুয়া?

—বাঃ, এরই মধ্যে ভুলে গেলেন। আপনার সঙ্গে ভিক্টোরিয়ায় দেখা হয়েছিল, তারপর মে ফ্লাওয়ার রেস্তরাঁয়।

অনাদিপ্রসাদের মনে পড়ে যায় মনুয়ার কথা, কি খবর, বল।

—খুব জরুরী দরকার আছে।

—হঠাৎ!

—আমার একজন গার্জেন দরকার।

—কিসের জন্যে?

—একটা চাকরি পেয়েছি, গার্জেনের অনুমতিপত্র না দেখালে ওরা নেবে না।

—আমি তার কি করব?

—আপনাকে আমার গার্জেন হতে হবে।

অনাদিপ্রসাদ যেন আকাশ থেকে পড়েন, সে কি করে হবে! আমি তোমাকে ভাল করে চিনি না, জানি না।

মনুয়ার সানুনয় অনুরোধ, সেসব আমি বুঝিয়ে দেব, আমি একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। এখন কি করছেন, একবার আসুন না 'মে ফ্লাওয়ার' রেস্তরাঁয়।

—সে কি, রাত প্রায় দশটা বাজে।

—তাতে কি হয়েছে, কলকাতার শহরে দশটা আবার রাত নাকি? যদি না পারেন কাল সকালে আসুন, দশটার মধ্যে। আমি এখানে বসে থাকব।

—আচ্ছা চেষ্টা করব।

মনুয়া অবুঝ, ওসব শুনছি না, আপনাকে আসতেই হবে। আমার গার্জেন বলে সই করতে হবে, নইলে—

—কি করবে?

—সে কথা আপনাকে বলব কেন? কিন্তু পরে দুঃখ পাবেন, পরশু দিন কাগজে জানতে পারবেন—

অনাদিপ্রসাদ হেসে ফেলেন, কি আবোল-তাবোল বকছ। ঠিক আছে, কাল আমি যাব।

মনুয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আঃ, আপনি বাঁচালেন, গুড নাইট।

—গুড নাইট।

॥ আঠারো ॥

মে ফ্লাওয়ারের কোণের দিকে ইংরাজী এল হরফের আকারে যে টেবিল-খানা পাতা থাকে, যেখানে স্বচ্ছন্দে ছ' সাতজন বসে খেতে পারে, যার ওপর সব সময় রিজার্ভ কার্ড লাগানো থাকে। সেইখানেই প্রতিদিন বসে মোহনচাঁদ। মোহনচাঁদ কোন প্রদেশের লোক তা বোঝবার চেষ্টা করবে শুধু বোকারা; কারণ ভদ্রলোককে সর্বভারতীয় আখ্যা দেওয়াই সমীচীন।

এক কথায় মোহনচাঁদ একজন বিজ্‌নেস্‌ ম্যাগনেট। সত্যিকারের চুম্বক, ব্যবসার লোহা যেখানেই পড়ে থাকুক না কেন মোহনচাঁদ রূপ চুম্বকের কাছে আপনা থেকেই এসে জোটে। ব্যবসা তার রক্তে। হেঁপো বাপের ছেলে যে রকম হাঁপানিতে ভোগে, ব্যবসায়ী মোহনচাঁদের ছেলেরা পেট থেকে পড়েই ব্যবসা করতে শেখে।

বাঙালী ব্যবসা করতে জানে না। শুধু আজকের দিনের কথা নয়, রূপকথার গল্প হাতড়ালে দেখা যাবে রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্রের আর এক বন্ধু ছিল সওদাগর পুত্র। কিন্তু সে ছেলেটি কোথায় হারিয়ে গেছে। সওদাগরী অফিসের কেরানী হয়েছে বাঙালী, কিন্তু সওদাগর হতে পারেনি। কর্নওয়ালিশ সাহেবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে বাঙালী জমিদার হয়ে বসল, নায়েব, গোমস্তা, মোসাহেব, প্রজা আর মেয়েমানুষ নিয়ে বড়-লোকমির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল, কিন্তু বিদেশী কুঠিয়ালদের সঙ্গে হাত

মিলিয়ে ব্যবসায় নামল না। বহু দূর থেকে এ কাজের জন্যে এল উমিচাঁদ-জগৎশেঠরা।

কংগ্রেসী রাজত্বে জমিদারি চলে গেল, কিন্তু ব্যবসায়ীদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত আরও পাকা হলো। ক্লাইভ স্ট্রীট-এর নাম বদলে রাখা হলো নেতাজী সুভাষ রোড, সাহেবের জায়গায় বাঙালী। কিন্তু ওটা শুধু নামেই, ক্লাইভ স্ট্রীটের সঙ্গে বিদায় নিল সওদাগরী অফিসের বিদেশী মালিকরা, কিন্তু সেখানে বাঙালী ঢুকতে পারল না। সেখানে চেপে বসল মোহনচাঁদের দল। ভারবাহী পশুর মত বাঙালী আগেও যা ছিল এখনও তাই—চিরন্তন কেরানী। তফাতের মধ্যে আগে বোবা ছিল, এখন দু চারটে স্লোগান শিখেছে, হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমাদের দাবি মানতে হবে।' কার দাবি, কে মানছে!

মোহনচাঁদের ব্যবসা ছড়ানো আছে সারা ভারতবর্ষে। কোন ভাই মাদ্রাজে, কোন ভাই বম্বেতে, কোন ভাই দিল্লী, এমন কি ছেলেরাও কলেজ থেকে বেরিয়ে এক একটা কোম্পানীর দায়িত্ব নেয়। কিন্তু মোহনচাঁদ বছরের বেশির ভাগ দিনই থাকে কলকাতায়। অফিস পাড়ায় সাজানো গোছানো বিরাট অফিস, কিন্তু মোহনচাঁদ সেখানে যায় না, ও বসে থাকে পার্ক স্ট্রীটের এই মে ফ্লাওয়ার রেস্তরাঁয়। রেস্তরাঁর মালিকরা মোহনচাঁদকে খদ্দের হিসেবে পেয়ে গর্ব অনুভব করে। কত ডাকসাঁইটে ধনী তার সঙ্গে দেখা করতে আসে এখানে। মোহনচাঁদকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি আর ব্যবসা দেখি না, ভাইরা দেখছে, ছেলেরা বড় হচ্ছে, আমি এখন অবসর নিয়েছি।

—তাহলে এখানে কি করেন?

—বসে থাকতে ভাল লাগে, কত লোকজন দেখি, কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে এইখানে ডাকি, খাওয়াই, গল্প করি, এই তো ভাল।

মোহনচাঁদকে রাগতে কেউ দেখেনি, প্রচন্ড বড়লোক অথচ অমায়িক ব্যবহার। রোজই ওর সঙ্গে দফায় দফায় বহু লোক খায়। মাসের শেষে কত হাজার টাকার চেক দেয় সে হিসেব তার অফিসের লোকেরাই জানে।

বিকেলে যখন টীন-এজারদের মত্ততা তখনও কিন্তু মোহনচাঁদ বিরক্ত হয় না। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ছেলে-মেয়েগুলোকে লক্ষ্য করে। অনেকেই তার মুখচেনা হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মনুয়া লাহিড়ীকেও লক্ষ্য করেছিল বহুজনের মধ্যে তাকে এককভাবে চিনে নেওয়া যায় বলেই। সেই মনুয়াকেই ক'দিন আগে যখন মোহনচাঁদ দেখল, মডেল হয়ে তারই মিলের শাড়ি পরে প্ল্যাটফরমের ওপর হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, তখন ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়েছিল মেয়েটি যেন তার সঙ্গে দেখা করে।

—কোথায়?

—মে ফ্লাওয়ারে, মেয়েটিকে আমি ওখানেই দেখেছি।

পরদিনই মনুয়া গিয়ে বসেছিল মোহনচাঁদের টেবিলে।

—আমাকে দেখা করতে বলেছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কাল ফ্যাশান প্যারেডে দেখলাম।

—আপনি ওখানে গিয়েছিলেন বুঝি?

মোহনচাঁদের ছোট্ট জবাব, যে মিলের শাড়ির প্রদর্শনী ছিল ওটা আমাদের।

এবার মনুয়ার চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে, ও তাই বুঝি! আপনি তো তা হলে মস্ত বড়লোক, আপনাকে এখানে রোজই দেখি, তখন জানতাম না—

—মডেল হয়েছো কেন?

—টাকা রোজগার করার জন্যে।

—চাকরি করলেই পার।

—পারি, কিন্তু ভাল চাকরি পাব কোথায়?

—কত মাইনে তুমি আশা কর।

মনুয়া কিছু না ভেবেই উত্তর দেয়, অন্তত পাঁচ শ' টাকা।

মোহনচাঁদ হাসে, কি পার?

—তার মানে? বরং জিজ্ঞেস করুন কি পারি না।

—তুমি খুব স্মার্ট।

—সেইজন্যেই তো পাঁচ শ' টাকা চাইছি।

—বেশ, তাই পাবে।

মনুয়া যেন আকাশ থেকে পড়ে, সত্যি আপনি আমায় চাকরি দেবেন?

—নয়তো কি আমি ঠাট্টা করছি!

—আমাকে কি করতে হবে? কোথায় অফিস?

মোহনচাঁদের সহজ উত্তর, যেদিন যা করতে হবে তোমায় বলে দেব। অফিস আপাতত মে ফ্লাওয়ার, হাজিরা সকাল দশটা, লাঞ্চের খরচ আমি দেব। কাজ না থাকলে লাঞ্চের পর ছুটি, আবার কোন কোন দিন হয়তো ডিনার পর্যন্ত থাকতে হতে পারে।

মনুয়া ইচ্ছে করে চোখ দুটো পিট পিট করে, আমি তো ভাবতে পারছি না, এরকম চাকরি আজকের দিনে পাওয়া সম্ভব।

মোহনচাঁদ তখনও কাজের ফিরিস্তি দিচ্ছে, প্রত্যেক শনিবার আমার সঙ্গে রেসকোর্সে যাবে, আমার পাঁচটা ঘোড়া আছে।

মনুয়া হাততালি দিয়ে ওঠে, উঃ কি থ্রীলিং!

—'বাটার কাপ'-এর নাম শুনেছ, ওটা আমার ঘোড়া।

—আমি কখনও রেসকোর্সে যাইনি।

—এখন থেকে যাবে, কি ভাবে বাজি ধরতে হয় শিখিয়ে দেব। আর যদি বরাতে থাকে, কে বলতে পারে, তুমি হয়তো জ্যাক্‌পট জিতে দশ টাকার বদলে লাখ টাকা পেয়ে যাবে।

—আমি আর ভাবতে পারছি না, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না তো! কবে থেকে 'জয়েন' করব?

—কাল থেকে। বলেই মোহনচাঁদ গম্ভীর হয়ে যায়, জিজ্ঞেস করে, তুমি নাবালিকা নও তো?

—কেন, তাতে কি হয়েছে?

—তা হলে অভিভাবকের অনুমতি চাই। নয়তো তোমাকে কাজ দিয়ে আমি বিপদে পড়ে যাব।

প্রথমটা মনুয়া থতমত খেয়ে যায়। বাবা তাকে চাকরি করতে দেবে না সে জানে, পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, অভিভাবকের অনুমতিপত্র আমি নিয়ে আসব।

মোহনচাঁদ আপত্তি তোলে, উঁহু, আমি তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে চাই।

মনুয়ার মনে হলো মুঠোর মধ্যে পেয়েও চাকরিটা ফসকে যাবার যোগাড় হয়েছে। তাই মরিয়া হয়ে মিথ্যে কথা বলল, বেশ, আমার মামাকে আমি নিয়ে আসব।

—তোমার বাবা নেই?

মনুয়া আরও বিপদে পড়ে, চোখ নামিয়ে বলে, আছেন, তবে আমাদের সঙ্গে থাকেন না।

—তোমার মা?

—মা অসুস্থ, তাঁর জন্যেই তো চাকরি করতে চাইছি। যদি বলেন, মার চিঠি নিয়ে আসতে পারি। আর যদি দেখা করতে চান মামাকে নিয়ে আসব। উনিই আমার গার্জেন।

—সেই ভাল।

তখন থেকে মনুয়া আকাশ-পাতাল ভেবেছে কিন্তু কাকে মামা বলে খাড়া করবে বুঝে উঠতে পারেনি। ওর বন্ধুবান্ধব সকলেই অল্প বয়েসী, আত্মীয়-স্বজনরা ওকে ভাল চোখে দেখে না, বেশী বয়েসী লোকেদের মনুয়া সচরাচর এড়িয়ে চলে। একমাত্র ব্যতিক্রম অনাদিপ্রসাদ। সেইজন্যেই ফোন করে তাঁকে অনুরোধ করেছিল মনুয়ার গার্জেন হবার জন্যে।

কথামত পরদিন অনাদিপ্রসাদ হাজির হলেন মে ফ্লাওয়ারে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। তখনও রেস্তরাঁয় ভিড় হয়নি, শুধু মোহনচাঁদের টেবিলে জন

চারেক লোক বসে। মনুয়াও ওদের কাছে বসে কাপে কফি ঢালছিল, অনাদিপ্রসাদকে দেখতে পেয়ে খুশিতে ঝলমল করে উঠল। মোহনচাঁদকে বলল, ঐ আমার মামা এসে গেছেন, আমি নিয়ে আসছি।

দেখা হতেই অনাদিপ্রসাদের প্রশ্ন, জরুরী তলব কেন, কি হয়েছে?

মনুয়ার চোখে দুষ্টুমিভরা হাসি, সব পরে বলছি, এখন চলুন, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। বেশি কথা বলতে হবে না, যা জিজ্ঞেস করবে হ্যাঁ বলবেন।

—না বাবা, আমি মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

—কিচ্ছু বলতে হবে না, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

মনুয়ার সঙ্গে অনাদিপ্রসাদকে দেখে মোহনচাঁদ হাত তুলে নমস্কার করে, নমস্কার, বসুন। মনুয়া আপনার কথা বলছিল।

অনাদিপ্রসাদ অস্বস্তি বোধ করেন, জানতে ইচ্ছে করে, মনুয়া কি বলছিল; কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারেন না।

মনুয়া কিন্তু সপ্রতিভ, বলে, আপনার কথামত ওঁকে ফোন করে আনিয়েছি।

মোহনচাঁদ স্মিত হাসে, মনুয়ার বয়েস কম হলে হবে কি, খুব চালাক। মনে হয়, কাজে ঢুকলে খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করবে। তবে খাটতে হবে।

অনাদিপ্রসাদ শুধু বলেন, তা তো বটেই।

—আমাদের ফার্মে অনেক মেয়ে কাজ করে, ছেলেদের চাইতে কোন অংশে তারা কম নয়। তাছাড়া কথা শোনে। মনুয়াকে 'ট্রায়াল বেসিসে' তিন মাসের জন্যে এখন আমরা নিচ্ছি, পরে চাকরি পাকা হয়ে যাবে। ও নিজেই পাঁচ শ' টাকা মাইনে চেয়েছে, আমি তাইতেই রাজী হয়েছি।

একটু থেকে মোহনচাঁদ জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম?

—অনাদিপ্রসাদ চৌধুরী।

—কোথায় থাকেন?

—বালিগঞ্জে। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে অনাদিপ্রসাদ মোহনচাঁদের দিকে এগিয়ে দেন।

আর কথা বলার সুযোগ হলো না, বয় এসে জানাল, মোহনচাঁদের টেলিফোন এসেছে। উনি উঠে গেলেন।

মনুয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল, অনাদিপ্রসাদকে বলল, চলুন আমরা অন্য টেবিলে গিয়ে বসি।

অনাদিপ্রসাদ কিছুই বুঝতে পারেন না, কই কথাবার্তা তো কিছু হলো না।

—ঐ যথেষ্ট হয়েছে, আপনি আসুন তো। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

অনাদিপ্রসাদ রেস্তরাঁর মাঝামাঝি একটা টেবিলে বসতে যাচ্ছিলেন,

মনুয়া বাধা দেয়, এখানে নয়। রোজ রোজ খেয়ে মুখে অরুচি হয়েছে, তার চেয়ে চীনে রেস্তরাঁয় যাওয়া যাক।

মনুয়া ইচ্ছে করেই অনাদিপ্রসাদকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেল পাছে মোহনচাঁদ টেলিফোন সেরে ফিরে এসে আরও পাঁচটা প্রশ্ন করে বুঝে ফেলে যে, অনাদিপ্রসাদ তার সাজানো মামা।

কেবিনের মধ্যে ঢুকে মনুয়ার উচ্ছ্বাস, মাসে মাসে পাঁচ শ' টাকা মাইনে, কম কথা! বাবার কাছে আর হাত পাততে হবে না।

অনাদিপ্রসাদ শঙ্কিত হন, তোমার বাবা যদি রেগে যান?

—আমার বয়ে গেল।

—তোমার বয়েস কত?

—'মেজর' হতে আর মাস কয়েক দেরি আছে। তার মধ্যে বাবা এ চাকরির হদিসই পাবে না।

—কাজটা কি?

—কে জানে!

অনাদিপ্রসাদের চিন্তা আরও বাড়ে, তুমি ছোট মেয়ে, কিছুই না জেনে-শুনে শেষকালে কার পাল্লায় গিয়ে পড়বে।

মনুয়া খিল খিল করে হাসে, সে ভয় নেই, তবে ঐ ভদ্রলোক আমার পাল্লায় পড়তে পারেন।

—কি রকম?

—যে রকম আপনি পড়েছেন।

—সে আবার কি?

—ফোন করলেই আমার কাছে আসেন, আমি কিছু অনুরোধ করলে সেটা রাখেন।

অনাদিপ্রসাদ হাল্কা হবার চেষ্টা করেন, এসব তোমার পাল্লায় পড়ে করি না।

মনুয়ার চোখে পাখীর দুষ্টুমি, তা হলে কেন করেন? আমি যদি সুন্দরী না হতাম তা হলেও করতেন? আমার বয়েস যদি উনিশ-কুড়ি না হতো তা হলেও করতেন?

—স্বীকার করছি তোমার সঙ্গে কথায় আমি পেরে উঠব না।

—আর যা স্বীকার করছেন না তা হলো—আপনি আমাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চান। কারণ আপনার কোন মেয়ে বন্ধু নেই।

অনাদিপ্রসাদ এবার জোরে জোরে হাসেন, এরকম তরুণী বন্ধু নিয়ে ঘুরলে অনেকেই কিন্তু আমার ভাগ্যকে ঈর্ষা করবে।

প্রসঙ্গ পাল্টে মনুয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আপনি কি বই লেখেন?

—কে বললে?

—সেদিন মে ফ্লাওয়ারে কয়েকজন ছেলেমেয়ে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিল, আপনার নামটা শুনে আমার কান ঐ দিকে গেল।

অনাদিপ্রসাদের কৌতূহল জাগে, কি, গালাগাল করছিল?

—ওদের মতে আপনি পপুলার রাইটার। কি লেখেন? উপন্যাস? একটা নাম বলুন, আমি পড়বার চেষ্টা করব।

অনাদিপ্রসাদ এড়িয়ে যান, কি দরকার?

ওদিকে মে ফ্লাওয়ারে মোহনচাঁদ টেলিফোন সেরে ফিরে এসে মনুয়াকে খুঁজেছিল কিন্তু দেখতে পেল না। একদিক থেকে সে খুশীই হলো, অপেক্ষমাণ লোকগুলির সঙ্গে এই ফাঁকে সে ব্যবসার কথা সেরে নিতে পারবে।

মোহনচাঁদ চেয়ারে বসে কথা আরম্ভ করে, বলুন কি সেবা করতে পারি।

অন্যরা কৃতার্থ হয়ে হাসে, হেঁ, হেঁ, আপনার ভাই পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে কথা বলে সব পাকা করে ফেলতে হবে।

—আমি তো ওসব কাজ আজকাল দেখি না, তবে যা বলছেন তা হতে পারে। নেপালে আমাদের অফিস আছে। এখানকার বাজার থেকে যদি চাল তুলে নেওয়া যায়, তা হলে পশ্চিম দিনাজপুরে ইসলাপুর কিংবা বিহারের কিষণগঞ্জ দিয়ে ভারতের সীমানা পার করে নেপালে স্টক করা যেতে পারে।

অন্যেরা সায় দেয়, ঠিক তাই, পরে এখানে যখন চাল আক্রা হবে, বাজারে পাওয়া যাবে না, তখন 'নেপালী চাল' বলে আমরা ভারত সরকারকে বিক্রি করব। মোটা প্রফিট্।

—ঠিক আছে ভাই, আমার ভাই-এর সঙ্গে কথা বলুন। ও যখন নর্থ বেঙ্গলে রয়েছে ঐদিকটা ওই সামলাবে। আমি বলে দেব ওখানকার এম. এল. এ-র সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রাখবে।

অন্যরা সাবধান করে দেয়, নতুন এম. এল. এ. সুবিধের লোক নয়, তিলে খচ্চর। কারুর কথা শোনে না।

মোহনচাঁদ-এর মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে ওঠে, সে যেই হোক আমাদের পোষা মাল।

—কি রকম?

—আরে ভাই ব্যবসা চালাতে গেলে এম. এল. এ, এম. পি, পুষতে হয়, একেবারে প্রথম থেকে। মনে করুন একটা সিটের জন্য তিন পার্টির তিনজন লোক দাঁড়াল। ইলেকশানের সময় আমরা তিন ব্যাটাকেই চাঁদা দিই, গাড়ি দিই। এক ভাই যায় কংগ্রেসীর কাছে, আর এক ভাই যায় কংগ্রেস ভেঙ্গে যে নতুন দল করেছে তার কাছে, আবার ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দিই ঝাণ্ডাওয়ালাদের কাছে। ফলে যে ইলেকশান জেতে সেই আমাদের লোক। দরকারের সময়

গলায় চেনটি দিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ নিয়ে আসি। আমাদের হয়ে সরকারের কাছে তদবির করার জন্যে। আরে বাবা, এই করেই তো রাজত্ব চলছে।

অন্যরা অবাক হয়ে মোহনচাঁদের কথা শুনছিল, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে, সত্যিই, এ না হলে ব্যবসা চলে! কি বুদ্ধি! তাহলে স্যার, আপনার 'ব্লেসিং' নিয়ে আমরা চাল মজুত করতে শুরু করে দিই। একেবারে ভেল্কি দেখিয়ে দেব। ক'দিন বাদে নেপালের চাল বলে যখন বাজারে ছাড়ব। কারুর ধরবার ক্ষমতা থাকবে না। একই মাল ট্রেনে ক'বে চক্কোর দিয়ে এল।

নিজেদের রসিকতায় তারা নিজেরাই হাসে।

ঠিক এমনি সময় মে ফ্লাওয়ারের আর এক কোণ থেকে তীক্ষ্ণ বামা কণ্ঠ শোনা গেল, ববি কোথায়? কেন তাকে লুকিয়ে রেখেছো?

প্রশ্ন করছে রত্না কুশারী, আজ তার রুদ্রমূর্তি।

—আমি ববির কোন খবর রাখি না, ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয় ব্যারিস্টার কে. জি-র শালী।

—তুমি খুব জান, তুমি ডাকিনী, নিজের বোনকে মেরেছো, কে. জি-র সর্বনাশ করেছো, এবার ববিটাকে উচ্ছন্নে পাঠাবে।

—শাট্ আপ! বলে মেমসাহেবী কায়দায় কে. জি-র শালী উঠে পড়ে গটমট করে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল।

তখনও কিন্তু রত্না কুশারী চেঁচাচ্ছে, ববিকে আমি ভালবাসি। তার ক্ষতি হতে আমি দেব না, যেখান থেকে হোক তাকে আমি খুঁজে বার করব।

চেঁচামেচি শুনে ম্যানেজার ছুটে যায় ভদ্রমহিলার কাছে, চাপা গলায় বলে, প্লীজ মিসেস কুশারী, আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

—কি করব, আমি কি করব! বলতে বলতে রত্না কুশারী চেয়ারের ওপর বসে পড়ে, অস্ফুট স্বরে ডাকে, ববি, ববি, ববি।

ঠিক মনে হলো, অতি সাধের হরিণশিশু হারিয়ে ভরত মুনি যেন কাতর কণ্ঠে ডাকছেন, আয়, আয়।

অবশ্য ম্যানেজারের বুঝতে বাকি রইল না রত্না কুশারী বেহেড্ মাতাল, সারারাত্রির পর বোধহয় এই সকাল পর্যন্ত অবিরাম মদ খেয়েছে। যার নতুন কিছু পাবার নেই তার শেষ সম্বল অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে চাইছে, তারই প্রকাশ এই বুকফাটা কান্নায়, অথচ কেউ তার দাম দেবে না।

॥ উনিশ ॥

সেদিন মে ফ্লাওয়ার রেস্তরাঁ থেকে রত্না কুশারীকে সহজে বাড়ি পাঠানো যায়নি। সে টেবিল আঁকড়ে বসে ছিল, ববির নাম ধরে চীৎকার করে ডেকেছিল, অবুঝ বালিকার মত কেঁদেছিল। হোটেলের কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছিল, ববিকে টেলিফোনে ধরতে, পারেনি। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে খবর দিয়েছে বেসরকারী সওদাগরী অফিসের ডিরেক্টার মিঃ কুশারীকে, স্ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মিঃ কুশারী মে ফ্লাওয়ারে এলেন। নিখুঁত স্যুট, স্ট্রাইপ্‌ড্ টাই, মুখে পাইপ, চকচকে কালো জুতো, কপালের দু'পাশে সাদা চুল, পালিশ করা চেহারা, আভিজাত্য ঠিকরে পড়ছে। কারুর দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলেন স্ত্রীর কাছে। ডাকলেন, রত্না, বাড়ি চল।

রত্না কুশারী প্রথমটা শুনতে পায়নি, তারপর আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকাল। কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে ফ্যাল্‌কা হাসল, কি ব্যাপার, তুমি এখানে?

—তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—এত দয়া? আজকাল তো কোথাও নিয়ে যাও না!

—এখান থেকে আমায় ফোন করেছিল। মিঃ কুশারীর গলার স্বর কঠিন, ছি, ছি, লজ্জা করে না, তোমার জন্যে অফিস ছেড়ে এইখানে আসতে হলো, গেট্ আপ্।

—আমি উঠব না।

—এটা একটা সস্তার রেস্তরাঁ, কত রকম লোক—

—তাতে কি হয়েছে, তোমাকে তো আমি ডাকিনি, তুমি চলে যাও। ববিকে না নিয়ে আমি যাবো না।

মিঃ কুশারী নিজেকে অসহায় বোধ করলেন। বুঝতে পারছেন, অন্যরা সবাই বিনা পয়সার নাটক দেখছে, অথচ কিই বা করা যায়।

—তাহলে তুমি যাবে না?

রত্না কুশারীর কি খেয়াল হলো, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে, বলল, যেতে পারি, যদি আমাকে তোমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাও।

মিঃ কুশারীর চোখে মুখে বিরক্তি, আমার ফ্ল্যাটে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ফ্ল্যাটে। রত্না কুশারীর জড়ানো গলার স্বর, যেখানে সেই মেয়েমানুষটাকে রেখেছ, যাকে নিয়ে বম্বে-দিল্লি উড়ে বেড়াও, যার সঙ্গে রেসকোর্সে যাও, যার বিছানায় রাত কাটাও, তার কাছে আমায় নিয়ে চল।

এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় ভেবে মিঃ কুশারী রাজী হলেন, বেশ, তাই চল।

রত্না কুশারীর বিশ্বাস হয় না, ঠিক বলছো?

—বলছি তো।

—যদি সেখানে নিয়ে না যাও, আমি কিন্তু গাড়ি থেকে নামবো না।

—ঠিক আছে, চল।

রত্না কুশারী উঠে দাঁড়াল কিন্তু চলতে পারলো না, স্বামীর কাঁধের উপর তার দেহটা নেতিয়ে পড়ল। রেস্তরাঁর ম্যানেজারের সাহায্য নিতে বাধ্য হলেন মিঃ কুশারী; দুজনে মিলে ধরাধরি করে কোনরকমে রত্না কুশারীকে রেস্তরাঁ থেকে বার করে নিয়ে গেল।

এ দৃশ্য দেখে হয়তো অনেকে হাসল, অনেকে বিদ্রূপ করল; কিন্তু তারা বুঝল না, আজকের নগরকেন্দ্রিক সভ্য সমাজে বাস করার এ এক নিদারুণ ট্র্যাজেডী। যতদিন চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে ততদিন মানুষ মানুষের মত বাস করে, মান আর হুঁশ দুটোই বজায় থাকে; কিন্তু যাদের জীবনে পাওয়ার মাত্রা বাড়তে থাকে, আর নতুন করে চাইবার কিছু থাকে না তারা তখন বাস করে এক কৃত্রিম জগতে। এই রত্না কুশারীরা সবাই যে মুখে রুপোর চামচে নিয়ে জন্মেছে তা নয়, কিন্তু এদের ওপর ভগবানের অভিশাপ, এরা যা চেয়েছে তার চেয়ে বেশী পেয়েছে। কুমারী রত্না কুশারী শিবপুজোর অছিলায় চেয়েছিল এমন বর যার নাম করলেই সমাজের লোক চিনতে পারবে। শিবঠাকুর অন্য মেয়েদের প্রার্থনা শুনেছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু রত্না কুশারীর সত্যিই ডাকসাঁইটে বর জুটল। তার জন্যে বেশী কাঠখড় পোড়াতে হয়নি, মিঃ কুশারী নিজে থেকেই যেচে রত্নাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, দাবিদাওয়া কিছুই ছিল না। বিয়ের রাত্রে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই কোরাসে বলল, কি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল রত্না, নয়তো এমন বর পায়!

এ তো জীবনের শুরু। শাড়ি, বাড়ি, গাড়ি, মেয়েদের যা স্বপ্ন তা বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছিল, চাইতে হয়নি। প্রতি বছর দু'বার করে চেঞ্জে যাওয়া, বিলাত আমেরিকা সফর, ঘরে বাইরে বড় বড় পার্টি। কিন্তু তারপর?

এর উত্তর কে দেবে। এমন একটা জায়গায় রত্না কুশারী গিয়ে পৌঁছল যখন আর চাইবার কিছু নেই। সোশ্যাল ওয়ার্ক, শুকনো [illegible]র, মিথ্যে বাহবা, আর কিছুই ভাল লাগে না। এসব মেয়েমানুষের পেছনে অনেকরকম পুরুষ জোটে। রত্নার কপালেও জুটল, ক'দিন মাছি ভনভন করল, মদ আর দেহের উত্তেজনায় কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল রত্না বুঝতে পারল না।

বুঝল যে রাত্রে প্রথম সে বাড়ি ফিরল না। ভেবেছিল তার জন্যে মিঃ কুশারী দুর্ভাবনায় রাত্রে ঘুমতে পারবে না, হয়তো পুলিসে খবর দেবে;

কিন্তু পরদিন বাড়ি ফিরে যখন শুনল সাহেব একবারও রত্নার খোঁজ করেনি, অভ্যাসমত ব্রেকফাস্ট সেরে অফিস করতে চলে গেছে, রাগে-দুঃখে সে জ্বলে উঠল। তখুনি টেলিফোন করল অফিসে।

—হ্যালো, আমি রত্না কথা বলছি।

মিঃ কুশারীর এক কথার জবাব, বল।

—আমি কাল রাত্রে আটকে গিয়েছিলাম পিসিমার বাড়ি, টেলিফোনটা খারাপ ছিল তাই তোমায় খবর দিতে পারিনি। তুমি রাগ করনি তো?

মিঃ কুশারীর অত্যন্ত সহজ উত্তর, ওমা, আমি জানতাম না তুমি বাড়ি ফেরনি। আমি ক্লাব থেকে ফিরেছি দেরিতে, সানিদের সঙ্গে খেয়ে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছি। ব্রেকফাস্ট টেবিলে তোমাকে না দেখে ভাবলাম বোধহয় ঘুম থেকে ওঠনি, তাই আর বিরক্ত করিনি। আজকেও আমার ফিরতে একটু দেরি হবে ডার্লিং। একটা স্ট্যাগ্ পার্টি আছে। কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বাই, বাই।

রত্না কুশারী বাই-বাইও বলতে পারেনি। এই প্রথম সে বুঝতে পারল, পাওয়ার স্রোতে সে ভেসে গেছে, আর তার কিছুই চাইবার নেই জীবনে। স্বামীকে এড়িয়ে পুরুষসঙ্গ চেয়েছিল, তা এত পেয়েছে যে, এখন আর তার মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই। কোন দিন ভাবতেও পারেনি স্বামীর দিক থেকেও আকর্ষণ ক্রমশঃ কমে আসছে। দুজনেরই এখন বয়েস হয়ে গেছে, মিঃ কুশারী চান রত্না কিছু নিয়ে ভুলে থাকুক, তাঁকে বিরক্ত না করলেই হলো। আর রত্না কি চায় তা সে নিজেই জানে না। কিছুদিন ববিকে আঁকড়ে ধরে ভেবেছিল কিছুটা শান্তি পাবে, পরে বুঝতে পারল কিছুই নয়, আলেয়া। আজ সে মাতাল, চরিত্রহীন, সব সত্যি, কিন্তু কিসের জন্যে। সমাজের যে স্তরে চাওয়ার চেয়ে পাওয়ার যোগান বেশি সেই স্তরের ছেলেরা মেয়েরা এই ভাবেই নৈরাশ্যের হাঁড়িকাঠে বলি হয়—রত্না কুশারীর জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়।

গাড়িতে ওঠার পর রত্না কুশারী কিন্তু আর কোনরকম দাপাদাপি করেনি। গাড়ির ঝাঁকানিতে ক্রমশ সে ঝিমিয়ে পড়ে, বোধহয় শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে যে জন্যে বাড়িতে পেঁছে দারোয়ান বেয়ারাদের সাহায্য নিয়ে রত্নাকে ওপরের বিছানায় শুইয়ে দিতে অসুবিধা হয়নি।

তখনকার মত হাঁক ছাড়লেও মিঃ কুশারী বুঝতে পেরেছিলেন, বাচ্চাদের ভুলিয়ে ঘুম পাড়ালেও ঘুম থেকে উঠেই তারা কাঁদতে শুরু করে যদি না মুখে চুষিকাঠি ভরে দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া যায়। রত্না কুশারীরও চুষিকাঠি দরকার, কারণ, মায়ের দুধের যোগান দিতে তিনি নিজে অপারগ, সে স্পৃহা তাঁর নেই। অগত্যা ববি চুষিকাঠিকে খুঁজে বের করতেই হবে।

ববির বাড়ি ড্রাইভাররা চিনত। মিঃ কুশারী নিজে গেলেন তার সঙ্গে

দেখা করতে। তখনও ববি ঘুমচ্ছে, বেরিয়ে এল তার মা।

মিঃ কুশারীর ঘোষণা, আমি ববির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—সে শুয়ে আছে।

—আমার বিশেষ দরকার।

—ডেকে দেখি।

—বলুন, মিঃ কুশারী কথা বলতে চায়! এ নামটা ববির মার অনেকবার শোনা! গাড়িটা অচেনা নয়। এই গাড়ি করে রাতে যতদিন ববি বাড়ি ফিরেছে তার কোটের পকেট থেকে সে কুড়িটা করে ঘুষের টাকা পেয়েছে। কিছুদিন হলো সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। ছেলেকেও এর কারণ পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করতে পারেনি, তাই এই অপরিচিত ভদ্রলোকের আগমনে হঠাৎ তার মনে হলো ভাগ্য বোধহয় প্রসন্ন, আবার হয়তো ঘুষের টাকা পাওয়া যাবে। সদা ব্যস্ত কলকাতার শহরে হাজার রকম শব্দের মাঝখানে ববির মা পরিষ্কার শুনতে পেল ঝন ঝনে রুপোর টাকার আওয়াজ।

ব্যস্তভাবে মিঃ কুশারীকে বসতে দিয়ে ভদ্রমহিলা ডাকতে গেল ববিকে। মিঃ কুশারী তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকটা দেখে নিয়ে বুঝে নিলেন এদের আর্থিক অবস্থা। এদের কিনতে বেশি পয়সা লাগে না, একটু বাহবা, কিছু নেশা আর কতকগুলো টাকা, ব্যস, তাহলেই গলায় চেন লাগিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রেখে দাও। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ল্যাজ নাড়বে, আবার লেলিয়ে দিলে ভৌ ভৌ করে চীৎকার করে অন্যদের ভয় দেখাবে।

ঘুমজড়ানো চোখে ববি উঠে এল। হাসবার চেষ্টা করে বলল, কি খবর মিঃ কুশারী? আপনি নিজে এলেন আমার কাছে! একটা খবর পাঠালেই পারতেন, আমি যেতাম।

মিঃ কুশারীও শুকনো হাসলেন, তুমি যাচ্ছ না বলেই তো আমায় আসতে হলো। বোধহয় তুমি জান না আমার স্ত্রী অসুস্থ।

—কেন, কি হয়েছে?

—নতুন করে তোমাকে আর কি বোঝাব। আমার মনে হয় তোমার অভাব ওকে পীড়িত করছে।

ববি চুপ করে কি যেন ভাবল, বলল, আমি কি করতে পারি বলুন?

—তুমি আগের মত আমাদের বাড়িতে এস, রত্নাকে নাচ শেখাও। ওর সঙ্গে রাত কাটাও কথাটা বলতে বোধহয় মিঃ কুশারীর রুচিতে বাধল।

এবার ববির স্পষ্ট উত্তর, কি করে তা সম্ভব হবে! একসময় আমি যেতাম, সে তো আপনি জানেন। মাঝখানে আপনার স্ত্রী কোথাও উধাও হয়ে গেলেন। সেই সময় আর একজন নতুন ছাত্রী আমি নিয়েছি, এখন তাকে কি বলব?

—কে তিনি, জানতে পারি কি?

—ব্যারিস্টার কে. জি-র শালী, অনুভা।

আর বলতে হলো না, নাম করা সোসাইটি স্ক্যান্ডাল-এর নায়িকা অনুভাকে কে না চেনে! তার নিত্য নূতন বব চুলের ফ্যাশান আজও বহু নবীনাকে অনুপ্রাণিত করে। ব্লাউজের কাট, শাড়ির পাড়, মুখের মেকআপ, লিপ্‌স্টিকের রং, ভুরু আর টিপের বৈচিত্র্য মেয়েমহলে আলোচনার বিষয়। সেই অনুভার খপ্পরে পড়েছে ববি, তার কাছে রত্না কুশারী তো ছেলেমানুষ।

মিঃ কুশারীর চিন্তিত স্বর, তোমাকে যে রত্নার প্রয়োজন!

ববি হাসল, অনুভার প্রয়োজনও তো ঠিক ততটাই।

—তা হলেও আমি বলব, সময়টা ভাগ করে নাও।

—কোন সময়? সন্ধ্যা নিয়েই তো মারামারি, দিনের বেলা আমি ঘুমোই।

মিঃ কুশারী বুঝতে পারলেন ববিকে বুঝিয়ে পেরে ওঠা যাবে না, ও চড়া দামে নিজেকে ভাঙাতে চায়। তাই সরাসরি কথা পাড়লেন, কত টাকা হলে তোমার পোষাবে?

ববি চোখ তুলে তাকাল, তার মানে?

—কত টাকা দিলে কে. জি-র শালীকে ছেড়ে তুমি রত্নার কাছে ফিরে আসবে? তোমার ডিউটি হবে তাকে খুশী রাখা, দরকার হলে চেঞ্জে যাবে, যেখানে রত্না যেতে চায় নিয়ে যাবে, তার সব খরচা আমি দেব।

ববির অজান্তে তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

মিঃ কুশারী বুঝতে পারেন দাওয়াই ধরেছে। বললেন, এই হচ্ছে তোমার রোজগার করার সময়, শরীর আছে, চেহারা আছে। টাকাওয়ালা অনেক মেয়েই তোমায় চাইবে। যেখানে বেশি পাবে নিয়ে নাও, কারণ তোমাদের তো কোন সেণ্টিমেণ্টের বালাই নেই। রত্নাকে তুমি ভালবাস না আমি জানি, অনুভাকেও না। সে স্টেজ ওরা পেরিয়ে গেছে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, হিসেব করে দেখ। নেশার ঘোরে সব মেয়েমানুষকেই সমান মনে হবে। এই বেলা টাকাটা জমালে পরে পছন্দমত বিয়ে-থা করে সংসার করতে পারবে।

ববি বাঁ হাত দিয়ে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে আনমনা হাসল, বলল, ওসব কথা আর ভাবি না। বয়েস আমার বেশি নয়, আপনাদের মত অভিজ্ঞও নই। একদিন শখ করে মদ খেতে শুরু করেছিলাম, এখন কিন্তু না খেয়ে থাকতে পারি না। লাঞ্চের সঙ্গে বীয়ার, চায়ের বদলে জিন্, আর রাত্রে এন্তার হুইস্কি। যতক্ষণ না বেহুঁশ হয়ে যাই থামতে ইচ্ছে করে না।

মিঃ কুশারীর শুকনো মন্তব্য, ওটা বয়েসের দোষ।

ববির চটপটে জাবাব, ওইজন্যেই কিন্তু আপনার স্ত্রী, কে. জি-র শালী আমাকে পছন্দ করে।

—আশ্চর্য নয়।

—তবে গোলমাল কোথায় জানেন! মদের মতই ঐ বিগতযৌবনারা আমার রক্তে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। মনে হয় না নিজের বয়সী কোন মেয়েকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারব।

কথাটা মিঃ কুশারীকে ধাক্কা মারল। অস্ফুট স্বরে ইংরাজীতে বললেন, বড় বেদনাদায়ক উপলব্ধি।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো ববিকে ধরে নিয়ে যেতে না পারলে চলবে না। রত্নার চুষিকাঠি চাই, নয়তো জীবনে অশান্তি। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব রাখলেন, মাসে হাজার টাকা।

ববি বড় বড়-চোখ করে তাকায়।

—কি, রাজী?

—আমাকে একটু ভেবে দেখতে সময় দিন।

—ভেবে দেখতে চাও দেখ, কিন্তু তোমাকে আমার প্রয়োজন। এখন এর্যন্ত ভাল কথাই বলছি, হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিতে চাইছি। কিন্তু তাতেও রাজী না হলে আমাকে শক্ত হতে হবে।

—তার মানে?

মিঃ কুশারী হাসলেন, কলকাতার শহরে ছেলেধরার অভাব নেই জান তো? রোজই কত ছেলে হারাচ্ছে, কতজন গায়েব হয়ে যাচ্ছে। অতএব ববির অন্তর্ধানেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে না। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে তোমার মার মুখ আমি বন্ধ করে দেব। সার্কাসের বাঘ সিংহকে ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে ঝিমিয়ে রেখে দেয়, সে তুলনায় তুমি তো ছেলেমানুষ।

ববি এবার ভয় পায়, এসব কি বলছেন?

মিঃ কুশারীর সদম্ভ ঘোষণা, এ পর্যন্ত জীবনে আমি হারিনি, যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। এখন তোমাকে আমার প্রয়োজন, তোমাকে আমি চাই। তাই যেরকম করে হোক পেতে হবে। আমার কাছে তোমার একমাত্র পরিচয় তুমি আমার স্ত্রীর চুষিকাঠি। এখন চলি। আশা করি শিগ্‌গীরি দেখা হবে।

মিঃ কুশারীর গাড়ি সজোরে স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল। চিন্তিত ববি নিজের ঘরে ঢোকে, দেখতে পায় তার মা আড়াল থেকে সব কথাই শুনেছে।

মিঃ কুশারীর হাজার টাকার টোপ বিধবা আগেই গিলেছে, তাই লজ্জার মাথা খেয়ে বলল, ওরা তোর পুরোনো বন্ধু, ওদের কাছে যাস্‌ না কেন?

ববি কোন উত্তর দিল না, কিন্তু বুঝতে পারল মিঃ কুশারীর হুমকি মিথ্যে নয়, ছেলে গুম হয়ে গেলেও টাকা পেলে তার মা মুখে রা কাড়বে না। রূঢ় স্বরে বলল, ঘর থেকে বেরোও, আমাকে বিরক্ত ক'রো না।

বিধবা অপমান গায়ে মাখে না। বলে, এরা খুব বড়লোক তাই না? দেখলেই বোঝা যায় অনেক টাকা।

ববি চীৎকার করে ওঠে, টাকা, টাকা! কি অভিশাপ! তুমি আমার মা, কিন্তু আমি তোমার ছেলে নই, একটা টাকা রোজগারের যন্ত্র। আর ওদের কাছে আমি চুষিকাঠি। চমৎকার! আর সোহাগ দেখিও না। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে যাও।

ববি আর কোনদিকে না তাকিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। যদি একটু ঘুম আসে এই আশায়।

ববি কিন্তু ঘুমোতে পারলো না, চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। ক্রমে সেই জ্বালা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শরীরে। বিকেলের মধ্যেই উঠে পড়ে সেজেগুজে ট্যাক্সী ধরে বেরিয়ে পড়ল ব্যারিস্টার কে. জি-র বাড়ির উদ্দেশ্যে। সব কথা অনুভাকে খুলে বলা দরকার, নয়তো ভদ্রমহিলা তার সম্বন্ধে কি ভাববে।

এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যারিস্টার কে. জি. এখন নিজে হাঁটতে পারে না, পক্ষাঘাতে অর্ধেকটা দেহ অবশ হয়ে গেছে। চাকা দেওয়া চেয়ারে বসে এঘর থেকে ওঘরে ঘুরে বেড়ায়। একজন সেবিকা আছে, দেখাশোনা করে, কয়েকটা খবরের কাগজ, নানরকম ইংরেজি পত্রিকা তার সঙ্গী। বাড়ির কর্ত্রী অনুভা। সে অবশ্য অনেকদিন থেকে, বলতে গেলে শ্রীমতী কে. জি-র মৃত্যুর আগে থেকেই। কেন যে কে. জি. অনুভাকে বিয়ে করেনি তা কেউ জানে না। অনুভা আজও অবিবাহিতা। তবে তারা দুজনে বরাবর একসঙ্গে থেকেছে, স্বামী-স্ত্রীর মতই ঘুরে বেড়িয়েছে, তাদের নিয়ে সোসাইটিতে মুখর আলোচনা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। কে. জি. অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনেকে ভেবেছিল অনুভা তাকে ত্যাগ করবে। কিন্তু তা সে করেনি। এখনও ওই বাড়িতেই আছে, তবে তার মহল আলাদা। সে মহলে নতুন বন্ধু-বান্ধবের আনাগোনা। তারা কে. জি-কে নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না, পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা গিয়ে হাজির হয় অনুভার ব্যক্তিগত ড্রইংরুমে।

ববির সঙ্গেও অনুভার ঐ ঘরেই দেখা হলো। সঙ্গে সঙ্গে উতলা কণ্ঠের প্রশ্ন, কি হয়েছে ববি? ফ্যাকাশে মুখ, চোখগুলো গর্তে ঢুকে গেছে!

—একটা দুর্ভাবনায় পড়েছি।

—কি নিয়ে?

—আজ দুপুরে মিঃ কুশারী এসেছিলেন আমার বাড়িতে।

কথাটা শুনেই অনুভার চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠল, কেন, কি চায় সে?

রত্নাকে আবার নাচ শেখাতে হবে।

অনুভার গর্জন, খবরদার, ঐ মাতালটার কাছে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না। আজ মে ফ্লাওয়ারে কি কাণ্ড করেছে তুমি জান না। লজ্জায় সকলের

মাথা কাটা গেছে।

ববির মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, হাজার টাকা মাইনে দেবে বলছে।

আগুনে যেন ঘি পড়ল; সাপিনীর মত ফুঁসতে লাগল অনুভা, মুখের মার্জিত মুখোশ খসে পড়ে গেল, নোংরা, ইতর, ছোটলোক, আমাকে জব্দ করার জন্যে টাকা দিয়ে তোমায় কিনতে চায়! খবরদার তুমি যাবে না, যদি যাও আমিও তোমার সর্বনাশ করব। দরকার হলে—

ববি সভয়ে কথার শেষটুকু শোনার জন্যে ত্রস্থ হয়ে থাকে।

—দরকার হলে অ্যাসিড ঢেলে তোমার ঐ সুন্দর মুখখানা বীভৎস করে দেব।

ববির মনে হলো সে যেন নাগরদোলায় ঘুরছে, বনবন করে চরকিবাজির মত। মাথা ঘুরছে, সেই সঙ্গে আকাশ, মাটি, সব কিছু। শুধু দুটো মুখ মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে আর তাদের গর্জন।

একটা বাঘ একটা সিংহী। মিঃ কুশারী আর অনুভা, দুজনের চোখেই হিংস্র দৃষ্টি। তাদের খাদ্য একজনই—সে ববি।

॥ কুড়ি ॥

ববি বয়সে অপরিণত বলেই কে. জি-র অ্যারিস্টোক্রাট শালী অনুভার কর্কশ ব্যবহারে বিস্মিত হয়েছিল এবং তার চেয়েও বিরক্ত হয়েছিল বেশী। অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলার সঙ্গে অনুভার সে কোন পার্থক্য খুঁজে পায়নি। এই সোসাইটি মহিলা কত না কেতাদুরস্ত, কত রুচিসম্মত তার ব্যবহার, কি মার্জিত ভাষা, অথচ সবই খসে পড়ল হিংসের জ্বালায়। সংসারে অভিজ্ঞ হলে ববি বুঝতে পারত অনুভা কোন ব্যতিক্রম নয়, চিরন্তন নারীচরিত্রের প্রতীক। একজন মেয়ে আর একজন মেয়েকে সহ্য করতে পারে না। যেমন সহ্য করতে পারে না সমধর্মী চুম্বক। সম্পর্কের কোন বালাই নেই। সে শাশুড়ী, বউ, ননদ, ভাজ, সপত্নী, জা—এমন কি সহোদরা বা মা, মেয়ে হোক না কেন, পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করে। বাইরে থেকে বোঝা কঠিন, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, নারীচরিত্রের এ সহজাত ধর্ম। দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব সুখে ঘরকন্না করেছেন, গৃহবিবাদ করেননি, কিন্তু দ্রৌপদী সহ্য করতে পারেননি সুভদ্রাকে, নববিবাহিত অর্জুনকে শ্লেষবাণে বিদ্ধ করেছেন। পাণ্ডুজায়া মাদ্রী গান্ধারীকে শতপুত্রের জননী হতে দেখেও ঈর্ষান্বিতা হননি, কিন্তু সপত্নী কুন্তীর তিন পুত্রকে জন্মাতে দেখে হিংসায় তিনি ফেটে পড়েছেন। নারী যাকে ভালবাসে বা যাকে সম্পূর্ণভাবে পেতে চায়, সেই

পুরুষের ভালবাসা এক ভগ্নাংশও অন্য কোন নারীর প্রতি যায়, তা সে সহ্য করতে পারে না। সেই নিয়েই তামাম দুনিয়ায় শাশুড়ী-বউ-এর ঝগড়া, ননদ-ভাজের কলহ। বোন সতীনের ঘর করা যে নরক-যন্ত্রণার শামিল, তার কাহিনী নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক যুগেও তার প্রকাশ সর্বত্র, নয়তো ব্যারিস্টার কে. জি-র স্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজেকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে কেন? তার মূলে হিংসা—কারণ সহোদরা অনুভা।

ছোটবেলা থেকে অনুভার চরিত্র ঐ একই ধরনের। যাকে আঁকড়ে ধরে, তাকে আর ছাড়ে না। বাবাকে সে ভালবাসত, কিন্তু সে ভালবাসা এতই একরোখা, এতই প্রবল যে, শেষ পর্যন্ত ওর বাবার দমবন্ধ হবার যোগাড় হয়েছিল। অন্য ছেলেমেয়েদের কাউকে তিনি কাছে ডাকতে পারেননি, অসুস্থ বাবাকে সারিয়ে তোলার জন্যে অনুভা তাঁকে নিয়ে যায় গিরিডিতে চেঞ্জে। সেইখানে মেয়ের জেদের শিকার হয়ে একরকম বিনা চিকিৎসায় ভদ্রলোক বেঘোরে প্রাণ হারালেন। সকলে বুঝল দোষ অনুভার, কিন্তু পরিষ্কার করে কেউ বলতে পারল না। একমাত্র অনুযোগ করেছিল কে. জী-র স্ত্রী, অনুভা, এ তোর উচিত হয়নি। যখন সামলাতে পারবি না, কেন বাবাকে নিয়ে গেলি?

অনুভার স্পষ্ট জবাব, বাবার জন্যে ভেবে যেন তোমরা ঘুমুতে পারছিলে না। তোমাদের তো শুধু পার্টি আর সোসাইটি, বুড়ো মধ্যবিত্ত বাপের কথা ভাববার অবসর কোথায়? তবু আমি গিরিডিতে নিয়ে গিয়েছিলাম বলে শেষ ক'টা দিন শান্তিতে কেটেছে।

—এ শুধু তোর জেদ!

—আমি বাবাকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসতাম।

—সে তোর দম্ভ।

—বাবাও আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত।

—সেই কথা ভেবে মনে সান্ত্বনা পাও।

অনুভা রাগে ফুলতে থাকে, তাই নাকি! ঠিক আছে, দেখা যাবে। অনুভা সেদিন কি দেখে নেবে বলে শাসিয়েছিল, তার দিদি সেদিন বুঝতে পারেনি, কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল বছর না ঘুরতেই। বাবা মারা যাবার পর ভাই-বোনরা সকলেই অবিবাহিতা অনুভাকে ডাকত তাদের বাড়িতে দিন কাটাবার জন্য। অনুভা কিন্তু বেছে নিল ব্যারিস্টার কে. জি-কে। মাসের বেশীর ভাগ দিনই কাটাত সেই বাড়িতে। হাসিতে, গল্পে, ব্যবহারে সে মাতিয়ে রাখল কে. জি-র সংসার, কে. জি-র পার্টির অতিথিদের কাছে অনুভা হলো প্রধান আকর্ষণ। অসহায় দিদি একদিন বুঝতে পারল অনুভা তার স্বামীকে আচ্ছন্ন করেছে। একদিন না বলে পারল না, অনু, কিছুদিনের জন্য তুই বরং দাদার কাছে যা।

অনুভা একটা ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, কেন?

—আমাদের ঘরোয়া জীবনে শান্তি নষ্ট হচ্ছে।

—আমার জন্যে নয়।

—তাহলেও আমি চাইছি না।

—বেশ তো, কে. জি. নিজের মুখে বলুক তবে আমি যাব।

সেই দিন থেকে অনুভার দিদি বুঝতে পারল, কেন বাবা মারা যাবার পর সে দেখা যাবে বলে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

বাবার পর অনুভার শিকার হলো কে. জি। ক্রমশ নিজের অধিকার সেখানে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু ইচ্ছে করেই বিপত্নীক কে. জি-কে সে বিয়ে করেনি। কে. জি. আজ পক্ষাঘাতে পঙ্গু, চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে ঘুরে বেড়ায়। অনুভা তাকে ত্যাগ করেনি সত্যি, কিন্তু তার সম্বন্ধে কোন আগ্রহও নেই।

এখন তার একমাত্র লক্ষ্য ববি। দু'জন মেয়ের কবল থেকে সেই ছেলেটাকে ছিনিয়ে এনেছে। পয়সাওয়ালা বড়লোকের বউ রত্না কুশারী আর যৌবনের জোয়ার-ভরা টীন-এজার মনুয়া, এইখানেই তার জয়। ববির উপর পূর্ণ অধিকারের স্বীকৃতি সে পেতে চায়, তারপর ঐ অর্বাচীন ছেলেটার উপর আর কোন আগ্রহ থাকবে কিনা বলা মুশকিল।

'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।'

ববি অনুভার ঘর থেকে একরকম না জানিয়েই পালিয়ে এল। অনুভার কাছে সে এসেছিল পরামর্শ করতে, ভেবেছিল মিঃ কুশারীর হাত থেকে বাঁচবার মতলব সে দেবে। কিন্তু তার বদলে অনুভার ভেতরকার নির্লজ্জ চেহারা দেখে নিজেই সে ভয়ে শিউরে উঠেছে। জীবনে কঠিন সমস্যার সামনে পড়লেই মানুষ বন্ধু খোঁজে—যার সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। কিন্তু আজ সে কার কাছে যাবে? রত্না কুশারীর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, সে নির্বোধ—এক বস্তা সেণ্টিমেণ্ট। মার সঙ্গে কথা বলেও কোন ফল পাওয়া যাবে না; কারণ সেখানে স্বার্থ জড়িয়ে পড়েছে। মিঃ কুশারীর হাজার টাকা মাইনের টোপ বিধবা গিলে বসে আছে। কথা বলতে গেলেই গলায় বঁড়শির টান পড়বে। অনুভার স্বরূপ তো সে জানতেই পেরেছে। তার সময়বসী ছেলে বন্ধুরা আরও ছেলেমানুষ, তারা শুধু নাচে আর মদ খায়। আর বাকি থাকে মনুয়া।

সোজা মে ফ্লাওয়ারে গিয়ে মনুয়ার সঙ্গেই দেখা করল ববি। সে তখন মোহনচাঁদের টেবিলে বসে পাঁচজনের সঙ্গে গল্প করছিল। ববি তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আর এক কোনায় বসল, খুলে বলল মিঃ কুশারী আর অনুভার

কথা অকপটে, কোন কথা গোপন না রেখে।

কিন্তু একটাও সমবেদনার কথা বেরল না মনুয়ার মুখ থেকে। নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে বলল, ববি, তুমি একটা গাধা। বলেছিলাম ঐ ডাইনীদের কাছে যেও না, এখন ওরা তোমার ঘাড় মটকাবে।

ববি তিরস্কার শুনতে চায়নি, নিজের মনেই বলে, এখন যে কি করি!

—কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাও।

—কোথায়?

—যেখানে খুশী, কিছুদিন গা-ঢাকা দাও। ও ডাইনী দুটো, বাজার থেকে চুষিকাঠি যোগাড় করুক, তারপর তুমি ফিরে এস।

—এতদিন বাইরে থাকব সে টাকাই বা কোথায়?

মনুয়ার বিস্ময়, কেন, বুড়ী গাইগুলোকে দুইয়ে নিতে পারনি?

ববির সহজ উত্তর, সে তো মাকে দিয়ে দিয়েছি, সংসারের জন্যে।

মনুয়া পিংপং বলে চাপস্ মারার মত বলল, তোমার মা-টাও একটা ডাইনী।

এইবার ববি ফিরে তাকাল মনুয়ার দিকে, ঐটুকু মেয়ে, ফুলের পাপড়ির মত সুন্দর, কিন্তু তারও চোখ দুটো জ্বলছে, বাজপাখির মত। ববি এই প্রথম উপলব্ধি করল অনুভা, রত্না কুশারী, তার মা, মনুয়া, সবাই সমান। বয়সের হয়তো তফাত আছে, তফাত আছে অর্থের, মর্যাদার, কিন্তু তারা চারজনই নারী—সকলেই কতগুলো জটিল স্নায়ুর সমষ্টি—এদের সকলেরই মূলধন ঈর্ষা।

ববি উঠে দাঁড়াল, আমি যাই।

—কোথায় যাচ্ছ?

—জানি না।

—আমার কথা শোন, তুমি যেখানে হোক চলে যাও। টাকা না থাকে আমি তোমায় যোগাড় করে দেব।

এ-ও সেই চিরকেলে নারীর উক্তি, নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ববির আর কথা বলার ইচ্ছে করে না, বলে, জানা রইল, দরকার হলে বলবো।

মে ফ্লাওয়ারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ববি। মনুয়ার মনে হলো ছেলেটার বয়েস হঠাৎ যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। মনে মনে সে হাসল, সময় থাকতে ছেলেটা যদি তার কথা শুনত, অন্তত ঐ ডাইনীগুলোর হাতে পড়ত না। যাকগে, কি হবে পরের কথা ভেবে! মনুয়া আবার মোহনচাঁদের টেবিলে ফিরে গেল। তাকে হাসতে হবে, গল্প করতে হবে, সেইজন্যেই তো তার পাঁচ শ' টাকা মাইনের চাকরি।

ববি রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে ভেবে পেল না। তখনও সন্ধ্যা নামেনি, পার্ক স্ট্রীটের রাস্তায়, দোকানে সবেমাত্র আলো জ্বলতে শুরু করেছে, অফিস-ফেরত সাহেবদের গাড়ির ভিড় তখনও কমেনি। ববি উদ্দেশ্য-হীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে মোড় পর্যন্ত এগিয়ে গেল। সামনে গান্ধীজীর স্ট্যাচু, জালের ঘেরাটোপের মধ্যে রোগা মানুষটা লাঠি ধরে দাঁড়িয়ে। স্থির অচঞ্চল প্রহরী, সদাব্যস্ত রাস্তার ওপর জাগ্রত দৃষ্টি রাখছে। শিল্পীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে ব্রোঞ্জের মুখে তাঁর বেদনার প্রকাশ। তাঁর স্বপ্নের ভারতকে বাস্তবে রূপ দেওয়া গেল না ভেবেই বোধহয় এই অনুশোচনা।

ববির কাছে গান্ধীজী অবশ্য বিশেষ কেউ নয়; কারণ, তার জন্মের আগেই গান্ধীজীর মৃত্যু হয়েছে। ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য করেছে, ঐ মানুষটার ছবি ঘরে টাঙিয়ে সমাজের মাথাওয়ালা লোকেদের ভণ্ডামি। ছাত্রজীবন থেকেই ধারণা হয়েছে, যারা মাথায় গান্ধী টুপি পরে তারা ব্ল্যাকমার্কেটীয়ার। নিজের হাতে সুতো কেটে স্বাধীনতার পর থেকে কেউ আর খদ্দর পরে না। সবাই বাজার থেকে কিনে আনে। খদ্দর আর মিটিংকা কাপড়া নয়, রীতিমত রাজবেশ। মর্যাদা অনুযায়ী দামও বেড়েছে, মিহি খদ্দরের ধুতি-শাড়ি পাঞ্জাবী ধনী ছাড়া কারুর পরবার সামর্থ্য নেই। সেই কারণেই ববিদের কাছে খদ্দর কোন দিনই শ্রদ্ধার আসন পায়নি। গান্ধীজীকে বোঝবার সুযোগ পায়নি ববিদের বয়সী ছেলেরা। দোষ তাদের নয়, দোষ মহাত্মার ভাবশিষ্যদের, যারা চিরকাল গান্ধীজীর নামে কপালে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করল, কিন্তু তাঁর দর্শনের ব্যাখ্যা করল না। পাছে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে। তাই না দেশের এই দুর্দশা!

ববিকে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটি পায়জামা-পরা লোক কাছে এগিয়ে গিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, গার্ল স্যার, ফ্রেশ ফ্রম দি কলেজ, কলেজ কি ছোকরি, বিশ রুপেয়া। আইয়ে হামারা সাথ।

ববি বিরক্ত হয়, আঃ, ভাগো।

—বহুত খুবসুরত। ফটো দেখিয়ে, ফটো।

—শাট আপ্! ববি আবার পেছন ফিরে পার্ক স্ট্রীটেই ঢুকে পড়ে। কলকাতার শহরের এইটেই তার সবচেয়ে পরিচিত রাস্তা। আজকে মন যখন ভারী, যাবার কোন জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না, কোথায় আর পথে পথে ঘুরে বেড়াবে! তাই ঢুকে পড়ল একটা পরিচিত বারে। বেশী সময়ের ব্যবধান না দিয়ে খান চারেক বড় পেগ দিশী হুইস্কি প্রচুর বরফ আর সোডা দিয়ে খেল।

নেশা যত বাড়ে যুক্তির গিঁট ততো আলগা হয়। এতক্ষণ ববির মনে হচ্ছিল, না বলে-কয়ে বিপদের যে ঝড় উঠেছে তার জীবনে তা থেকে বেরিয়ে

আসতে পারবে না। চারদিকেই যেন কালো জমাট অন্ধকার। কিন্তু নেশার ফলে অন্ধকারের মধ্যে একে একে তারা ফুটল। এমন কি ধীরে ধীরে চাঁদও উঠল।

হুইস্কি, আরও হুইস্কি। আর সোডা নয়, শুধু বরফের টুকরো। গিলতে গিয়ে গলা জ্বলছে কিন্তু বুক জ্বলছে না। সেখানে ঠাণ্ডা আমেজ। চাঁদের আলোর মতই ঠাণ্ডা, নরম।

চিন্তার প্রবাহকে যদি বাধা দেওয়া না হয় শেষ পর্যন্ত তার খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। নরমের অনুভূতি থেকেই বোধহয় ববির মনে হলো ডানলোপিলোর নরম বিছানার কথা। ঐ বিছানায় শুলে সহজে ঘুম ভাঙতে চায় না। কত বেলা গড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দার্জিলিং-এর কথা, পাহাড়ী রাজ্যে বেলা বয়ে গেলেও বোঝা যায় না, সারাদিনই একটা মেঘলা আবহাওয়া। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ে, আবার শীতকালে তুষার, সাদা সাদা নরম পাখির পালকের মত, ধুনুরীতে ভাঁজা পেঁজা তুলোর মত, তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া। চারপাশে লোকজনের সংখ্যা খুব কম, এক একজোড়া মেয়ে পুরুষ। চিন্তার জগতে ববি নিজেকে দেখতে পেল, পাশে একটা গরম মেয়ে। মুখটা ঝাপসা। মনের কাঁচে ওয়াইপার চালাতেই ফুটে উঠল রত্না কুশারীর মুখ, ক'টা দিন ভীষণ হইহই করে কেটেছিল, ঐ ঠাণ্ডায়, ঐ দার্জিলিং-এ ঐ গরম মেয়ে নিয়ে।

ম্যানেজার এসে পাশে দাঁড়াতেই ববি মুখ তুলে তাকাল।

—শরীর ঠিক আছে তো?

ববি আশ্চর্য হয়, কেন আমার কি হয়েছে?

—না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।

ববি বলল, কত বিল হয়েছে জানি না, তবে আমার কাছে বেশী টাকা নেই।

—সে ঠিক আছে, আজ সই করে দিলেই হবে।

—ধন্যবাদ, বলে ববি দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারলো না, মাথাটা টলছে। পা ফেলতে ভয় পেল, যদি সেটাও টলে, লোকে মাতাল ভাববে। হাসবার চেষ্টা করল, বোধহয় বেশী পান করেছি। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলে ভাল হয়।

ম্যানেজার ববির পরিচিত লোক, নিজেই ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তুলে দিল। কোনরকমে একটা ঠিকানা বলে পেছনের সিটে নেতিয়ে পড়ল ববি। ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার ববিকে ডেকে দিল, নামুন, ঘর এসে গেছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ববি ভাড়া চুকিয়ে দিল। এ কোথায় নামল সে, এ তো

তার বাড়ি নয়! গেটে রত্না কুশারীর দারোয়ান সেলাম করে ববিকে আপ্যায়িত করে। ববি কিছুতেই মনে করতে পারে না এখানে সে এল কেন। ঐ ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা কি মিঃ কুশারীর ভাড়া করা লোক? না, ঐ বার ম্যানেজারটা ওর সঙ্গে বদমাইশি করেছে? একবারও ববির মনে পড়ল না রত্না কুশারীর ঠিকানা সে নিজেই দিয়েছে ড্রাইভারকে। প্রথমটা ইতস্তত করলেও পরে দারোয়ানের সাহায্যে ববি আস্তে আস্তে দোতলায় উঠল। রত্না কুশারী বিছানায় শুয়ে, ঘরে একটা নীল আলো। দারোয়ান ফিস ফিস করে জানাল, মেম সাহেবের শরীর খুব খারাপ। ববি তাকে বিদায় দিয়ে রত্না কুশারীর বিছানায় গিয়ে বসল। কপালে হাত দিতেই চোখ মেলে তাকাল রত্না, ভয়-মাখা সে চাহনি, শুধু বলল, তুমি এসেছ!

দু' চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল ভদ্রমহিলার।

ববি জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে তোমার?

—জানি না, শুধু মরে যেতে ইচ্ছে করছে, আমি সুইসাইড করতে চাই।

—আঃ, কি আজেবাজে বকছ!

রত্না কুশারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, কার জন্যে বেঁচে থাকব, কেউ তো আমাকে চায় না। আমি মরে গেলে তোমরা সবাই খুশী হবে। তুমি, মিঃ কুশারী—

ববি বোঝাবার চেষ্টা করে, এ তোমার ভুল ধারণা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

রত্না ববির হাতটা নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলে, আমি তোমায় কষ্ট দিতে চাই না। যাকে তোমার ভাল লাগে তার কাছেই যাও—অনুভা, মনুয়া, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমার কাছেও এস। কারণ, আমার কেউ নেই, আমি বড় একা।

নেশার ঝোঁকে ববি কথা দেয়, শুধু আসব না রত্না, আমি তোমার কাছেই থাকব। অনুভা, মনুয়া, এদের সঙ্গে মেশাও আমার দরকার ছিল। আমি এখন বুঝে ফেলেছি, ওরা কত ছোট। তুমি অনেক বড় রত্না, তোমার হৃদয় আছে, তুমি মানুষকে ভালবাসতে জান। দুর্ভাগ্য মিঃ কুশারীর, সে তোমাকে বুঝতে পারেনি।

রত্না কুশারী সদ্য বিধবার মত হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল, জিজ্ঞেস করল, ববি, তুমি সত্যি কথা বলছ?

—সত্যি বলছি।

—তুমি আমায় ভালবাস?

—বাসি।

রত্না কুশারী বিছানার উপর উঠে বসে, আমার শরীর খুব খারাপ জানো?

এই ক'দিন শরীরের ওপর বড় অত্যাচার করেছি। আত্মহত্যা করব বলেই বোতলের পর বোতল মদ খেয়েছি। কয়েকদিন আমাকে নিয়ে দার্জিলিং-এ যাবে? সেই দার্জিলিং—

আর বলতে হল না, ববিরও উচ্ছ্বাস পেয়ে বসল, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না রত্না, আমিও বারে বসে দার্জিলিং-এর স্বপ্ন দেখছিলাম। চল ক'দিন ঘুরে আসি, আমারও রেস্ট দরকার।

রত্না কুশারী ববিকে একেবারে কাছে টেনে নিল, আমি ভাবতে পারছি না ববি, এটা সত্যি না স্বপ্ন! ক'দিন পাগলের মত তোমায় খুঁজেছি, আজ তুমি আমার পাশে বসে। তুমি বলেছ আমাকে দার্জিলিং-এ নিয়ে যাবে, এই যথেষ্ট। আঃ, আমার সমস্ত জ্বালা তুমি জুড়িয়ে দিলে, আমি বাঁচতে চাই ববি, মরতে আমার বড় ভয়।

ববিরও চোখে জল আসে, কে তোমাকে মরতে দিচ্ছে! দার্জিলিং-এ গিয়ে আমরা নতুন প্ল্যান করব, কলকাতায় ফিরে এসে নতুন জীবন শুরু করব, নতুন কাজ, নতুন স্বপ্ন।

দুজনেই মাতাল। এ স্বপ্ন, এ প্রতিশ্রুতির কি দাম, কে বলতে পারে? তবু এ মুহূর্তটা সর্বহারা ধনী রত্না কুশারীর জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

॥ একুশ ॥

কলকাতার হালচাল সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিফহাল, স্বদেশী বিদেশী যিনিই হোন না কেন, তিনি জানেন এ শহরের বিশেষণ হল 'মিছিল নগরী'। স্লোগান দিয়ে বলা চলে কলকাতার আর এক নাম, 'প্রোসেশান প্রোসেশান'। বলা নেই কওয়া নেই, শহরের যেখান থেকে খুশি অলিগলি থেকে কেঁচোর মত মিছিল বেরিয়ে পড়ে। মনুমেণ্ট পর্যন্ত পেঁাছতে পেঁাছতে ক্রমশ দেহ স্থূল হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত কেঁচো পরিণত হয় অজগরে।

অজগর-মিছিলের ভয়ে বিদেশী পর্যটকরা আজ শঙ্কিত। গালফুলো গোবিন্দর মাকে যেমন চালতাতলায় যেতে বারণ করা হয়েছিল, কারণ 'চালতাতলায় গরুর ঠ্যাঙ কলাকে নাচে ড্যাডাং ড্যাং।' তেমনি বিদেশের পত্রিকা পর্যটকদের নিয়ত সাবধান করে দিচ্ছে, খবরদার ভাই, কলকাতায় যেও না। কারণ, 'বিস্ফোরক কলকাতা' যেদিন খুশি ফাটলেই হলো। 'সাম্প্রদায়িক কলকাতা' মানুষের রক্ত নিয়ে এরা নাকি হোলি খেলে। 'বস্তির শহর কলকাতা', দারিদ্র্য রোগ মহামারী, তার ওপর মিছিল নগরী কলকাতা, এ

যেন গোদের ওপর বিষফোড়া।

তবে যারা কলকাতার লোক তারা রাতে মশা দিনে মাছির সঙ্গে মিছিলকেও মেনে নিয়েছে। এসব ব্যাপারে আর তাদের আগ্রহ নেই, উৎসাহ কোন দিনই ছিল না; মাঝে মাঝে কৌতূহল জাগত, এখন তাও নিবে গেছে। কলকাতা-বাসীর কাছে আতঙ্ক হলো এই শহরের সাংস্কৃতিক রূপ।

সংস্কৃতির নামে আজকাল এক ধরনের হুল্লোড় শুরু হয়েছে এই আজব শহরে। যাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশী লেবু চটকান হয়েছে তিনি বেচারী রবীন্দ্রনাথ। ভদ্রলোক বেঁচে থাকলে নির্ঘাত পুলিস ডেকে এই রবীন্দ্র-জয়ন্তীওয়ালাদের নির্বাসনে পাঠাতেন। বৃষ্টির ভয়ে একটা প্যাণ্ডেল, মাইক, কিছু ফুলের মালা, কবিগুরুর একখানা ছবি জোটাতে পারলেই হলো। কোনরকম একখানা সভা ডাকতে পারলেই সভাপতি পাওয়া যাবে, এর জন্য সাধারণতঃ লেখকদের ডাকা হয় যাঁদের এখন লেখবারও কিছু নেই, বলবারও কিছু নেই। তবু মালা পাবার লোভে তাঁরা সভাপতি হন। ইনিয়ে বিনিয়ে বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করেন রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ছিলেন। বলবার জন্যে তাঁরা তৈরী হয়ে আসেন না, কারণ জানেন শ্রোতারা সভাপতির ভাষণ শোনে না। তারা অপেক্ষা করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে। প্রথমেই কয়েকজন কণ্ঠশিল্পীর গান। গানের মানে না বুঝেই নিজের পছন্দমত যে কোন একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে দেয়, এমন কি উদ্বোধন সঙ্গীতও শোনা যায়, 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে।' নামকরা অনুষ্ঠান হলে নামকরা গায়কদের সারি। তারা বেসুরো গাইলেও বলবার কিছু নেই। আর ছোটখাট জায়গা হলে পাড়ার উঠতি গায়ক-গায়িকাদের রবীন্দ্র সঙ্গীতের নামে আর্তনাদ। তাও নীরবে সহ্য করতে হবে।

গানের পর নাটক। কবিগুরুর মৃত্যুর পর থেকে এই দীর্ঘ দিন নাটক অভিনয়ের পর আর এখন নাটক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উপন্যাস, ছোট গল্পের দফারফা করা হয়ে গেছে। কবিতা, চিঠিপত্র, কিছুই ছাড়া পায়নি—তারই ওপর নাটক কিংবা নৃত্যনাট্য। একদিনের রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পালা শেষ হয়ে গেছে, কমপক্ষে তিন দিন অনুষ্ঠান না চালালে প্যাণ্ডেলের খরচা ওঠে না। যত বড় প্যাণ্ডেল, তত দীর্ঘ দিনের অনুষ্ঠান। কোথাও সপ্তাহব্যাপী, কোথাও পক্ষকাল।

যখন বোঝা গেল ঠিক গুছিয়ে করতে পারলে এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেশ দু' পয়সা রোজগার হয় তখন উদ্যোক্তারা রবীন্দ্র নামটি বিযুক্ত করলেন। শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বললেই যথেষ্ট, সাড়ে বত্রিশ ভাজা পরিবেশন করার চমৎকার আসর। সংস্কৃতির নামে কি না চলে! যাত্রা, থিয়েটার,

কবিগান, সিনেমা, নাচ, আবৃত্তি যা হোক একটা কিছু স্টেজে তুলে দিলেই হলো। হাজার হাজার সভ্য দর্শক দর্শনী দিয়ে এই সাংস্কৃতিক পাগলামি দেখছে। সংস্কৃতির নামে সবাইকে ধাপ্পা দেওয়া যায়। সরকার কর ধার্য করতে পারে না, কারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—সে যে লজ্জাবতী লতা, যারা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তারা দক্ষিণা চাইতে ভয় পায়, তাতে যদি তাদের অসাংস্কৃতিক আচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁদের প্রাপ্তি ট্যাক্সি ভাড়া আর এক প্লেট জলখাবার। প্যাণ্ডেলওয়ালা জানে এসব অনুষ্ঠানে বিলের টাকা পাওয়া পাওয়া যায় না; তবু প্রাণের ভয়ে মাচা বেঁধে দিতে হয়, আর মনে সান্ত্বনা, এত লোকের কাছে তাদের কোম্পানীর পাবলিসিটি হচ্ছে। উদ্যোক্তারা শুধু ফাঁকি দিতে পারে না নাট্যকে দলগুলোকে। তারাও সেয়ানা, তাই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হয়। সংস্কৃতির নামে এই প্রগতিবাদী নাট্য গোষ্ঠীগুলিও তো কম ধাপ্পা দিয়ে বেড়ায় না! তাই উদ্যোক্তাদের ভাঁওতায় তারা ভোলে না, মুখে রঙ মেখেই পর্দা তোলার আগে প্রযোজনার খরচ বাবদ টাকাটা হাতিয়ে নেয়। সে আর কতটুকুই খরচ! উদ্যোক্তারা জানে তাদের সারা বছরের খরচা এই এক-একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উঠে যায়। তাই তাদের স্লোগান হলো, 'বাংলার সংস্কৃতি জিন্দাবাদ।'

এই ধরনের এক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্ব চলছিল মধ্য কলকাতার কোন এক পার্কে। অনাদিপ্রসাদ সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ডাবের জল পান করতে করতে লক্ষ্য করেছিলেন ডেকরেটারের লোকদের প্যাণ্ডেল বাঁধার কাজ। এমন সময় পেছন থেকে কে এসে পিঠে একটা চাপড় মারল, হেসে বলল, আরে মশাই, আজ আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছি। আপনি সেই লেখক, যিনি পর্নোগ্রাফি না লিখে সাহিত্যিক হবেন ভাবছেন। আপনি সেই ভ্যাবা গঙ্গারাম দি গ্রেট, যিনি রুটি শব্দের অর্থ না বুঝে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছেন। কি, ঠিক চিনেছি কিনা?

অনাদিপ্রসাদও চিনতে পারলেন। এ সেই প্রেসিডেন্সী কলজের সামনে দেখা লোকটি, আবার যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সরস্বতী পুজোর দিন লম্বুদের পাড়ায়, ফটিকের বাবা যেদিন খুন হলো। অনাদিপ্রসাদ অকপটে স্বীকার করেন, আপনার নামটা কিন্তু আমি ভুলে গেছি।

ভদ্রলোকের চটপটে উত্তর, তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। আপনাকে তো বলেই ছিলাম নাম আমার প্রায়ই পাল্টে যায়। শেষবার যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয় তখন আমার নাম ছিল ঝুনুদা।

—আর এখন?

—পুলকেশ।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—সহজ ব্যাপার। যখন কোন কালচারাল ফাংশান-টাংশান করি তখন আমি পুলকেশ। নামের মধ্যে একটা কালচারের গন্ধ থাকা চাই তো, যেখানে মারা-মারি খুনোখুনি, সেখানে আমি ঝুনুদা দি গুণ্ডা সাপ্লায়ার, আবার যখন—

অনাদিপ্রসাদ থামিয়ে দেন, আর দরকার নেই, মাথা গোলমাল হয়ে যাবে। তা পুলকেশবাবু, এত বড় প্যাণ্ডেল হচ্ছে—

—আমার ক্লাবের ফাংশান, আমি সেক্রেটারী আর বাস্তুঘুঘু পেট্রন। প্রেসিডেণ্ট, ভাইস প্রেসিডেণ্ট এনতার আছে। বছরে একবার এই ধরনের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি, তাইতেই ক্লাবের সারা বছরের খরচা চলে যায়, আমরাও পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকি। চলুন না, আমাদের ক্লাব ঘরে গিয়ে বসবেন। একটু জমিয়ে গল্প করা যাবে।

—না থাক, দেরি হয়ে যাবে।

পুলকেশ ছাড়বার পাত্র নয়, কি এমন রাজকার্য পণ্ড হবে শুনি? ভাল চা খাওয়াব, সেই সঙ্গে পান, কড়া জর্দা।

—আমি খাই না।

—মাল টাল চলে?

—না। তা ছাড়া এই ঠিক দুপুর বেলায়—

পুলকেশ হাসল, মালের আবার সময় কি মশাই! সকালেও মাল, দুপুরেও মাল, রাত্তিরেও মাল। আসুন আমার সঙ্গে।

অগত্যা অনাদিপ্রসাদকে যেতেই হয় পুলকেশের সঙ্গে। লোকটির বেশভূষারও কিন্তু নামের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে। ঢিলে পায়জামা, হলদে আর গেরুয়ার মাঝামাঝি রঙের বড়ুয়া-গলা পাঞ্জাবি। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা। সাবান মাখা উস্কোখুস্কো চুল, চোখে রোদ আটকাবার চশমা।

অনাদিপ্রসাদ না বলে পারেন না, এ সাজে আপনাকে বেশ দেখাচ্ছে।

—কেমন, দেখলেই ইণ্টেলেকচুয়াল মনে হচ্ছে না? সাংস্কৃতিক কিছু করতে গেলে ভেকের দরকার—আমি এর নাম দিয়েছি কালচারাল কস্টিউম, হেঁ-হেঁ—

অনাদিপ্রসাদের মন্তব্য, আপনি বেশ চালু লোক।

পুলকেশের সহজ স্বীকৃতি, নইলে এই ক্লাব চালাব কি করে? বছরে একটা ফাংশান করি মশায়, বাংলা দেশের কোন আর্টিস্টকে বাদ দিই না। সে লাল নীল হলদে যে রঙেরই হোক না কেন। প্রগতিবাদী, প্রাচীনবাদী, শোধনবাদী সব মক্কেলকে এক মঞ্চে জড় করি। মাত্র এক জায়গায় ওদের আদর্শের মিল সেটা আমি ধরে ফেলেছি, এরা সকলেই সুবিধাবাদী।

—এ তো দার্শনিক তথ্য।

—সে যাই বলুন। আমাদের পেট্রন বাস্তুঘুঘু, অতএব টাকার স্বাচ্ছন্দ্য,

আর রাজনৈতিক পার্টিরা আমার কব্জায়; কারণ, ওদের মিছিলে লোক সাপ্লাই করতে হয়তো।

এ প্রসঙ্গ শেষ হবার আগেই তারা ক্লাবঘরে এসে পড়ল। হ্যারিসন রোড পেরিয়ে সরু গলির মধ্যে একখানা বাড়ি। সামনে দিয়ে ঢোকবার পথ নেই, ক্লাবঘরে ঢুকতে গেলে বাড়ির পেছনের দিকে যেতে হয়, তার জন্য নিজস্ব আরও সরু একটি গলিপথ আছে। ক্লাবঘরটি মাঝারি আকৃতির, শতরঞ্চি পাতা। এক পাশে কতকগুলো ছাপা কাগজপত্র, বোধহয় এই অনুষ্ঠান সংক্রান্ত। দুটি ছেলে উবু হয়ে বসে গুছিয়ে রাখছিল। পুলকেশকে দেখে তারা জানাল, প্রেস থেকে সব ছাপিয়ে এনেছি।

—ভাল করেছিস, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছিল, একজনকে অনাদিপ্রসাদ চিনতে পারলেন। সে লম্বু। তাই জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ প্রেস, অশোক জানার?

লম্বু এতক্ষণে অনাদিপ্রসাদকে লক্ষ্য করে, আরে, আপনি এখানে?

পুলকেশের মন্তব্য, উনি সর্বঘটে কাঁঠালী কলা।

—অশোকের খবর ভাল? অনেকদিন দেখা হয়নি।

লম্বু জানায়, হ্যাঁ, দিব্যি আছে, পায়ের ওপর পা তুলে ব্যবসা করছে। তা হলে ঝুনুদা, আমরা চলি। পাঁচটা টাকা দিন, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। কোথাও রুটি মাংস খেয়ে নেব।

পুলকেশ একটা নোট এগিয়ে দেয়, যা ঘোঁতন, তুইও লম্বুর সঙ্গে খেয়ে আয়।

তারা দুজনে বেরিয়ে যায়।

অনাদিপ্রসাদ বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেন না, যত দূর মনে পড়ছে লম্বু আর ঘোঁতন দুই বিরুদ্ধ পার্টির লোক। তারা মিলে গেল কি করে?

পুলকেশ হো-হো করে হাসে, আপনিও যেমন, এই ভাব এই ঝগড়া, সবই এদের অভিনয়। সকালে হয়তো দেখবেন এ ওকে ছুরি মারতে যাচ্ছে, আবার হয়তো সেই রাত্রেই দেখবেন ওই দুই মক্কেল বোতল গেলাস নিয়ে এক জায়গায় বসে গলায় গলায় ভাব। এরাই তো আমার ডান হাত, বাঁ হাত। মিছিল, দাঙ্গা, বারোয়ারি পুজো, মড়া পোড়ানো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা-কিছু বলুন ওরাই সামলায়। আমার বুদ্ধি, ওদের মেহনত।

কথায় আবার ছেদ পড়ল, একটি ছেলে ঢুকল ঘরে। হাতে খাতা বই, দেখলেই বোঝা যায় কলেজের ছাত্র। পুলকেশকে দেখে ম্লান হাসল, এই যে ঝুনুদা, এলাম।

পুলকেশের উদার আহ্বান, কিন্তু একলা কেন? তোমার বান্ধবীটি কোথায়?

ছেলেটির সলজ্জ উত্তর, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

—সে আবার কি কথা! ভেতরে ডেকে নিয়ে এস, আমি তো সব ব্যবস্থা করেই রেখেছি। পাশের ঐ ছোট ঘরে চলে যাও। নিরিবিলিতে পড়াশুনো কর।

ছেলেটি আর কথা বাড়াল না, বেরিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এল, ফ্যাকাশে রোগা মেয়ে, কলেজেরই ছাত্রী। দুটো বিনুনি করা, মুখটা ঘেমেছে। হাতে লাল পাড় ছোট্ট রুমাল, বড় বেশী আত্মসচেতন। কারুর দিকে ভাল করে না তাকিয়ে ছেলেটির সঙ্গে দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

অনাদিপ্রসাদ এতক্ষণ নাটক দেখছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, ওরা এখন পড়াশুনো করবে?

পুলকেশ একটা চোখ টিপল, বুঝতেই তো পারছেন। তবে আর লজ্জা দিচ্ছেন কেন।

—তা নয়, তবে এখানে—

—আহা, বেচারীরা কোথায় যাবে বলুন তো? কলেজের ছাত্রছাত্রী, এদের প্রেম করবার একটা জায়গা রেখেছেন? চারদিকে ভিড়, বেচারিরা যে দুটো মনের কথা বলবে তার উপায় নেই। তাই আমি ঐ পাশের ঘরের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

—আপনার উদারতার প্রশংসা না করে উপায় নেই।

পুলকেশ আরও পুলকিত হয়, এর ফলে এই ছেলে মেয়ে দুটি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে। কারণ, এদের সিক্রেট আমি জেনে গেছি। এদের দিয়ে আমি ফ্যাংশানের টিকিট বিক্রি করাবো, ভলেণ্টিয়ার করে খাটাবো। আবার হয়তো ঐ ছেলেটাকে মিছিলে যোগ দিয়ে স্লোগান দেবার কাজে লাগাবো।

অনাদিপ্রসাদ নিজের মনেই বলেন, এ তো দেখছি আপনার মোক্ষম ঘর।

—আরে মশাই কলকাতার শহরে খানকয়েক ফাঁকা ঘর থাকলে কত কাজে লাগান যায় জানেন! দিনের বেলায় ঐ পাশের ঘরে নিরিবিলিতে পড়ার ব্যবস্থা, আর সন্ধ্যের পর লম্বুরা ঐ ঘরে জুয়ো খেলে। আমি বিনা পয়সায় মদের যোগান দিই, অতএব বুঝতে পারছেন ডান হাত বাঁ হাত খসবার কোন ভয় নেই।

অনাদিপ্রসাদ বাহবা দিয়ে ওঠেন, খলিফা লোক মশাই আপনি। আপনার উচিত ছিল মুখ্যমন্ত্রী হওয়া। তা হলে এই দেশটা বেঁচে যেত। আপনার সঙ্গে আরও মিশতে হবে।

পুলকেশ আনন্দে উচ্ছল, আরে মশাই যখন খুশি আসবেন। দুপুরবেলা নিরিবিলিতে পড়াশুনো করার জন্যে মেয়েছেলেও নিয়ে আসতে পারেন, নয়তো সন্ধ্যের সময় জুয়োর আড্ডায় পকেট ভর্তি কাঁচা টাকা নিয়ে আসবেন, আপনাকেও

বিনা পয়সায় ধেনো খাওয়াব।

অনাদিপ্রসাদ হাসতে হাসতে বলেন, লোভনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই। তবে বয়েসটা হয়ে গেছে তো, কয়েক বছর আগে আপনার সঙ্গে দেখা হলে পরে সুবিধে হতো। আলাপ করে ভাল লাগল, আজ উঠি।

পুলকেশ কিছুক্ষণ জোর জবরদস্তি করল যাতে অনাদিপ্রসাদ ঐ ক্লাব ঘরে আরও কিছুক্ষণ কাটায়, যাতে অন্তত এক কাপ চা কিংবা কফি খেয়ে যায়। শেষে আটকে রাখতে না পেরে বলল, তৈরি থাকবেন মশায়। প্রোগ্রামে অনেক সাহিত্যিকের নাম ছাপিয়েছি, যদি কেউ এসে না পৌঁছয় আপনাকে সাবস্টিটিউট হিসেবে ধরে নিয়ে আসব। আপনি যখন সাহিত্যিক, যা হয় কিছু মাইকে বলে দেবেন, পাবলিসিটি হয়ে যাবে। তবে আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি, সাবস্টিটিউটদের ট্যাক্সি ভাড়া আমরা দিই না। আসা-যাওয়ার ট্রাম ভাড়া আর টিফিন।

অনাদিপ্রসাদ কোন উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে নমস্কার করে রাস্তায় নেমে পড়লেন। মনে মনে পুলকেশের কথাই ভাবছিলেন। এরাই কলকাতার সংস্কৃতির ধারক বাহক। এরা ঠকাচ্ছে জেনেও কেউ প্রতিবাদ করে না, মিছিল নগরী কলকাতায় প্রতি সন্ধ্যায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সামান্যতম ত্রুটির বিরুদ্ধেও সোচ্চার প্রতিবাদ। অথচ এই সাংস্কৃতিক কালোবাজারীদের সম্বন্ধে জনতা নীরব কেন? কোথায় রাজনৈতিক নেতারা, তাঁরাই বা অন্ধ হলেন কি করে! এঁদেরও সম্বন্ধটা কি মাসতুতো ভাই-এর?

একটা সিনেমা হলের সামনে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিলেন অনাদি-প্রসাদ, একটি মেয়েলী কণ্ঠের আবেদনে তিনি থামলেন।

—আমার একটা টিকিট বেশী হয়ে গেছে আপনি যদি কেনেন।

অনাদিপ্রসাদ ভুরু কুঁচকে বলেন, আমি তো সিনেমা দেখতে আসিনি।

—টিকিটটা বেশী হয়ে গেছে তাই বলছিলাম। বিক্রি করতে না পারলে আমার লোকসান হবে।

—কাউণ্টারে দিয়ে দিন না।

—একটু বেশী দামের টিকিট কিনা, ঐ ক্লাসটা এখনও ফুল হয়নি।

—কত দাম?

—তিন টাকা।

—ঠিক আছে, আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি। অনাদিপ্রসাদ টাকা দিয়ে টিকিট নেন; সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তবে ছবি দেখব কিনা বলতে পারছি না।

—কেন দেখবেন না, আমি বলছি ভাল লাগবে।

অনাদিপ্রসাদ টিকিটটা পকেটে ফেলে বইপাড়ায় গিয়েছিলেন নতুন কি বই বেরিয়েছে তাই দেখতে, ভেবেছিলেন দেরি হবে; কিন্তু কাজটা তাড়াতাড়ি

শেষ হয়ে গেল। মনে পড়ল পকেটে সিনেমার টিকিট রয়েছে, ছবি না দেখলেও কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা ঘরে কাটিয়ে দিতে দোষ কি। তখন শো শুরু হয়ে গেছে, অনাদিপ্রসাদের টিকিট দোতলার। ওপরটা মোটামুটি ফাঁকাই বলতে হবে, টিকিট চেকার তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল একপ্রান্তে। বসার সঙ্গে সঙ্গে পাশের সিটে মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, যাক্, শেষ পর্যন্ত এসেছেন তা হলে?

অনাদিপ্রসাদ চমকে ওঠেন, কে? তারপর মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলেন, ও আপনি?

মেয়েটি ফিক করে হাসল, কেন, আর কেউ হবে ভেবেছিলেন বুঝি?

—আমি কিছুই ভাবিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মেয়েটি আস্তে আস্তে হাত রাখল অনাদিপ্রসাদের হাতের উপর। অনাদিপ্রসাদ সসঙ্কোচে হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, মেয়েটি ধরে ফেলে, মিথ্যে লজ্জা পাচ্ছেন কেন, আশেপাশে কেউ নেই।

অনাদিপ্রসাদ বিরক্ত হন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মেয়েটির সহজ প্রশ্ন, বিকেলে কি করছেন, পাঁচটার পর? আমি ফ্রি আছি। যদি চান বেড়াতে যেতে পারি ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায়, গঙ্গার ধারে।

অনাদিপ্রসাদের বিস্মিত প্রশ্ন, কিসের জন্যে?

মেয়েটি শব্দ করে হাসে, ন্যাকা, এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না।

অনাদিপ্রসাদ কঠোর কিছু বলার জন্যে পাশ ফিরতেই দেখেন, বড় বড় দুটো চোখে অসহায় গরুর মত তাকিয়ে রয়েছে পাশের মেয়েটা। রূঢ় কথা বলতে কষ্ট হলো। জিজ্ঞেস করলেন কি চাও?

—টাকা।

—কেন?

—তা ছাড়া আমাদের সংসার চলে না।

—বাড়িতে কে আছে?

—বাবা, মা, ভাই—

—তাঁরা জানেন, তুমি এইভাবে রোজগার কর?

—জানলেও জানতে চান না, শুনলেও শুনতে চান না, বুঝলেও বুঝতে চান না। কারণ, তাঁদের দরকার টাকা।

—হুঁ। অনাদিপ্রসাদ কি যেন চিন্তা করেন, আমার কাছে দু'খানা দশ টাকার নোট আছে, রেখে দাও। বেশী থাকলে আরও দিতাম। আমি উঠছি, ছবিটা ভাল লাগছে না।

এবার মেয়েটি অবাক হয়, আপনার নাম ঠিকানা?

—তা জেনে কি লাভ? আবার হয়তো কোন সিনেমায় দেখা হয়ে যাবে।

এবার মেয়েটি বিরক্ত হয়, টাকার খুব প্রয়োজন না থাকলে আপনার এই ভিক্ষা আমি নিতাম না। আমিও মানুষ, শুধু ভাগ্যের বিপর্যয়ে—যাকগে সে কথা, সাহায্য যখন করেছেন, এই কাগজটা দিলাম, আমার নাম ঠিকানা লেখা আছে।

অন্ধকারের মধ্যেও অনাদিপ্রসাদ চেষ্টা করে পড়লেন, মেয়েটির নাম আরতি বসু।

॥ বাইশ ॥

অনাদিপ্রসাদ কেন সেদিন আরতির সঙ্গে বসে সিনেমাটা শেষ পর্যন্ত দেখলেন না? কেন ঐ মেয়েটির আহ্বান উপেক্ষা করলেন, কেন তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরলেন না—ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায়? এ কি লোকলজ্জা? না সংস্কারের হুমকি? না ভয়? হাতে তাঁর যথেষ্ট সময় ছিল, টাকাও ছিল পকেটে, তবু লেখক অনাদিপ্রসাদ আরতিকে বোঝবার চেষ্টা করলেন না।

আরতি একটি মামুলী মেয়ে, তার চেহারার বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। আর পাঁচটা কমবয়েসী মেয়ের মতই আরতি। বয়সের যাদু আছে, দেহে যৌবন, তাছাড়া সব কিছুই সাধারণ। অতি সাধারণ। উপন্যাসের নায়িকাদের মত তার হৃদয় মহত্ত্বে ভরা নয়, ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়েদের আরতি হিংসে করে। ওর চেয়ে যাদের অবস্থা ভাল তাদের সহ্য করতে পারে না। নিজের ক্ষতি হলে বস্তীর মেয়েদের মত ঝগড়া করে। যে অবস্থার মধ্যে সে মানুষ হচ্ছে তাতে সে খুশী নয়, তার ভাল খেতে ইচ্ছে করে, দামী শাড়ি পরতে ইচ্ছে করে, আর পাঁচটা মেয়ের মতই অনেক ইচ্ছে, অনেক স্বপ্ন। যার জন্যে তাকে এই পথে আসতে হয়েছে। না এসে উপায়ও ছিল না। বাবা মা ভাই আর পাড়ার মণ্টুদা, তাছাড়া মাঝে মাঝে দিদি জামাইবাবুরা আসে, তাদের একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে। যে ক'দিন বাড়িতে থাকে, এক মিনিট শান্তিতে তিষ্ঠোন যায় না, সারাক্ষণ চ্যাঁ, ভ্যাঁ, কান্নাকাটি মারামারি।

এই নিয়ে দিদির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়।

—তুই তো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াস।

আরতির প্রশ্ন, কি করতে হবে?

—বাচ্চাগুলো 'মাসী' 'মাসী' করে তোর কাছে যায়, একবারও তো কোলেও তুলিস না।

—যা অসভ্য তোমার ছেলেমেয়েগুলো, কোলে উঠেই পেচ্ছাব করে দেয়।

—দেখব, নিজের ছেলেমেয়ে হোক।

আরতি মুখখানা ভেটকি মাছের মত করে বলে, ওসব আপদের দরকার নেই।

দিদি চটে যায়, বিয়ে করবি না?

—তোমার বিয়ে দিতেই তো বাবার পাঁচ হাজার টাকা দেনা হয়েছে। মার গায়ে একরতিও সোনার গয়না নেই, আবার আদিখ্যেতা করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আমি বিয়ে করব কিনা? হুঃ!

ঢিল খেয়ে দিদিও পাটকেল ছোঁড়ে, সবাই জানে ঐ মণ্টুটার সঙ্গে ধিঙ্গিপনা করে ঘুরে বেড়াস, তাই বিয়ে করতে চাস না। দেখি ক'দিন মিষ্টি লাগে। পুরুষ মানুষকে খুব জানি, ক'দিন মজা লুটে নিয়ে তোর ছিবড়েটা ফেলে দেবে।

আরতির আস্ফালন, সেরকম পুরুষ মানুষ এখনও জন্মায়নি, যাকে ইচ্ছে আমি বাঁদর-নাচ করাতে পারি!

দুই বোনের ঝগড়ার মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত আছে বলা কঠিন। কিন্তু আজ সিনেমা থেকে বেরিয়ে বিনা পরিশ্রমে অনাদিপ্রসাদের কাছ থেকে কুড়ি টাকা পারিশ্রমিক পেয়ে আরতির মনে হলো মণ্টুদার কাছেই যায়; কারণ, অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

মণ্টুদা একই পাড়ার ছেলে। সেও অতি সাধারণ। ময়লা রঙ, পাতলা শরীর, বড় বড় চুল, চোখে চশমা। এম-এ পর্যন্ত পড়েছিল, দুতিন জায়গায় অস্থায়ী চাকরি করেছে, কিন্তু কোথাও পাকা হতে পারেনি। সকাল বিকেল কতগুলো টিউশনী করে সেই রোজগার থেকেই বাবার সংসার চালায়। গুরুজনরা মণ্টুর মত ছেলেকে বাহবা দেন। কারণ, সেণ্টিমেণ্টের নেশায় এরা বুঁদ হয়ে থাকে। বাবা, মা, ভাই, বোন—তাদের সমস্যার কথা ভাবতে গিয়ে নিজেদের দিকে আর তাকাতে পারে না। বাড়িতে অবিবাহিতা বোন থাকায় কোন মুখে সে নিজে বিয়ে করবে? আরতির মত মেয়েকে এই মণ্টু ভালবাসে। কিন্তু বিয়ে করার সামর্থ্য নেই। তবে হাতে পয়সা থাকলে কম দামের সিটে সিনেমা দেখায়, রেস্তরাঁয় বসিয়ে কাটলেট খাওয়ায়, আবার মাঝে মধ্যে এক আধখানা শাড়িও উপহার দেয়। মণ্টুরূপী মোল্লাদের দৌড় এই মসজিদ পর্যন্ত।

বড় রাস্তার মোড়ে যে চায়ের দোকানে বসে মণ্টু সাধারণত আড্ডা দেয় আরতি সেইখানে গিয়ে হাজির হলো। বলা বাহুল্য আরতিকে দেখে মণ্টু খুশী হলো। ব্যস্তভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আরে কি খবর আরতি? কতদিন পরে দেখা হলো।

আরতির পাল্টা জবাব, তুমিও তো কই খবর নাও না।

—বিকেলের দিকে দুদিন গিয়েছিলাম, তুমি বাড়ি ছিলে না।

আরতি স্বীকার করল, আজকাল বিকেলের দিকটা কাজে আটকে যাই।

মণ্টুর প্রশ্ন, নতুন কোন কাজ করছ?

—হ্যাঁ। চল না, বেড়াতে বেড়াতে গল্প করা যাক, এখানে বড় ভিড়। কোন একটা নির্জন জায়গায়—

—চল। একটা টিউশানী ছিল, আজ আর যাব না পড়াতে।

ওরা গিয়ে বসল নির্জনে জলের ধারে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে, ঝাপসা অন্ধকার, ভাল করে কারুর মুখ দেখা যায় না। অনেকে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, তবে জলের ধারে জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণীদের বসে থাকতে দেখলে তারা বিরক্ত করে না।

প্রথম প্রথম বাড়ি থেকে পালিয়ে মণ্টুদার সঙ্গে এই ধরনের কোন নিভৃত জায়গায় বসে আলাপ করতে আরতির মনে রোমাঞ্চ হতো। একটুকু ছোঁয়া লাগা, একটুকু কথা শোনা, তাই দিয়ে মনে মনে রঙে রসে জাল বোনা। চাঁদ উঠত, হাওয়া বইত, কতরকম শব্দ শোনা যেত, সবে মিলে সৃষ্টি করত একটা স্বপ্নরাজ্য, যেখানকার চিরকেলে রাজকুমারী আরতি আর সেই আদ্যিকালের রাজকুমার মণ্টুদা।

কিন্তু যত দিন যায় স্বপ্ন আর থাকে না। কঠিন বাস্তব দৈত্যের রূপ নিয়ে এসে জোর করে রাজকুমার আর রাজকুমারীকে আলাদা করে দেয়। মণ্টুদা সেই দিন থেকে খুঁজছে সোনার কৌটো। অফিসে অফিসে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে, কিন্তু আজও টাকা রোজগারের উপায় খুঁজে পায়নি। তবে আর কেমন করে সে দৈত্যের প্রাণ-ভোমরাকে মেরে স্বপ্নের রাজকুমারী আরতিকে পাবে!

আর অন্য দিকে? আরতিকে কে জাগিয়ে দিয়েছে সোনার কাঠির স্পর্শে, নির্ভীক মনে সে প্রবেশ করেছে যৌবরাজ্যে। প্রতিটি সন্ধ্যায় নতুন নতুন পুরুষমানুষ, আলাপের চাবিকাঠি সিনেমার টিকিটে। পাশাপাশি বসা, হাতে হাত রাখা, তারপর আলাপ। সন্ধ্যায় মাঠে বেড়ানো, হয়তো বা রেস্তরাঁর কেবিনে বসে খাওয়া, কিছু অর্থপ্রাপ্তি, রাত্রে বাড়ি ফেরা। দিনের পর দিন একই ধরনের জীবন, কিন্তু নূতন নূতন অভিজ্ঞতা। এ লাইনে আরতিকে নিয়ে এসেছিল মীরাদি। তখনও আরতির সচ্ছল সংসারের গৃহিণী হয়ে বেঁচে থাকার বাসনা ছিল। তখনও চাকরি খুঁজছিল।

—যা হোক তুমি আমায় একটা করে দাও মীরাদি। ঝি-গিরি করতে হয় তাও করব, বাসন মাজব, কাপড় কাচব, তবু—

মীরাদি খিলখিল করে হেসেছিল, তবু ঐ অপদার্থ মণ্টুটাকে বিয়ে করবি! কতগুলো অপোগণ্ড ছেলেমেয়ের মা হবি। ওসব উচ্ছ্বাস রাখ। ঝি-রাও

খুব সতী-সাধ্বী নয়। দিনের বেলা বাসন মাজে আর রাত্রি বেলা বাবু পাকড়ায়।

আরতি বিরক্ত হয়েছিল, এসব কি কথা বলছ মীরাদি?

—আজকের সমাজব্যবস্থাই তাই। তোর মণ্টুরা বিয়ে করতে পারে না, কিন্তু তোর মত মেয়ের সঙ্গে দু' দিন ফুর্তি করে বেড়াতে পারে।

—সবাই একরকম নয়।

মীরাদির আবার হাসি, তুই একেবারে ছেলেমানুষ। পুরুষমানুষ সব সমান। মণ্টুদাকে ছেড়ে বাবু ধর। বিকেলবেলা চল আমার সঙ্গে, আজকেই হাতেখড়ি হয়ে যাবে।

তখন আরতির কৌতূহলের বয়েস। বিকেলবেলা সেজেগুজে মীরাদির সঙ্গে সে বেরল। তার পরের পদ্ধতি এক। কোন বাংলা সিনেমার তিনখানা টিকিট কাটল মীরাদি। আরতি প্রশ্ন করেছিল, অন্যজন কে? মীরাদি ফিক করে হাসে, বাবু, দেখ না কিরকম ছিপে মাছ তুলি।

আশ্চর্য অভিনয়-ক্ষমতা মীরাদির। দশ মিনিটের মধ্যে বাড়তি টিকিটটি বিক্রি করে দিল একটা গেবেচারা ছেলেকে। বলবার ধরন এক, একটা টিকিট আমাদের বেশী হয়ে গেছে, আপনার যদি দরকার থাকে—

ছেলেটি টিকিট কিনল। বুঝতে পারল না টোপ গিলেছে। সিনেমার হলে ঢুকে বসল আরতি আর মীরা দুটি মেয়ের মাঝখানে। বাইরের লোকের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হবার কিছু নেই। তারা ভাবছে এরা একই সঙ্গে এসেছে। কিন্তু ছবি চলতে চলতে মীরাদি জমিয়ে ফেলল ছেলেটির সঙ্গে। পুরো ছবি দেখতেও আর তার আগ্রহ রইল না। ইণ্টারভ্যালে তিনজনেই বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ ট্যাক্সি চড়া, তারপর ভিক্টোরিয়ার সামনে অন্ধকার মাঠে।

চতুর মীরাদি হঠাৎ বলে উঠল, ও মা, আমাকে যে পিসীমার বাড়ি যেতে হবে, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আমি এখন চলি, আপনি আরতির সঙ্গে গল্প করুন। কাল বরং তুই আমার কাছে আসিস আরতি।

আরতিকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই মীরাদির প্রস্থান।

সম্পূর্ণ একটি অচেনা পুরুষের সঙ্গে অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতা আরতির এই প্রথম। তখনও জানবার কৌতূহল, এর পর কি হয়? আশ্চর্য, সেই বোকা ছেলেটি কিন্তু মুখর হয়ে উঠল। আরতির পরিচয় জানবার জন্যে প্রশ্নে প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে মারল। হাত ধরাধরি করে হাঁটল, পাশাপাশি বসে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেল, কতরকমভাবে আদর করল। আরতির ব্যাগের মধ্যে দশটা টাকা ভরে দিল। আবার ট্যাক্সিতে করে বেরিয়ে গঙ্গার ঘাটে একটা চক্কর মেরে আরতিকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তারই নির্দেশমত একটা রাস্তার মোড়ে।

আরতির এই প্রথম রোজগার। কই, খারাপ তো কিছু লাগল না, মনে কোন গ্লানি নেই। মণ্টুদা তো তার সঙ্গে ঐরকমই করে, শুধু শেষকালে টাকাটা দিতে পারে না, এই যা! তবে আর মণ্টুদার সঙ্গে ঐ অপরিচিত মানুষটির তফাত কি? মীরাদি ঠিকই বলেছে, সব পুরুষমানুষই সমান—সবাই আরশোলা।

পরদিন আরতি কিন্তু আর মীরাদির সঙ্গে দেখা করেনি, জানায়ওনি তার এই নতুন অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু সেই দিন থেকে এই ব্যবসা শুরু হয়ে গেল। প্রতিটি সন্ধ্যায় প্রসাধন করে সিনেমা হলের সামনে দাঁড়ানো—টিকিট কাটা—বাবু ধরা।

মণ্টুদা জিজ্ঞেস করল, কোথায় কাজ করছ?

আরতির মিথ্যে বলা ছাড়া উপায় ছিল না, একটা ছোট কোম্পানীতে, ওরা মাথার তেল, গায়ে মাখার সাবান তৈরি করে। আমাদের রেখেছে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ওদের জিনিস বিক্রি করার জন্যে।

—কত মাইনে?

—সত্তর টাকা। তা ছাড়া ভাল বিক্রি করতে পারলে কমিশন দেয়।

—এ সুখবরটা আমায় আগে দাওনি। কে চাকরি করে দিল?

—মীরাদি।

এবার আরতির প্রশ্নের পালা, মণ্টুদা, তোমার বাড়ির খবর কিরকম?

—একঘেয়ে।

—বাবা কেমন আছেন?

—আজকাল আর বাইরে বেরুতে পারেন না, খাটেই শুয়ে থাকেন।

—মা?

—ব্লাড-প্রেসার কখনও বাড়ে কখনও কমে।

—লালটু?

—এ বছরেও ফেল করেছে।

—দাদা বউদি?

—আগে যাও বা খবর-টবর নিত, আজকাল তাও বন্ধ করেছে।

—তার মানে তোমার ঘাড়েই সব।

—একরকম তাই, ঘাড়টা খুব শক্ত তাই ভাঙেনি।

আরতি টিপ্পনী না কেটে পারল না, তুমি বড় বোকা মণ্টুদা।

মণ্টুদা স্বীকার করল, সবাই তো তাই বলে।

আরও কিছুক্ষণ কথা চলল। বৈচিত্র্যহীন সংলাপ। গত দু' বছর ধরে যা আলাপ চলছে তারই পুনরুক্তি। খানিকটা মসলামুড়ি খাওয়া হলো, কিছুটা চানাচুর গরম, তারপর আলুকাবলি। এক সময় উঠে পড়া। মণ্টুদার চিরন্তন

জিজ্ঞাসা, আবার কবে দেখা হবে?

আরতির দায়সারা উত্তর, দেখি, আবার কবে সময় করতে পারি।

বেচারির দোষ নেই, সেই বা কি করে বলবে, আবার কবে অনাদিপ্রসাদের মত কোন আহাম্মক বিনা পরিশ্রমে পারিশ্রমিক দিয়ে যাবে। যখন আরতি ফুরসত পাবে সন্ধ্যাবেলা জলের ধারে বসে এইভাবে মণ্টুদার সঙ্গে একঘেয়ে খবরের জাবর কাটতে।

আরতি যখন রাত্রে বাসায় ফেরে, বাবা তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েন। সত্যি ঘুমোন কিনা বলা মুশকিল। তবে খাটের ওপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন এবং ঘরের আলো নিবোনো থাকে। নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের বাড়ির কর্তা। আগের যুগের কর্তাদের সঙ্গে আরতির বাবার কোন মিল নেই। আজকের জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে এ ভদ্রলোককে অনেকখানি স্বার্থপর হতে হয়েছে। আগেকার দিনে বাবাদের মাংস খেতে ইচ্ছে করলে বাজার থেকে এক সের মাংস কিনে এনে বাড়িতে রান্না করে ছেলে মেয়ে বউ সবাই মিলে বসে আনন্দ করে খেতেন। কিন্তু আধুনিক বাবার আজকের বাজারে এক কিলো মাংস কেনার অবস্থা নেই, তাই মাংস খেতে ইচ্ছে করলে ভদ্রলোক একলা কোন রেস্তরাঁয় ঢুকে কোয়ার্টার প্লেট মাংস খেয়ে মুখটি মুছে বেরিয়ে যান। উনি সিনেমাও দেখেন, তবে পয়সার অভাবে সবাইকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই অফিস পালিয়ে ম্যাটিনীতে ছবি দেখেন যাতে বাড়ির লোক বুঝতে না পারে। কিন্তু আরতির মা আগেকার দিনের মায়েদের মত বোকা নন, তিনি স্বামীর জামার পকেট হাতড়ে অনেক সময় ট্রামের টিকিটের সঙ্গে সিনেমার টিকিটও পেয়েছেন, তাই তিনিও সিনেমা দেখেন অন্য বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে। বাজারের পয়সা থেকে সরিয়ে যে ক'টি টাকা তাঁর মাসিক সঞ্চয় তাই দিয়েই দুপুরবেলা ছবি দেখতে যান ছেলে-মেয়েদের না জানিয়ে। অজুহাত, অমুকের মার সঙ্গে গল্প করতে যাচ্ছি বা কারুর মেয়ের জন্য বাজার করে দিতে হবে। এ জায়গায় স্বামী স্ত্রী দু'জনেরই যথেষ্ট মিল, দু'জনেই দু'জনকে লুকিয়ে অনেক কিছু করেন, কিন্তু কেউ কাউকে দোষারোপ করেন না।

আরও এক জায়গায় দু'জনের মিল আছে, সোমত্থ মেয়ে আরতির বিয়ে দিতে পারছেন না বলে দু'জনেই নিজেদের অপরাধী মনে করেন। যে বাপের টাকার জোর নেই, যে মেয়ের চেহারার জোর নেই, যাদের কোন খুঁটির জোর নেই তাদের বাড়ির মেয়ের বিয়ে হবে কি করে? প্রথম প্রথম দু' এক জায়গায় সম্বন্ধ করলেও এখন সে আশা ছেড়ে দিয়েছেন। বোঝেন, বয়েসের দোষে মেয়ে এখন চারদিকে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াবে। মণ্টুর মত কতগুলো অপদার্থ জুটবে, রাত্রে বাড়ি ফিরতে মেয়ে দেরি করবে, কিন্তু তবু আরতিকে কোন

কথা বলতে তাদের সাহস হয় না। কারণ, মুখরা মেয়ে ছ্যার ছ্যার করে শুনিয়ে দেবে অক্ষম বাবা-মায়ের কর্তব্যবিমুখতার কাহিনী। তাই মেয়ে যখন বাড়ি ফেরে, বাবা চোখ বুজে ঘুমের ভান করেন।

মাও জিজ্ঞেস করতে চান না এত রাত পর্যন্ত আরতি কোথায় ছিল। দরকারে-অদরকারে মেয়ের কাছেই তো তাঁকে হাত পাততে হয়। ব্যাগে টাকা থাকলে আরতি মাকে সাহায্য করে, বিমুখ করে না। যদিও মা বলেন, মাসের গোড়ায় তোকে টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব।

মেয়ে জানে, এ কথার কোন অর্থ নেই। অভাবের মরুভূমিতে ক' ফোঁটা জলের মত ঐ ক'টা টাকা পড়তে না-পড়তে শুকিয়ে যাবে।

বাবাও মাঝে মাঝে হাত পাতেন, তবে অত পরিষ্কারভাবে নয়। উনি হয়তো বলেন, আরতি, বাইরে যাচ্ছিস? যদি পারিস মা, ইলেকট্রিকের বিলটা জমা দিয়ে দিস, আমার জামার পকেটে আছে।

বলা বাহুল্য, আরতি বাবার পকেট থেকে শুধু বিলটাই পায়, কোন টাকা পায় না। চাইলেই শুনতে হবে, মাসের শেষ কিনা, তাই বলছিলাম—

আরতি বুদ্ধিমতী, তার বুঝে নিতে দেরি হয় না ইলেকট্রিক বিলের নামে এই ক'টা টাকা বাবাকে ঘুষ দিতে হবে, তা হলেই বাড়িতে শান্তি। যত রাত্রে, যে অবস্থাতেই সে বাড়িতে ফিরুক না কেন, বাবা কিছু বলবেন না। চোখ খুলে হোক, বুঁজে হোক, তিনি ঘুমবেন।

কিন্তু বিপদ হয় ভাইটাকে নিয়ে। ঠিকমত পড়াশুনো করতে পারেনি। অনেক কষ্টে টেকনিকাল স্কুল থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে বেরিয়েছে, চাকরিও জুটিয়েছে, তবে বেশী মাইনে নয়, আর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। ফ্যাক্টরী থেকে বাড়িতে ফিরতেই সন্ধ্যে হয়ে যায়। তারপর হয়তো বার হয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। সেদিন খেতে বসতে তার দেরি হয়। ইতিমধ্যে আরতি হয়তো ফিরে আসে। ভাইবোনের নিভৃত আলাপ রান্নাঘরে বসে। বাবা মা তখন শুয়ে পড়েছেন, অতএব আড়ি পেতে শোনবার কোন লোক নেই।

আরতির প্রশ্ন, এত রাত হল ফিরতে, কোথায় গিয়েছিলি?

মানু খেতে খেতে উত্তর দেয়, ফ্যাক্টরীতে এত গরম, সন্ধ্যেবেলা তাই ফাঁকা মাঠে গিয়ে বসে থাকি।

—একলা?

মানু দিদির দিকে আড়চোখে তাকায়, তার মানে?

—এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

মানু বিরক্ত স্বরে বলে, কেন কথা ঘোরাবার চেষ্টা করছ ছোড়দি! তুমি জানতে চাইছিলে, কোন মেয়ে জুটেছে কিনা, এই তো? না, জোটেনি, জুটবেও না। ক'টাকা মাইনে পাই, যা দেখিয়ে মেয়ে ধরব?

আরতি হাসবার চেষ্টা করে, তুই এত চটে যাবি বুঝতে পারিনি।

—সাধে চটি না, চটি তোমাদের জন্যে।

—আমি আবার কি করলাম?

—কিছু করনি, তবে করতে পারতে। আমার সঙ্গে একটি পাঞ্জাবী ছেলে কাজে ঢুকেছিল, সে আজ আমার ওপরে চলে গেল প্রমোশন পেয়ে। অথচ আমি যেখানে ছিলাম সেইখানে পড়ে রইলাম।

—কেন?

—ঐ ছেলেটি তার বোনকে তুলে দিত বস্-এর স্কুটারের পেছনে কয়েকটি সন্ধ্যার সান্ধ্যভ্রমণে কার্যসিদ্ধি। তুমি যদি আমার কথা শুনতে আমার বস্-এর সঙ্গে—

আরতি ধমক দেয়, তোর বড় বাড় বেড়েছে মানু, আমি না তোর দিদি!

মানুর চোখে উপেক্ষা, আমি তো জানি, তুমি মণ্টুদার সঙ্গে ঘুরে বেড়াও তার সঙ্গে আড্ডা মারো, তার সঙ্গে শোও। ঐটুকুই যদি আমার বস্-এর সঙ্গে করতে, তোমার নিন্দে বেশী করে রটত না, তবে আমার উন্নতি হতো।

আরতির চোখ জ্বলতে থাকে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। মানু যা বলেছে তা স্পষ্ট কথা। মণ্টুদা ছাড়াও অন্যদের সঙ্গেও তো আরতি ঐভাবেই সন্ধ্যেটা কাটায়, তবে মানুর বস্-এর বেলা আপত্তি কি ছিল? সেখানেও প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা। মানুর উন্নতি হয় আরতি চায় না। কারণ হয়তো খুঁজে বার করা শক্ত, তবু ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন হিংসের শিকড় আছে, মাছের কাঁটার মত যার অস্তিত্ব খচ্‌খচ্‌ করে গলায় লাগে।

মানুর সদম্ভ উক্তি, তোমরা কেউ আমাকে চাও না—বাবা, মা, তুমি সবাই। কারণ, আমি বোধহয় তাঁদের অবাঞ্ছিত সন্তান, আর তোমার মর্যাদাহীন ভাই।

এই হলো অবক্ষয়ের চিত্র। হায় অনাদিপ্রসাদ, আরতির সঙ্গে বেরলে এদের জীবনটা তুমি দেখতে পেতে, তোমার মিথ্যে মর্যাদাবোধ বাস্তব থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। কি করে তুমি লেখক হবে?

॥ তেইশ ॥

এক একটি ভয়াবহ রাত্রির স্মৃতি মানুষ সহজে ভুলতে পারে না, যেমন ভুলতে পারেনি কবিতা মিতার বাসার সেই কালরাত্রির কথা, যেদিন বন্ধ দরজার বাইরে উন্মত্ত জন্তুর মত গর্জন করছিল হলধরবাবু, আর ঘরের মধ্যে খাটের ওপর বেহেড মাতাল হয়ে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিল মিতা আর

প্রাণপণে দরজাটাকে ঠেলে রেখে ভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাচ্ছিল অসহায় কবিতা। সে রাত্রি কাটতে অনেক সময় লেগেছে। জন্তুটা এক একবার দরজা থেকে সরে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে আবার ফিরে আসে। আরও জোরে ধাক্কা মারে। এভাবে কতক্ষণ চলেছে কবিতার খেয়াল নেই। এক সময় শাসানি শোনা গেল, ঠিক আছে, আজ তোকে ছেড়ে দিলাম কিন্তু হলধরকে যখন ক্ষেপিয়েছিস ঠিক তোকে ঝুঁটি ধরে নিয়ে আসব, চাঁদির জুতো মেরে তোর বন্ধুর মতই এই ঘরে পুষব। তখন দেখব তোর সতীপনা।

জুতোর শব্দ শোনা গেল হলধরবাবুর, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে, পরে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। তবু কবিতা প্রথমটা নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, অনেকক্ষণ অবধি দরজায় পিঠ দিয়ে বসে ছিল। ক্রমে ভরসা এল, মনে হলো লোকটা সত্যিই গেছে। ফিরে তাকাল মিতার দিকে। সে তখনও বেহুঁশই বলতে গেলে। এলোমেলো শাড়ি, জামার বোতাম খোলা, মাথার চুল খোঁপা বাঁধাই রয়েছে, এলিয়ে পড়েছে দেহটা।

একবার কবিতার মনে হলো আজ সন্ধ্যায় মিতার সঙ্গে না বেরলেই তার ভাল হতো, বিকেলে এখান থেকে বেরিয়ে রানাঘাটে ফিরে যেতে পারত, নিশ্চয় বাড়ির লোকেরা তার জন্যে ভাবছে, আর এদিকে ঐ মাতাল পুরুষমানুষটা মিতার উন্মত্ত দেহটাকে নিয়ে নিশ্চয় মহানন্দে রাত কাটাত। শুধু তারই জন্যে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল।

কবিতা অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে ভোর হয়। মিতার সঙ্গে কথা বলার আর তার ইচ্ছে ছিল না। কীই বা বলবার আছে। মিতার সোহাগের বাবু যে তারই ঘরে কবিতাকে নিয়ে শুতে চেয়েছিল তা শুনলে মিতা নিশ্চয় খুশী হবে না, হয়তো ভুল বুঝবে, ভাববে কবিতা তার বাবুর সোহাগে ভাগ বসাবার চেষ্টা করছে।

সেইজন্যেই ভোর হতেই মিতার বাসা ছেড়ে আস্তে আস্তে নেমে দপ্তরীপাড়ার অলিগলি পেরিয়ে কবিতা এসে হাজির হলো অশোক জানার প্রেসে। তখনও দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করতে মেশিন-ম্যান নিরঞ্জন ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল। তখনও চোখ থেকে তার ঘুম যায়নি, হাই তুলে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, তুমি এত সকালে?

কবিতা উত্তর দিল, কাল রানাঘাটে ফিরতে পারিনি।

—সে তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি।

—আমার বন্ধুটার খুব অসুখ।

—তাই নাকি, কি হয়েছে?

—এই জ্বরজাড়ি গায়ে ব্যথা, দেখবার কেউ নেই। তাই রাত্রিবেলাটা ওর কাছে থাকতে হলো।

নিরঞ্জন টিপ্পনি কাটল, তবু ভাল।

—তার মানে?

—মেয়েরা রাতে বাড়ি না ফিরলেই ভয় লাগে, এই আর কি।

কবিতা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, আমি সে রকম মেয়ে নই নিরঞ্জনদা, ওসব ছেঁদো কথা অন্য মেয়েদের ব'লো। কত কষ্ট করে আমাকে যে থাকতে হয় তা যদি জানতে—

—হ্যাঁ, কষ্ট তো শুধু তোমরাই কর, আমাদের তো সুখের জীবন।

কবিতার মন্তব্য, তোমরা পুরুষ মানুষ।

নিরঞ্জন পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করে হেসে বলে, মাঝে মাঝে সেই কথাটাই ভুলে যাই। যাক গে, ভোরবেলা এসেই যখন পড়েছ, চায়ের জল চাপাও, আমি যাই গরম কচুরি সিঙ্গাড়া কিনে আনি।

—আমি খাব না, তুমি আমাকে দেখলেই কি রকম খোঁটা দিয়ে কথা বল।

—আর বলব না, লক্ষ্মীটি, ভাল করে চা বানাও দেখি। তোমাকে খুশী করার জন্যে আজ না হয় জিলিপিও নিয়ে আসব।

কবিতা হেসে ফেলে, কি করে জানলে জিলিপির কথা শুনলে আমার রাগ পড়ে যাবে? সত্যি আমি জিলিপি খেতে ভালবাসি। ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি হাত মুখ ধুয়ে চায়ের ব্যবস্থা করছি।

কবিতা শুধু হাত মুখই ধুল না, কলের জলে গাও ধুয়ে নিল। কেমন নিজেকে যেন তার অপবিত্র মনে হচ্ছিল। প্রেসের দপ্তরী ঘরের এক কোণে ও সব সময় একটা ধোপ শাড়ি রেখে দিত, যদি হঠাৎ কোথাও বেরতে হয় তার জন্যে। আজ স্নান সেরে ঐ শাড়িখানা পরেই সে স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল বসালো, চারদিকে তাকিয়ে দেখল অনেক কাজ বাকি আছে। একটা নতুন বই-এর ফর্মা ভাঁজাই চলছে, তা ছাড়া এক হাজার প্যাড বাঁধতে হবে, পাঁচখানা রসিদ বই। তবু আজ রানাঘাটে না ফিরলেই নয়। সকালের দিকটা কাজ করা যাবে না, যদি পারে তো বিকেলে ফিরে আসবে। খবরটা বলে যেতে হবে নিরঞ্জনকে, যদিও জানে অশোক জানা শুনলেই বিরক্ত হবে। কিন্তু সে নিরুপায়। খাবার নিয়ে ফিরে এসে নিরঞ্জন সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে এসে একটা সিগারেট ধরালো। কবিতার দিকে চেয়ে তারিফ করে বলল, বাঃ, আজ তোমায় বেশ পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

—সে বোধহয় এই ধোপ শাড়িটার জন্যে।

—না, তা নয়। চোখে মুখে বিরক্তির ভাব নেই, কত সহজ।

কবিতা হাসল, সে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে হচ্ছে না বলে।

নিরঞ্জনও হাসল, আমি তোমায় খুব বিরক্ত করি, না কবিতা? কেন করি জানো? তোমাকে আমার ভাল লাগে বলে।

—থাক আর ঢঙ করে কথা বলতে হবে না। হঠাৎ এত প্রশংসা কেন? চায়ে একটু বেশী চিনি দিতে হবে নাকি?

—তোমার কোন রসকষ নেই।

—তাও তো আমি কবিতা লিখি, গান বাঁধি—

—কই, অনেকদিন তো নতুন কিছু শোনাওনি!

কবিতা অন্যমনস্ক স্বরে বলে, তা সত্যি, অনেকদিন কিছু লেখা হয়নি।

চা খেতে খেতে কবিতা জানিয়ে দিল, ঐদিন সে কাজে আসতে পারবে না। নিরঞ্জন যেন বাবুকে খবরটা দিয়ে দেয়।

নিরঞ্জন অবশ্য অনুরোধ করেছিল, কি দরকার বাবা, হাতের কাজগুলো শেষ করে তাড়াতাড়ি চলে যাও না।

—উহুঁ, বাড়িতে ভাববে, তা ছাড়া সারা রাত আমি কাল ঘুমইনি।

—বেশ তো, এখন ঘুমিয়ে নাও। দুপুরবেলা হোটেলে মাংস-ভাত খাওয়াব।

কবিতা হাসল, খুব পয়সা হয়েছে বুঝি?

—ওভারটাইমের টাকা পেয়েছি।

—তুমি একলা বসে খেও, আমি চললাম। সত্যি কথা বলতে কি, কাজ করতে আজ ইচ্ছে করছে না।

—কেন কি হয়েছে?

কবিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কি জানি।

কবিতা মিথ্যে বলেনি, সত্যিই তার কাজ করতে ভাল লাগছিল না। কেন, এ কথার সে উত্তর দেবে কি করে? জবাব দিতে গেলে বলতে হয়, 'কি জানি'। কারণ কবিতা জানে না সে কি চায়। অভাব-অনটনের মধ্যে মানুষ হয়েও সে ভেবেছিল একবার বড় হয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে পারলে নিশ্চয় সে জীবনটাকে নিজের পছন্দমত চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, স্বপ্ন দেখেছিল একটা সুখী নিশ্চিন্ত সংসারের। সে মিতার মত স্বার্থপর কোন দিনই নয়। তার স্বপ্নরাজ্য থেকে বাবা মাকে সে বাদ দেয়নি, বাদ দেয়নি ছোট ভাই-বোনদের। কিন্তু কতটুকু সে করতে পেরেছে সারা দিন খেটে! শুধু রেশনের টাকাটারই যোগান দিতে পারে সংসারে, তার বেশী আর কিছুই নয়। ছোট-বেলায় যখন কবিতা লিখত, বন্ধুরা বলত বড় হলে তার কত নাম হবে, তার লেখা ছেপে বেরবে। কিন্তু হলো কই? লেখাপড়াটুকুও তো ভাল করে শেখবার সুযোগ পেল না। জ্ঞানের পরিধি সীমিত, মাত্র গুটিকয়েক শব্দ

নিয়ে নাড়াচাড়া করা। যা ভাবে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। এই অক্ষমতাই তাকে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দেয়, আপনা থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। শুধু হতাশা, আর ব্যর্থতা।

মিতার জীবনধারণের রীতি নিজের চোখে দেখে কবিতা মনে মনে আরও শঙ্কিত হয়েছে। ও মেয়েটার ভবিষ্যৎ কি? ভেবেছিল নিজের পায়ে দাঁড়াবে, সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না পাঁকের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে! পুরুষ মানুষের চোখে নেশা ধরাতে গিয়ে মিতা আজ নিজেই নেশুড়ে। মদ তাকে জড়িয়ে রেখেছে কড়া আচারের মত, এর থেকে মুক্তি নেই। আজ হলধরবাবু কাল হয়তো অন্য কোন বাবু জুটবে, ধাপে ধাপে নামতে হবে নর্দমায়, তারপর কি আছে মেয়েটার কপালে কে জানে।

কবিতার ইচ্ছে ছিল না রানাঘাটে পৌঁছে মিতার মার সঙ্গে দেখা করে। কি প্রয়োজন এই দুঃসংবাদ তাকে দেবার। কিন্তু বাসায় পৌঁছে প্রথমেই মিতার মার সঙ্গে দেখা হলো। একটা হাড়ের কাঠামোর ওপর শাড়ি জড়ানো, বলল, মিতার খবর নিতে এসে শুনলাম, তুইও নাকি রাত্রে ফিরিসনি?

—না, বড্ড কাজের চাপ ছিল।

—হ্যাঁরে, মিতার সঙ্গে দেখা হয়েছে? কিছু বলল?

কবিতা মিথ্যে বলতে বাধ্য হয়, ওদের কারখানায় গিয়েছিলাম, দেখা হয়নি।

—কেন? কাজে যাচ্ছে না?

—যাচ্ছে, মানে তখন ছিল না। আমি বড্ড ক্লান্ত মাসীমা, যদি ওর কোন খবর পাই জানিয়ে আসব।

মিতার মারও দীর্ঘশ্বাস পড়ে, কি মেয়েই পেটে ধরেছিলাম! সারা জীবন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারল। যাক গে যাক, যা হবার হবে। আজ তো শুনলাম তোকে দেখতে আসছে। ভালয় ভালয় পছন্দ হয়ে গেলেই বাঁচি।

এ খবর কবিতার জানা ছিল না, বললে, কে বললে?

—কেন, তোর মা।

কবিতা সোজা গিয়ে হাজির হলো রান্নাঘরে মায়ের কাছে, আবার কি তামাশা হবে শুনছি? আজ নাকি আমাকে কে দেখতে আসছে?

কবিতার মা মেয়েকে দেখে নিশ্চিন্ত হন, যাক, তুই ফিরে এসেছিস। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যদি কালকের মত আজকেও কলকাতায় আটকে যাস তাহলে সন্ধ্যেবেলা ছেলের বাড়ির লোকদের কি বলব?

কবিতা কঠিন স্বরে বলে, তুমি তো জান সঙ্ সাজতে আমার ভাল লাগে না, তবে কেন বার বার এইভাবে মেয়ে দেখাবার নাম করে আমায় কষ্ট দাও! আমি তো তোমাদের গলগ্রহ হয়ে নেই, আমি তো রোজগার করছি।

—তবু আমাদের কর্তব্য।

—দুনিয়াসুদ্ধ লোক শুধু কর্তব্য করে যাচ্ছে, তবু কিছুই তো হয় না দেখি। কর্তব্য না করে চোখ বুজে পড়ে থাক না, তা হলেও দেখবে সংসার চলছে, পৃথিবী ঘুরছে।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, এ সম্বন্ধ কে আনল?

—রতন ঠাকুরপো।

কবিতা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সেই দালালটা?

—আঃ কি বলছিস! তোদের কত ভালবাসে, তোদের কাকা।

—বলিহারি কাকা, আজকে এই ক্যাম্পের যতকিছু দুর্দশা ঐ শয়তান রতনকাকার জন্যে। গ্রামের লোক, এক সঙ্গে পাকিস্তান থেকে তোমরা এসেছিলে। মানুষটাকে সবাই অকপটে বিশ্বাস করেছিলে, তারই সুযোগ নিয়ে ঐ মানুষটা প্রত্যেকের নাম করে 'গ্রাণ্টে'র টাকা চুরি করেছে। সরকারী অফিসারদের সঙ্গে সড় করে তোমাদের মত বোকাদের ঠকিয়েছে। পোড়ামুখো দালাল।

মা থামাবার চেষ্টা করেন, চুপ কর কবিতা। আজকাল যা তোদের মুখ হয়েছে! রতন ঠাকুরপো গণিমান্যি লোক, তাছাড়া বিপদের সময় সাহায্যও তো করেছে—

—সেই বিশ্বাসেই থাকো। ঐ রতন কাকাদের জন্যেই উদ্বাস্তুদের এই হাল, ইতিহাসে এদের নাম লেখা থাকবে, মীরজাফরের মতই এরা আমাদের ডুবিয়েছে। যদি দেশে সত্যিকারের শাসন থাকত তাহলে ঐ মানুষগুলোকে শুলে চড়াত।

কবিতার মা কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেলেন। কবিতাও কিছুক্ষণ গজগজ করে মাটিতে বিছানাটা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ল। রতন কাকার ওপর রাগের অবশ্য কবিতার বিশেষ কারণ ছিল। সে ছোটবেলা থেকে জানত ঐ মানুষটা শঠ, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ। বুঝত, ওর বাবার মত ভাল মানুষদের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের নাম করে সরকারী দৌলত ফাঁক করাই তার নেশা। কিন্তু ভাবতে পারেনি, ঐ প্রৌঢ় লোকটা এই ক্যাম্পের এবং অন্য উদ্বাস্তু কলোনীর মেয়েদের দালালি করে। কথাটা রতনকাকা তার কাছে সরাসরি পেড়েছিল, আজকে কলকাতায় তুই নাই বা গেলি, কবিতা।

—কেন কাকা?

—না মানে, আমার এক বন্ধু খুব বড় অফিসার, বিশেষ কাজে এখানে আসছে, ভাবছিলাম তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

কবিতা বিস্মিত হয়, আমার সঙ্গে? কেন?

—আহা আলাপ করতে ক্ষতি কি? বলা যায় না তোর বাবার সে দরখাস্তটা

অনেকদিন থেকে পড়ে আছে হয়তো পাশ হয়ে যাবে।

—আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না রতন কাকা।

এইবার রতনকাকার মুখোশ খসে পড়ে, কচি খুকীটি তো নও, কলকাতায় যাচ্ছ, রোজগার করছ, শহরের চাল-চলন সবই তো শিখেছ। প্রেসে কাজ করার নাম করে কত জায়গায় ঘুরে বেড়াও তা কি আমার জানতে বাকি আছে! মাঝে মাঝে না-হয় আমার কথা শুনলে, তাতে দু' পয়সা রোজগারও হবে, নিজের আখেরটাও গুছিয়ে নিতে পারবে।

স্তম্ভিত কবিতা শুধু বলে, ছি ছি! আপ'নি এই?

—কি?

—মেয়েমানুষের দালাল?

রতন কাকা চটে যায়, চুপ কর। চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে হবে না। না যাবি তো বয়ে গেল। এটুকু জানবি, এ ক্যাম্পের যত ক'টা মেয়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে, সবাই আমার কথামত চলেছে—সে মিতা, সন্ধ্যা, আরতি, যেই হোক না কেন। তুমি ব্যতিক্রম হিসেবে থাকতে চাও, থাক। তবে আমার কাছ থেকে আর কোন দিন সাহায্য চেয়ো না। বরং ক্যাম্প থেকে তল্পিতল্পা গুটোও।

সেই রতন কাকা আজ বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে, তারাই মেয়ে দেখতে আসবে আজ সন্ধ্যের সময়। এর আগেও অনেকবার কবিতাকে দেখতে এসেছে কিন্তু কোন পক্ষেরই তাকে পছন্দ হয়নি। রঙ ময়লা, চেহারাও খুব সুশ্রী না, লেখাপড়ায় কমজোর, তার ওপর বাপের পয়সা নেই। কে আর তাকে যেচে বউ সাজিয়ে ঘরে নিয়ে যাবে। তাই মনে মনে আজ সে প্রস্তুত হয়েই ছিল, পাত্র পক্ষের লোকেরা যদি বেয়াড়া কিছু বলে সে তার উচিত জবাব দেবে। আর বাপ মায়ের ইজ্জতের কথা ভেবে মুখ বুজে থাকবে না।

আজও তার মা নিজে হাতে মেয়ের চুল বেঁধে দিলেন। পাশের বাড়ির বউয়ের কাছ থেকে চেয়ে এনে পরালেন ফিকে কমলা রঙের একটা শাড়ি। মুখে লাগালেন পাউডারের প্রলেপ, কপালে কুমকুমের টিপ, হাতে দুগাছি চুড়ি, কানে ফুল।

যারা মেয়ে দেখতে এল তারা চারজনই যুবক। বয়োজ্যেষ্ঠরা কেউ সঙ্গে আসেননি, এমন কি যিনি সম্বন্ধ এনেছেন সে রতন কাকাও নয়। মেয়ের পক্ষ থেকে আপ্যায়নের ত্রুটি হলো না, ঘরের মধ্যে শতরঞ্চি পেতে তাদের বসানো হলো। মিষ্টির প্লেট চায়ের কাপ দেওয়া হলো সকলের সামনে। কবিতার ছোট বোনেরা হাতে তালপাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল অতিথিদের। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হলো না, অন্যান্যবারের মতই ধারালো মন্তব্য—'গায়ের রঙ বড্ড কালো', 'তাই তো, একেবারে একটাও পাস না করলে আজকালকার দিনে

কি চলে', 'সে কী, মেয়ে কলকাতায় যায় চাকরি করতে! এসব কথা তো জানতাম না', 'ধরুন, যেখানেই বিয়ে হোক, কিছু তো আপনাদের দিতে হবে। অন্তত একটা খাট, নমঃ নমঃ করে এক সেট গয়না, বরের আংটি বোতাম, দু'চারখানা জামা কাপড়', 'মিছি মিছি সময় নষ্ট হলো, রতনবাবু জেনে-শুনে কেন যে এখানে পাঠালেন!'

এর কোন মন্তব্যটিই কবিতার কাছে নতুন নয়। এসব সে বহুবার শুনেছে, কিন্তু আজ এদের কথার ধরনে কেমন যেন চিমটি কাটার ভাব ছিল। কেন জানা নেই কবিতার মনে হলো, রতনকাকা ইচ্ছে করে তাদের অপদস্থ করার জন্যে এই লোকগুলোকে পাঠিয়েছে। এ ধারণা তার দৃঢ় হয়েছিল আরও এইজন্যে যে, বাবা মা বুঝতে না পারলেও কবিতা ধরতে পেরেছিল ঐ চারটি ছেলেই নেশার ঘোরে রয়েছে, তাদের মুখে মদের গন্ধ। চাপা দেবার জন্যে একমুখ পান খেয়েছে আর জামায় লাগিয়েছে আতর।

কবিতা হঠাৎ বাবা মাকে অনুরোধ করল, তোমরা একটু অন্য ঘরে যাও, আমি এ'দের সঙ্গে কথা বলব।

এ প্রস্তাবে ছেলের পক্ষের লোকেরা উৎসাহ দেখাল, ভাল কথা, যদি মেয়ের কিছু জিজ্ঞেস করবার থাকে—

কবিতার সরাসরি প্রশ্ন, পাত্র কি আপনাদের মধ্যেই আছেন?

তারা রসিকতা করে, যদি থাকে?

—তার সঙ্গেই আমি কথা বলতে চাই।

কানামাছি খেলার মত পরস্পর পরস্পরকে ঠেলে দেয়, তুই তো পাত্র, যা না, কথা বল মেয়ের সঙ্গে।

সকলেই সকলকে দেখায় কিন্তু কে পাত্র ঠিক বোঝা যায় না।

কবিতার কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ, আপনারা এখানে এসেছেন কেন? আপনাদের যাওয়া উচিত ছিল কোন বেশ্যাপাড়ায়।

চারজনই একসঙ্গে চমকে ওঠে, কি বলছেন?

—চার ইয়ারে মিলে মদ খেয়ে যদি মাইফেলের আসর বসাতে চান, তবে সেইরকম জায়গাতেই যাওয়া উচিত ছিল। আপনাদের কোন পাত্র নেই, মেয়ে দেখতে আসাটা বাহানা মাত্র।

চারজনেই রাগবার চেষ্টা করে, বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে আমাদের এইভাবে অপমান করা? ঠিক আছে, রতনবাবুকে বলে—

—কি আর করবেন, তার দালালির পয়সাটা না-হয় নাই দেবেন। মুখে আপনাদের শুধু বড় বড় বুলি, শিক্ষার বড়াই, স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা, আগেও যেমন সমাজটা ছিল পুরুষ জানোয়ারের রাজত্ব আজও তাই আছে—আপনারা জানোয়ার।

লোকগুলো অসম্ভব রেগে হাত পা ছুঁড়ে কবিতার চোদ্দ পুরুষ তুলে গালাগাল দিতে দিতে বেরিয়ে চলে গেল।

ভয়ে ভয়ে কবিতার অসুস্থ বাবা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হলো রে?

কবিতা নিষ্ঠুর হলো, বলল, দরে পোষাল না, তাই অন্য মেয়ে খুঁজতে গেছে।

—কি বলছিস?

কবিতার আকুতি, আর এভাবে আমাকে অপমান ক'রো না। আমি কালো, আমি বিশ্রী, আমি মুখ্যু, সব জানি। কিন্তু বার বার আমাকে এভাবে খোঁচা দিয়ে মনে করিয়ে দিয়ে কি লাভ? দোহাই তোমাদের, আমার বিয়ের কথা ভুলে যাও। চাকরি করে রোজগার করে তোমাদের খাওয়াব, যতটুকু পারি করব। ব্যস্ আর কিছু আশা ক'রো না, আমাকে নিজের মত থাকতে দাও, মিছিমিছি বিরক্ত ক'রো না।

কাঁদতে কাঁদতে কবিতা গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মা এসে বসলেন মাথার কাছে। আস্তে আস্তে মেয়ের কপালে হাত দিলেন, দু' চোখ বেয়ে তাঁর জলের ধারা নামছে, নিজেকেও তিনি সংযত রাখতে পারলেন না। কারুর জন্যেই তো কিছু করতে পারেননি। বড় সাধ ছিল কবিতার একটা বিয়ে হয়, জামাই আসে। এ সাধও অপূর্ণ থেকে যাবে। এই অক্ষমতার অশ্রু টপটপ করে চোখ দিয়ে পড়তে লাগল। উনি তা মোছবার চেষ্টা করলেন না, ধরা গলায় একবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ রায়-বাবুদের বাড়ি কীর্তনের বড় আসর বসছে, শুনতে যাবি?

কবিতা কোন উত্তর দিল না।

—তুই গেলে আমি যেতাম।

—তুমি যাও না, ঘুরে এস।

—না! গেলে তোকে নিয়ে যাব।

কবিতা মায়ের চোখের দিকে তাকাল। সে কি অপরিসীম বেদনার ভাষা, একটা অব্যক্ত অনুভূতি! কবিতা মায়ের হাতটা ধরে সমবেদনাভরা গলায় বলল, বেশ যাব।

বহুদিন বাদে এক হতভাগিনী মা তার অভিমানী মেয়েকে কোলের ওপর টেনে নিলেন।

॥ চব্বিশ ॥

কি বিচিত্র এই শহর কলকাতা।

এখানে পায়রার খোপের মত ছোট্ট ছোট্ট খুপরীতে কখন যে কি ঘটে, অতি নিকট প্রতিবেশীরও তা জানবার উপায় নেই। অবশ্য তেমন কৌতূহলী প্রতিবেশী হলে হয়তো হাঁড়ির খবর বার করতে সক্ষম হয়, সরব হয় দৈনন্দিন জীবন পাশের বাড়ির কেচ্ছা কাকলীতে। কিন্তু এই নিষ্করুণ শহরে যেখানে জীবন সংগ্রাম চলে ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত, সেখানে পাশের বাড়ির কে কি ভাবে বেঁচে আছে তা জানার উৎসাহ খুব কম লোকেরই থাকে। আর, এ শহরে সবাই চায় নিজের গন্ডীটুকুকে লক্ষ্মণের বেড়াজালে ঘিরে রাখতে।

আগেকার দিনে বৈকালিক মহিলা মজলিসে অনেক কিছু ফাঁস হয়ে পড়ত পাড়া-বেড়ানো দু'-একজন অত্যুৎসাহী বক্তার আগমনে। অপরের আনন্দ ওদের ঈর্ষার বস্তু হতো, অন্যদের দুঃখ ওদের রসনায় রস যোগাত, সামান্য একটি সংবাদ থেকে মুখে মুখে তৈরী হয়ে যেত সংবাদ-বিচিত্রা।

সেকালের সেইসব পাড়া-বেড়ানো ঠানদিদিদের আজকাল দেখা পাওয়া যায় ক্বচিৎ, ক্বচিৎ খবর পাওয়া যায় এদের-ওদের-তাদের বাড়ির কিস্যা-কাহিনী। ঠানদিরা সেকালে ছিলেন হিন্দু সমাজের উত্থান পতনের ব্যারো-মিটার, বর্তমানে সংবাদ পত্রের নানান ধরনের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন চিন্তাশীল পাঠককে সামাজিক আর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে। হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেরকম পাওয়া যায় বিচিত্র ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক পশ্চাৎপট, তেমনি পাওয়া যায় মধ্যবিত্ত সমাজের রূঢ় নিষ্করুণ বাস্তব।

হারোনো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ!!!

হারাইয়াছে :—গত সোমবার বড়বাজার হইতে ম্যাডান স্ট্রীট যাইবার পথে কালো রং-এর ট্রাঙ্ক বোঝাই আমাদের কোম্পানীর গত তিন বছরের হিসাব-পত্রের খাতা হারাইয়াছে। যে কেউ ফিরত দিলে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। নেবোরাম দেওনা দাস অ্যান্ড কোম্পানী, সোনাপট্টি।

পাওয়া গিয়াছে :—পরশু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে নিউটন কোম্পানীর অতি সুদৃশ্য নির্ভরশীল, নিখুঁত ১৫০ টাকা মূল্যের লেডিস রিস্ট-ওয়াচ পাওয়া গিয়াছে। ঘড়ির মালিকান প্রমাণসহ দোকানে সাক্ষাৎ করুন।

এই ধরনের বিজ্ঞাপন কতই না প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে, কিন্তু এর পিছনে যে ব্যবসাবুদ্ধি লুকিয়ে নেই কে বলতে পারে? ইনকাম ট্যাক্স অফিসকে বিভ্রান্ত করার জন্যে তিন বছরের হিসাবের খাতা কল্পনায় জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া হয়তো গতি ছিল না নেবোরাম দেওনা দাস কোম্পানীর। আর, এমনও তো হতে পারে, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি স্রেফ নিউটন কোম্পানীর ঘড়ির বিজ্ঞাপন। আদৌ কোন লেডীজ রিস্ট-ওয়াচ কুড়িয়ে পাওয়া যায়নি ভিক্টোরিয়ার সামনে।

নিরুদ্দেশ :—বাবা ভ্যাবলা, আর কেউ কি পরীক্ষায় ফেল করে না? তাই বলে কি মায়ের গহনা নিয়ে পালিয়ে যেতে হয়? শীঘ্র ফিরে এস, তোমার মা আজ সাত দিন অন্নজল ত্যাগ করেছেন। তোমাকে ক্ষমা করলাম, টাকার প্রয়োজন হলেই লিখবে, মনিঅর্ডার যাবে, ইতি বাবা।

কিংবা, নিরুদ্দেশ :—কুমারী রমলা দত্ত, উচ্চতা চার ফুট ছ' ইঞ্চি। বয়স উনিশ বছর ছ' মাস, হাতে চার গাছা করে সোনার চুড়ি, পরনে লাল রঙের খয়েরী পাড় শাড়ি, বাম কনুই-এর নীচে লাল তিল। সংবাদ দিবেন, বক্স নং—।

প্রথম বিজ্ঞাপনে বাবা ভ্যাবলার পিতা পুত্রকে ক্ষমা করে ঠিকানা জানবার টোপ ফেলেছেন কাগজে। অপহৃত গহনার শোক হয়তো তাঁর জিঘাংসার কারণ। তাই চটপট ঠিকানা জেনেই অকুস্থলে গিয়ে হাতে-নাতে ভ্যাবলাকে পাকড়াও করার পর বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত বাৎসল্য রস শুকোতে বিন্দুমাত্র দেরী হবে না। যে মা ক্ষিদে সইতে পারেন না বলে ষষ্ঠিটুকুও করেন না, তাঁর পক্ষে পুত্রের বিচ্ছেদে সাত সাতটা দিন উপবাসে থাকা যে একরকম অসম্ভব তা ভ্যাবলাও ভাল ভাবে জানে।

আর ঐ কুমারী রমলা দত্ত? উনিশ বছর ছ' মাস বয়েসের মেয়েকে খোঁজার জন্যে পথে ঘাটে পরোপকারী পথচারী হয়তো বা পাওয়া গেল, কিন্তু সেই ব্যক্তির পক্ষে ফিতে নিয়ে চার ফুট ছ' ইঞ্চি উচ্চতা মাপার মত সৎসাহস নাও থাকতে পারে। আরও বেশি সাহস চাই তার সেই অপরিচিত মহিলাকে বাম কনুই-এর নীচে লাল তিল আছে কিনা দেখাতে বলার।

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপনগুলির সবই যে এ ধরনের হবে এমন কোন কথা নেই। অধিকাংশই বহন করছে বর্তমান সমাজের অবক্ষয়, আকাঙ্ক্ষা আর আশা-নিরাশার পরিচয়। আজকাল পাশের বাড়িটা নিলামে উঠলে প্রতি-বেশীরা জানতে পারে কোর্টের নিলাম ইস্তাহার বিজ্ঞাপনে। বহুবার সাক্ষাত ঘটলেও ফল্‌স্‌ প্রেস্টিজ জানান দিতে চায় না নিজের দুর্দশার কথা।

ঠিক এই কারণেই নিকট প্রতিবেশী হয়েও অনাদিপ্রসাদরা জানতে পারেননি পাশের বাড়ির সাধনবাবুর মানসিক অশান্তির কথা। খবরটা পেলেন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন মারফত।

"মা মীনা, যা হবার হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরে এসো। আমার সামাজিক মর্যাদার কথা ভাববে, এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই। ইতি বাবা।"

চারদিকেই জীবন-সংগ্রামের এ কি নব নব প্রকাশ! জীবন নাটকের অন্যতম হোতা অনাদিপ্রসাদও আজ বিস্মিত। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা লাভের সেই গৌরবদীপ্ত দিনগুলি আর সোনার খাঁচায় আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। জীবনসায়াহ্নে এ কি বিচিত্র জীবন-দর্শন ঘটছে বার বার, নিত্য নূতন চরিত্র লক্ষ্য করে? দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে বিয়ের পর রমলাকে নিয়ে যে রোমান্স সৃষ্টি হয়েছিল, সাহিত্যে তা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, পাঠক ডুবেছে রস-সাগরে। আর এখন? দৈনন্দিন জীবন-যন্ত্রণায় সে রস-সাগর রূপ নিয়েছে লবণ সমুদ্রের, চোখের জলে লবণাক্ত। তাই এখন দৃষ্ট চরিত্রগুলিও যেন এক-একটি নুনের পুতুল। হাহাকার, ক্লান্তি, বিলাসব্যসনের ফাঁসে বিদ্ধ অবক্ষয়ের প্রতীক।

অনাদিপ্রসাদ দেখেছেন ময়দানের মিস্ কলকাত্তাকে—কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট দিন কাটানোর মধ্যেই যার আত্মরতির সুখানুভূতি ছিল, জলে ভেসে যাওয়া এক শিশু যাদুকাঠির স্পর্শে তাকে নিয়ে গেল অন্য এক জগতে। দেখেছেন সাধনবাবুকে, পিতা হয়ে কন্যার প্রতি অবহেলার চরম পরিণতি—মীনার আজকের এই নিরুদ্দেশ যাত্রার ঘটনা। দেখা পেলেন মনুয়ার, কি বীভৎস—সুন্দর এই মেয়েটা, যার এক চোখে স্বপ্নের মায়াজাল, অন্য চোখে স্বপ্নহীন বিনিদ্ররজনীর অস্বস্তি। হঠাৎ দেখা পেলেন বহু দিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু অশোক জানাকে—যে এক হাতে কালকেউটে শশধর বোস অন্য হাতে ততোধিক বিষাক্ত বাস্তুঘুঘুকে নিয়ে অকুতোভয়ে খেলা দেখাচ্ছে। লম্বু, রুটিওয়ালা, এরা তো সে তুলনায় নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ। অনাদিপ্রসাদ জেনেছেন ওপর মহলের জীবনকে—ববি, মিঃ কুশারী আর রত্না—বাইরে থেকে যাকে মনে হয় উচ্চ শিক্ষিত ধনী, সেই মিঃ কুশারীর কি অস্বস্তিকর জীবনের ট্র্যাজেডী। পথ চলতে হঠাৎ দেখা সেই কবিতা মেয়েটি কি তাঁর মোহাঞ্জন কম ঘুচিয়েছে? পদে পদে ইজ্জৎ বাঁচাবার চেষ্টায় যারা সুদূর রানাঘাট থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুজি-রোজগার করতে আসে—তাদের মধ্যেও এ কি ব্যতিক্রম। সবাই এক নয় তার প্রমাণ মিতা।

অনাদিপ্রসাদের চোখের সামনে আজ সব চরিত্রগুলোই ভীড় করে রয়েছে—দৃশ্য আর জনতার মিছিল চলছে, একের পর এক, কেউ চলছে ছক বাঁধা জীবনের নিশ্চিন্ততায়, কেউ চলছে বল্গাহীন অশ্বের দুর্গম আবেগে বিদ্রোহের নিশান তুলে। আজকের এই মীনার নিরুদ্দেশ যাত্রা কি সেই বিদ্রোহের সূচনা?

অনাদিপ্রসাদ অন্যমনস্কভাবে পায়চারী করতে করতে হাজির হলেন পাশের ছোট ঝোলা বারান্দায়। লক্ষ্য করলেন, সাধনবাবুর বাড়ির জানালা দরজা সব বন্ধ। নীচের গেটখানাও খোলা নেই। তবে ভদ্রলোকের গাড়িটা রয়েছে। ড্রাইভার গাড়ির সিটে বসে ঘুমোচ্ছে।

এমন সময় রমলা বউদি পাশে এসে দাঁড়ায়, নিজের থেকেই বলে, সাধন-বাবুরা বোধ হয় কলকাতার বাইরে কোথাও গেছেন।

—কোথায়?

—তা জানি না, হয়তো চেঞ্জে কোথাও। কিংবা কোন আত্মীয়স্বজনের বিয়ে উপলক্ষে—

অনাদিপ্রসাদের হিসেব ঠিক মেলে না, তাই জিজ্ঞেস করেন, বাড়িতে কেউই নেই?

রমলা বউদি জানায়, মাঝে মাঝে দেখি সাধনবাবুকে গাড়ি করে বেরোতে। অন্যরা বোধহয় কেউ নেই।

—তা হবে, অনাদিপ্রসাদ চুপ করে যান। কাগজের বিজ্ঞাপনের কথা স্ত্রীর কাছেও প্রকাশ করেন না। যদি ঐ বিজ্ঞাপন অন্য কোন মীনার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে, মর্যাদাবোধসম্পন্ন বাবা সাধনবাবু ছাড়া আর কেউও তো হতে পারে।

সন্দেহের নিরসন ঘটল কয়েক দিনের মধ্যে। একটি চিঠি এল ডাকে, মাত্র কয়েকটি ছত্র। লেখা—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একদিন ভরসা দিয়েছিলেন বিপদে পড়লে আপনাকে পাশে দেখতে পাব। সেই আশায় এ চিঠি লিখছি। ইচ্ছে করে বাসার ঠিকানা গোপন রাখছি। যদি একটি বিপন্ন যুবককে সাহায্য করার বাসনা এখনও থাকে তবে এই শনি, রবি, সোম, যে-কোন দিন সকালে দশটার সময় গড়িয়াহাটের মোড়ে আসুন। অনেক আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করব।

ইতি

আপনার গুণমুগ্ধ

সমীর

চিঠি পৌঁছল শনিবার সকালেই। অনাদিপ্রসাদ কালবিলম্ব করলেন না, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চিঠির নির্দেশমত হাজির হলেন গড়িয়াহাটের মোড়ে। তখনও দশটা বাজেনি, আশেপাশে সমীরকে কোথাও দেখতে পেলেন না, এক কোণায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন আর ভাবছেন এই জায়গাটার কথা। কয়েক বছর আগেও কলকাতার এ অঞ্চলটা এত বেশী উন্নত ছিল না। কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি উঠেছে, কত রকমারি দোকান, বাজার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা, মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়, নিজেরা বাজার-হাট করে। উত্তর কলকাতা যেমন

বনেদী বাঙালী পাড়া, এ অঞ্চলে তেমনি উচ্চ মধ্যবিত্ত বিলিতী কায়দায় ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে অভ্যস্ত ছোট ছোট বাঙালী পরিবার। মাঝখানের কলকাতাটা বাঙালীদের বেহাত হয়ে গেছে। বড়বাজারে রাজস্থানী, চৌরঙ্গী অঞ্চলে ইঙ্গ বঙ্গ, ভবানীপুরে গুজরাটি, পাঞ্জাবী আর মাদ্রাজী। সেই কারণে উত্তর আর দক্ষিণ কলকাতার বাঙালীদের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান। সে শুধু দূরত্বের জন্যেই নয়, আচারে-ব্যবহারে জীবনধারণের রীতিতে অনেক তফাত। উত্তরে এখনও যৌথ পরিবার আছে, দক্ষিণের লোকেরা আদৌ তাতে বিশ্বাস করে না। উত্তরে এখনও সাহেবীআনা ততটা ঢুকতে পারেনি যতটা ঢুকেছে দক্ষিণে। এখনও উত্তরের রান্নাঘরে শুক্তুনি, ছ্যাঁচ্ড়া, ডাঁটা চচ্চড়ি রান্না হয়, কিন্তু দক্ষিণে গ্যাসের উনুনের থেকে বার হয় মাংসের রোস্ট, পুডিং কিংবা প্রেস্টিজ্ কুকারে রাঁধা মুরগীর কারি। উত্তরের মেয়েদের প্রসাধনে এখনও পুরোন বাঙালীআনার রেশটুকু বেঁচে আছে, কিন্তু দক্ষিণের মেয়েদের কেশচর্চার বৈচিত্র্যে তাদের অনেক সময় বাঙালী বলে চেনা যায় না। উত্তরের বাজারে মোহনবাগান জিতলে আজও বোধহয় চিংড়ি মাছের দাম বাড়ে কিন্তু দক্ষিণের বাজারে খেলার ফলাফলের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। উত্তর কলকাতার বনেদীআনার নজির পেশাদার মঞ্চ। ভিড় করে সেখানে নাটক দেখতে যাওয়া যায়। আর দক্ষিণ কলকাতার বাঙালীদের চিত্তবিনোদনের স্থান সিনেমা, সে বাংলা, হিন্দী, ইংরিজী যে ভাষারই হোক না কেন। তা ছাড়া পিকনিক। উত্তর কলকাতার লোকদের ফাঁকা মাঠে বেড়াবার অভ্যেস নেই। দক্ষিণবাসীদের দেখা যায় লেকে, ময়দানে, গঙ্গার ধারে।

অনাদিপ্রসাদের চিন্তায় বাধা পড়ল, লক্ষ্য করেননি কখন সমীর এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে। ছেলেটার মুখ ফ্যাকাশে, চোখের তলায় কালি পড়েছে। হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ?

সমীরের ছোট্ট উত্তর, ভাল নয়।

—কি হয়েছে?

—সে অনেক কথা, চলুন একটু ফাঁকায় গিয়ে কোথাও বসি।

—চল।

দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে তারা ঢুকল সাদার্ন অ্যাভেন্যুতে। লেক পর্যন্ত যেতে হলো না, গাছের তলায় ছায়া দেখে অনাদি-প্রসাদ বললেন, এইখানেই বসা যাক।

—মাটিতে?

—ঘাসের ওপর, খুব অপরিষ্কার নয়।

তারা দুজনে পাশাপাশি বসে। পরিস্থিতিটা একটু সহজ করে নেবার

জন্যে অনাদিপ্রসাদ স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করলেন, এখন কোথায় আছ তোমরা?

—গড়িয়াতে।

—বিয়ে হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—কত দিন হলো?

সমীর যা বলল তা গুছিয়ে নিলে এই দাঁড়ায়, দিন পনের আগে ওরা বিয়ে করবে বলে ঠিক করে। সমীরের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বিয়ে হয়, রেজিস্ট্রার সেখানেই আসেন। বিয়ের রাত্রে জন পাঁচ ছয় লোক ছিল, তারা সকলেই সমীরের বন্ধু। মীনা কলেজ থেকে সোজা সেখানে চলে আসে। সে রাত্রিটা তারা বন্ধুর বাড়িতে কাটায়। পর দিন চলে যায় গড়িয়ায়, সেখানে সমীর আগে থেকেই বাসা ঠিক করে রেখেছিল, সমীর যেভাবে প্ল্যান করেছিল তার এতটুকুও নড়চড় হয়নি। নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেছে, সাধনবাবুরা কোন খবর পাননি। গোলমাল করার সুযোগ তাদের ছিল না।

এত দূর শুনে অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে দুর্ভাবনার কি হলো? টাকা পয়সার অভাব?

—না, তা নয়।

—তবে?

—গোলমাল হয়েছে মীনাকে নিয়ে। প্রথমটা সে খুব খুশী হয়েছিল, কেমন করে নিজের সংসার পাতবে তারই জল্পনা কল্পনা করছিল। কিন্তু তার পর কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল। যত দিন যাচ্ছে বুঝতে পারছি মীনার ভাল লাগছে না, কথা বলছে, কাজ করছে, হাসছে, কিন্তু কোনটার মধ্যে প্রাণ নেই। আমি অনেক বুঝিয়েছি, কোন ফল হয়নি। আমার বন্ধুরাও বোঝাচ্ছে, ও সেসব কথা শোনেই না।

—মীনা কি চাইছে?

—পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। নিজে কোন কূলকিনারা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আপনাকে চিঠি দিলাম। লুকিয়ে বিয়ে করেছি বলে আমার বাড়ির লোকদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এই দুঃসময়ে কার সঙ্গে যে পরামর্শ করব, কে যে ঠিক উপদেশ দেবে, তাই—

অনাদিপ্রসাদ এই বিষণ্ন যুবকটির কাঁধে হাত রাখলেন, তুমি নিজে অনুতপ্ত নও তো?

সমীর দৃপ্তকণ্ঠে বলে, মোটেও না। আমি তো কোন অন্যায় করিনি, মীনাকে ভালবেসে বিয়ে করেছি, তাকে সুখী করার প্রাণপণ চেষ্টা করছি, কিন্তু কেন যে পারছি না!

—ঠিক আছে, চল তোমাদের বাসায় যাওয়া যাক।

—সে যে অনেক দূর।

—তা হোক, ট্যাক্সি নিয়ে যাব। মীনার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।

শহর ছাড়িয়ে গড়িয়া স্টেশনের কাছে নির্জন মাঠের উপর দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সমীরদের নতুন সংসার। ঘর দুটি মাঝারি সাইজের, একখানা তক্তপোষ পাতা, তার ওপরে বিছানা গোটানো রয়েছে। ওপরে দড়ি দিয়ে মশারী টাঙানো। ঘরে আসবাবপত্র আর বিশেষ কিছু নেই। একটা মাঝারি ট্রাঙ্ক, ছোট স্যুটকেশ। দেওয়ালে পেরেক দিয়ে মারা কাঠের আলনা, তাতে খানকয়েক পাঞ্জাবি শাড়ি ব্লাউজ ঝুলছে।

অনাদিপ্রসাদের চোখ নতুন বউটিকে খুঁজছিল, সমীর জানাল, বোধহয় কলে গেছে, এখুনি আসবে।

একটু পরেই মীনা এসে দাঁড়াল ঘরে, তখনও শাড়িটা ভাল করে পরেনি, ভিজে চুল দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। অনাদিপ্রসাদকে দেখে ভয়ে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। মুখ দিয়ে শুধু বেরল, কাকাবাবু, আপনি!

অনাদিপ্রসাদ সস্নেহে হাসলেন, তোমাদের নতুন সংসার দেখতে এলাম।

মীনা কথাটা সহজভাবে নিতে পারল না, আপনি আমাদের ঠিকানা পেলেন কোথায়? বাবা আপনাকে পাঠাননি তো? চুপ করে কেন, বলুন না কি হয়েছে?

—কেন, আমি এসেছি বলে তুমি খুশী হওনি মীনা?

মীনা বিড় বিড় করে বলে, খুশী হয়েছি। কিন্তু কে আপনাকে খবর দিল?

সমীর এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, বলল, আমি ওঁকে চিঠি লিখেছিলাম।

—কেন? আমাকে তো বলনি।

—তোমার মনটা ভাল নেই তাই।

—আমার মন খুব ভাল আছে, আমার নিজের সংসার, আমার ঘর, আমার স্বামী, সব মেয়েই তো এই চায়, তাই না কাকাবাবু? আপনি কত বই লেখেন, আপনি তো জানেন, মেয়েরা আর অন্য কিছু চায় না। আমি টাকা চাই না গয়না চাই না, বাপের বাড়ি—

বলতে গিয়ে মীনা কি রকম থেমে গেল, একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে শুরু করে। সমীর সেদিকে অনাদিপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অনাদিপ্রসাদ কথার খেই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, বাপের বাড়ির কথা কি বলছিলে মীনা?

মীনা ফিরে তাকায়, ব্যথিত চোখের দৃষ্টি, মা কেমন আছে? খুব কান্না-

কাটি করছেন বোধহয়, না? বাবার ভয়ে হয়তো কাঁদতেও পারছেন না, এর মধ্যে মার সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

অনাদিপ্রসাদ কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না, কি করে জানাবেন ওদের বাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

মীনা বলে যায়, আপনি কিন্তু ওদের কাছে আমাদের ঠিকানা দেবেন না, বাবা জানতে পারলেই পুলিশ পাঠাবে, ওকে জেলে দেবে।

অনাদিপ্রসাদ ভরসা দেন, কি সব আবোল-তাবোল ভাবছ, তোমরা এখন স্বামী-স্ত্রী, বাবার কথায় পুলিশ তোমাদের বিরুদ্ধ করবে কেন?

—কি জানি, বাবার কত টাকা, কত লোকজন, তা ছাড়াও ওর ওপর খুব রেগে আছেন তো, কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না, আমি তো বাবাকে জানি।

সমীর জোর দিয়ে বলে, সে ভাবনা আমার, এসব কথা চিন্তা করে তুমি মন খারাপ করছ কেন?

মীনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমার জন্যে এর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল, কাকাবাবু, যতই সেই কথা ভাবি মনে হয় বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই।

অনাদিপ্রসাদ চিন্তিত হন, বলেন, ছিঃ মীনা, সবেমাত্র তোমার বিয়ে হয়েছে, এখন মনের জোর কর, হাসিমুখে সংসার কর তবে তো সমীর সুখী হবে। তুমিও যে রকম বাড়ি ছেড়ে এসেছ সেও তো তোমারই জন্যে তার বাবা মা সবাইকে ছেড়ে চলে এসেছে। এখন তুমি যদি কান্নাকাটি কর ওর কি অবস্থা হবে বল তো?

মীনা অবুঝের মত বলে, তাইতো বলছি কাকাবাবু, যত অশান্তি আমাকে নিয়ে, আমি মরে গেলে আমার বাড়ির লোকেরা আর ওর পেছনে লাগবে না। তখন ও ইচ্ছে করলে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে। আমার আর সত্যি বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।

অনাদিপ্রসাদ আর কথা বাড়ালেন না, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। চাপা গলায় বললেন, সমীর, আমার মনে হচ্ছে মীনাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।

সমীরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, কেন, কি হয়েছে?

—মীনার কল্পনার নৌকো বাস্তবের পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ফুটো হয়ে গেছে, জল ঢুকছে, ক্রমশ ও তলিয়ে যাবে যদি না এখনি বাঁচাবার ব্যবস্থা করা যায়।

অসহায় সমীর মীনার দিকে তাকিয়ে দেখে বিভ্রান্ত নাবিকের মত।

॥ পঁচিশ ॥

এতদিন পরে হঠাৎ এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে শশধর বোস এম. এল. এ-র কাছ থেকে টেলিফোন আসবে অশোক জানা ভাবতেও পারেনি। প্রেসের ছোট ঘরে বসে অন্যদিনের মত আজও সে প্রুফ সংশোধন করছিল, এমন সময় জন-প্রতিনিধির টেলিফোন এল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর, আরে মশাই কোন খোঁজ খবর নেই, কেমন আছেন? প্রেস কেমন চলছে, বাড়ির সব খবর ভাল তো?

অশোক জানার কিন্তু ব্যবহারিক প্রশ্ন, এতদিন পরে কি মনে করে?

—অনেকদিন দেখা হয়নি, আজকে আসুন না জমিয়ে গল্প করা যাক।

—কোথায় যাব?

—আমি এখানে আছি পান্থ নিবাসে, বালীগঞ্জের একটা হোটেল।

—গেলে কোন লাভ হবে?

শশধর বোস আরও উদার, অনেক ছাপার কাজ দেব, তাছাড়া একটু পরামর্শ করবারও আছে। এক সময় আপনি তো আমাকে কম সাহায্য করেননি।

অশোক জানা ঠিকানাটা টুকে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, হাতের কাজ সেরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

—খুব খুশী হলাম, ধন্যবাদ।

এই সেই শশধর বোস। অশোক জানা যার নাম দিয়েছিল ক্যাবলাকান্ত। মুখ ফুটে একটা ভাল করে কথা বলতে পারত না, তার হয়ে বক্তৃতার ভাষণ লিখে দিতে দিতে কত সময় অশোক জানা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সেই লোকটার কথা বলার ধরন আজ বদলেছে, কেমন যেন একটা পিঠ চাপড়ানি ভাব। আগে কলকাতায় এলে রোজই অশোক জানার সঙ্গে দেখা করত, যেত তার বাসায়, আসত প্রেসে অথচ সেই বাস্তুঘুঘুর সঙ্গে ঠাণ্ডা নীল রেস্তরাঁয় মাল খেয়ে মাতাল হবার পর থেকে আর এদিকে আসেনি। হঠাৎ তার কি দরকার পড়ল এ কথা জানবার কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক, সেই জন্যেই অশোক জানা কথা দিয়েছিল শশধর বোসের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে।

'পান্থ নিবাস'।

বালীগঞ্জের কোন এক সম্ভ্রান্ত অঞ্চলের এটি একটি রহস্যময় গৃহ। বেশ

লম্বা চওড়া, অনেক ঘর, বহু ফ্ল্যাট, বিচিত্র বাসিন্দা। কেউ বলে এটা হোটেল তবে লাইসেন্সবিহীন। যারা সন্ধান জানে তারা এখানে থাকে খায়, হিসাব মত পয়সা দিলেই চলে। তবে অনেকের মতে ওখানে ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যায় বড়লোক হাফ গেরস্তদের জন্যে। নিজের বিবাহিত স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যেসব পুরুষ মানুষ অন্য মেয়ে মানুষ নিয়ে ঘর করতে চায় গোপনে, অথচ বিপদে পড়তে চায় না, তাদের কাছে এসব ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে বাড়িওয়ালা প্রচুর টাকা রোজগার করে। পান্থ নিবাস-এর সঙ্গে লাগোয়া একটা বিরাট গ্যারেজ আছে, টিনের শেড দেওয়া। এ অঞ্চলের অনেক গাড়িই রাত্রিবেলা এখানে আশ্রয় নেয়। গাড়ির মেরামতি এ গ্যারেজে খুব হয় বলে দেখা যায় না, তবে এদের নিজস্ব গাড়ি অনেকগুলি, প্রাইভেটে সব ভাড়া খাটে। দুটি সংস্থার মালিক একই ব্যক্তি। —যার পরিচয় অবশ্য বিশেষ কেউ জানে না।

পান্থ নিবাসের নীচে একজন নেপালী দরোয়ান বসেছিল, শশধর বোসের নাম বলায় সে অশোক জানাকে খাতির করে ওপরে নিয়ে গেল। সাধারণ একটা ঘর আধুনিক রুচিতে সাজানো, কয়েকটি সোফা, নীচু টেবিল, এক কোণায় একটি সিঙ্গল বেড, ছোট আলনা।

শশধর বোস উঠে এসে আপ্যায়ন করল, আসুন, এই হচ্ছে আমার কলকাতার আস্তানা। সঙ্গে একটা ছোট বাথরুম আছে, তাছাড়া টেলিফোন। এখানে থাকতে কোন অসুবিধে হয় না।

অশোক জানা সোফায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি প্রায়ই কলকাতায় আসেন?

—মাসে অন্তত পনের দিন।

—আশ্চর্য, আমাদের দিকে একবারও যান না!

—সত্যি বলছি অশোকবাবু, একেবারে সময় পাই না। কত কাজ করতে হয়, জনগণ যখন আমাকে ভোট দিয়েছে, তাদের সুবিধে অসুবিধে আমাকে দেখতে হবে।

অশোক জানার মনে হলো ময়না পাখী 'রাধে কেষ্ট' বুলি শিখেছে। চেহারাটাও পাল্টে ফেলেছে শশধর বোস, গেঁও ভাব আর নেই, শহরের জলুস চোখে মুখে চমকাচ্ছে। কায়দা করে চুল ছাঁটা, ঘাড়ে গলায় সাদা পাউডার, ফিনফিনে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচালুটোন ধুতি, টেবিলের উপরে একটা সিগারেটের টিন।

অশোক জানা মন্তব্য করল, শরীর তো ভালই আছে মনে হচ্ছে।

শশধর বোস অমায়িক হেসে বলল, রাখতে হচ্ছে, শরীর তো এখন আর আমার নয়, দেশের দশের। অতএব ভাল না থাকলে চলবে কেন?

সেদিনের ক্যাবলাকান্তর মুখ থেকে এই ধরনের বাণী শোনা অসহ্য, তাই

অশোক জানা সরাসরি কথা পাড়ে, কেন ডেকেছেন বলুন।

—এ কিন্তু খুব গোপন কথা, কারুর সঙ্গে আলোচনা করবেন না।

—সেটুকু বিশ্বাস আমাকে করতে পারেন।

—আমরা একটা নতুন দল তৈরী করছি, সব এম. এল. এ'রা মিলে। হঠাৎ রাতারাতি গভর্নমেণ্ট উল্টে দেব।

—কাজটা যত সোজা মনে করছেন তত নয়।

শশধর বোস জোর দিয়ে বলে, তবু আমাদের করতে হবে, এত খরচা করে যে এম. এল. এ. হলুম কি তাতে লাভ হলো? ক'টা পয়সা আমরা রোজগার করতে পেরেছি!

—শুধু পয়সা ভাবছেন কেন, কত সম্মান, খাতির।

শশধরের অভিমান, সেসব ঐ মন্ত্রীরা পায়, আজকাল সভা সমিতি, বৃক্ষ রোপণ, এসব বড় বড় অনুষ্ঠান ছেড়ে দিন, কলেজের সোশ্যাল, টিউবওয়েল উদ্বোধন এসবের জন্যেও মন্ত্রী পাওয়া যায়। সারাদিন কাজকর্ম তো নেই, কাঁহাতক আর ঘরের মধ্যে বসে থাকবে। তাই যে কোন একটা নিমন্ত্রণ পেলেই ছোটে। আমাদের আর কে ডাকছে বলুন?

অশোক জানা তখনও বোঝাবার চেষ্টা করে, শুধু দল বাঁধলেই তো হবে না, একজন নেতা চাই।

—আপনি একেবারে ছেলেমানুষ, একজন কি বলছেন, ক'টা নেতা চান? বাংলা দেশে যত না পার্টি তার চেয়ে বেশি নেতা। এবং আদর্শ সুবিধাবাদ। নেতা আমাদের যোগাড় হয়ে গেছে, একজন ফসকালে দুজন রিজার্ভে আছে।

—তাহলে আর বলবার কিছু নেই।

শশধর বোস এবার ব্যবসায়িক গলায় বলে, এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে, আপনাকে এবার আমার হয়ে একটু পাব্লিসিটি করতে হবে।

—কি রকম?

দু'চারটে কাগজে লেখা, দু'চার জায়গায় আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করানো, মানে বুঝতে পারছেন তো, এখন একটু লাইম লাইটে আসা দরকার। তাহলে নতুন সরকার গড়বার সময় আমাকে মন্ত্রী করতেই হবে, এ ছাড়া এদের উপায় থাকবে না। আপনার ইণ্টারেস্ট আমি দেখব, এত ছাপার অর্ডার আমি এনে দেব যে আপনি কাজ শেষ করে উঠতে পারবেন না।

অশোক জানার ছোট্ট উত্তর, ভেবে দেখি।

—ভেবে দেখলে চলবে না, এ আপনাকে করতেই হবে। শশধর বোসের শেষের কথাটা যেন আদেশের মত শোনাল।

আশ্চর্য, ক'মাস আগে এই লোকটাই খুন হবার ভয়ে অশোক জানার

সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। আজ সেই লোকটাই দল পাকিয়ে বলীয়ান হয়ে অশোক জানাকে ধমকাচ্ছে, মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ডাইনে মোড় নিতেই অশোক জানার সঙ্গে লম্বুর মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। লম্বুই অবাক হল বেশি।

—দাদা আপনি এখানে?

—একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

—কে শশধরদা? আপনার ওখানে দেখেছিলাম বটে, আজকাল বেশ চালু হয়েছে ভদ্রলোক।

—কি রকম?

—বলব একদিন, আসব আপনার প্রেসে।

অশোক জানা জিজ্ঞেস করল, তুই এখানে কি করছিস?

—প্রাইভেট গাড়ির দরকার পড়লে এখান থেকে ভাড়া নিই।

—কিসের জন্যে?

—স্টুডিওর কাজে লাগে, কখনও বা বিয়ে বাড়িতে, তাছাড়া—

—কি?

লম্বু চোখ মারল, বুঝিয়ে দিল বাকী পদটুকু পূরণ না করলেও চলে।

অশোক জানা চলে যাবার পর লম্বু কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরেই গেল এবং ঢুকল শশধর বোসের ঘরেই।

জননায়ক মন্ত্রিত্বের স্বপ্ন ছেড়ে নেমে এলেন কঠিন বাস্তবে, তুই কোন কাজের নোস লম্বু। এতদিন কিছুই করতে পারলি না।

লম্বু হি-হি করে হাসল, সব ঠিক করে ফেলেছি, সেই কথা বলতেই এসেছিলাম, অশোকদা ঘরে ছিলেন বলে আর ঢুকিনি।

—চুপ চুপ, ওরা না জানতে পারে, তাহলেই—

—পাগল হয়েছেন, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। তবে যাকে ঠিক করেছি একেবারে আনকোরা কলেজের মেয়ে, এখান থেকে গাড়ি নিয়ে বেরব, মেয়েটিকে তুলে নেব কলেজের সামনে থকে, তার বাড়িব লোকও বুঝতে পারবে না। যখন বিকেলে ফিরবে তারা ভাববে কলেজ থেকে পড়ে এল।

শশধর বোসের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে, সিগারেটের টিনটা লম্বুর দিকে এগিয়ে দেয়। লম্বু' সিগারেট ধরিয়ে মুরুব্বি চালে বলে, দরটা একটু বেশি পড়বে, একেবারে আনকোরা কিনা। মাঝখানে একটা দালাল রাখতে হয়েছে, মেয়েটার কাকা, সে কিছু টাকা খাবে। দেড়শ' পড়বে।

—দে-ড়-শ? তার ওপর গাড়ি ভাড়া!

—সেখানে কম করে দেব। পঁচাত্তর, আমি নিজে চালাব। আপনার কোন রিস্ক থাকবে না। ছোট ভ্যান গাড়ি, আপনারা পেছনে উঠবেন, জানালায় পর্দার ব্যবস্থা আছে, এ সব গাড়ি একশ'র কমে ছাড়ে না।

শশধর বোস মনে মনে কি যেন হিসেব করল, দেখ যদি আর একটু কম করাতে পার।

লম্বুর সাফ জবাব, এর কমে হবে না। এখন একশ' টাকা অ্যাডভান্স ছাড়ুন, আমাকেও তো বায়না দিয়ে রাখতে হবে।

অগত্যা শশধর বোস বাক্স খুলে একশ' টাকা বার করে এনে দেয়। ভগবান জানেন এ কার টাকা! কোন শুভ কাজের জন্যে কোন অর্বাচীন এই জন-প্রতিনিধির হাতে ভুল করে টাকাটা তুলে দিয়েছিলেন। লম্বু মারফত আজ তা কোন মতিরানীর বস্তিতে ব্যয়িত হবে কে বলতে পারে?

বালীগঞ্জের 'পান্থ নিবাস' থেকে রাজাবাজারের প্রেস পর্যন্ত আসতে অশোক জানা সারাক্ষণ শশধর বোসের কথাই ভেবেছে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার? ক্রীড়াচ্ছলে যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে সে জীবন দিয়েছিল সেই কিম্ভূত মানুষটা এখন নিজেই হাত পা ছুঁড়তে শুরু করেছে। বুদ্ধিহীন একটা দেহ, কোন বিকৃত চিন্তার বশবর্তী হয়ে কার সর্বনাশ করবে, ভাবতেই অশোক জানা মনে মনে শিউরে ওঠে। রাজনীতির সার্কাসে ঐ নির্লজ্জ ক্লাউন শশধর বোস মুখে চুন মেখে লোক হাসাবে। যত হাততালি আর বাহবা পাবে ততই ঐ ভাঁড়টা ডিগবাজী খাবে। অথচ বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঐ মানুষটাকে ফিরিয়ে আনার কোন উপায় নেই। সে এখন জনগণের প্রতিনিধি, মনে তার জনপ্রিয় হবার সাধ, সেই সঙ্গে মন্ত্রিত্বের গদীতে বসার স্বপ্ন। অতএব ঐ আহাম্মকটাকে যে কোন রাজনৈতিক রিং-মাস্টার বাঁদর নাচ করাবে, গলায় ঘণ্টি লাগিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে গান করবে, চলরে বুড়া বুড়ীর বাড়ি চল, চলরে বুড়া চল শ্বশুরাল চল।

প্রেসে পৌঁছে কবিতার সঙ্গে দেখা। মেয়েটা অন্যমনস্কভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। অশোক জানা জিজ্ঞেস করল, কি, হাতে কোন কাজ নেই বুঝি? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

কবিতা বলল, আমার ক'দিন ছুটির দরকার ছিল, তাই আপনার জন্যে

অপেক্ষা করছিলাম।

অশোক জানা বিরক্ত হয়, ছুটি, ছুটি, এ ছাড়া যেন আর কোন কথা নেই। মাসে ক'দিন কাজ কর বলতে পার? তাহলে আর মাসমাইনে নিও না, এবার থেকে দিন-মজুরি করো।

—আমি তো কখনও ছুটি চাই না।

—বাজে বকিও না, কাজ করতে হয় কর, আর ইচ্ছে না করে তো বাড়ি যাও। অশোক জানা পাঞ্জাবীটা খুলে রেখে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল, প্রুফ সংশোধন করতে। একটু পরেই কবিতা এক কাপ গরম চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। সত্যিই অশোক জানার চা তেষ্টা পাচ্ছিল, অথচ একটু আগে কবিতাকে বকেছে বলে চা তৈরী করে আনার জন্যে বলতে পারছিল না।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেই কবিতা জিজ্ঞেস করল, বিস্কুট আনতে হবে?

—না, থাক।

তখনও কবিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অশোক জানা প্রশ্ন করে, ক'দিন ছুটি চাই?

—এক সপ্তাহ।

—কেন, কি হয়েছে?

—মাকে নিয়ে নবদ্বীপ যেতে হবে।

—হঠাৎ?

কবিতা হাসল, সে কথা পরে জানাব।

—এদিকের কাজ সামলাবে কে?

—আমি একটা মেয়ে দিয়ে যাব, ঐ সাতদিনের টাকা আমার মাইনে থেকে কাটিয়ে দেব, আপনার কাজের কোন অসুবিধে হবে না।

অশোক জানা এতক্ষণে খুশী হয়, নিতান্তই যেতে যদি হয়, বেশ যেও তাহলে, তবে তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

সম্মতি পেয়ে খুশীর ঢেউ তুলে কবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই তার গলা শোনা যায়, কি, বলেছিলাম না বাবু আমায় ছুটি দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জনের জবাব, ছুটি না হয় পেলে, দেখা যাক ঠাকরুন অদ্দিন নবদ্বীপে থাকতে পারেন কিনা।

—কেন পারব না?

—এ হলো ক'লকাতার মায়া, একবার যে ফাঁদে পড়েছে সে আর কিছুতেই বেরতে পারে না।

—বেশ দেখা যাবে।

কান পাতলে অশোক জানা হয়তো ওদের কথা আরও শুনতে পেত, ঠিক এই সময় মিঃ দত্ত এসে হাজির। লোকটা ভাল মক্কেল, প্রেসের অনেক কাজ

এনে দেয়। অশোক জানা তাকে খাতির করে বসাল। ভদ্রলোকের হাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ডিবে, অশোক জানার টেবিলের ওপর এগিয়ে দিয়ে বলল, আমার স্ত্রী বাড়িতে সন্দেশ তৈরী করেছে, তাই একটু পাঠিয়ে দিয়েছে আপনার জন্যে।

—সন্দেশ, হঠাৎ?

—আপনার কথা আমার কাছে শোনে তো, যেই বলেছি এখানে আসছি, অমনি ডিবেটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

—শ্রীমতীকে ধন্যবাদ জানাবেন।

—আগে খেয়ে দেখুন মুখে দেবার মত হয়েছে কিনা।

অশোক জানাও ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে আমিও কিছু খাবার আনাই, রাজাবাজারের বিখ্যাত কষা মাংস।

—না, না, এ তো আপনি লৌকিকতা করতে শুরু করলেন।

অশোক জানা নাছোড়বান্দা, বলে, তাই কখনও হয়, আপনি আমাদের খদ্দের—লক্ষ্মী, আপনি আমাদের খাওয়াবেন আর আমরা চুপ করে বসে থাকব!

প্রেসের লোককে ডেকে অশোক জানা তখুনি অর্ডার দেয়, কষা মাংস আর পরোটা নিয়ে আসার জন্যে।

অফিসের পরিবেশে পারিবারিক গল্প বড় একটা জমে না, কিন্তু আজ এই প্রেসের ছোট ঘরে খেতে খেতে কথা বলতে বলতে ঘরোয়া গল্প কেমন করে যেন জমে উঠল। অশোক জানা স্বভাবসুলভ চাপল্যের সঙ্গে বলে, মিঃ দত্ত, আপনাকে দেখলেই বুঝতে পারি খুব সুখী মানুষ এবং তার মূলে রয়েছে একটি সুখী পরিবারের অবদান।

মিঃ দত্ত ম্লান হাসে, কি করে বুঝলেন?

—মানুষ দেখলেই আমি বুঝতে পারি। জানেন, অনাদিপ্রসাদের মত আমিও লেখক হতে পারতাম, পা হড়কে গিয়ে প্রেসের মালিক হয়ে বসেছি, আপনাদের মত নিশ্চিন্ত জীবন হলে দেখতেন আমিও কতো কি করতাম।

—এইখানে কিন্তু ভুল করলেন অশোকদা, জীবনে আমার অনেক সমস্যা, সহজে কাউকে জানতে দিই না, হাসিমুখে ঘুরে বেড়াই।

একটু থেমে ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরায়, চোখ দুটো ছোট করে বলে, আমার বিধবা মা, বয়স প্রায় ষাট, পাঁচ বছর আগে কলঘরে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে যায়; দু'বার অপারেশান করিয়েছি, যতরকম চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু কিছু হলো না, মা আমার চলৎশক্তিহীন, বিছানায় শুয়ে থাকেন, সব কিছু করিয়ে দিতে হয়। রোগে ভুগে ভুগে মেজাজটাও রুক্ষ হয়ে উঠেছে, একটুতেই বিরক্ত হন।

অশোক জানা সমবেদনা প্রকাশ করে, আহা, এ জীবন বড় দুঃখের।

—আমার স্ত্রী সুন্দরী, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, শিক্ষিতা, কিন্তু বিয়ের আগে ছোটবেলায় ওর চোখে ছুঁচ ফুটে গিয়েছিল, তার ফল ফলছে এখন। ক্রমশ চোখের পাওয়ার বাড়ছে, ঘন ঘন চশমা বদলেও ভাল দেখতে পাচ্ছে না। ওর মনে ভয় ঢুকেছে যদি পরে অন্ধ হয়ে যায়।

অশোক জানা শুনতে শুনতে অস্বস্তি বোধ করে, এসব কি বলছেন? এত বড় দুঃখের কথা, অথচ আপনাকে দেখে--,

মিঃ দত্তর দীর্ঘশ্বাস পড়ে; বুঝতেই পারছেন, অসুস্থ মা এবং স্ত্রীর এই অসুখের জন্য বাড়িতে ঝি, চাকর সবই রাখতে হয়। দু'টি বাচ্চা আছে, তাদেরও দেখাশোনা করা দরকার। সব কিছুই করছিলাম, ভালো চাকরি ছিল, প্রায় সাতশো মাইনে, কিন্তু—

—কি বলুন।

—প্রায় পাঁচ মাস হল চাকরিটা গেছে, ঠিক নিজের দোষেও নয়। বিলিতী কোম্পানী, লালমুখো সাহেব, আমাদের ডিপার্টমেণ্টের অনেকের ওপরেই চটে যায়, তাইতেই চাকরি গেল। অথচ একথা বাড়িতে আমি বলতে পারিনি, তাতে মা বউ আরও ভাববে। অফিসের সময় বেরিয়ে পড়ি, সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে যথারীতি বাড়িতে ফিরি সন্ধ্যার সময়। হাতে যা টাকা ছিল এ ক'মাস সমানভাবে সংসার টেনে গেছি, কিন্তু আর বোধ হয় পারব না।

অশোক জানা এই পর্যন্ত শুনে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে, আরে মশাই এতো ঠিক নাটকের মত মনে হচ্ছে, কিন্তু তারপর আর কোথাও চাকরি পেলেন না?

—সেটা আরও নাটকীয়, আমি টেকনিকাল লাইনের লোক। আমার সার্টি-ফিকেটটা ছিল সাহেবের কাছে, তিনি আমাকে শুধু জবাব দিলেন তাই নয় ঐ সার্টিফিকেটটা লাল কালি দিয়ে কেটে আমার বিরুদ্ধে মতামত লিখে সই করে দিয়েছেন, যার ফলে সে সার্টিফিকেট অন্য কোথাও দেখাতে পারছি না, আর সার্টিফিকেট ছাড়া আমাদের লাইনে কাজ যোগাড় করা একরকম অসম্ভব।

কথা বলতে বলতে লাল কালি লাঞ্ছিত সার্টিফিকেটখানা মিঃ দত্ত অশোক জানার সামনে মেলে ধরে। অশোক জানা সজোরে বলে, এ তো ঘোর অন্যায়, সার্টিফিকেট নষ্ট করার অধিকার কারুর নেই।

—আমিও বলতে গিয়েছিলাম। এখন শুনলাম সেই সাহেব বিলেতে চলে গেছেন আমার সর্বনাশ করে। ফলে আজও আমি বেকার।

—তাহলে?

মরুভূমিতে জল দেখতে পাওয়া চোখে মিঃ দত্ত তৃষ্ণার্ত স্বরে বলে, অশোকদা এই সার্টিফিকেটের একটা কপি ছাপিয়ে দেবেন? আমার যথাসাধ্য

আমি দেব, দুশো, তিনশো টাকা যা চাইবেন। শুধু একটি কপি।

অশোক জানা এ প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, ব্যস্ত হয়ে বলে, কি বলছেন, জাল সার্টিফিকেট ছাপাব?

মিঃ দত্তর অনুনয়, এটুকু সাহায্য করলে আবার আমি চাকরি পাব, একটা পরিবার বেঁচে যাবে, প্লীজ অশোকদা।

অশোক জানা উঠে দাঁড়ায়, ঘন ঘন মাথা নাড়ে, না, না, এ অসম্ভব, এ অন্যায়, এ পাপ!

মিঃ দত্তর আকুতি, একটি বৃদ্ধা, একটি প্রায় অন্ধ স্ত্রী, দু'টি অসহায় শিশু।

॥ ছাব্বিশ ॥

মোহনচাঁদের সামনে অনাদিপ্রসাদকে অভিভাবক খাড়া করে ক্রীড়াচ্ছলে মনুয়া যে চাকরি পেয়েছিল, দেখতে দেখতে সেই চাকরিতে একটা মাস কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল। কিসের চাকরি, কি ব্যবসা, কি কাজ, এ-সব কথা বোঝবার অবকাশই হলো না। ছাত্র-জীবনের সঙ্গে চাকরি-জীবনের পার্থক্য, নিজের স্বাধীনতা অনেকখানি বিসর্জন দিতে হয়, ইচ্ছা না করলেও ঘড়ি দেখে অফিস যাওয়া, ঘণ্টা ধরে কাজ করা, প্রয়োজন না থাকলেও ছুটি না-হওয়া পর্যন্ত অফিসের টেবিলে বন্দী থাকা। কিন্তু মনুয়াকে এ ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হলো না। প্রথমটা সে বুঝতেই পারেনি চাকরি করছে বলে, আগের মতই সে সকালবেলা মে-ফ্লাওয়ারে আসে, মোহনচাঁদের সঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট খায়, অন্য অতিথি থাকলে তাদের আপ্যায়ন করে, তারপর আগের মতই এ-টেবিল থেকে ও-টেবিলে প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায়। নাচের বাজনা শুনলে নাচে, হি-হি করে হাসে, অন্যদের টিট্‌কিরি কাটে, ববির অভাব অনুভব করে, নিত্য নূতন বন্ধু জুটিয়ে সাংহাইতে চীনে খাবার খেতে যায়।

মাঝে মাঝে মোহনচাঁদ বলে, আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি, অমুক লোক আসবে, মিস লাহিড়ী, তুমি তাকে বসিও, যা খেতে চায় খাইও, গল্প করো। আসল কথা তাকে ধরে রেখো যতক্ষণ না আমি ফিরি।

মনুয়ার কাছে এ কোন কাজই নয়, সে যে লোকই আসুক না কেন, মনুয়া তার সঙ্গে অনর্গল বকবক করে যেতে পারে, ইংরাজী, হিন্দী, বাংলায়। কাজের লোক কাজ ভুলে যায়, মনুয়ার সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠে। মোহনচাঁদ ফিরে এসে কাজের তারিফ করে বলে, সত্যি তোমার ক্ষমতা আছে মিস লাহিড়ী, কি এত গল্প কর ওদের সঙ্গে?

মনুয়া খিল খিল করে হাসে, আবোল-তাবোল কত কি বলি, এই পার্ক স্ট্রীটের গল্প, রেস্তোরাঁ, মার্কেট, সিনেমা কত কথা, তার কি শেষ আছে?

—লোকগুলোর ধৈর্য আছে এতক্ষণ ধরে আবোল-তাবোল শোনা—

—শুধু শুনবে কেন, দেখে।

—কি?

—মেয়ে।

—অর্থাৎ?

—আমাকে। পুরুষ মানুষদের এক আশ্চর্য স্বভাব সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তারিয়ে তারিয়ে আইসক্রীম খাওয়ার মত চোখ দিয়ে চেখে চেখে দেখে।

—আর মেয়েরা?

—সামনা সামনি দেখতে পারে না, এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারে। এমনকি পরপুরুষকে দেখবার জন্য মাঝে মাঝে লিপস্টিক মাখার ছলে আয়নাও ব্যবহার করে।

মোহনচাঁদ হাসতে হাসতে মন্তব্য করে, তুমি একটি আশ্চর্য চরিত্র।

মনুয়া তক্ষুনি বিলিতী কায়দায় অভিবাদন জানায়, এটা কিন্তু আমি কমপ্লিমেন্ট বলেই গ্রহণ করলাম।

বলা বাহুল্য, এদের কথাবার্তার মাধ্যম ইংরাজী।

মাঝে মাঝে মনুয়া জানবার চেষ্টা করে, আপনাদের কতরকম ব্যবসা?

মোহনচাঁদ মৃদু হাসে, অনেক রকম। চটকল, কাপড়ের মিল, চা-বাগান, আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা, এ-সব ছাড়াও অনেক কিছু। শুধু বাংলা দেশে নয়, বিহার, ইউ পি, গুজরাট, দিল্লী সব জায়গাতেই অফিস আছে। ভাইরা কাজ দেখে, আমার ছেলেরাও। নিজে এক সময় খুব খেটেছি, এখন একরকম অবসর নিয়েছি।

—সে কী, এত লোক আসে, এতরকম ব্যবসার কথা শুনি—

—নতুন নতুন কাজ ধরি। তবে সে-সব করে অন্যরা, এখানে কথাবার্তা হবার পর পার্টিদের পাঠিয়ে দিই অফিসে, ম্যানেজাররা কাজ সামলায়।

—আমি একদিন আপনাদের অফিসে যাব।

—যেতে পার, তবে ওখানকার পরিবেশ তোমার ভাল লাগবে না।

—কেন?

—সে তো কাঠখোট্টা অফিস, কত লোক কাজ করছে, কত মেয়ে, টাইপিস্ট, স্টেনো, টেলিফোন-অপারেটার, ওদের একটা আলাদা জগৎ আছে। তুমি সে-জগতের মেয়ে নও।

মনুয়া আশ্চর্য না হয়ে পারে না, আমি তা হলে কোন্ জগতের মেয়ে?

—তোমাকে ভাবতে গেলেই এই আবছা আলোর রেস্তোরাঁর কথা ভাবতে

হয়, বাজনার কথা ভাবতে হয়, এইসব 'টীনএজার'দের কথা ভাবতে হয়, অফিসে নিয়ে গিয়ে ঢোকালে এ-মনুয়া লাহিড়ী বাঁচবে না। চোখে চশমা আঁটা, মুখ গম্ভীর, সযত্ন প্রসাধন করা আর-এক মনুয়া লাহিড়ীর সৃষ্টি হবে। তাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না।

—ভারি তো কাজ করি আমি।

—এই তো কাজ, এতক্ষণ যে বসে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করছি, তার দাম নেই? তুমি হঠাৎ আমার সঙ্গে গল্প করবে কেন? চাকরি করছ বলে তোমায় গল্প করতে হচ্ছে।

মনুয়া আপত্তি করে, মোটেও না, আমার বেশ ভাল লাগে আপনাদের কথা শুনতে। সবকিছু হয়তো বুঝতে পারি না, তবে এটুকু বুঝি ব্যবসার জগৎটাই আলাদা। আমাদের বাড়িতে এ ধরনের কথাই হয় না। বাবা খুব বড় চাকরি করেন।

—কোথায়?

—ফিন্‌লে কোম্পানীতে।

—কি নাম?

বলা ঠিক হবে কিনা মনুয়া একবার ভেবে নেয়. শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে, স্বরূপ লাহিড়ী।

—নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে, হয়তো কোথাও দেখাও হয়েছে।

—সেই জন্যে আমাদের বাড়িতে বেশীর ভাগই সাহেবদের কথা শুনতাম, অন্যান্য অফিসাররা আসত, চাকরির গল্প, প্রমোশনের চেষ্টা, কিন্তু ব্যবসার কথা হতো না।

মোহনচাঁদ জিজ্ঞেস করে, আর তোমার মামা?

মনুয়া পাতানো মামার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল, অন্যমনস্কভাবে পাল্টা প্রশ্ন করে, কোন্ মামা?

—যিনি তোমার লোকাল গার্জেন।

এতক্ষণে মনুয়ার খেয়াল হয় অনাদিপ্রসাদের কথা, বলে, উনি লেখক, বই লেখেন।

প্রথম মাসে একদিনও মনুয়াকে বিকেলের দিকে আটকে থাকতে হয়নি মোহনচাঁদের কাজে। লাঞ্চের পরই মোহনচাঁদ বলে দিত, মিস লাহিড়ী, আমার আর কোন দরকার নেই, তুমি চলে যেতে পার।

মনুয়া অবশ্য চলে যেত না, অন্য টেবিলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করত, দু'-একটা ব্যবসার কথা বলে সবাইকে চমকে দিত। তারা জিজ্ঞেস করত,

হঠাৎ ক'দিন থেকে তোমার মাথায় ব্যবসাবুদ্ধি খেলছে কি করে?

মনুয়ার জবাব, ব্যবসা ছাড়া কোন জাত বড় হয় না, কারুর টাকা হয় না।

—তা বুঝলাম, কিন্তু তুমি কি করবে?

—ব্যবসা করব। তারই চেষ্টায় আছি। কিছু-না-হোক একটা এজেন্সী নেব।

—মনুয়া, তোমার মুখে এ-সব কথা শুনতে কিন্তু আশ্চর্য লাগছে। নাচ, গান, বাজনা ছেড়ে ব্যবসা?

মনুয়া হাত দুটো ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে খুশীভরা গলায় বলে, নাচতে নাচতে ব্যবসা করব। গাইতে গাইতে টাকা রোজগার করব।

অন্যদের সরস প্রশ্ন, আর বাজাতে বাজাতে?

মনুয়া খিল খিল করে হাসে, বাজাতে বাজাতে পার্টি দেব, সমস্ত মে-ফ্লাওয়ারটা বুক করে বোতলের পর বোতল খুলব—শ্যাম্পেন।

সকলের উচ্ছ্বাস, থ্রি চীয়ার্স ফর মনুয়া লাহিড়ী, দি বিজনেস কুইন!

মাসের শেষে মাইনের টাকা হাতে পেল মনুয়া, এমন কিছু বেশী নয়, পাঁচ শ' টাকা। স্বরূপ লাহিড়ীর মেয়ে ছোটবেলা থেকে অনেক টাকা দেখেছে, তবু নিজের রোজগারের প্রথম টাকার প্রতি কেমন যেন একটা মমতা জন্মায়। নিজের মনে হিসেব করে কি করবে এই টাকাগুলো দিয়ে। ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখবে, খরচ করবে, বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াবে, কিছুই ভেবে পায় না। এক-এক সময় মনে হয়, ববিটা থাকলে ভাল হতো। অন্তত কয়েকটা দিনের জন্যে সে ববিকে নিজের কাছে ধরে রাখত, রম্ভা কুশারী কিংবা কে. জি-র শালীর কাছে যেতে দিত না। নিজের রোজগারের টাকায় সে ববিকে মদ খাওয়াত, অনেক রাত পর্যন্ত বসে গল্প করত। ছেলেটা বড় সুন্দর, আরও সুন্দর ওর চোখ দুটো। কিন্তু ক্রমশ কেমন যেন উল্টো স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। যদি ঠিকমত সাঁতার কাটতে না পারে, কি হবে বলা শক্ত। ববির জন্যে মনে মনে শঙ্কিত হয় মনুয়া।

মাইনের টাকা ব্যাগে নিয়ে মে-ফ্লাওয়ার থেকে বেরিয়ে মনুয়া গেল মার্কেটে। কত দোকান, কতরকম জিনিসপত্র, ঘুরে বেড়াতে বেশ ভাগ লাগে। এটা-ওটা দেখতে দেখতেই সময় কেটে যায়। যারা জিনিস কিনছে, তাদেরও দেখতে ভাল লাগে! কতরকম দর কষাকষি, রাগারাগি, শেষ পর্যন্ত খদ্দের ভাবে সে জিতল, দোকানীও মনে মনে হাসে। যতই দাম কমাক কোন দিনই তার দুধে হাত পড়ে না।

একটা নতুন ডিজাইনের সিল্ক প্রিণ্টের শাড়ি। চমৎকার দেখতে, এখনও

কলকাতার বাজারে ততটা চালু হয়নি, দামও খুব বেশী নয়। মনুয়ার লোভ হলো শাড়িটা দেখে, না কিনে পারল না। বাড়ির জন্যে কিছু কেক, প্যাটি কিনে নিল, ইচ্ছে করে ট্যাক্সি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরল বাড়িতে।

স্বরূপ লাহিড়ী তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। মা সেজেগুজে তৈরী হয়ে বারান্দায় বসে, স্বামী ফিরলে দুজনে একসঙ্গে চা খান। মনুয়া কোন দিনই এ সময় ফেরে না, তাই মার স্বরে বিস্ময়, কি ব্যাপার, এত সকাল সকাল ফিরে এলে?

মনুয়ার ছোট্ট উত্তর, এমনি। আজ তোমাদের সঙ্গে চা খাব।

—মুখ হাত-পা ধুয়ে এস, উনি এখুনি এসে পড়বেন।

মনুয়া নিজের ঘরে চলে গেল। হাতের জিনিসপত্রগুলো খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে, চোখ, মুখ আগের চেয়ে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। কপালের চুলগুলো বেড়েছে, যেমন করে সেলুনে বেঁকিয়ে দিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবেই বেড়ে উঠেছে। সারাদিনের ক্লান্তির কোন ছাপই নেই মুখের ওপর। ঠোঁট দুটো এত গোলাপী হয় কি করে, সে তো লাঞ্চ খাওয়ার পর আর লিপস্টিক ব্যবহার করেনি।

হঠাৎ নজরে পড়ল খোলা দরজা দিয়ে মাকে দেখা যাচ্ছে, তারও আবছা প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নায়। কে বলবে এ সেই মা, মনুয়ার চেয়ে উনি একদিন অনেক সুন্দরী ছিলেন। যাকে ঘিরে স্তাবকদের কত গুঞ্জন, যার জন্যে বাবা-মার অবিরাম ঝগড়া। নিত্য নূতন কত স্টাইল, কত শাড়ি, গয়না। সে-ই ভদ্রমহিলা চুপটি করে চেয়ারে বসে আছে স্বামীর প্রতীক্ষায়। নেই সেই আগের জলুস, আগের সেই প্রাণ। আজকাল বড় একলা পড়ে গেছে। মনুয়া সকালে বেরিয়ে যায়, রাত্রে ফেরে, স্বরূপ লাহিড়ীরও ফিরতে সন্ধ্যে হয়। সকাল, দুপুর, বিকেল মিসেস লাহিড়ী চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকে, বই পড়ার অভ্যেস নেই। কখনও উল বোনে, কখনও রান্না করে। কাজে আনন্দ নেই, কোনরকমে সময় কাটানো।

মনুয়া ঘুরে বসল। আয়নার মধ্যে দিয়ে নয়, এবার সামনাসামনি দেখল তার মাকে। আহা, বেচারি! মায়ের কথা ভাবতে তার কষ্ট হলো। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল, মা শোন।

মিসেস লাহিড়ী সাড়া দেয়, কি রে?

—এ ঘরে এস।

মা এসে দাঁড়াতে মনুয়া ঝুপ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মেয়ের এ ব্যবহারে মায়ের বিস্ময়, হঠাৎ, কি ব্যাপার? প্রণাম করছিস?

মনুয়া শাড়ির বাক্সটা মার হাতে ধরিয়ে দেয়, তোমার জন্যে এটা কিনে

এনেছি। আনন্দবিহ্বল মিসেস লাহিড়ী। আমার জন্যে শাড়ি কিনেছিস, কি চমৎকার! এ পরলে কি এখন আমায় মানাবে?

—খুব মানাবে। আমার মায়ের মত সুন্দর ক'জন?

মা আরও অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকায়। অগত্যা মনুয়া বলে, আজ প্রথম মাইনের টাকা পেয়েছি, তাই তোমার জন্যে শাড়ি নিয়ে এলাম।

—মাইনে? তুই কি চাকরি করিস?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—সে মস্ত একটা কোম্পানীতে।

—কি কাজ? কে যোগাড় করে দিল?

মনুয়া একটু যেন বিরক্ত হয়, সেই জন্যে তো তোমাদের কিছু বলতে চাই না, অত কথা জানবার দরকার কি? আমি তো অন্যায় কিছু করছি না।

—তা নয়, তোমার বাবাকে তো জান, ক'দিন ধরে আমাকে খালি বলছেন তোমাকে ঠিক মত দেখছি না, বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছি। মাঝে মাঝে রাত করে তুমি বাড়ি ফের। তোমার বয়সী মেয়ের পক্ষে সেটা ভাল নয়।

মনুয়া চটে গিয়ে বলে, প্লীজ, আর পায়রার মত বকম বকম করো না। নীতিকথা অনেক শুনেছি, তোমাদের সুখের জীবন নিজে চোখে দেখেছি, আর আমাকে জ্বালিও না।

মিসেস লাহিড়ী নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে, এই তো আমার অবস্থা, সারাক্ষণই তোমার বাবার কাছে বকুনি খাচ্ছি, আবার সেই সব কথা তোমাকে বলতে গেলে বিরক্ত হও, চুরির দায়ে যেন ধরা পড়েছি।

মনুয়া আর কথা না বাড়িয়ে কলঘরে ঢুকে যায়। কিছুক্ষণ বাদে শাড়ি পাল্টে বেরিয়ে এসে মার কাছে গিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে বলে, মানী, আমার ওপর রাগ করো না। এবার থেকে আমি তোমায় দেখব, এখন থেকে নিজে রোজগার করছি তো?

মিসেস লাহিড়ী ম্লান হাসে।

—কিন্তু একটা কথা, বাবাকে এখন জানিও না আমি চাকরি করছি। কি জানি, হয়তো রেগে যাবে। আরও দু'এক মাস যাক, তারপরে বললেই হবে।

—আমার ওপর রেগে যাবে না তো?

—সে আর নতুন কথা কি? তখন বলে দিও তুমিও জানতে না। তাহলে তো আর তোমায় দোষ দিতে পারবে না।

নিজের অজান্তে মিসেস লাহিড়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কি জানি।

স্বরূপ লাহিড়ী বাড়ি ফিরে মা-মেয়েকে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখে প্রথমটা ভুরু কোঁচকাল, সন্দিগ্ধ চোখে এদিক-ওদিক দেখল, শেষ পর্যন্ত

টাই-এর নট্ খুলতে খুলতে খুশী হয়ে বলল, দিস্ ইজ্ এ প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ। অফিস থেকে ফিরে মেয়েকে আমি কোনদিন দেখিনি। শরীর-টরির খারাপ হয়নি তো?

মনুয়াও হাসল, আজ ঠিক করলাম, বাবা-মার সঙ্গে সন্ধ্যেটা কাটাব।

—ভাল কথা, কোন প্রোগ্রাম আছে নাকি? নয়তো চল চা খেয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাক, হয়তে যদি চাও রাত্রে আমরা বাইরে খেতে পারি।

—তার চেয়ে বাড়িতে বসে গল্প করা ভাল। রাত্রে এক বাড়িতে আমরা শুই বটে, এ ছাড়া আর কোন্ সময় এক সঙ্গে থাকা হয় বল?

তিনজনে গল্প করতে করতে তারা চা খেল। মিসেস লাহিড়ী বাড়িতে কাবাব তৈরি করেছিল, সেই সঙ্গে মনুয়ার কিনে আনা কেক, প্যাটি, তার চেয়েও বড় কথা সরব ঘরোয়া আলোচনা।

স্বরূপ লাহিড়ী না বলে পারে না, অন্যদিন বাড়ি ফিরি, চুপচাপ বসে চা খাই। তোমার মা আজকাল দরকার না পড়লে কথা বলেন না।

মিসেস লাহিড়ীর উত্তর, কি করব, আমি কিছু বললেই তো তুমি বিরক্ত হও।

—যাতে বিরক্ত না হই এমন কথাও তো বলতে পার।

—সেরকম কোন কথা আছে কিনা আমি তো জানি না। এত বছর বিয়ে হয়েছে কই আজও তো খুঁজে পাইনি।

মনুয়া থামিয়ে দেয়, তর্কাতর্কি থাক, আজকের সন্ধ্যেটা এসো আমরা গল্প করে কাটাই। ভাবছিলাম অনেকদিন তো আমরা কোন চেঞ্জে যাইনি, বাপি যদি ছুটি পায় দিন সাতেকের জন্যে কোথাও ঘুরে আসা যায়। দার্জিলিং, পুরী কিংবা গোপালপুর।

স্বরূপ লাহিড়ী উৎসাহিত হয়, ছুটি আমি যখন খুশি পেতে পারি, তোমরা আগে ঠিক কর কবে যাবে, কোথায় যাবে।

এতক্ষণে মনুয়ার মা এ প্রসঙ্গে যোগ দেয়, বলে, যদি যাওয়াই হয় দার্জিলিং চল, অনেকদিন ওখানে যাইনি, কি সুন্দর জায়গা। অল্পদিনের মধ্যে মনটা ভুলিয়ে দেয়, সত্যিকারের চেঞ্জ হয়।

—মনে পড়ে, মনুয়া যখন এক বছরের বাচ্চা, আমরা জলাপাহাড়ের একটা বাড়িতে ছিলাম।

—তোমাদের কোম্পানীর এক সাহেবের বাড়ি, কিন্তু তারপর মনুয়া যখন চার বছরের, ম্যালের ওপরে একটা হোটেলে উঠেছিলাম, তোর মনে পড়ে?

মনুয়া বলল, না, তবে যেবার আমরা মাউণ্ট এভারেস্টে উঠি, বাপি ঘোড়ার চড়ে ঘুরে বেড়াত, কয়েকজন তিব্বতী মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল, আমরা বার্চ হিলে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম, সে সব কথা মনে আছে।

—তখন তো তোর দশ বছর বয়েস।

—আর একবার গিয়েছিলাম শুধু তুমি আর আমি, বাপি তখন ইউরোপে। তোমার অসুখ করল, আমরা ফিরে এলাম।

তিনজনে পুরোন দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে। ফেলে আসা দিনের কথা ভাবতেও আনন্দ। তিক্ততা থাকে না, শুধু সুখস্মৃতি।

টেলিফোন বেজে উঠল।

স্বরূপ লাহিড়ী অভ্যাসমত উঠে পড়ে, যন্ত্রণা। বসতে দেবে না, এখুনি হয়তো খবর দেবে ডকের কাজে গোলমাল হয়েছে। হ্যালো, কাকে চাই? মিস লাহিড়ীকে?

—আপনি কে কথা বলছেন? আচ্ছা ধরুন আমি দিচ্ছি।

রিসিভার টেবিলের উপর রেখে মনুয়াকে বলে, কোন এক অবাঙালী ভদ্রলোক তোমাকে খুঁজছে, নাম বলল মোহনচাঁদ।

মনুয়া তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরে, আমি মনুয়া কথা বলছি।

অন্যদিক থেকে মোহনচাঁদের গলা শোনা যায়, মিস্ লাহিড়ী, আমার দুজন বিশিষ্ট অতিথি আসছেন, ডিনারে যেতে হবে। কতক্ষণের মধ্যে তুমি আসতে পারবে?

মনুয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, ডিনারে, কোথায়?

—বড় হোটেলে, টেবিল আমার রিজার্ভ করা আছে। ওরা স্বামী-স্ত্রী, সেই জন্যে আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে থাক।

—কখন যেতে হবে?

—তুমি তৈরী হয়ে নাও আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—ঠিক আছে।

—রাত্রে আমার গাড়ি তোমায় বাড়ি পেঁছে দেবে।

মোহনচাঁদ টেলিফোন কেটে দেয়।

মনুয়া ভয়ে ভয়ে মা-বাবার দিকে ফিরে তাকায়, অপরাধীর মত বলে, আমাকে একটু বেরতে হবে।

স্বরূপ লাহিড়ীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, তা তো বুঝতেই পারলাম, মোহনচাঁদ লোকটা কে?

মনুয়া কি জবাব দেবে প্রথমটা ভেবে পায় না। শেষ পর্যন্ত মিথ্যে বলে, আমার বন্ধু।

—তুমি বললেই পারতে আজকে বেরবে না। বাড়িতে থাকবে।

মনুয়া ঢোক গেলে, পারতাম।

—তাহলে বললে না কেন?

মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে স্বরূপ লাহিড়ীর আদেশ, আবার টেলিফোন করে জানিয়ে দাও তুমি যাবে না।

—আমি যে কথা দিয়েছি।

—তুমি লাইন দাও আমি বলে দিচ্ছি তুমি যেতে পারবে না।

মনুয়া প্রমাদ গোনে, মিথ্যে বলে, আমি তো ওর কোন নম্বর জানি না।

স্বরূপ লাহিড়ীর মেজাজ আরও চড়ে যায়, ঠিক আছে, গাড়ি আসুক আমি ফেরত পাঠিয়ে দেব।

মনুয়া এবার জোর দিয়ে বলে, উপায় নেই আমাকে যেতেই হবে।

—কেন?

—সে আমি তোমায় পরে বলব।

আর তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে মনুয়া ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। বহুদিন বাদে যে সহজ সুন্দর একটি পারিবারিক পরিবেশ গড়ে উঠছিল স্বরূপ লাহিড়ীর এই ছন্নছাড়া বাড়িতে, এক নিমেষের মধ্যে তা অন্তর্হিত হলো। কোথায় দার্জিলিং-এর পাহাড়, কোথায় স্মৃতির রোমন্থন, আবার সেই লবণাক্ত সমুদ্রে তিনটি নির্জন দ্বীপ। স্বরূপ লাহিড়ী—মনুয়া আর তার মা।

॥ সাতাশ ॥

শহর কলকাতার বাসিন্দা অথচ জ্যোতিষীর কাছে ভবিষ্যতের কথা জানতে যায়নি এমন লোক কেউ আছে বলে মনে হয় না। সে ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, বাঙালী অবাঙালী, বৃদ্ধ যুবক, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী যেই হোক না কেন, এক দিন না এক দিন সতর্ক বা অসতর্ক মুহূর্তে নিশ্চয় গিয়ে হাজির হয়েছে জ্যোতিষীর কাছে। সে জ্যোতিষী রাজজ্যোতিষী বা ফুটপাথ-জ্যোতিষী যাই হোক না কেন। কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন, রাজা মহারাজা কবি বিজ্ঞানীদের সার্টিফিকেট সহ দিগ্বিজয়ী জ্যোতিষীদের সদম্ভ আত্মপ্রচার, তাদের সুসজ্জিত বাড়ি, ঝকঝকে চেম্বার, নিজস্ব গাড়ি, ছোট্ট অফিস, সেই সঙ্গে গ্রহরত্নের ব্যবসা। এঁদের দরজায় বড়লোকদের ভীড়—শান্তিহীন জীবনে আংটি মাদুলির প্রেসক্রিপশান সংগ্রহ করতে যায়।

ফুটপাথের জ্যোতিষীদের প্রসার কম নয়, যে কোন পার্কের পাশে এরা বসে যায়, কারুর মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কারুর কপালে শ্বেত চন্দন, পাশের রেলিঙে ঝোলান হস্তরেখার ছবি। কারুর সামনে চেনে বাঁধা টিয়া পাখি, খানকয়েক কাগজের খাম। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ কোন

মক্কেল উবু হয়ে এদের সামনে বসে পড়ে, ফিস ফিস করে দু' চারটে কথার আদান-প্রদান, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা—কয়েক আনা দক্ষিণা।

এ ধরনের পেশাদার জ্যোতিষী ছাড়াও অপেশাদারদের সংখ্যা কম নয়। ট্রামে বাসে অফিসে খেলার মাঠে সিনেমার লাইনে যত্রতত্র এদের বিচরণ। পাশের লোকের হাতটা টেনে নিয়ে বিজ্ঞের মত মৃদু মৃদু হাসি আর দু' চারটে অস্ফুট ভবিষ্যৎবাণী। অতি সহজে এরা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদের এক একজন পেশাদার গুরু থাকে, যখন নিজে হালে পানি পায় না তখন ছোটে সেই গুরুর কাছে। এই সব চ্যালাদের জন্য গুরুদেরও পশার বাড়ে।

'কত যোজন দূরে রয়েছে চন্দ্র সূর্য, তবু তাদের আবর্তনে কত নীচের পৃথিবীর জলে জোয়ার ভাঁটা হয়, হয় অমাবস্যায় অন্ধকার, পূর্ণিমায় চন্দ্র-করোজ্জ্বল রাত্রি। তবে কেন জ্যোতিষ্কগুলি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে না? এতে অবিশ্বাসের কি আছে?'

বলেছিলেন এক জ্যোতিষী তাঁর অবিশ্বাসী মক্কেলকে।

মক্কেলটির আক্কেল নিশ্চয় হয়েছিল তা না হলে অবিশ্বাসী মন নিয়ে জ্যোতিষীর দোরগোড়ায় দিনের পর দিন ধরনা দেয় কেন? অদ্ভুত মানুষের মন, একাধারে বিশ্বাস অন্য দিকে অবিশ্বাসী মনকে চোখ ঠেরে সান্ত্বনা দেয়, বলুক না, পাগলে কি না বলে।

জ্যোতিষীও কি না বলে?

বলে দেয় প্রসূতির জঠরোদ্ভূত ভাবী জাতকের আবির্ভাবের দিন-ক্ষণ-লগ্ন, বলে দেয় ভাবী দম্পতির রাজযোটক মিলের খবরাখবর—সারাজীবন সদ্য বিবাহিত জোড়াটি হৃদয়ে হৃদয়ে জুড়ে থাকতে পারবে কিনা; বলে দেয় আধি-ব্যাধির হেতু, সেই সঙ্গে তার প্রতিকার। সেয়ানা জ্যোতিষী হদিশ দেন গ্রহ-রত্নের; প্রেসক্রিপশান এবং দাওয়াই—একই জায়গায় মিলবার ব্যবস্থা। রত্নের ওজন ও উৎকর্ষতার হেরফেরে দামেরও পার্থক্য। যে যুবক বেকার, হাতে একটাও পয়সা নেই, সেও জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী শুনে উৎফুল্ল হৃদয়ে বাড়ি ফেরে—টাকা ধার করে পাঁচ ছ'খানা লটারীর টিকিট কিনে ফেলে, কিংবা মাঝারি ধরনের একটা পাথর ধারণ করে আঙুলে।

'ধন্য আশা কুহকিনী।' আশা, শুধুমাত্র আশার মোহে ঠকেও মানুষ পুনরায় ছোটে জ্যোতিষীর কাছে—যেহেতু ভবিষ্যৎ এমনই জিনিস, যা জীবনে আসা মাত্র বর্তমানে পরিণত, কিছু বিলম্বে যার পরিচয় অতীত বলে। এবং সর্বোপরি—যাকে জানা যায় না, যার কথা বলা যায় না আগে থেকে।

'ফুল আপনার ভাগ্য বলিয়া দিবে', কিংবা 'সম্মোহনী রুমাল', যা অবাধ্য

বড়বাবুর সামনে অত্যাশ্চর্য সুগন্ধী যোগে নাড়লে বড়বাবু আপনাকে পেয়ার করতে থাকবেন। পরীক্ষা পাস, মামলা মকদ্দমা জয়ের জন্য রয়েছে এক্সট্রা, স্ট্রং ত্রিমোহিনী কবচ, প্রিয় নর বা নারী যত দূরেই অবস্থান করুক না কেন, 'আজব আয়নায়' তার মুখ প্রতিফলিত হবেই। পাঁজিতে বিজ্ঞাপন দেখে প্রলুব্ধ হয় মানুষ—জলন্ধরি পোস্ট বক্সের ঠিকানায় ভি পি পি-র অর্ডার যায়, প্যাকেট ছাড়াবার পর নাড়ি ছাড়বার উপক্রম। বিজ্ঞাপনে যে 'ডামী' রিস্টওয়াচকে ছাপার ভুল হয়েছে বলে 'দামী' রিস্টওয়াচ ভেবেছিলেন, ভি পি-তে পিচ্-বোর্ডের খেলনা ঘড়ি পাবার পর—এ তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারেন না আপনি। পাঞ্জাবে বসে অন্য প্রদেশের লোকের এ হেন পকেট কাটা দেখে সরকারও চুপ করে থাকেন, যেহেতু বিজনেস ইস বিজনেস।

কিন্তু কালীপ্রসাদবাবুর হস্তরেখা বিচার আদৌ বিজনেস নয়। প্রথম জীবনে স্কুল মাস্টারি করতে করতে হদিশ পেয়েছিলেন এক সাধুর—তার পেছনে ঘুরলেন বছর কয়েক। তারপর ফিরে এলেন কলকাতায়—শুরু করলেন অপেশাদারী কর-গণনা। এখন তাঁর নাম সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। এক দিনের শখের নেশা আজ পেশায় পরিণত হয়েছে।

—আজ অবধি দেড় লক্ষ লোকের হাত দেখেছি, গর্বের সঙ্গে প্রায়ই ঘোষণা করেন কালীপ্রসাদবাবু।

আরও বলেন, ধাপ্পা আমি দিতে পারি না, ইনটুইশান-এর সাহায্যে আমি ভবিষ্যতের কথা বলি। শুধু হাতের রেখা দেখে এ বিচার করা যায় না। আমাদের চক্ষুলজ্জা থাকলে চলে না। সেদিন তো এক ভদ্রমহিলাকে বলেই ফেললাম তার কুমারী জীবনের প্রেমের কথা, তারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে একটি অনাথ আশ্রমের শিশু।

যারা কালীপ্রসাদবাবুকে চেনে তারা তাঁর চেম্বার ফাঁকা থাকলে আসে।—ভয় পায় কার সামনে কি বেফাঁস বলে ফেলেন।

তবে যাদের চক্ষুলজ্জা নেই, যেমন হলধর বা ফিল্ম ডিরেক্টার সৌরভ সেন, তারা নির্লজ্জের মত নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কালীপ্রসাদকে প্রশ্ন করে, আবার উত্তর শুনে কান এ'টো করে হাসে। সেদিন অবশ্য হলধর মিতাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, জিজ্ঞেস করল, কালীবাবু ভাল করে হাতটা দেখুন তো আমাদের তিনজনের, এ মেয়েটির ইচ্ছে ফিল্ম প্রোডিউসার হবে, টাকাটা আমার, আর ইনি ডিরেক্টার। সেই জন্যে তিনটে হাতই দেখা দরকার।

কালীপ্রসাদ মিতার দিকে তাকান, ইনি কে?

—আমার ইয়ে।

—হঠাৎ ছবির শখ কেন?

হলধর অম্লান হাসে, জানেনই তো আমার ঘোড়া রোগ আছে, ঘোড়ার পয়সা এদ্দিন মেয়েমানুষের পেছনে ঢেলেছি, এবার ভাবছি ছবির পেছনে ঢালব। কায়া থেকে ছায়া।

কালীপ্রসাদ হলধরের হাতটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলেন, নতুন ব্যবসার পক্ষে সময়টা ভাল নয়, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

সৌরভ সেন না বলে পারে না, আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই, কোনরকমে লোকটাকে নিমরাজী করিয়েছিলাম, আপনি স্রেফ জল ঢেলে দিলেন।

কালীপ্রসাদের আহ্বান, দেখি আপনার হাত।

সৌরভ সেন ডান হাতের তালুটা প্যাণ্টে মুছে নিয়ে গণৎকারের সামনে এগিয়ে দেয়। একটু পরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ ধরে কি দেখছেন স্যার?

কালীপ্রসাদের মুখে মৃদু হাসি, দেখছি আপনার অতীতটাকে, আপনি যা ছিলেন। এন্তার টাকা রোজগার করেছেন, গ্রাহ্য করেননি। দু' হাতে উড়িয়েছেন, নবাবী করেও সাধ মেটেনি। বহু নারীসঙ্গ, শরীরের ওপর অত্যাচার, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে লিভারটা নষ্ট হতে বসেছে। মনটা আপনার ভাল, সেই কারণে বহু লোকে ঠকিয়েছেও।

—এসব কথা শুনে আর লাভ কি? নিজে কি ছিলাম তা তো জানিই, এখন বর্তমানটা কিরকম দেখছেন।

—ভাল নয়।

—কবে ভাল হবে?

—সেটা নির্ভর করছে আপনার ভবিষ্যতের ওপর।

সৌরভ সেন বিরক্ত হয়, আহা সেই ভবিষ্যৎটাই তো জানতে এসেছি।

—জীবনে আর একটা সুযোগ আপনি পাবেন, তবে একেবারে শেষ বেলায়। খুব নাম হবে, তবে টাকা হবে কিনা বলতে পারছি না।

সৌরভ সেন আশার আলো দেখে, কবে সেটা?

—দেরী আছে।

—দূর মশাই, আরও দেরী? এ তো মনে হচ্ছে দেবদাস শেষ অবস্থায় পার্বতীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত দোরগোড়ায় গিয়ে মুখ থুবড়ে মরবে আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করবে, 'ধর্মদা আর কত দেরি?' আমার ধর্মদা অবশ্য আপনি।

কালীপ্রসাদ হাসেন, আপনি বেশ বাক্‌পটু।

—পরিষ্কার করে বলুন না বাক্‌সর্বস্ব, আগে কাজ করতাম এখন শুধু কথা বলি। নয়তো চব্বিশ ঘণ্টা কাটবে কি করে? যাক্ গে, মোদ্দা কথা, বলুন তো হলধরবাবুকে নিয়ে ছবি করা যাবে কিনা।

—আমি করবার উপদেশ দেব না, খারাপ সময়টা কেটে যাক, সেও প্রায় দেড় বছর, তারপর দেখা যাবে।

এ কথায় হলধর কিন্তু অখুশী হলো না, বলল, এখন বুঝতে পারছেন তো সৌরভবাবু, কেন আমি ইতস্তত করছিলাম, কালীদা যখন বলছেন এখন বরং ছবির ব্যাপারটা থাক। তার চেয়ে ক'দিন আপনি আমার সঙ্গে রেসের মাঠে চলুন। কপালে থাকলে বেশ দু' পয়সা রোজগার হবে।

সৌরভ সেনের সায় দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না, বলে, তথাস্তু।

এইবার কালীপ্রসাদ মিতাকে লক্ষ্য করে বলেন, দেখি মা তোমার হাত দুটো।

মিতার জবাব, আমি কিন্তু একলা আপনাকে দেখাব। এখানে আর কেউ থাকলে চলবে না।

হলধর উঠে পড়ে, ঠিক আছে, তুমি কালীদার সঙ্গে কথা বল, আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।

কালীপ্রসাদকে একলা পেয়ে মিতা প্রথম কথাই বলল, আমাকে কিন্তু মিথ্যে কথা বলবেন না আমার মন রাখবার জন্যে।

কালীপ্রসাদের গম্ভীর উত্তর, আমি সেরকম কখনও বলি না।

—ঐ হলধরবাবুটি কিরকম লোক?

কালীপ্রসাদ হাতের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে মিতার মুখখানা দেখেন, বুঝতে পারেন সে চঞ্চলা সফরী নয়, গভীর জলের মাছ। তাই পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনার কিরকম মনে হয়?

—ঘোড়েল।

—এক কথায় তা বলা চলে।

—কদ্দিন টিঁকবে?

—ইহজগতে?

—আমার কপালে।

—টিঁকলেও আপনিই হয়তো আর পাত্তা দেবেন না।

—কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আপনার হাত বলছে আপনি বহু পুরুষসঙ্গ করবেন. হলধরবাবু আপনার কত নম্বর?

মিতা কি যেন ভাবে. পরে সপ্রতিভ গলায় বলে. যদি ঘর করা বলেন তা হলে হলধরবাবু পয়লা নম্বর. এর আগে কারুর সঙ্গে থাকিনি।

—তাই মনে হচ্ছে. তবে আপনার ভাগ্যরেখা ভাল. পয়সাকড়ি হবে, অতএব হলধরবাবুকে অনায়াসে সিঁড়ি বানিয়ে ফেলতে পারবেন, ধাপে ধাপে পা ফেলে দিব্যি ওপরে উঠে যাবেন।

মিতা খিল খিল করে হাসল, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, আমার লাইন-এর অনেক মক্কেল আপনার কাছে পাঠাব। তবে যদি ভাল বোঝেন একটা বশীকরণ জাতের মাদুলী কিংবা কবচ দিন না, বাবুদের নাকের কাছে ঘোরাব, তা হলে আর সিঁড়ি উঠতে কষ্ট হবে না, কি বলুন?

কালীপ্রসাদও হাসেন, তার দরকার হবে না, চেহারাটা এরকম তাজা রাখবেন ঐতেই বশীকরণের কাজ দেবে।

হলধর এবার পার্টিশানের ভেতরে মুখ বাড়ায়, এখনও কথা শেষ হলো না, কেমন দেখলেন কালীদা?

—খু-উ-ব ভাল।

—সর্বনাশ, উড়ে যাবে না তো?

—সোনার খাঁচায় রাখুন।

হলধরও রসিকতা করে, শেষ পর্যন্ত তাই রাখতে হবে দেখছি, এই প্রণামীর টাকা দিয়ে গেলাম, আজকে চলি, বাইরে আপনার জন্যে মক্কেলরা বসে আছে।

হলধর বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে একটি মাঝবয়সী ভদ্রলোক ফুড়ুৎ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। চকিতে কালীপ্রসাদের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকায়, ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে, গুরুজীর হাতটা কেমন দেখলেন?

ক'দিন আগে এই ভদ্রলোক কালীপ্রসাদকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল তার গুরুদেবের হস্তরেখা বিচার করার জন্যে। বাড়িভর্তি ভক্তরা থাকায় কালীপ্রসাদের সঙ্গে জনান্তিকে কথা বলার সুযোগ পায়নি বলে ভদ্রলোক আজ এখানে এসেছে।

কালীপ্রসাদ বললেন, মিথ্যে আপনারা ভয় পাচ্ছিলেন মশাই, আমি তো দেখলাম আপনার গুরুদেব দীর্ঘায়ু, অনেক দিন বাঁচবেন, স্বাস্থ্যহানিরও কোন লক্ষণ পেলাম না।

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে ভাঙেন, ঠিক এ কথা জানবার জন্যে আমি আপনাকে নিয়ে যাইনি। ওটা ছিল উপলক্ষ।

—তবে ওঁর সম্বন্ধে কি জানতে চান?

ভদ্রলোক এইবার ঝেড়ে কাশে, জানতে চাইছিলাম গুরুদেব আসলে লোক কেমন? মানে ঠকিয়ে নেবে না তো?

কালীপ্রসাদ আকাশ থেকে পড়েন, আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই, যাঁকে গুরু বলে বরণ করেছেন তাঁকে যাচিয়ে নিচ্ছেন জ্যোতিষী দিয়ে?

—কি করব বলুন, ভেজালের মত বদ্ গুরুতে দেশটা যে ছেয়ে গেছে, গুরুগিরি এখন মস্ত বড় প্রফেশান, কে সং কে অসৎ বাইরে থেকে বুঝব কি করে?

—এতই যদি ভয়, গুরু নাই বা করলেন।

ভদ্রলোক টেনে টেনে হাসে, আমরা ছাপোষা মানুষ, একটা গুরুটুরু থাকলে অনেক সুবিধে। বিপদে-আপদে শরণ নেওয়া যায়, নিজেদের ভুল ত্রুটি-গুলো তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়, বাড়ির মেয়েরাও খুশী থাকে। যা দিনকাল পড়েছে একটু-আধটু ভক্তিভাব থাকা ভাল। তবে আমাদের সংশয়ী মন তো, তাই গুরুজীকে একটু যাচিয়ে নিলাম। তা কেমন বুঝছেন, লেগে থাকব?

সংযমে অভ্যস্ত কালীপ্রসাদ এবার আওয়াজ করে হাসলেন, মনুষ্যচরিত্র যে কি বিচিত্র এই ছোট্ট চেম্বারে বসেই তা দেখতে পাই। একটু আগে একটি রক্ষিতা এসেছিল তার বাবুর চরিত্র যাচাই করতে, আর আপনি এসেছেন গুরু-দেবের চরিত্র জানতে। এসব ক্ষেত্রে উত্তর দেওয়া বড় কঠিন, তবে আপনার ভয় নেই, গুরু যদি সাচ্চা হন এমন শিষ্য তাঁর কপালে বেশী দিন সইবে না। আর তিনি যদি নকল হন, এ তো হবে মণিকাঞ্চন যোগ।

ভদ্রলোক কালীপ্রসাদের কথার অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারল না, একটা দশ টাকার নোট টেবিলের উপর রেখে বলে, যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম, তা হলে আমি আসি।

—আসুন, কালীপ্রসাদও মনে মনে হাসেন, ভদ্রলোক কি ভেবে কিসের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন তা তিনিও বুঝতে পারলেন না।

এ ধরনের কত লোক আসে কালীপ্রসাদবাবুর কাছে। সকাল দুপুর বিকেল, তার আর অন্ত নেই। কেউ চায় হঠাৎ বড়লোক হতে, জানতে আসে লটারির টিকিট কিনবে কিনা, কেউ খুঁজছে পারিবারিক শান্তি, কারুর প্রয়োজন রোগ-মুক্তি তার জন্যে যদি কোন প্রতিষেধক পাওয়া যায়। কারুর স্বপ্ন ঘর বাঁধবার, কারু বা লোভ পরস্ত্রীর ওপর। হাজারো রকমের লোক, হাজারো রকম চিন্তায় এই ছোট্ট দপ্তরে আসে। কালীপ্রসাদ চেষ্টা করেন সকলকে উপদেশ দেবার, অবশ্য তাদের সবাইকে খুশী করতে পারেন না।

মক্কেলদের নিয়ে যখন হাতের রেখা বিচারে ব্যস্ত, অনেক সময় তিনি দরজার আড়ালে শুনতে পান চুড়ির আওয়াজ, শাড়ির খসখসে শব্দ, বুঝতে পারেন গৃহিণী তাঁকে কিছু বলতে চান। নিতান্ত প্রয়োজনভরা সাংসারিক আলাপ, মুদির বিলটা বাকি পড়েছে, ধারে আর জিনিস পাঠাতে চাইছে না।

—ছেলেদের কাউকে পাঠিয়ে অন্য কোন দোকান থেকে নগদ টাকা দিয়ে জিনিস কিনে আন।

—দেখি। খুকীর শ্বশুরবাড়ি একবার নিশ্চয় যেও, মেয়েটাকে ওরা বড্ড কষ্ট দিচ্ছে।

—রোজই তো ভাবি যাব, এত মক্কেল এসে পড়ে, সময় করে উঠতে পারি না।

স্ত্রীর অভিমান, কতজনের হাত দেখে তো কতরকম বলছ, এত দেখে শুনে নিজের মেয়েটার বিয়ে যে কোথায় দিলে।

এরপর পালিয়ে আসা ছাড়া কালীপ্রসাদের উপায় থাকে না, যাই, মক্কেলরা বসে আছে, পরে তোমার কথা শুনব।

কি করে তিনি গৃহিণীকে বোঝাবেন কারুর ভাগ্য বদলে দেওয়া যায় না, হয়তো সাবধান করা যায়, বলা যায় কোন সময়টা ভাল কোনটা মন্দ। নিজে তিনি চিরকাল অভাব অনটনের মাঝখানে মানুষ হয়েছেন, ভবিষ্যতে কোথাও রুপোলী রেখা দেখতে পান না, তবে তিনি অসুখী নন। বিশেষ করে তাঁর বন্ধুভাগ্যকে অনেকে ঈর্ষা করে। সৎ পরামর্শ দেওয়ার ফলে অন্য ব্যবসায়ী জ্যোতিষীদের মত তিনি ভয় দেখিয়ে লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করতে পারেন না সত্যি, কিন্তু অনেক অকৃত্রিম বন্ধু পেয়েছেন জীবনে যারা সত্যিই তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

এরই মধ্যে একদিন সাধনবাবু এলেন কালীপ্রসাদের কাছে। লোকটিকে দেখলে সত্যি চেনা যায় না। সেই উদ্ধত মানুষটা কুঁকড়ে গেছে, ভাল করে চোখ তুলে কথা বলতে পারছে না, সসঙ্কোচে বলে, আপনার কথা আমার মক্কেলদের কাছে অনেক শুনেছি। আসব আসব করে আসা হয়নি। আজ এলাম —এলাম বড় দুর্দিনে।

কালীপ্রসাদ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নতুন মক্কেলটিকে লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, আপনার কপালের ওপর একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছি, সময়টা শুভ নয়। কোন বিপদ ঘটতে পারে।

—আর নতুন করে ঘটবার কিছু নেই, যা হবার তা হয়ে গেছে। আমাকে চুরমার করে ভেঙে দিয়েছে। আমার এতদিনের খ্যাতি, ইজ্জৎ, প্রতিষ্ঠা নস্যাৎ করে দিয়ে আমার উঁচু মাথা হেঁট করে আমার মেয়ে একটা রাস্তার ছেলের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, বলতে পারেন কোথায় গেলে তাদের হাতে-নাতে ধরতে পারব?

জ্যোতিষী মাথা নাড়েন, আপনার হাত দেখে সে কথা বলব কি করে, পুলিসে খবর দিয়েছেন?

—খবর দিয়েছি, এখনও কোন হদিশ পাইনি, কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলাম, কোন সাড়া পাইনি, ভাবতে পারছি না মেয়ে হয়ে বাপের এরকম সর্বনাশ করল কি করে।

—সবই গ্রহের ফেরে।

—মেয়েটাকে ফিরে পাব?

—পাবেন।

—কবে?

—দিন পনেরোর মধ্যে, যে গ্রহ তাকে বাড়ি-ছাড়া করেছে সেই গ্রহই সরে যাবার সময় আপনার মেয়েকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

সাধনবাবুর চোখ দুটো যেন আরও ভেতরে ঢুকে গেল, জ্বলে উঠল টর্চের আলোর মত। বললেন, আপনার কথা যেন সত্যি হয়, আর জীবনে কিছু চাই না, শুধু মেয়েটাকে ফিরে পেতে চাই, তারপর কী করতে হয় আমি জানি। সাধনবাবুর ভেতর থেকে বুনো জন্তুটা উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে, তা দেখে কালীপ্রসাদ শঙ্কিত হন, সাবধান, মনে রাখবেন আপনার সময়টা খুব খারাপ, নিজের অবিবেচনার ফলে—

নির্বোধ জন্তুটা তখন গর্জন করছে, বলেছি তো, আর কিছু নয়, শুধু ওই মেয়েটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে চাই।

—পাবেন, কিন্তু পরে না অনুতাপ করতে হয়।

উকীল সাধনবাবু জেরা করার ভঙ্গীতে জ্যোতিষীর দিকে তাকালেন, কিন্তু তাঁর নিষ্পলক গভীর অথচ মমতাপূর্ণ দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারলেন না।

॥ আটাশ ॥

কেওড়াতলা ক্লাবের সদস্যরা আজ নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে। শুধু নিন্দা নয়, ভর্ৎসনা। আধুনিক ছেলেমেয়েদের শালীনতাহীন কদর্য ব্যবহার যে ক্রমশ সমাজকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে তারই জন্য অনুশোচনা—সরুব আলোচনা—খেদোক্তি।

কেওড়াতলা ক্লাবের পত্তন কবে হয়েছিল জানা নেই। অবস্থান ঢাকুরিয়া লেকের ধারে দু'খানা বেঞ্চিকে কেন্দ্র করে, যার পেছনে একটা অশ্বত্থগাছ জাপটে ধরে রয়েছে একটা তালগাছকে। কেওড়াতলা ক্লাবের সভ্যরা কেন এ জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন তার ইতিহাস জানতে পারলেও বোঝা যায় সভ্যরা রসিক ছিলেন। গাছের মধ্যে দিয়ে পুরুষ ও প্রকৃতির এই যে চিরন্তন খেলার প্রকাশ, তা তাঁরা উপভোগ করতেন আর হয়তো ছানিপড়া চোখে লক্ষ্য করতেন সেই সব তরুণ-তরুণীদের যারা জলের ধারে ঝোপের আড়ালে রাতের অন্ধকারে নিজেদের লুকিয়ে রাখত।

এ ক্লাবের সভ্য হতে হলে বয়স ষাটের ওপর হওয়া প্রয়োজন। কর্মে অবসর প্রাপ্ত, মাথায় পেঁজা তুলোর মত সাদা চুল, চোখে চশমা, হাতে লাঠি, গাল তোবড়ান বৃদ্ধরাই কেওড়াতলা ক্লাবের সভ্য। এঁদের মধ্যে অনেকেই একদিন বড় চাকুরে ছিলেন, কিংবা প্রখ্যাত অধ্যাপক অথবা সরকারী অফিসার। সাধারণত বিপত্নীক, থাকেন ছেলে বা মেয়ের সংসারে, বাড়িতে সময় কাটান নাতি নাত্‌নী-

দের সঙ্গে। কিন্তু ছেলের বউ বা জামাইদের সঙ্গে মতে মেলে না বলে বাড়িতে বেশিক্ষণ ভাল লাগে না, আরও ভাল লাগে না ওদের বন্ধু-বান্ধবদের। তাদের উগ্র মতামত বৃদ্ধদের ব্যথা দেয়। এরা নিজেদের মনে করেন সংসারে অবহেলিত। ঝি-চাকরগুলো প্রশ্রয় পেয়ে বেয়াড়া হয়েছে, অন্যদের কাজ সেরে তবে কর্তার ডাকে সাড়া দেয়, ভাবটা এই বুড়োর আবার তাড়া কিসের। মাঝে মাঝে এঁরা রেগে যান, চেঁচামেচি করেন, কিন্তু তাতেও কেউ কান দেয় না; অভিমান হয়, তাই সময়-অসময় লাঠি হাতে করে হনহন করে বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে, কিন্তু গন্তব্যস্থল একটাই—ওই কেওড়াতলা ক্লাব।

রোদ না পড়তেই এক-একজন করে সভ্য গুটিগুটি পায়ে ক্লাবের বেঞ্চিতে এসে বসেন। প্রতিদিনের অভ্যর্থনা, কি, আজও বেঁচে আছেন?

এঁদের দার্শনিক মন সব সময় প্রস্তুত হয়ে আছে, জানে যে কোন সকালে খবর পাবে একজন না একজন সদস্য খসে পড়েছে। নড়বড়ে শরীর নিয়ে আলোচনা রোজই লেগে থাকে।

—আরে আসুন, আসুন, ক'দিন দেখিনি যে?

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর, আর বলবেন না, শরীরটা বড় নন-কো-অপরেশান করছে, সেই পিঠের ব্যথাটা—

—বললাম নুনের পুঁটলীর সেঁক দিন।

—কে দেবে? বাড়ির সবাই ব্যস্ত। ছেলের অফিস, বউমা কি সব মাথা-মুণ্ডু সোশ্যাল ওয়ার্ক করে, বুড়ো শ্বশুরকে দেখবার তার সময় কোথায়? আগে নাত্‌নীটা কথা শুনত, সে এখন একটা ফিরিঙ্গী স্কুলে পড়ে কচর-মচর ইংরিজী বলে, আর নাচের স্কুলে গিয়ে ধেই ধেই করে নাচে।

—আহা চাকরটাকে তো বলতে পারেন।

—সে হারামজাদা আরও শয়তান, একদিন সেঁক দিলে আট আনা বক্‌শিশ চায়। অত পয়সা আমি কোত্থেকে দেব?

এ ধরনের আলোচনা অল্পবিস্তর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রতিদিনের আসরে উঠবেই এবং ওই সুবাদে অন্য সভ্যদেরও কুশল বার্তার আদান-প্রদান হয়। খবরের কাগজ এঁদের কণ্ঠস্থ, যে কোন চাঞ্চল্যকর সংবাদ এঁদের মুখর আলোচনার বিষয়। রাজনীতি নিয়ে মাঝে মাঝে তর্কের ঝড় ওঠে। অর্থ-নীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রনীতি এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এক বিষয়ে এঁদের মতের কোন অমিল নেই, তা হলো আধুনিক যুব সমাজের অধঃপতন।

অবশ্য আজকের মুখরোচক আলোচনার বিশেষ কারণ ছিল। কিছুক্ষণ আগেই এই বৃদ্ধদের চোখের সামনে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। কোনও একটি যুবক বুঝি অন্য দলের একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে টিট্‌কিরি

কেটেছে। সেইটাই সূত্রপাত, তারপর অশ্লীল মন্তব্য, দু' পক্ষের গালাগালি, পরে হাতাহাতি। ইঁট ছোঁড়াছুঁড়ি করেও গায়ের জ্বালা মেটেনি, অনেকগুলো সোডার বোতলও ফেটেছে। শ্রাদ্ধ হয়তো আরও গড়াত, অকুস্থলে পুলিস আসার সম্ভাবনায় যে যার কেটে পড়েছে। হতভম্ব দর্শক, কেওড়াতলা ক্লাবের সদস্যরা।

এই কারণেই ছিছিক্কার আজ শুরু হয়েছে। ছ্যা, ছ্যা, কে বলবে এগুলো ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে, মুখে কিছু আটকায় না, কথায় কথায় মা, বোন, তুলে কি অশ্লীল মন্তব্য। আইন করে ব্যাটাদের জিভগুলো কেটে নেওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে অন্যের উক্তি, ছুঁড়িগুলোই বা কি কম যায়, এমন করে সাজ পোশাক করবে যাতে ছেলেগুলোকে উস্কে দিতে পারে, বগল কাটা ব্লাউজ তো কিছুই না, পিঠ, বুক সবই তো কাটতে শুরু করেছে, ঢঙ করে জামা না পরলেই হয়, মাথার চুলে বাবুই পাখির বাসা।

আর একজন ফোড়ন দেয়, মেয়েগুলোও আজকাল কম খিস্তি করে না, ওদেরও ভাষার কোন আঁট নেই, যা ইচ্ছে তাই বলে।

কথাগুলো হয়তো মিথ্যে নয়। কলকাতার শহরের পাড়ায় পাড়ায় প্রতিনিয়ত এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, অলিতে-গলিতে 'ইভ টিজার'রা বসে থাকে। চোঙা প্যাণ্ট, হাওয়াই সার্ট আর ফাঁপানো চুল মাথায় নিয়ে এনতার সস্তা সিগারেট ফোঁকে, খালি পেটে চা খায় আর মেয়ে দেখলে আদেখলের মত চোখ দিয়ে গেলে আর রসিয়ে রসিয়ে অশ্লীল ফুট্ কাটে। এই পর্যন্তই এদের দৌড়, একটা মেয়েকে নিয়ে পালাবারও মুরোদ নেই।

অন্যদিকে ইভেরা যতদূর সম্ভব দেহটাকে নগ্ন করে মুখে রঙ মেখে খোঁপার ভেল্কি দেখিয়ে, গায়ে ঢেউ তুলে ঘুরে বেড়ায়। তাদের দেখে ছেলেরা সিটি না মারলে এরা হতাশ হয়, আবার নোংরা মন্তব্য শুনলে লোক দেখানো বিরক্তি প্রকাশ করে। এ হলো এক ধরনের খেলা।

কিন্তু এর জন্য দায়ী কারা? আধুনিক যুবসমাজকে তো দোষ দিলে চলবে না, তাদের জীবনীশক্তিকে আমরা কাজে লাগাইনি, অবহেলা করেছি। যে ছাত্রসমাজ একদিন ইংরাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যাদের প্রাণ-শক্তির জোয়ারের ফলে অসহযোগ আন্দোলনের দুর্বার গতি, যাদের ভয়ে বিদেশী সরকার শঙ্কিত হয়ে এদেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল, তাদের সেই উচ্ছ্বাস, সেই উদ্দীপনাকে আমরা তো কাজে লাগাতে পারিনি। যদি সেই অবরুদ্ধ শক্তিকে খাল কেটে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রবাহিত করা হতো তাহলে দেশের এ দুর্দশা হতো না। ছাত্রদের আমরা বই মুখস্থ করে পাস করতে বলেছি, কিন্তু চাকরির প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনি। এদের খেলবার জন্যে মাঠ দিইনি, সাঁতার কাটার জল দিইনি, দেশ দেখার সুযোগ দিইনি, ঘরের কোণে বন্দী করে রেখে

ক্রমশ দমবন্ধ করে শুকিয়ে মেরেছি। এরই জন্যে ছাত্রজীবনে নৈরাশ্য, যুব-সমাজ চলৎশক্তিহীন। তাই এরা অসভ্য, এরা অশ্লীল, কিন্তু এর জন্য দায়ী আমাদের সমাজ। দায়ী ভুল নেতৃত্ব, ইতিহাস তার রায় দেবে।

এর ব্যতিক্রম সমাজের কোন স্তরেই নেই। যে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়েছে অভাবের সংসারে কিংবা যারা মধ্যবিত্ত সকলেই রকে বসে আড্ডা মারে, পার্কের রেলিঙে চড়ে চেঁচামেচি করে রুচিহীনতার পরিচয় দেয়, এইভাবেই তাদের সন্ধ্যেটা কাটে; আর কিছু করার নেই।

তেমনি কিছু করার নেই ববির মত ছেলেদের যাদের অভাবের আঁচ পোয়াতে হয়নি, যারা বিত্তবান না হলেও ধনীদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছে, সেই জন্যে রত্না কুশারীকে নিয়ে প্রথমটা ববির মন্দ লাগেনি, প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিবর্তনের একটা বাহ্যিক মূল্য আছে, পাহাড়, তুষার, ঠাণ্ডা সব কিছু ববির দমে-পড়া মনটাকে চাঙ্গা করে তুলেছিল। রত্না কুশারীকে নিয়ে সে ঘুরে বেড়াত ওপরের জলাপাহাড়ে, নীচের বোটানিকাল গার্ডেনে, আবার ম্যাল রাউণ্ড পেরিয়ে বার্চহিলের চিড়িয়াখানায়, চেনা-অচেনা লোকের জনতায় বসে থাকত ম্যালের বেঞ্চে, তাদের মধ্যে কিছু লোক ভীড় করত ক্লাবে। ববি কাউকে গ্রাহ্য করত না, গল্প করে, নেচে, নিজের মনে সময়টা কাটিয়ে দিত।

কিন্তু এভাবে বেশী দিন চলে না। আবার একঘেঁয়েমী জমা হতে লাগল। তখন ববির মনে হলো পাহাড় বড় শুকনো, তুষার যেন কৃত্রিম আর ঠাণ্ডা গা-সওয়া হয়ে গেছে। মনে হতে লাগল, রত্না কুশারী অসহ্য, কোন-রকমে মদ খেয়ে তাকে নিয়ে শোওয়া যায় কিন্তু ঘোরা যায় না। সারাক্ষণ ওই বিগতযৌবনাকে নিয়ে থাকা বড় ক্লান্তিকর। তাই সে আবার মদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। সকাল, দুপুর, বিকেল, বীয়ার, জিন, হুইস্কি।

রত্না কুশারী ভয় পায়, এ কি করছ ববি, এত মদ খেলে মরে যাবে।

ববির ছোট্ট জিজ্ঞাসা, ক্ষতি কি?

—তুমি বাঁচতে চাও না?

—কি জানি।

—এখানে ভাল লাগছে না?

—এই তো দিব্যি আছি।

—আমার জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে?

—তুমি না হলে কে আমাকে এত মদ খাওয়াবে?

—তুমি আজকাল আমায় এড়িয়ে যাচ্ছ, ক্লাবে আসবে বলে আস না, আমি একলা বসে থাকি।

ববি হাসবার চেষ্টা করে, কি হয় জান, যেদিন বেশী মদ খেয়ে ফেলি ঠিক মনে পড়ে না কোথায় যাবার আছে।

—তাই তো বলছি অত মদ খেও না।

ববি শব্দ করে হাসে কিন্তু উত্তর দেয় না। দেয় না কারণ, উত্তর দেবার কিছু নেই, রত্না কুশারীকে এড়িয়ে থাকার জন্যেই তো দিন রাত মদ খাচ্ছে, জীবনটাকে ভুলে থাকতে চাইছে।

রত্না কুশারী এ নিয়ে বেশী কথা বলতে সাহস করে না, পাছে ববি চটে গিয়ে কলকাতায় ফিরে যায়। কিন্তু একদিন সে ভয় পেল, যেদিন ম্যালের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখল ব্যারিস্টার কে. জি.-র শালী অনুভাকে। ডাইনীটা এখানেও এসেছে, তবে কি ববি আগে থেকে খবর পেয়ে অনুভার কাছে যাতায়াত শুরু করেছে? সেই জন্যেই কি রত্না কুশারীকে ক্লাবে একলা বসে থাকতে হয়?

রত্না কুশারী কথাটা নিজে থেকেই পাড়ল, অনুভাকে দেখলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ববি বলল, না।

—সে কি, ক'দিন থেকেই দেখছি ম্যালে বসে থাকে।

—আমি তো সপ্তাহখানেক ম্যালের দিকেই যাইনি।

—তবে কোথায় যাও?

—হয় এই বাড়িতেই বসে থাকি, আর নয়তো পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে নীচে নামি, দার্জিলিং-এর কৃত্রিমতা আর ভাল লাগছে না।

—তা হলে চল এখান থেকে আমরা চলে যাই।

ববি ভরসা দেয়, অনুভাকে তোমার ভয় নেই, ওর কাছে আমি সহজে যাচ্ছি না।

—কি জানি, ক্রমশ তুমি দুর্বোধ্য হয়ে উঠছ ববি। কি যে চাও—

কি চায় ববি তা কি নিজেই জানে। হয়তো চায় সহজ সুস্থ জীবন, কিন্তু তা কি আর পাওয়া সম্ভব। একদিন খেলার ছলে রত্না কুশারী, অনুভাদের মত মেয়েদের নাচ শেখাতে শুরু করেছিল, আজ তাদের সুরে নিজেকে নাচতে হচ্ছে। কি করবে, এই স্বাচ্ছন্দ্য, এই নিশ্চিন্ততা ত্যাগ করবে কি করে? তার ওপর মদের নেশা তাকে গিলে ফেলেছে, সেখান থেকেই বা কি করে বেরোবে, কে টাকার যোগান দেবে।

সেদিন বাড়িতে রত্না কুশারী ছিল না, ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। ববি একলা ড্রইংরুমে বসে মদ গিলছে। আগে দিনের বেলা হুইস্কি সে খেত না, এখন ওটা না খেলে যেন নেশা জমে না। ভেজাল মেশানো ছেড়ে দিয়েছে, জল নয়, সোডা নয়, নীট্ হুইস্কি, গলা দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নীচে নেমে যায়। এক সময় মনে হলো খালি পেটে পান করা ঠিক হচ্ছে না। বেয়ারার নাম ধরে ডাকল যদি সে এসে কিছু ভেজে দেয়। কিন্তু সাড়া পেল

না, বোধ হয় বাজার করতে গেছে। অগত্যা নিজেই গেল রান্নাঘরে, যদি গোটাকয়েক ডিম থাকে সেদ্ধ করে নেবে। রান্নাঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাসন মাজার কল, সেখানে দাঁড়িয়ে একটা পাহাড়ী মেয়ে বাসন পরিষ্কার করছিল। রত্না কুশারী রাঁধবার লোক এনেছিল কলকাতা থেকে, এখানে রেখেছে একটা ঠিকে ঝি, সকাল-বিকেল কাজ করে দিয়ে চলে যায়। ববি কোনদিন খেয়াল করে মেয়েটাকে দেখেনি, আজ এই প্রথম পুরুষের চোখে দেখল। ফর্সা রঙ, স্বাস্থ্য ভাল, বয়েস খুব বেশি হলে সতের-আঠার হবে, তাজা চোখ মুখ।

ববি মেয়েটিকে দেখে হাসল।

মেয়েটিও হাসে, অত্যন্ত সহজ হাসি।

—তোমার নাম কি?

—কাঞ্চী।

—বাড়িতে ডিম আছে কিনা জান?

মেয়েটি কোন জবাব দিল না, তবে ঝুড়ির ভেতর থেকে দুটো ডিম বার করে এনে ববির সামনে ধরল। ববিকে তখন নেশা জড়িয়ে ধরেছে, সে কাঞ্চীর হাত থেকে শুধু ডিম দুটোই নিল না, মেয়েটাকেও কাছে টেনে নিল, চুমু খেল ঠোঁটের ওপর।

আশ্চর্য, মেয়েটা কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদ করল না, ববির আকর্ষণী শক্তির কাছে নিজেকে ধরা দিল, তারপর ছাড়া পেয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে রইল সলজ্জে, চোখ নীচু করে।

সেই হলো সূচনা। ববি সভ্যসমাজ থেকে মুখ ফেরাল। যখন তখন ঘুরে বেড়াতে লাগল কাঞ্চীকে নিয়ে নীচের পাহাড়ে, ভুটিয়া বস্তীতে, কখনও বা গেস্তিখানায়।

রত্না কুশারীর বুঝতে দেরী হলো না। কাঞ্চীকে জবাব দিল। কিন্তু তাতে ফল ভাল হয়নি, আগে যদিও বা ববি বেশির ভাগ সময় বাড়িতে থাকত, এখন সেই মেয়েটির জন্যে ঘুরতে লাগল বাইরে বাইরে।

রত্না কুশারী একদিন না বলে পারল না, ববি, তুমি যদি এইভাবে থাকতে চাও আমি আর প্রশ্রয় দেব না, কলকাতায় ফিরে যাব।

ববির স্বচ্ছন্দ উত্তর, বেশ তো যাও না।

—তা হলে তুমি কোথায় থাকবে।

—যেখানে হোক, দরকার হলে বস্তীতে।

—মদ খাবে না?

—দেখেচো তো, হুইস্কি, জিন, বীয়ার একরকম প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।

—কি খাচ্ছ?

—রক্সি, জাঁড়—এখানকার দিশী মদ।

—ছি ছি আমি ভাবতে পারছি না, তুমি কি করে এত নীচে নেমে গেলে, একটা ঝি-এর সঙ্গে—

ববি হাসল, ঝি হলে হবে কি, মেয়ে তো। তাজা মেয়ে। গরম মেয়ে।

রত্না কুশারী ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এর পর ক্লাবে দেখা গেল রত্না কুশারী গল্প করছে কে. জি-র শালী অনুভার সঙ্গে, বাইরে থেকে ছেলেদের কিছু বোঝা যায় না, ববির এরকম অধঃপতন হবে আমি ভাবতে পারিনি, তুমি পার তো দেখ না, যদি ছেলেটাকে উদ্ধার করতে পার।

অনুভারও নিজের ওপর খুব আস্থা নেই বোঝা যায়, আমার কথা কি শুনবে, এই পাহাড়ী মেয়েগুলো অসম্ভব পাজী, শুনি ওই মদের সঙ্গে গাছের শেকড়ের রস খাওয়ায়, নানা রকম তুক্‌তাক্‌ করে।

রত্নার ক্ষোভ, এর চেয়ে সেই মনুয়া লাহিড়ী ভাল ছিল, তবু তো আমাদের সমাজের মেয়ে, যদিও ববিটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত তবু এরকম একটা স্ক্যাণ্ডাল হতো না। এক এক সময় মনে হয় আমারই দোষ, ছোঁড়াটাকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয়নি।

অনুভা সান্ত্বনা দেয়, তোমার কি দোষ ভাই, তুমি তো ববির ভালর জন্যেই যা করবার তা করেছ, পুরুষ জাতটাই ওইরকম, কৃতজ্ঞতার ছিটে-ফোঁটাও ওদের শরীরে নেই।

রত্না কুশারীর চিন্তা, এখন যে আমি কি করি—

অনুভার প্রস্তাব, কলকাতায় ফিরে চল। আমি তো শনিবার দিন নামছি, প্লেনে সিট রিজার্ভ করা আছে, চল তোমারটাও করিয়ে দিই, একসঙ্গে গল্প করতে করতে চলে যাব।

—আমি তো ফ্ল্যাট নিয়ে ছিলাম, একগাদা জিনিসপত্র হয়েছে।

—তোমার পুরোন বেয়ারা হুঁশিয়ার লোক, সব কিছু গুছিয়ে ট্রেনে করে নিয়ে যাবে, এখানে থাকলে আরও তোমার মন খারাপ হবে।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। শনিবার একই প্লেনে পাশাপাশি বসে রত্না কুশারী আর অনুভা কলকাতায় ফিরল। দমদমে স্ত্রীকে আনতে গিয়েছিলেন মিস্টার কুশারী। ববির বদলে অনুভাকে দেখে মিঃ কুশারীর বিস্ময়ের অবধি থাকে না, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন, ববি এল না?

—না।

—কেন?

রত্না কুশারীর কঠিন স্বর, ববি মারা গেছে।

বিস্মিত মিঃ কুশারী বোঝেন, কোন গণ্ডগোল হয়েছে, তাই এ প্রসঙ্গ আর তুলতে চান না।

রত্না কুশারী আর অনুভার কাছে ববি মৃত হলেও আসলে কিন্তু ছেলেটা বেঁচে গেছে। কৃত্রিমতার আওতা থেকে বেরিয়ে বুক ভরে সে নিশ্বাস নিয়েছে। প্রকৃতির যাদুকাঠির স্পর্শ ববিকে নতুন করে জাগিয়ে দিয়েছে, বাঁচতে শিখিয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ, একদল পাহাড়ী ছেলেমেয়ে তাদের হাসি আনন্দ গান, একটা উদার আন্তরিকতা মুগ্ধ করেছে ববিকে, তার ওপর ওই নেপালী মেয়ে কাঞ্চী। কোন প্রত্যাশা নিয়ে সে ববির কাছে আসেনি, বরং হাত ধরে ছেলেটাকে টেনে বার করে এনে একটা পঙ্কিল পরিবেশ থেকে মুক্তি দিয়েছে। ও মেয়েটা একটা উপলক্ষ মাত্র, ববির জীবনে কতদিন টিঁকবে বলা যায় না, হয়তো থাকবে না চলে যাবে, কিন্তু ববির চোখের কালো চশমাটা সে খুলে দিয়েছে—সেইটাই তো পরম লাভ। এখন ববি হয়তো মদ খায়, কিন্তু আগের মত মদ আর ববিকে খেতে পারে না। ববি সাদা চোখে মেঘে ভরা আকাশ দেখে, দেখে কতরকম রঙ, সবুজ পাহাড়, গাছে গাছে ভরা; নানারকম পাখি, তাদের উচ্ছল কলতান। পাহাড়ী ঝরনা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, নীল নদীর জল, তার উপল-ব্যথিত গতি, রকমারি ফুল, লাল নীল হলদে সবুজ।

ববির এখন মনে হয় বেঁচে থাকার অর্থ আছে, প্রয়োজনও আছে। মানুষের তৈরী আড়ষ্ট সমাজের বাইরে যে বিরাট রাজত্ব, তার যে উদার আহ্বান, যে মানুষ শুনতে পেয়েছে, দেখতে পেয়েছে, তার বিমর্ষ হবার তো আর কোন কারণ নেই। কলুর চোখবাঁধা বলদের মত মদ আর মেয়েমানুষের চক্কোরে পড়ে এতদিন যে ঘানি টেনেছে ববি, আজ এই প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হলো সেই জীবনটা বিরাট মিথ্যে, একেবারে ফাঁকা প্রচন্ড ধাপ্পা। যদি নতুন করে জীবন শুরু করতে হয়, বেঁচে থাকার জন্যে কাজ করতে হবে, কাজ করে আনন্দ পেতে হবে। ওই যে মানুষগুলো হাজারো অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও প্রতিদিন পিঁপড়ের মত কাজ করে, পরিশ্রান্ত হয় না। নাচে, গান করে, কিন্তু লোক দেখিয়ে করে না, সন্ধ্যার অবসরে রক্সি খায়, কিন্তু মত্ত হয় না। ওদের হাসিকান্না, ঝগড়া মারামারি, সুখ দুঃখ সবকিছু মিলিয়ে যে জীবনযাত্রা তার প্রধান উপজীব্য আনন্দ।

ববি তার দুঃস্বপ্নভরা অতীত জীবনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই আনন্দ-রস সাগরে ডুব দিল, ডুবুরীর মত হয়তো একদিন নীচে থেকে অমূল্য মুক্তো তুলে আনবে—কে বলতে পারে।

॥ ঊনত্রিশ ॥

শহর কলকাতায় আরও কিছু আজব জীব আছে, তারা কফি-হাউস 'আঁতেলেক্‌চুয়ালস্‌' নামে পরিচিত। এরা কফি হাউসের নির্দিষ্ট জায়গায় বসে নির্দিষ্ট সময়ে আড্ডা মারে; এদের বেশভূষায় চমক না থাকলেও প্রায়ই মুখের মেক আপ বদলায়। কখনও চাঁছা-ছোলা কামানো, কখনও বা কাঁচি দিয়ে ছাঁটা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কখনও বা ফ্রেঞ্চ কাট্‌। মাথায় চুল থাকলে এরা তেল দেয় না, আর না থাকলে চকচকে টাককে ব্যক্তিত্বের প্রতীকরূপে ব্যবহার করে। চোখে পুরু কাঁচের চশমা আর নয়তো পাওয়ারহীন গ্লাসের মোটা ফ্রেম। এদের বেশীর ভাগ লোকের পেশা বিজ্ঞাপনের জন্য ইংরাজী কপি লেখা। অনস্বীকার্য, ইংরাজী এরা লিখতে পারে, তবে গল্প-প্রবন্ধ বা ডিরেক্টারের স্পীচ্‌ নয়, স্রেফ বিজ্ঞাপনের বয়ান। কোন সুন্দরী তরুণীর মুখের ছবির পাশে বিজ্ঞাপিত বস্তুর গুণ বর্ণনা।

এদের পড়াশুনো বিদেশী পত্রিকাতেই সীমাবন্ধ। কোথায় কোন দেশে নতুন নতুন বই ছাপা হচ্ছে তার সমালোচনা এদের কণ্ঠস্থ—যে কারণে আসল বই পড়ার প্রয়োজন বোধ করে না। আঁতেলেক্‌চুয়াল আসরে আলোচনা করার অসুবিধা হয় না, কারণ, সকলেই তো ওই একই রিভিউ পড়েছে—নতুন কথা আর কে শোনাবে? এরা ধূমপান করে চারমিনার, অন্য সিগারেট খেলে ঠিক জমে না, তবে এদের মধ্যে যারা উগ্র তারা বিড়িতে টান দেয়। বিড়ি এখন আঁতেলেক্‌চুয়ালদের ধূমপানের শেষ কথা।

কফি হাউসে এরা কাপের পর কাপ কালো কফি খায় আর সন্ধ্যার পর পান করে মদ। পার্টিতে গেলে, বিশেষ করে কোন কনসুলেটে, স্কচ্‌ হুইস্কি ছাড়া ছোঁয় না, তবে ভড্‌কার ওপরও দুর্বলতা যথেষ্ট। কিন্তু বিদেশী মাল না পেলে এরা নিজের পয়সায় খায় বাংলা দু' নম্বর, এদের কথাবার্তার মধ্যে কয়েকটি স্টক ফ্রেজ্‌ আছে। কোনও কিছু ভাল লাগার উচ্ছ্বাস—'দারুন'। রসিকতার স্বীকৃতি—'জ্বালিয়ে দিল'। এরা যাকে মাথায় তোলে তাকে বাঁশ দিয়ে ঠেলে উঁচুতে উঠিয়ে দেয়, বলেঃ গুরু, গুরু!! আবার যাকে ফেলে, ধপাস্‌ করে মাটিতে আছাড় মারে। যে কোন গুণী, জ্ঞানী, রাষ্ট্রবিদ্‌, তার ডাক নামের উল্লেখ করে নিজেদের রায় দেয়—'ফট্‌কেটা ফুটে গেছে'। সঙ্গে সঙ্গে কোরাসে অন্যদের হাসি। ফুটে গেছে মানে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এদের প্রেম অবৈধ, নাবালিকা কুমারীদের নিয়ে এরা কেলেঙ্কারী করে কিংবা বিধবাদের পেছনে ছোটে, কিন্তু বিয়ে করে পরস্ত্রীকে। ধর্ম এদের কাছে কুসংস্কার। পূজা অর্চনা, মন্দির গুরুগিরি এদের কাছে ধাপ্পাবাজী, তবে নিজের অসুখ করলে বুড়ী পিসীমার অনুরোধে চরণামৃত গলাধঃকরণ করতে দ্বিধা করে না। রাজনীতি এদের কাছে মনের সঙ্কীর্ণতার পরিচয়—আসলে বলতে গেলে কোন নীতির বালাই নেই, কথায় কথায় এরা রাষ্ট্র-বিদ্‌দের ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। চিত্রকলার জগতে এরা শেষ পর্যন্ত কালী-ঘাটের পট নিয়ে পড়েছিল, এখন সুর রিয়ালিস্টিকের ধাক্কায় কিছুটা হাবুডুবু খাচ্ছে; ভালমন্দ ঘোষণা করতে পাচ্ছে না। নাট্য-জগতে আভান্ত্‌ গার্ড থিয়েটারের এরা চাম্পিয়ান। কথায় কথায় ব্রেশট, ইওনেস্কো, এল্‌বি আর পিণ্টারের অ্যাবসার্ড নাটকের ঢেঁকুর তোলে আর বাংলা নাটকের জন্য দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে। এরা সকলেই ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার, বাংলা ছবি দেখতে গেলে এদের হাই ওঠে, ইংরিজী ছবির ছেলেমানুষিতে হাসি পায়, তাই কণ্টিনেণ্টে আন্‌সেন্‌সার্ড ছবি দেখে এদের তৃপ্তি।

বাংলাসাহিত্য এরা পড়ে না। এদের মতে রবীন্দ্রনাথ 'চিৎপুরের বুর্জোয়া কবি', শরৎসাহিত্য এক বাণ্ডিল সেণ্টিমেণ্ট আর আধুনিক সাহিত্য ন্যক্কার-জনক। তবে মাঝে মাঝে এরা আশার আলো দেখতে পায় টোটো মজুমদারের লেখায়, তার ভাষা নাকি আগুন, বিষয়বস্তু জীবনের খিস্তি। অহো! কি বাস্তব!

অনভিজ্ঞ শ্রোতা হয়তো বোকার মত প্রশ্ন করবে, কে এই টোটো মজুমদার? তার কোন বই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

উত্তর শুনবে, সে লেখা এখনও ছাপা হয়নি, পাণ্ডুলিপিতে আবদ্ধ আছে। সাত বছর ধরে ঘষা মাজা চলছে; তারপর একদিন যখন ছাপার পাতা ফুঁড়ে বেরবে, তখন বাংলার সাহিত্যজগতে আনবে বিপ্লব।

এরা যখন তখন বিপ্লবের হুমকি দেয়। বাচ্চা ছেলেদের ঘুম পাড়াবার সময় মা মাসীরা যেমন 'জুজু'র ভয় দেখায়, ভারত সরকারকে যেমন খাড়া করতে হয় চীনে জুজুর, তেমনি এই কফি হাউস আঁতেলেক্‌চুয়ালরা আমাদের ভয় দেখায় বিপ্লব-জুজু দেখিয়ে—সাহিত্যে, সিনেমায়, শিল্পে, চিত্রে, সমাজে—সর্বত্র।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীবনের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই, বাস্তব অভিজ্ঞতার ধার ধারে না। এরা নিজেদের ফ্ল্যাটে বসে পায়রার মত বকম্‌ বকম্‌ করে, কোম্পানীর গাড়ি চড়ে অফিসে যায়, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সাজানো কক্ষে বিজ্ঞাপনের কপি লেখে, কফি হাউসে আড্ডা মারে, নিজেদের ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এর বাইরের বিরাট জগতের কথা কিছুই জানে

না, বোঝে না, কাউকে চেনে না; তবু দিশী কাহিনী পড়ে ফরমান্ জারি করে, এ তো জীবনের ছবি নয়, এ মেলোড্রামা।

হায় মূঢ়! এরা জানে না জীবনে এমন ঘটনা ঘটে যা মেলোড্রামার চেয়েও নাটকীয়, সে ঘটনার ছবি আঁকলে কি জীবনের বাস্তব চিত্র দেওয়া হয় না? আর তাই যদি না হবে তবে কবিতা যেদিন তার মাকে নিয়ে অশান্ত মনে অপমানিত হৃদয়ে কিছুটা শান্তি পাবার আশায় বাবুদের বাড়ি কীর্তন শুনতে গেল, কি করে সেখানে তার মার সঙ্গে দেখা হলো তার পাকিস্তানে হারিয়ে যাওয়া পাশের বাড়ির সই বকুলফুলের সঙ্গে!

—বকুলফুল।

তখনও পাকিস্তান হয়নি, পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে দুই গৃহস্থবধূ। পাশা-পাশি বাড়ি, প্রায় সমবয়েসী, দুজনে সই পাতিয়েছিল যাতে এমনি কাছাকাছি তারা থাকতে পারে, পরস্পর পরস্পরের সুখেদুঃখে পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। তখনও গ্রামের এই শীর্ণ চেহারা হয়নি, সেখানকার নদীতে জল ছিল, ক্ষেতে ফসল ছিল, গোলায় ধান ছিল, সবচেয়ে বড় কথা মানুষের মনে ছিল আনন্দ। সেদিনের লোক ভাবতে পারত না শুধু দু' মুঠো অন্নের জন্যে মানুষকে হতে হবে ভিখারী।

কবিতার মা তখন সন্তানসম্ভবা। সই বকুলফুল বলেছিল, যদি তোর মেয়ে হয় আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব।

কবিতার মা উত্তর দিয়েছিল, আমি তো তাই দিন-রাত প্রার্থনা করছি। আমার এই প্রথম সন্তান যেন মেয়ে হয়, তোর ঘরে ঠাঁই পাবে, আমার কোন দুর্ভাবনা থাকবে না।

—আমার গোপাল পাঁচ বছরে পড়েছে, তোর মেয়ে হলে প্রায় ছ'বছরের তফাৎ হবে, ঠিক মানাবে, তাই না?

কবিতার মার আশঙ্কা, আমার মেয়ে যদি কালো হয়!

—সেই মেয়েই আমার ঘর আলো করবে।

সই বকুলফুল কবিতার মার অরুচি কাটাবার জন্যে কতরকম রান্না করে আনত, সেই সঙ্গে ক্ষীর, আমসত্ত্ব, কুলের চাট্নী, লেবুর আচার।

এত জল্পনা-কল্পনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদের কপালে সইলো না। সুদূর দিল্লীতে বসে রাজনৈতিক নেতারা শকুনির পাশা খেলে দেশ ভাগ করে ফেললেন। নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরা উপেক্ষা করলেন কোটি কোটি নরনারীর হাসি-কান্নার সংসার। এই দেশভাগে স্বয়ং গান্ধীও রইলেন নীরব। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ ঝড় উঠল। রক্তের বন্যা ছুটল। হাজার হাজার উদ্বাস্তু ভিটে ছেড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে শুধু বেঁচে থাকার আশায় চলল কলকাতার দিকে। কে কার খবর রাখে? কোথায় হারিয়ে গেল

বকুলফুল, তার ছেলে গোপাল, তাদের সুখের সংসার। কত ঘাটের জল খেয়ে কবিতার মা-রা শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে পৌঁছল, সীমান্ত পেরতেই বুঝতে পারল তারা এদেশে অবাঞ্ছিত। সেদিনের মূর্খ নেতারা সংবাদপত্রের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু বুঝতেও পারেননি দেশের লোক তা চায়নি। দিনের পর দিন কবিতার মাদের অনাহারে অবহেলায় পড়ে থাকতে হয়েছে শেয়ালদার স্টেশনে। কি নিষ্ঠুর জীবন! একদিন যাদের সব ছিল, তারা হলো ভিখারী। সরকারী ডোল দেবার নাম করে ঘুরতে লাগল মেয়েমানুষের দালালরা। হাতে সরকারি ফাইল, সরকারি ছাপ, 'সত্যমেব জয়তে'।

কোথায় সত্য, শুধু দেখা গেল মিথ্যার বেসাতি। এরই মধ্যে কবিতারা জন্মাল, বড় হলো, কিন্তু মানুষ হতে পারল না।—সুযোগ নেই, সুবিধে নেই। বেঁচে থাকার জন্যে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি, অন্যের মুখ থেকে খাবার কেড়ে নেওয়া। ক্রমে মানুষ পশু হলো, তখনও নেতারা নাকে গোলাপফুল শুঁকে উদার মানবিকতার বক্তৃতা করছেন, আর উল্টোদিকে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে কতগুলো সুবিধাবাদী নিজেদের দল ভারী করার চেষ্টা করছে। কবিতাদের নিয়ে কাড়খেলা শুরু হলো, দেশের কথা, দশের কথা কেউ চিন্তা করল না।

সেই হারিয়ে যাওয়া বকুলফুলকে কীর্তনের আসরে দেখতে পেয়ে কবিতার মা আনন্দে জড়িয়ে ধরল। প্রথমটা কথা বলতে পারেনি, শুধু চাপা কান্না আর উচ্ছ্বাস। দুজনেরই ইতিহাস এক জ্বালাময় অভিজ্ঞতা, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। অতীতের কথা শেষ করে তারা এল বর্তমানে।

—হ্যাঁরে সই, তোর ছেলে হয়েছিল, না মেয়ে?

—এই তো আমার বড় মেয়ে কবিতা, তোর মাসীকে প্রণাম কর।

বকুলফুল কবিতার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে, বাঃ, খাসা মেয়ে হয়েছে. মনে আছে তো আমরা কি কথা দিয়েছিলাম?

কবিতার মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সে সব কথা স্বপ্নের মত মনে হয়।

—কিন্তু দেখ, আমাদের কপালে জোর আছে, নয়তো আবার তোর সংগে দেখা হয়ে গেল কি করে?

—গোপাল এখন কি করছে?

—ওই তো, গান করছে।

ওরা ফিরে তাকায়, কীর্তনের দলে বসে আছে গোপাল, নধরকান্তি, ঘাড় পর্যন্ত বড় বড় চুল, গদগদ কণ্ঠে দোয়ারকি দিচ্ছে।

—এখনও গোপালের বিয়ে দিস্‌নি বুঝি?

—এই তো মেয়ে খুঁজছি। বিয়ে বলে কথা, যার যেখানে লেখা আছে তা কি কেউ বদলাতে পারে?

—তোরা আছিস্ কোথায়?

—নবদ্বীপে।

—এত কাছে অথচ জানতে পারিনি।

—এবার চল নবদ্বীপ, আমাদের বাসায় থাকবি। গোপালদের আখড়ায় নিয়ে যাব, গান শুনবি, খুব ভাল লাগবে।

কবিতার মা মেয়ের দিকে তাকায়, কিরে যাবি তো?

ভয় ছিল, পাছে কবিতা আপত্তি করে কিংবা চাকরির দোহাই পাড়ে। কিন্তু আশ্চর্য, কবিতা আপত্তি করল না, গোপালকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, নিশ্চয়ই যাব। মার কাছে আপনাদের কথা কত শুনেছি। আরও শুনতে ইচ্ছে করে।

—কি আর শুনবে মা, সে রামও নেই সে রাজত্বও নেই।

—তবু শুনব। আমরা যে একদিন মানুষের মত ছিলাম, সেকথা শুনলেও ভাল লাগে, শিগগির একদিন যাব আপনার কাছে।

কবিতা কেন নিজে থেকে এতটা আগ্রহ প্রকাশ করল ঠিক বোঝা গেল না। সত্যিই কি সে তাদের সুখী গৃহস্থ জীবনের কথা শুনতে চায়, না জানতে চায় ওই গোপাল ছেলেটিকে, জন্মের পূর্বে যার কাছে সে বাগ্‌দত্তা, কিংবা তার কৌতূহল নবদ্বীপ সম্বন্ধে।—নবদ্বীপ নয়, নবদ্বীপধাম। গোলকধামের মতই হরিপ্রিয়া আর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমময়ের লীলাভূমি।

এই যে দুই সই বকুলফুলের সাক্ষাৎ, প্রায় দেড় যুগ বাদে রানাঘাটের কীর্তনের আসরে; এই যে অতি সাধারণ চাকুরে মেয়ে কবিতার দৃষ্টি বিনিময় হলো কীর্তনীয়া গোপালের সঙ্গে, উপন্যাসের পাতায় এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করলে তাকে কি মেলোড্রামা ছাড়া আর কোন আখ্যা দেওয়া চলে?

সেই একই মেলোড্রামার সূত্র পাওয়া যায় অনাদিপ্রসাদের জীবনে। যে অনাদিপ্রসাদ নিজের লেখার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে জীবন দেখতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছেন, যে অনাদিপ্রসাদ লেখা থামিয়েছেন, শুধু অবাক বিস্ময়ে চোখ মেলে দেখেছেন চারপাশের জীবন। যিনি আত্মীয়তার নাগপাশ থেকে মুক্তি খুঁজেছেন, সেই তিনি আবার ধরা পড়লেন স্নেহের মায়াজালে, মীনা আর সমীর, দুটি হতভাগ্য জীবনকে বাঁচাতে গিয়ে।

ডাক্তার মীনাকে পরীক্ষা করে রায় দিল, যে রকম করে হোক ওর বাবা-মাকে খবর দিন। হয় তারা মেয়েকে নিয়ে যান, নয়তো ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে ফেলে আসা যাওয়া শুরু করুন।

অনাদিপ্রসাদের প্রশ্ন, নইলে কি আপনি মনে করছেন,—

—ও মেয়ের এতটুকু মনের জোর নেই। সমীরবাবুর কথায় রাজী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু সংসার করতে পারবে না। ক'দিন ওষুধপত্র দিয়ে তো দেখলাম, এতটুকু উন্নতি হচ্ছে না।

—ওর বাবা একেবারে অবুঝ মানুষ।

—তবু তাঁকে বোঝাতে হবে। যদি বেশিদিন এ কেস্ ফেলে রাখেন, এ মেয়েকে সারানো যাবে না।

ডাক্তারকে নিয়ে সমীর বেরিয়ে গেল। অনাদিপ্রসাদ ঢুকলেন মীনার ঘরে। মেয়েটা বিছানার ওপর শুয়ে আছে। এই ক'দিনে চেহারাটা শুকিয়ে গেছে, আর সেই আগের লাবণ্য নেই, দুটো চোখে জমাট ভয়। জিজ্ঞেস করলে, ডাক্তার কি বলল?

অনাদিপ্রসাদ মীনার কপালে হাত দিয়ে বলেন, ওষুধ পড়ছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে তুমি একটু মনের জোর কর। কিসের তোমার এত ভাবনা?

—ভাবনা—, সমীরের জন্যে। ওর যে কেউ নেই।

—তুমি তো আছ।

—আমি? কি জানি! আমার জন্যে না সমীরের জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়।

—তোমার ওই এক কথা।

মীনা অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকায়ঃ জানেন, ওর কোন চাকরি নেই, দুটো টিউশানী করে। এত ডাক্তার, ওষুধ। ও কোথা থেকে টাকা পাচ্ছে? আমি তো জানি ওর টাকা নেই।

অনাদিপ্রসাদ ভরসা দেন, কেন, আমি তোমার চিকিৎসা করাতে পারি না বুঝি?

—আপনি কেন করাবেন, আমার বাবা করল না, মা করল না, বলতে বলতে মীনা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে।

—ছিঃ, ছিঃ, এমন করে কাঁদে না। লক্ষ্মী মা আমার, মনের জোর কর। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো। সমীরের মুখের দিকে চেয়ে—

মীনা চীৎকার করে ওঠে, আমি আর বাঁচতে চাই না কাকাবাবু, আমাকে ওষুধ না দিয়ে বিষ দিন।

অনাদিপ্রসাদ সমীরের সংগে পরামর্শ করেন, ডাক্তার ঠিকই বলেছে, মীনার বাবাকে খবর দিতেই হবে।

সমীরও মাথা নাড়ে, তাই মনে হচ্ছে, আমি তো আর মীনাকে সামলাতে পারছি না, সামর্থ্য নেই। ভেবেছিলাম দুজনে মিলে লড়াই করব, সব যেন কিরকম গোলমাল হয়ে গেল। ভাগ্যিস আপনি এসেছিলেন, তবু ডাক্তার

দেখাতে পারলাম, ওষুধপত্রও খাইয়েছি।

—সে কিছু নয় সমীর, আমি ভয় পাচ্ছি কোন দুর্বল মুহূর্তে মেয়েটা না আত্মহত্যা করে বসে।

সমীরের চোখে জল আসে, কেন এরকম হলো?

—ভেবে কোন ফল হবে না, কর্তব্য ঠিক করে ফেলা যাক, ওর বাবার কাছে যেতে হবে।

—বেশ, তাই যাব।

—তোমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে, যদি গালমন্দ করে?

—সে তো করবেনই, মারধোরও করতে পারেন।

—তাহলে উপায়?

—আর তো কিছু নেই।

অনাদিপ্রসাদ ঘরের মধ্যে ক'বার পায়চারী করলেন। তার চেয়ে বরং আমিই যাই। প্রথম ঝড়টা আমার ওপর দিয়েই বয়ে যাক।

সমীর শিউরে ওঠে, না, না, তা হয় না কাকাবাবু, আমি তো জানি মীনার বাবাকে, আপনাকে যাচ্ছেতাই অপমান করবে।

—করুক, আমি তো তার ভাল করতেই যাচ্ছি। তা ছাড়া তোমাকে এখন মীনার কাছে সব সময় থাকতে হবে।

সমীরের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরে গাঢ় স্বরে বলেন, ইয়ংম্যান, ভেঙে পড়ো না, জীবনে ঝড়ঝাপটা অনেক আসবে, তাকে সহ্য করে যে এগিয়ে চলতে পারে সেই তো মানুষ!

সমীর জামার হাতা দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে হাসবার চেষ্টা করে, ধারণা ছিল আমি খুব শক্ত, এখন বুঝতে পারছি নিজেকে শক্ত রাখা খুব কঠিন।

অনাদিপ্রসাদ সরাসরি গিয়ে হাজির হলেন সাধনবাবুর বাড়িতে। দু'জনের মুখোমুখি দেখা হলো সাধনবাবুর অফিস ঘরে। ঐ মানুষটারও কপালে ইতিমধ্যে রেখা পড়েছে, চোখেমুখে দুশ্চিন্তা। অনাদিপ্রসাদকে দেখে অতি শুকনো প্রশ্ন, কি ব্যাপার?

অনাদিপ্রসাদ কিভাবে কাথাটা পাড়বেন ভেবে নেন, বলেন, কিছু না, একটা খবর দিতে এলাম।

—বলুন।

—মীনা আর সমীর—

—কি বললেন?

—আপনার মেয়ে মীনা—

—সে কথা আমি জানি, মীনা আমার মেয়ে, আপনি কি বলতে এসেছেন?

—ওরা গড়িয়াতে একটা বাসা নিয়ে আছে।

সাধনবাবু প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ গলায় প্রশ্ন করেন, ঠিকানা?

অনাদিপ্রসাদের কাছে ঠিকানা শুনে খাতায় লিখে নেন, আপনার বুঝি যাতায়াত আছে?

সমীর আমায় ডেকেছিল। মীনার শরীরটা খুব খারাপ, আমি এসেছি আপনাকে বলতে ওদের উপর রাগারাগি করবেন না। বড্ড বিপদের মধ্যে আছে।

এইবার সাধনবাবু নিজমূর্তি ধারণ করেন, আমার কি কর্তব্য তা আমি জানি, আপনার কাছ থেকে উপদেশ শুনতে আমি রাজী নই।

—তা নয়, আপনার মেয়ে মীনার জন্যে বলছি।

—আমার মেয়ের বিষয়ে আপনার চেয়ে আমি নিশ্চয় ভাল বুঝি; অনুগ্রহ করে আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মাথা গলাবেন না।

সাধনবাবু নিজের মনে বিড় বিড় করেন, গণৎকার কালীপ্রসাদ ঠিকই বলেছিল, গ্রহ কেটে যাচ্ছে, মীনা আবার ফিরে আসবে। এইবার আমি তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাব।

তার চোখ মুখ দেখে অনাদিপ্রসাদ ভয় পান, কিন্তু আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না, আপনার মেয়ে খুব অসুস্থ।

—অসুস্থ? অসুস্থ না হলে কেউ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়? অসুস্থ! তাকে অসুস্থ করেছে কে? রাস্তার লোফার, একটা ভ্যাগাবণ্ড—,

—যা হবার তা হয়ে গেছে—

—শাট্ আপ! কিছুই হয়নি, আগে মেয়েটাকে নিয়ে আসি তারপর ওই হারামজাদাকে আমি দেখব, ওর সর্বনাশ করে ছাড়ব।

অনাদিপ্রসাদ তখনও বোঝাবার চেষ্টা করেন, অনুগ্রহ করে আমার কথা শুনুন—

সাধনবাবু তখন অবুঝ গণ্ডার, খড়্গ উঁচিয়ে বলেন, বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে! আমার উঁচু মাথা আপনারা সবাই মিলে নীচু করেছেন, ফের যদি বকর বকর করেন চাবুক মেরে পিঠের চামড়া তুলে নেব।

ততক্ষণে সাধনবাবুর বাড়ির লোকেরা ঘরের মধ্যে জমা হয়ে গেছে। অনাদিপ্রসাদ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। তবু নিজেকে সংযত রেখে বললেন, আমি যাচ্ছি তবে এমন কিছু করে বসবেন না

যাতে মীনার জীবনটা চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যায়।

আর একটা বন্য হুঙ্কার, গেট্ আউট্।

জীবনসন্ধানী লেখক অনাদিপ্রসাদ আস্তে আস্তে সাধনবাবুর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

—এও তো মেলেড্রামা!

॥ ত্রিশ ॥

সাধনবাবুর হুঙ্কার পাড়াপড়শীরা বোধ হয় শুনতে পেয়েছিল, তাই অনাদিপ্রসাদ যখন ওঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, লক্ষ্য করলেন অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। তাঁর নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে রমলা বউদি এবং বড় ছেলে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই স্ত্রীর উদ্বিগ্ন প্রশ্ন শোনা গেল, তুমি আবার ও বাড়িতে গিয়েছিলে কেন?

অনাদিপ্রসাদের চিরাচরিত ছোট্ট উত্তর, এমনি।

—তুমি জান সাধনবাবু তোমাকে পছন্দ করেন না, তবু—

—কি করব, না গিয়ে উপায় ছিল না।

ইচ্ছে করে স্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে অনাদিপ্রসাদ শোবার ঘরে চলে যান। মনে দুশ্চিন্তা, পাগলা বাপ সত্যিই না মেয়ের সর্বনাশ করে। তেমনি ওদের বাড়ির লোকগুলো! কারুর কি মীনার জন্যে এতটুকু সহানুভূতি নেই! আর মীনার মাকেও বলিহারি! চেলাকাঠের মত শুকনো, নিজের মতামত বলতে কিছুই নেই, স্বামীর ভয়ে সব সময় তটস্থ। হয়তো সাধনবাবু এখনই রওনা হবেন সমীরদের গড়িয়ার বাসার উদ্দেশে, কিন্তু তারপর কি যে ঘটবে! অথচ না বলে উপায় ছিল না। মীনার যা মানসিক অবস্থা!

এমন সময় অনাদিপ্রসাদ শুনতে পেলেন পাশের ঘরে মাতা-পুত্রের আলোচনা —তাঁর সম্বন্ধে, কানটা খাড়া করলেন।

ছেলের অনুযোগঃ মা, তুমি বাবাকে ভাল করে বোঝাও, কেন এভাবে যেচে অপমান মাথায় নিতে যান।—সবাই এ নিয়ে হাসাহাসি করে।

রমলা বউদির শান্ত উত্তর, তোরা তো দেখেছিস, আগে উনি এরকম ছিলেন না, কারুর সাতে পাঁচে থাকতেন না, এখন কি যে হয়েছে!

—মামার সঙ্গে পরামর্শ কর, দরকার হলে ডাক্তার দেখাও, আমার এক বন্ধুর বাবার ঠিক এইরকম হয়েছিল, এখন একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

—চুপ, চুপ, ওসব কথা বলে না।

—তোমাকে তো বাড়ির বাইরে যেতে হয় না, আমরা পাঁচ জায়গায় ঘুরি, কত লোক জিজ্ঞেস করে বাবার কি হয়েছে? কেন লিখছেন না? যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান, ওঁর মত একজন নামী লোক—

রমলা বউদির চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, রোজই তো ঠাকুরকে ডাকছি।

ছেলে বিরক্ত হয়, ঠাকুর-টাকুর ক'দিন তাকে তুলে রেখে ডাক্তার ডাকো, চিকিৎসা করাও।

কথাগুলো শুনতে অনাদিপ্রসাদের বেশ মজা লাগল; আমরা কেউ কাউকেই বুঝতে পারি না, চেষ্টাও করি না, হঠাৎ কেন যে একটা মানুষ বদলে যায়, কেন যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়, কেন হঠাৎ স্বার্থপর দৈত্যের বাগানে ফুল ফোটে, শিশুরা খেলা করতে আসে, কিরকম করে ওলট-পালট হয়ে যায় ধরা-বাঁধা ছককাটা জীবনে, কে তার খবর রাখে?

অনাদিপ্রসাদ গিয়ে দাঁড়ালেন সেই মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে—যা ভেবেছিলেন তাই, শুঁড়আলা রুপোলী মাছটা অন্যদের বিরক্ত করে মারছে। ক'দিন আগে ওটা দোকান থেকে এনেছিলেন, নতুন জাতের মাছ—কস্‌বি জেরাম, কিন্তু এখানে এনে জলে ফেলতেই ওর স্বভাবটা বোঝা গেল। নিরীহ ব্ল্যাক মলি, শান্ত গোল্ড ফিশ, এমন কি চঞ্চল ফাইটারগুলোও ওর জ্বালায় অস্থির। ওরা ভয়ে পালিয়ে গিয়ে পাতার নীচে, শ্যাওলার তলায় কিংবা ছোট্ট ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে রমলা বউদি স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ায়। অনাদিপ্রসাদকে নিজের মনে হাসতে দেখে জিজ্ঞেস করে, হাসছ যে?

অনাদিপ্রসাদ বললেন, ঐ নতুন মাছটাকে লক্ষ্য কর রমি, ঠিক যেন আমাদের সাধনবাবু, কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

—ও মাছটাকে ওখান থেকে তুলে নিলেই পার, আপাতত একটা কাঁচের জারে রেখে দাও।

—কিন্তু সাধনবাবুকে মীনাদের জীবন থেকে সরিয়ে নেবে কি করে, জারের মধ্যে ওঁকে তুলে রাখবে?

রমলা বউদি ভুরু কুঁচকে বলেন, আজকাল তুমি কি যে বল আমি বুঝতে পারি না।

অনাদিপ্রসাদ হাসলেন, সন্দেহ হচ্ছে মাথাটা ঠিক আছে কিনা। বেশ তো, ডাক্তার দেখাও না, আমার কোন আপত্তি নেই। মজা কি জান, যতদিন আমি

চরম স্বার্থপর ছিলাম, আমার বউ-ছেলে-সংসার ছাড়া আর কিছু ভাবতাম না, যতদিন এই বাড়ির চৌহদ্দিই ছিল আমার রাজত্ব, দরজা জানালা বন্ধ করে বাইরের আলো-বাতাস ঢুকতে দিইনি,—ততদিন আমাকে তোমরা বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান মনে করেছ। আর যেদিন থেকে হঠাৎ বাইরের টানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম, যেদিন থেকে মনে হতে লাগল জীবনটাই অ্যাকসিডেণ্ট। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে নাও হতে পারত, যে রাস্তার ছেলেটা ধুলোয়-কাদায় আগাছার মত বেড়ে উঠছে সেও হয়তো আমার ছেলে হতে পারত, আমি লেখক না হয়ে অন্য কিছু হতে পারতাম! যে জীবনটা চাই, যা পাই না সেটা হয়তো ফসকে গেছে, হায়, যদি পেতাম, আমি কি হতাম বলতে পার? আমি মনে করি আমি সৎ, সে হয়তো অসৎ হবার সুযোগ পাইনি বলে। যদি আমি ব্যবসাদার হতাম, কে বলতে পারে আমি কালো টাকার মোহে পড়তাম কি না? যদি প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হতাম, হয়তো মদ খেতাম, মেয়েমানুষ রাখতাম। সে সব হইনি, তা নিয়ে বড়াই করবার কিছু নেই, যে কোন মুহূর্তে পা পেছলাতে তো পারে।

অনাদিপ্রসাদ একদৃষ্টে স্ত্রীকে লক্ষ্য করেন। প্রশ্ন করেন, এখনকার চেয়ে আগেই আমি ভাল ছিলাম, তাই না?

রমলা বউদি ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, অনেক, অনেক ভাল।

—তখন ছিলাম সেলফিশ জায়াণ্ট, স্বার্থপর দৈত্য। কেন সে রকম থাকতে পারলাম না! কে আমার চারপাশের দেয়াল সরিয়ে নিল, ওরে, ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর, ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি, এসেছে রবির কর।

অনাদিপ্রসাদকে জুতো পরতে দেখে রমলা বউদি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেঃ তুমি কি আবার বেরচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—জানি না।

—তুমি আমায় খুলে বল তোমার কি হয়েছে, আমার বড় ভয় করে।

অনাদিপ্রসাদ স্মিত হাসেন, কিসের ভয়, তোমার চারপাশের দেয়াল তো আমি সরিয়ে নিইনি, তোমার জীবনে ঝড় আসবে না, জল আসবে না। তুমি দুই ছেলের মা, তুমি একজন নামী লেখকের স্ত্রী, তোমার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ব্যাঙ্কে আছে টাকা, কিসের ভয় তোমার?

অবুঝ রমলা বউদি তবুও বলে, আমি তোমার সঙ্গে যাব, কোথায় তুমি যাও আমি দেখব, ঘুরব।

—তাতে তোমার তেষ্টা বাড়বে, জীবনের তেষ্টা। আমার মত ছটফট করে মরবে, অথচ জল খেতে পারবে না। কেন সুখে থাকতে ভূতে কিলোবে, তার চেয়ে এই ভাল। আয়নার মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখ, নির্ভয় নিশ্চিন্ত হবে। আমি চলি।

অনাদিপ্রসাদ বেরিয়ে যেতেই বড় ছেলে ঘরে ঢুকল, আমি বলছি মা, বাবার শরীর ভাল নেই, তুমি আর ফেলে রেখ না।

—তাই মনে হচ্ছে, আজই একবার দাদার কাছে যাই।

অনাদিপ্রসাদ ইচ্ছে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যাবার উদ্দেশ্যে নয়, শুধু জনতার মধ্যে মিশে যেতে। এই বিরাট শহরের সব রাস্তা দিয়েই সারাক্ষণ জনস্রোত বইছে। যে কোন একটি ধারায় গা ভাসিয়ে দিতে পারলে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া যায়, অথচ নিজেকে একা মনে হয় না। কথাও বলতে হয় না কারুর সঙ্গে, শুধু হাঁটা চলা, অন্যদের কথা শোনা আর চোখ মেলে দেখা। অবশ্য দেখবার মত চোখ থাকা চাই। চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। গত বিশ বছরে যা ভয়ংকর রকম বেড়েছে তা হলো মানুষ। এন্তার মানুষ—পথে—ঘাটে—ট্রামে—বাসে—ঘরে—বাইরে—বস্তিতে—মাঠে শুধু মানুষ। অনাদিপ্রসাদের মনে পড়ে, তাঁদের যৌবনে অফিসের ব্যস্ততা ছাড়া অন্য সময় ফাঁকা ট্রামে বসে শহর বেরিয়ে এসেছেন, দুপুর বা সন্ধ্যের পর কোন দিনই ভিড় থাকত না। মোহনবাগানের ফুটবল খেলা থাকলে হয়তো ট্রামে বসবার জায়গা পাওয়া যেত না, কিন্তু দাঁড়িয়ে আসা যেত স্বচ্ছন্দে। কিন্তু আজকালকার ছেলেরা এসব কথা বিশ্বাস করে না। কারণ তারা সব সময় দেখছে ট্রামে বাদুড়-ঝোলা হয়ে মানুষকে যেতে হয়, যেখানে দাঁড়াবার জায়গা নেই সেখানে বসবার স্বপ্ন কে দেখবে। যেহেতু মানুষ বেড়েছে, কিন্তু ট্রাম বাড়েনি, এবং মানুষের অনুপাতে কিছুই বাড়েনি। প্রয়োজনের সময় কোনদিনই ট্যাক্সি পাওয়া যায় না, অথচ যাত্রিভর্তি ট্যাক্সি মিটার ডাউন করে অবিরাম চলছে। তার সঙ্গে পাশাপাশি চলছে ঠেলাগাড়ি—রিকশা—মালবোঝাই ভাঙ্গা লরি, আর টেম্পো। চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তায় জট পাকিয়ে যায়, কোন গাড়ি অচল হয়েছে কিংবা ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা মেরেছে কোন ট্যাক্সি, হয়তো বা চাপা পড়েছে মানুষ। চীৎকার, চেঁচামেচি হৈ চৈ,—বেশ কিছুক্ষণের জন্যে ট্রাফিক জ্যাম। কিন্তু পাশ দিয়ে ঠিকই জন-

স্রোত বয়ে চলেছে, উত্তরে-দক্ষিণে, পূবে-পশ্চিমে।

একেই উনুনের ধোঁয়ায় দেখা যায় না কলকাতার আকাশ, তার ওপর স্টেট বাসের অত্যাচার। অনর্গল কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে না এমন কোন স্টেট বাস কলকাতার রাস্তায় দেখতে পাওয়া যায় না। পথচারীদের চোখ জ্বালা করে, কাশি পায়, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে না। বাঘ মার্কা সরকারী বাস। কে তার বিরুদ্ধে কথা বলবে? প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এ বাস ফুটপাথের ওপর চড়ে মানুষ চাপা দেয়, ভেঙে দেয় ল্যাম্পপোস্ট, থানার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নড়বড়ে দেহ, আঁকা বাঁকা চাকা দেখলেই বোঝা যায় মাসের পর মাস অযত্নে অবহেলায় রাখা হয় এ গাড়িগুলোকে। 'কোম্পানী কা মাল দরিয়ামে ঢাল'।—জাতীয় সম্পদের অপচয়; অথচ সেদিকে নজর দিচ্ছে কে? কর্মবিমুখ কর্মীদের শাসন না করে, নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত নেতারা তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক জিগির তোলেন, 'আমাদের দাবি মানতে হবে।' এ প্রহসন কিন্তু বেশী দিন চলবে না। জনতা ক্রমশ সজাগ হয়ে উঠছে, একদিন সেই গণ-আদালতে বিচার হবে ঐ নেতাদের। সেখানে কিন্তু উকিল খাড়া করা যাবে না, জনতা এদের মুখোশ খুলে দেবে, কঠিন শাস্তি দেবে এতদিনের পুঞ্জীভূত অপরাধের।

অনেকক্ষণ পথ চলার পর ক্লান্ত অনাদিপ্রসাদ ঢুকে পড়লেন রাস্তার ধারের একটা পার্কে। বসলেন বেঞ্চের ওপর। বেশী লোক নেই, কয়েকজন অবাঙালী এক কোনায় বসে তাস খেলছে। অদূরে গাছের ছায়ায় একটি লোক ঘুমোচ্ছে। দু-চারটি ছোট ছেলেমেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে স্লিপ খাচ্ছে, দোলনাটা ভাঙা, নয়তো ওরা দুলত। পার্কের গেটের মুখে একটা চা-ওয়ালা, তার পাশে একজন গণৎকার খদ্দেরের আশায় উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে।

যে লোকটা ঘুমোচ্ছিল উঠে বসল, বয়স হয়েছে, ময়লা রং, ডুরে চুল। চারপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে উঠে এল অনাদিপ্রসাদের কাছে। জিজ্ঞেস করল, একটা দেশলাই হবে?

অনাদিপ্রসাদ বললেন, না।

—একটা বিড়ি খেতাম।

লোকটা অনাদিপ্রসাদের পাশে বেঞ্চিতে বসল, উঃ, যা মাগগীগণ্ডার বাজার, দেড় টাকা কিলোর কম কোন আনাজ নেই। ঢেঁড়স এখন দু' টাকা, শালা মানুষ না হয়ে তরকারি হলে ভাল হতো, চড়া দামে বিকোতাম। কি বলেন?

কথা শুনে অনাদিপ্রসাদের হাসি পেল। বললেন, তার চেয়ে মাছ হলে আরও ভাল, সাত টাকা। ইলিশ হলে কথা নেই, এগারো।

—মাছ-মাংসের খবর রাখি না মশাই, ওসব দূর থেকে দেখা ভাল, ছুঁলেই

হাতে ফোস্কা পড়ে। তবে কেনবার লোকও আছে। সেদিন বাজারে এক মেছো এক জোড়া ইলিশের দাম হাঁকলো তিরিশ টাকা। আমি শুনে হাসলাম, এত দাম দিয়ে কে মাছ কিনবে! ও মা, কিছুক্ষণ বাদে দেখি এক ভদ্রলোক কড়কড়ে তিনখানা দশ টাকার নোট দিয়ে মাছ দুটো নিয়ে চলে গেল। তবেই বুঝুন, টাকাওয়ালা লোক নিশ্চয় আছে, খদ্দের আছে, কিন্তু মাল কম; তাই দাম বাড়ছে। আমাদের মত লোকের আঁটি চোষা ছাড়া উপায় নেই।

লোকটা কিছুক্ষণ থেকে উসখুস করছিল, বলল, দাঁড়ান, বিড়িটা ধরিয়ে আনি, নয়তো ঠিক জমছে না।

অনাদিপ্রসাদ স্বভাবতই গম্ভীর মানুষ, কারুর সঙ্গেই গায়ে পড়ে কথা বলেন না; তাই ভাবছিলেন লোকটা যখন চা-ওয়ালার কাছে গেছে বিড়ি ধরাতে, এই বেলা কেটে পড়লে হয়। কিন্তু তার সুযোগ পেলেন না। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি, দু' হাতে দু' ভাঁড় চা নিয়ে লোকটা ফিরে এল, নিন, চা খান।

অনাদিপ্রসাদ আপত্তি করলেন, এই অবেলায় চা?

—আপনি হাসালেন, চায়ের আবার সময়-অসময় আছে নাকি? সকালেও চা, দুপুরেও চা, বিকেলেও চা, সন্ধ্যায়ও চা, বৃষ্টিতে চা, রোদে চা, সুখে চা, দুঃখে চা। আর—, লোকটি থামে, চোখে কৌতুক।

অনাদিপ্রসাদের কৌতূহল, আর কি?

—আর আফিম। ঠিক চায়ের মত, আনন্দে, শোকে, শিহরণে, আঁতুড়ঘরে, শ্মশানে—

—কি বলছেন?

—স্বর্গসুখ মশাই। আঃ, যে খায়নি সে বুঝবে না। তখন মনে হয় আমি নবাব, বাদশা, কত সুন্দরী বেগম আমার, কত বাঁদী। আহা, আপনি কখনও খেয়েছেন?

—না।

—আমাকে খেতে বলেছিল হাঁপানির জন্যে, এখন আর হাঁপানির দোহাই দিই না, নেশার জন্যেই আফিম খাই।

—বাড়িতে চেঁচামেচি করে না?

—স্ত্রী-পুত্র?

লোকটা হাসল, আমি তাদের সঙ্গে থাকি না।

—তার মানে?

—যদ্দিন জোয়ান ছিলাম, ভাল রোজগার করতাম, বউ ছেলে নিয়ে চুটিয়ে সংসার করেছি। এখন রিটায়ার্ড লোক, রোজগার কম, তাই ওসব ঝামেলা চুকিয়ে দিয়েছি। বউ আছে ছেলেদের সংসারে, তারা সবাই রোজগেরে, তা ছাড়া আমার ভাইয়ের সঙ্গে চিরকালই ওর একটা লটখটে সম্বন্ধ ছিল। আমি চলে

আসায় সকলেই খুশী, তা ছাড়া বিধবা তো হয়নি। দিব্যি মাছ মাংস ওড়ায়, সিঁথিতে দেয় সিঁদুর। বলেই লোকটা হি-হি করে হাসে।

অনাদিপ্রসাদ বিস্মিত হন, আশ্চর্য লোক আপনি, এ জীবনটাকে মেনে নিতে পেরেছেন?

—বললাম তো, সংসার করার সাধ মিটে গেছে। ছেলেগুলোকে মানুষ করে দিয়েছি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে যে টাকা পেয়েছিলাম বউয়ের জন্যে রেখে দিয়েছি, আমি মশায় এখন ঝাড়া হাত-পা। দিব্যি আছি, আফিম খাই আর মৌজ করি।

—থাকেন কোথায়?

—এই সামনের বস্তিতে, একজন ফলওয়ালার সঙ্গে। সপ্তাহে রেশনের টাকাটা ওকে দিয়ে দিই।

—তা হলে তো এখনও রোজগার করতে হয়।

—করি। দরকার পড়লেই ট্যাক্সি চালাই, মাসে দশ দিন খাটি, বিশ দিন ঝিমুই। মহা আনন্দে আছি। এখন আমার ঝিমোবার পালা। এই যে সঙ্গে ঝোলাটা দেখছেন, এর মধ্যে সরঞ্জাম আছে। টুক করে মুখের মধ্যে ফেলে দেবো, ব্যাস, দুলুনি শুরু হয়ে যাবে।—বাজনা বাজবে, কত রকম স্বপ্ন দেখব, তারপর ঐ গাছতলায়, মাঠের ওপর সুখনিদ্রা—মনে হবে মখমলের বিছানায় আরামে শুয়ে আছি। আবার সেই হি-হি করে হাসি।

অনাদিপ্রসাদ জানতে চান, আপনার নামটা?

লোকটির জবাব, সংসার ত্যাগ করার পর সন্ন্যাসীরা যেমন নিজেদের নাম বদলায়, আমিও তেমনি সংসারী নামটা ত্যাগ করেছি। তবে পদবীটা বদলাইনি। ওই বস্তিতে গিয়ে যাকে বলবেন আফিম মিত্তিরকে ডেকে দাও, সে তখুনি আমায় ডেকে দেবে।

—আগে কি করতেন?

—সে কথাও কাউকে বলি না। এ একটা অন্য জীবন। বিশ্বাস করুন, দিব্যি আছি মশাই, তবে আর দেরি করব না, এখন উঠি। মৌতাতের সময় হলো, ঘরে গিয়ে দেখি, গোয়ালিনীটা হয়তো আমার জন্যে বসে আছে।

—গোয়ালিনী?

—জানেন না, আফিম খেলেই দুধ খেতে হয়, আর তার সঙ্গে একটু রোমান্স মেশাতে হলে চাই একজন গোয়ালিনী—স্রেফ আদিরসের ব্যাপার।

লোকটা হাসতে হাসতে উঠে পড়ে, মশাই ওই আফিমের ঘোরেই একদিন পটল তুলব, ব্যাস, সোজা মহাপ্রস্থানের পথে। ভয় নেই, কাউকে বিপদে ফেলে যাব না, দাহ খরচাটা ঐ গয়লানীরই কাছে গচ্ছিত রেখেছি, আর নয়, চলি।

লোকটা স্ফূর্তিতে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে চলে গেল, 'দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার, বলে জীব ক'রো না ক্রন্দন।'

অগত্যা অনাদিপ্রসাদও উঠে পড়েন। পথ চলতে কত রকম চরিত্রের সংগে পরিচয় হলো। এই আফিম মিত্তির তাদেরই একজন, তবে লোকটার জীবন-দর্শনকে অগ্রাহ্য করা যায় না। সত্যিই হয়তো সংসার করার সময় হাতে তেল মেখে কাঁঠাল খেয়েছে, তা না হলে এত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে কি করে?

ক্রমশ সন্ধ্যা নামছে, এইবার আস্তে আস্তে রাস্তার আলো জ্বলে উঠবে। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি চলার বিরাম নেই, বিরাম নেই জনস্রোতের। তবু ফুটপাথের এক-একটা জায়গা অপেক্ষাকৃত নির্জন। চৌরঙ্গীমুখো হাঁটলে, যাদুঘর পেরলেই এই ধরনের জায়গা পাওয়া যায়, যা শুধু নির্জন নয়, কিছুটা রহস্যাবৃতও বটে।

অনাদিপ্রসাদের পিছনেও ফেউ লাগল, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছোকরি, ফার্স্ট ক্লাস, ওনলি ফাইভ মিনিটস ফ্রম হিয়ার।

অনাদিপ্রসাদ ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে চললেন. দালালটা কিন্তু তখনও সংগে লেগে রয়েছে, ওথেলোর কানে ইয়াগোর মত মন্ত্র জপছেঃ নয়তো ইন্ডিয়ান গার্ল, সামনের ময়দানে, রাস্তা পেরলেই দাঁড়িয়ে আছে। ঐ যে দেখুন, ওমর বিশ সাল।

কৌতূহলের বশে অনাদিপ্রসাদ রাস্তার ওধারে চোখ ফেরালেন, সত্যিই মাঠের মধ্যে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওষুধ ধরেছে বুঝে লোকটা বড় রাস্তা পার হয়ে অন্য দিকে চলে যায়, হাতছানি দিয়ে ডাকে. বাবু জলদি আইয়ে।

অনাদিপ্রসাদের মনে হলো, দেখাই যাক ব্যাপারটা কি। উনিও রাস্তা পার হয়ে প্রায় অন্ধকার মাঠের মধ্যে ঢুকলেন। কিন্তু মেয়েটির কাছ পর্যন্ত এগোতে পারলেন না, হঠাৎ দুটো লোক এসে পেছন থেকে জাপটে ধরল। নিমেষের মধ্যে খুলে নিল হাতঘড়ি, আর একজন তুলে নিল পকেটের ব্যাগ, সংগে সংগে ঘাড়ের ওপর এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটিতে, শাসিয়ে বলল, ভাল চান তো চিল্লাবেন না, নিজেরই বদনাম হবে।

অনাদিপ্রসাদের দুরবস্থা দেখে মেয়েটি দূর থেকে খিল খিল করে হাসছিল, এবার কাছে এগিয়ে এল, বোধ হয় দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে লুঠের টাকার ভাগ নিতে। কিন্তু অনাদিপ্রসাদকে দেখে সে চমকে উঠল, বাবুজী আপনি?

অনাদিপ্রসাদও চিনতে পারলেন, এ সেই মিস কলকাত্তা!

মেয়েটির হুকুম, এই কাল্লু, বাবুর জিনিস যা নিয়েছিস ফেরত দিয়ে দে, অন্ধকারে চিনতে পারলি না। উনি তো আমাদের লোক। মাফ করবেন বাবুজী, গলতি হয়ে গেছে।

অনাদিপ্রসাদ হারানো জিনিস ফেরত পেলেন। ভাবছেন কোন দিকে যাবেন, এমন সময় মিস কলকাত্তা বলল, আসুন বাবুজী, আমাদের সঙ্গে, সেই বাচ্চাটাকে দেখাব।

অনাদিপ্রসাদ না করতে পারলেন না।

॥ একত্রিশ ॥

ট্রাম রাস্তা পার হয়ে ময়দান, তারই একপাশে পুকুর, চার কোণে চারটি ঘর। দেখলে মনে হয়, যিনি পুকুর কেটেছিলেন তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করারও বাসনা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় করে যেতে পারেননি। আবার এমনও হতে পারে এগুলি পথিকদের জিরোবার জন্যে তৈরী পান্থশালা। উত্তর-পশ্চিমে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল মিস কলকাত্তা, বাবুজী এই আমার ঘর।

অনাদিপ্রসাদ তাকিয়ে দেখলেন ঘরটি অপ্রশস্ত নয়। পাকা মেঝে, ওপরে মন্দিরের মত গম্বুজ। অনেকগুলি খিলান, তবে দেয়াল নেই, জল ঝড় থেকে বাঁচবার জন্যে দরমা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে। ঘরের মধ্যে জ্বলছে একটা লণ্ঠন। কয়েকটা কাঠের বাক্স, খান কয়েক ঝুড়ি, একপাশে মাদুরের উপর শোবার বিছানা, সব কিছুই নোংরা, ময়লা, ছেঁড়া। তার মধ্যে একখানা ঝকঝকে বেতের দোলনা। বোঝা গেল বাচ্চাটা তার মধ্যে শুয়ে আছে। মেয়েটি বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনাদিপ্রসাদের কিছু বলার ছিল না। শুধু অবাক হয়ে চারদিকটা দেখছিলেন। মিস কলকাত্তা হঠাৎ প্রশ্ন করলঃ বাবুজী, সত্যি কি আপনি ছোক্‌রির খোঁজ করতে এদিকে এসেছিলেন?

অনাদিপ্রসাদ পাল্টা প্রশ্ন করেন, বেশ তো, তাই যদি হয়!

—আমার হাতে অনেক ছোক্‌রি আছে। বাঙালী, হিন্দুস্থানী। বাবুরা আসে, আমার কাছে দাম ঠিক করে অন্ধকারে ময়দানের মধ্যে চলে যায়।

অনাদিপ্রসাদ কথাগুলো শুনছিলেন কিনা বোঝা গেল না, জিজ্ঞেস করলেন, মাঠের মধ্যে এই ঘরে একলা থাকতে তোমার ভয় করে না?

মিস্ কলকাত্তা হাসল, কিসের ভয়? আদ্‌মীর? তারা তো আমাকে ডর

করে, আমার বডিগার্ডদের দেখেননি? কাল্লু ওস্তাদ, জোন্‌স্‌, এ শহরের খুব নাম করা গুন্ডা। ওরাই তো আমাকে 'মিস্‌ কলকাত্তা' বানিয়েছে।

অনাদিপ্রসাদের কৌতূহল জাগে, মিস্‌ কলকাত্তা ব্যাপারটা কি?

—কাল্লু ওস্তাদদের যখন কোন মেয়েকে পসন্দ্‌ হয় ওরা তাকে মিস্‌ কলকাত্তা বানায়। এ বছর আমাকে লিয়েছে, এই জায়গায় থাকবার কোয়ার্টার দিয়েছে, দুবেলা খিলায়, পরবার শাড়ি দেয়, আবার ছিন্‌তাই পকেটমার হলে কিছু কমিশন ভি দেয়। এ সাল আমাকে আর খাটতে হবে না। তার ওপর ভগবান কৃপা করলেন, একটা বাচ্চা ভি পেয়ে গেলাম।

—তোমার সাদী হয়নি?

—সাদীওয়ালা মেয়ে কি মিস্‌ কলকাত্তা বন্‌তে পারে?

—তুমি আগে কোথায় থাকতে?

—আমার ঘরের লোকেদের সঙ্গে, গঙ্গার ধারে, তাঁবুর মধ্যে, যেখানে আপনি আমায় দেখেছিলেন।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

মেয়েটি সহজ গলায় বলে, আমার বাপ-দাদারা রাজস্থান থেকে এসেছিল, সে অনেক সাল আগে। এই কলকাতাই এখন ঘরবাড়ি হয়ে গেছে। আমরা কুকুরের ব্যবসা করি।

—হাঁ বাবুজী, একদিন গঙ্গা কিনারে গিয়ে দেখবেন।

—হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করেছি কাঠের বাক্সর মধ্যে ছোট বড় কুকুর থাকে। সেসব বুঝি তোমরা আনাও?

—সব জাতের কুকুর, নেপাল থেকে আসে। নীলগিরি পাহাড় থেকে, ওইখানে গঙ্গার ধারে আমাদের সঙ্গে থাকে, বাচ্চাও হয়, বাবুরা কিনে নিয়ে যায়। আলিপুরের এক বোস সাহেব আছে, কুকুরের ব্যবসা করে, কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, কিন্তু সব কুকুর তো লিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকেই।

অনাদিপ্রসাদ স্বীকার করতে বাধ্য হন, আমি কলকাতার লোক অথচ এসব কথা তো জানি না।

মিস্‌ কলকাত্তা অনাদিপ্রসাদকে আরও বিস্মিত করার জন্যে সগর্বে ঘোষণা করল, আমার পিতাজী কিন্তু গোরা সাহেব।

—সে কি?

—দিনের বেলা দেখবেন আমার চোখ নীল, চুলের রঙ্‌ বাদামী। আমার মার কাছে শুনেছি আমার বাবা ছিল বিলাতি জাহাজের খালাসী। তখনকার দিনে জাহাজ যখন গঙ্গার মাঝখানে নোঙ্গর করত তখন মা'রা সাঁতার কাটতে নামত জলে, জাহাজের খালাসীরা মাল চুরি করে পুলিসকে ছিপিয়ে ফেলে

দিত গঙ্গার জলে। মা'রা সেগুলো তুলে আনত। পরে রাত্রিবেলা খালাসীরা ডাঙ্গায় নেমে চুরির মালের ভাগ নিত। সেই সময় আমার মার সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল একজন গোরা খালাসীর, তার নাম ছিল জনি, সেই আমার বাবা।

যেন নিজের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে গৌরবে মিস্ কলকাত্তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অনাদিপ্রসাদ মন্তব্য করেন, তাহলে তো তুমি যে সে মেয়ে নও, কাল্লু ওস্তাদরা তোমায় ঠিক চিনেছে।

মেয়েটি কি বুঝল কে জানে, কিন্তু খিল খিল করে হাসল।

ঠিক এই সময় কাল্লু আর জোন্‌স্ এসে হাজির। একটা মনিব্যাগ দিয়ে বলল, ছুপিয়ে রাখ, একটা মারওয়াড়ী বাবুর পকেট সাফাই করেছি, শালা টাকার চেয়ে কাগজ বোঝাই করে রেখেছে।

মিস্ কলকাত্তা নিমেষের মধ্যে ব্যাগটা একটা ঝুড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে জিজ্ঞেস করল, কত টাকা আছে।

—অন্ধকারে ভাল গুণতে পারিনি, মনে হলো তিরিশ, তারপরেই গলা নামিয়ে বলল, খুব সাবধান, ঐ যে লোক দুটো আসছে, সাদা ড্রেসের পুলিশ, ফট্ করে কোন জবাব দিবি না, আমরা কাছেই আছি।

কাল্লুরা সরে যেতেই অনাদিপ্রসাদ লক্ষ্য করলেন অন্ধকারের মধ্যে থেকে পায়জামা পাঞ্জাবী পরা দুটি জোয়ান লোক ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

দু'জনেই কাঠখোট্টা, গোঁয়ার গোবিন্দ, সরাসরি এসে মেয়েটাকে বলল, মদের একটা ছোট বোতল ছাড়্ দেখি—।

মিস্ কলকাত্তা যেন আকাশ থেকে পড়ে, কি বলছেন বাবুজি!

—বুঝতে পারছ না, মদ চাইছি, মদ, হুইস্কি, রাম, জিন্। এখন বোধহয় দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, তাই তোমার দুয়ারে এসেছি মা জননী, বাজারদর থেকে দু' টাকা বেশি দেব, মাল ছাড়।

—আঈ রাম, এসব কি বলছেন বাবুজি?

দু'জনেই হাসে, মাগীর আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না, এখান থেকে রোজ ডজন ডজন বোতল পাচার হয় তা কি আমরা জানি না? ভাল কথায় যদি না দিস এখুনি তাল্লাসী করে বোতলগুলো বাজেয়াপ্ত করে নেব।

মেয়েটা রুখে ওঠে, কর না, আমার বয়ে গেছে, কিন্তু খবর্দার আমার বাচ্চার ঘুম ভাঙ্গাতে পারবে না, এই বাবুজী সাক্ষী রইল।

দু'জনেই এবার অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকায়, দেখে রাখি বাবুজীটিকে, নিশ্চয় কোন ছিনতাই পার্টির মেম্বার, নয়তো এ মাগীর কাছে বসে গল্প করছে!

এদের কথার ধরনে অনাদিপ্রসাদের গা ঘিন ঘিন করে ওঠে, কিন্তু মুখে কিছু বলেন না।

একজন গলা বাড়িয়ে ভেতরে উঁকি মেরে মন্তব্য করে, মাগীর কথা মিথ্যে নয় রে, সত্যিই একটা বাচ্চা শুয়ে আছে।

অন্যের জবাব, কার বাচ্চা কে জানে!

—এখানে হুজ্জতি করে কোন লাভ হবে না, তার চেয়ে মাঠের মধ্যে চল, জোড়ায় জোড়ায় সখাসখীরা শুয়ে আছে, ধমকালেই দশ পনের টাকা নজরানা দেবে।

—সেই ভাল। চল ময়দানে যাই, কিন্তু এই মাগী, তোকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম,- ছিন্‌তাই পার্টিদের সঙ্গে মিশবি না, বেআইনী মাল বিক্রী করবি না, ধরা পড়লে নির্ঘাৎ জেল হবে।

লোক দুটো টলতে টলতে চলে গেল। অনাদিপ্রসাদের বুঝতে বাকি রইল না লোক দুটো আগে থেকেই নেশা করে এসেছে। এ মেয়েটার কাছ থেকে সুবিধে করতে না পেরে এখন চলল অবৈধ প্রণয়ীদের কাছ থেকে ঘুষের টাকা আদায় করতে।

মিস্ কলকাত্তাও মুখ খারাপ করল, এ শালারা শকুন, মড়ার মাংস খায়, ঘুষ আর ঘুষ।

অনাদিপ্রসাদের তখনও কৌতূহল নেভেনি, জিজ্ঞেস করেন, সত্যিই কি তুমি মদ বিক্রী কর?

মেয়েটা খিল খিল করে হাসে, নয়তো আমাদের চলবে কি করে?

অনাদিপ্রসাদের আরও বিস্ময়, তার মানে? এখন, এই ঘরে তোমার মদের বোতল আছে?

মেয়েটা উঠে গিয়ে দোলনা থেকে বাচ্চাটা কোলে তুলে নেয়, দেখা যায় গদীর তলায় আট দশটা চ্যাপটা পাঁইট বোতল।

অনাদিপ্রসাদ না বলে পারেন না, তুমি বাহাদুর, কি বুকের পাটা, যদি ওরা তাল্লাসী করত?

মেয়েটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, ওরা তো বুদ্ধু, ঝুড়িগুলো দেখত, কিন্তু বাচ্চাকে তুলতে সাহস করত না। মজা দেখবেন বাবুজী, এখন তো ঘুষ নিতে এসেছিল, কিছুক্ষণ পরে যখন তেষ্টায় ছাতি ফাটবে ঐ শালারাই আমার কাছে ঘুরে আসবে। আমার পায়ের কাছে টাকা রেখে মাল কিনবে, ওদের আমি চিনি না?

অনাদিপ্রসাদ উঠে পড়েন, এবার আমি চলি।

মেয়েটা ঠাট্টা করে, কি বাবুজী, পুলিশ দেখে আপনিও ভয় পেয়ে গেলেন নাকি?

—তা নয়, রাত হলো বাড়ি ফিরতে হবে তো?

—আবার কবে আসবেন?

—একদিন এসে যাব। ঘুরতে ঘুরতে; আমার তো কোন ঠিক নেই। এই দশটা টাকা রাখ।

—কেন বাবুজী?

—ঐ বাচ্চাটার জন্যে জামা বানিয়ে দিও, বলো তার মামা দিয়েছে।

মেয়েটার চোখ ছল ছল করে ওঠে। সত্যি বাবুজী, আমার কোন ভাই নেই, আপনার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

অনাদিপ্রসাদ যদিও ঐখান থেকে উঠে পড়লেন কিন্তু এগুতে পারলেন না। কে বলবে দারিদ্র্যপীড়িত এই শহর কলকাতা, আলো জ্বলছে আর নিভছে, হাজারো প্রলোভনের ইশারা, কতরকমের মেকআপ। এখানে ওখানে নিয়ন লাইট, হয়তো বা রাস্তায় স্থির হয়ে আছে, নয়তো বর্ণচ্ছটায় জ্বলছে আর নিভছে, এ শুধু শহরের হাতছানি, কানে কানে বলে, এস আমাকে দেখে মুগ্ধ হও, গ্রহণ করো, ঈশ্বরের দোহাই, শুধু নিজের মতামত প্রকাশ করো না।

তবু অনাদিপ্রসাদ মনের জোর করে এগিয়ে চললেন। অন্ধকার ময়দান, আলোকিত রাজপথ, সচঞ্চল গাড়ি, অবিরাম জনস্রোত, সব কিছু উপেক্ষা করে চলতে চাইলেও যেখানে তিনি বাধা পেলেন সে হলো যাযাবর মানুষের রাজ্যে। তাদের রাজত্ব ফুটপাথে, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, গৃহপালিত পশু, পাখী সবাই এক ফুটপাথে, পাহাড়প্রমাণ আবর্জনার পাশে নিশ্চুপ বসে আছে. রাঁধছে, সংসার করছে। আজব শহরবাসী, কেউ এ দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে না, ভাবে না কিভাবে মানুষগুলোর দিন চলবে। স্বাচ্ছন্দ্য আর দারিদ্র্যের দুটো আলাদা স্রোত বইছে, কোথাও বোধ হয় এদের মেলবার সম্ভাবনা নেই। অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এরা জিগীর তুলছে, 'আমরা মরব না, আমরা বাঁচব।' কিন্তু কে এর জবাব দেবে?

আদিম সভ্যতার ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায়, পশু জীবনের ভেতর থেকেই মানুষের উৎপত্তি। হিংস্র জন্তুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে মানুষ পর্বতের গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, প্রকৃতির বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে শিখেছে। ক্রমশ বৈরীভাব ভুলে পশুকে পালন করেছে, তারপর যুগ-যুগ ধরে চলেছে এই মানব সভ্যতার বিকাশ। আজ আমরা চীৎকার করে বলছি 'আমরা বর্বর নই, আমরা সভ্য'। অথচ ভাগ্যের একি নিষ্ঠুর পরিহাস, যার ফলে ক্রমশ মানুষকে আমরা পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনছি, শুধু বেঁচে থাকার জন্যে, শুধু খাওয়া আর পরার লোভে মানুষ আজ স্বার্থপর জন্তুতে পরিণত হয়েছে। তবু মুখ ফুটে বলতে পারছে না,

হে ভগবান, আমাকে জন্তু করে দাও তাহলে অন্তত এই নকল সভ্যতার হাড়ি-কাঠ থেকে রেহাই পাই।

রাস্তার জঞ্জাল, ফুটপাথের ফেরিওয়ালা, মানুষ, গরু, ছাগলের পাশ কাটিয়ে বেশ ঘণ্টাখানেক সজোরে হাঁটার পর অনাদিপ্রসাদ এসে হাজির হলেন অশোক জানার প্রেসে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, মৃদু আলো জ্বলছে, অনাদি-প্রসাদ কড়া নাড়লেন।

ভেতর থেকে অশোক জানার শঙ্কিত প্রশ্ন, কে?

—দরজা খোল।

আবার প্রশ্ন, কে?

—আমি অনাদি।

অশোক জানার চিন্তিত কণ্ঠস্বর, ও তুমি? আচ্ছা দাঁড়াও, দরজা খুলছি। তবু যেন দরজা খুলতে বেশ দেরী হলো। অশোক জানার চোখ মুখ দেখে অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? মুখখানা থমথমে, প্রেসের ভেতরটা কেমন যেন ছমছমে, কি করছিলে?

—ভেতরে এস, বলছি।

অশোক জানা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, নিজের হাতে মেশিন চালানোর অভ্যেস অনেকদিন চলে গেছে, তবে খুব একটা জরুরী কাজ ছিল তাই নিজেকেই করতে হলো, অনভ্যাসের জন্য একটু গলদঘর্ম হয়ে গেছি।

—তোমার প্রেসের লোকজন সব কোথায় গেল?

—ছুটি হয়ে গেছে।

—সেকি, তোমার এখানে তো অনেক রাত পর্যন্ত কাজ হয়।

অশোক জানা অন্যমনস্ক স্বরে জবাব দেয়, হয়—তবে আজকে সবাই ছুটি নিয়েছে তাই আমি নিজেই কম্পোজ করে ছাপালাম।

—কি?

—একটা সার্টিফিকেট, এখুনি ডেলিভারী নিতে আসবে।

অনাদিপ্রসাদ ক্যানভাসের ইজিচেয়ারে বসে পড়ে প্রসঙ্গ বদলান, অনেক-দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি তাই একবার খবর নিতে এলাম, কাজকর্ম কেমন চলছে?

—ভালই।

—তোমার সেই এম. এল. এ. বন্ধুটির কি খবর?

—শশধর বোস? শুনছি গভর্নমেণ্ট ফেলে দেবার জন্যে দল পাকাচ্ছে। ব্যাটা এখন বেশ চালু হয়ে গেছে।

—তোমার এখানে একটা ছোঁড়া আসত লম্বু না কি নাম—

—কেন তার কি হয়েছে?

অনাদিপ্রসাদ মধ্য কলকাতায় ঝনুদার সাংস্কৃতিক ক্লাবের বর্ণনা করে বলেন, ঐখানে লম্বুকে দেখলাম ঘোঁতনের সঙ্গে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

অশোক জানা মন্তব্য করে, ওরা সব বাস্তুঘুঘুর সাগরেদ, সব সময় টাকা রোজগারের ধান্দা, হাজারো রকম ফন্দিফিকির। আবার ওদের হাতে না রাখলেও চলে না, কোনদিন ক্ষেপে গিয়ে প্রেস জ্বালিয়ে দেবে কে বলতে পারে। অনাদিপ্রসাদ বাঁধাই ঘরের দিকে তাকাতে মনে পড়ে যায় এখানকার সরস্বতী পুজোর কথা। জিজ্ঞেস করেন, সেই কবিতা মেয়েটি কেমন আছে?

—ভালই আছে, তবে বোঝই তো অভাবের সংসার, মাঝে মাঝে কামাই করে, মুখে বলে বাড়িতে অসুখ বিসুখ, অথচ বুঝতে পারি হয় কোন গুঁড়ো মশলার কারখানায়, নয়তো ওষুধের শিশি তৈরীর দোকানে কাজ করে কিছু বেশি টাকা রোজগার করছে। আমিও কিছু বলতে পারি না, মাসে মাত্র আটচল্লিশ টাকা দিই তো।

—তার মানে এখন আসছে না।

—ছুটি নিয়ে নবদ্বীপ গেছে।

—হঠাৎ নবদ্বীপ?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোধ হয় কোন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

ঠিক এমনি সময় দরজার কড়া আবার নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অশোক জানার চোখ মুখ আগের মত কঠিন হয়ে যায়। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খোলে। বাইরে থেকে যে ঢুকল সে আর কেউ নয় মিঃ দত্ত। বোঝা গেল অশোক জানা তারই প্রতীক্ষা করছিল, বলল, আপনার কাজ হয়ে গেছে, ভেতরে চলুন, দিচ্ছি।

অনাদিপ্রসাদকে বসতে বলে অশোক জানা মক্কেল সমেত পাশের ঘরে চলে যায়, গলা নামিয়ে কথা বলে, আপনার জন্যে এই প্রথম নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা নকল সার্টিফিকেট ছাপিয়ে দিলাম।—এই নিন।

সার্টিফিকেটটা হাতে নিয়ে মিঃ দত্ত প্রায় কেঁদে ফেলে, আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন অশোকবাবু।

—আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে মেরেছি, বিবেকের ছুরি কেটে কেটে বসছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছি।

বিচক্ষণ মিঃ দত্ত পকেট থেকে মলম বার করে, তিনখানা করকরে একশ টাকার নোট।

অশোক জানা কিন্তু শিউরে ওঠে, না না, ও সবের দরকার নেই, আপনি সার্টিফিকেটটা নিয়ে চলে যান।

মিঃ দত্তর মনে হয় অশোক জানা দর বাড়াতে চাইছে, বলে, বিশ্বাস করুন আমার হাতে আর টাকা নেই, থাকলে নিশ্চয় দিতাম।

এ কথায় অশোক জানা চটে যায়, আমি তো বলছি, টাকা চাই না।

মিঃ দত্ত তখনও অবুঝ, আপনি এখন 'এই তিনশ' টাকা রাখুন, আমি চাকরি পেলে আরও দুশো টাকা দেব।

অশোক জানা ক্ষেপে ওঠে, আপনি একটা আহাম্মক, আমি কি বলতে গেলাম তা বুঝতেই পারলেন না, জেনে বুঝে শুধু আপনার মুখ চেয়ে এতবড় অন্যায় কাজ আমি করেছি, করেছি নিজের হাতে, কাউকে ভাগী হতে দিইনি। কম্পোজ করেছি, ছেপেছি, আপনি তার দাম দিতে চান টাকা দিয়ে! বিবেকের সঙ্গে কতখানি লড়তে হয়েছে তা বুঝতেও পারলেন না? এই নিন আপনার সার্টিফিকেট, বাড়ি যান, আর কখনও এখানে আসবেন না।

মিঃ দত্ত থতমত খেয়ে যায়, সার্টিফিকেটটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে ভাঙ্গা গলায় বলবার চেষ্টা করে, আপনি মিথ্যে রাগ করছেন, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব—।

অশোক জানা তখনও বিরক্ত, ঢের হয়েছে এখন যান।

লোকটা আর অপেক্ষা করে না, অনাদিপ্রসাদের পাশ দিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

ওদের কথাবার্তার কিছু অংশ অনাদিপ্রসাদের কানেও গিয়েছিল, উনি উঠে গেলেন অশোক জানার কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না অশোক, তোমাকে এত উত্তেজিত হতে আগে তো কখনও দেখিনি।

অশোক জানা বাঁ হাতের তালুতে ঘুষি মেরে কঠিন স্বরে বলে, ঠিক বুঝতে পারছি না অনাদি, ভুল করলাম না ঠিক করলাম! ইলেকশানের সময় ভুল করে শশধর বোসকে দাঁড় করিয়েছিলাম, সেই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে দেশের কত লোককে। আমি না বুঝে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরী করেছি, সে এখন রাজনীতির ক্ষেত্রে তাণ্ডব নাচ শুরু করেছে। জানি না আজকেও আবার ভুল করলাম কি না। বুঝতে পারছি না ঐ মিঃ দত্তকে, লোকটা সৎ না অসৎ।

—এত কথা কিসের জন্যে, কি ছাপিয়ে দিলে তাকে?

—*একটা জাল সার্টিফিকেট।*

অনাদিপ্রসাদ অবাক হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন—সে যেন ব্রোঞ্জের মূর্তি, কোন অভিব্যক্তির প্রকাশ নেই।

॥ বত্রিশ ॥

স্বরূপ লাহিড়ীর সংসারে শান্তি কোনদিনই ছিল না, কিন্তু অশান্তি আরও বাড়ল যে সন্ধ্যায় মনুয়া বাবার আপত্তি অগ্রাহ্য করে মোহনচাঁদের গাড়ি চড়ে চাকরি বজায় রাখতে খেতে গেল দামী হোটেলে।

মেয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ লাহিড়ী তেতো গলায় স্ত্রীকে বলল, শুধু তোমার জন্যেই মেয়েটা এতখানি বেয়াড়া হয়েছে।

মনুয়ার মা আপত্তি করে, আমার কি দোষ, মেয়ে তোমার মত একগুঁয়ে হয়েছে।

—প্রত্যেকদিন রাত করে ফেরে।

—আমাকে শোনাচ্ছ কেন, মেয়েকে বললেই তো পার।

—বলবার মুখ রেখেছো, তোমার যত রকম নোংরামী, ইতরামী, বাঁদরামী মনুয়া ছোটবেলা থেকে দেখেছে, কিছু বলতে গেলেই তো সেইসব কথা শোনায়।

মিসেস লাহিড়ী বিরক্ত হয়ে বলে, সারাজীবন তো তোমার কাছে শুধু গালাগালি খেলাম, মেয়ে আমাকে আজ মানবে কেন? সে তো জানে আমি এ বাড়ির ঝি, তার বেশি কিছু নই।

স্বরূপ লাহিড়ী গর্জায়, বাড়ির ঝি, থাক আর কথা বাড়িও না, যা সব কেলেঙ্কারি করেছ, জানতে কারুর বাকি নেই। ওই মেয়েটাও আমার কিনা কে জানে?

মনুয়ার মা চীৎকার করে ওঠে, আঃ, কি যা তা বলছ।

—তুমি সব পার, যে কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে শুতে পার। তোমার মেয়েও পারে।

মিসেস লাহিড়ী আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

স্বরূপ লাহিড়ী তখনও বাইরে নোংরা ভাষায় গালাগাল করছে। ঠিক যেন দুটো বুনো জন্তু, কেউ কাউকে দু'চোখে দেখতে পারে না অথচ একই জায়গায় রয়েছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মোহনচাঁদের গাড়িতে উঠে মনুয়া শুধু মনকে শক্ত করল না, সেই সঙ্গে যুক্তি দিয়ে বোঝাল, বাবার কথা শুনতে গিয়ে নিজের কর্মজীবন নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তাছাড়া বাবা-মার কাছ থেকে সে পেয়েছেই বা কি? দুজনেই চরম স্বার্থপর, নিজেদের সুখ-সুবিধে নিয়েই চিরকাল ব্যস্ত ছিল। কোনদিন মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

মনুয়া মানুষ হয়েছে আগাছার মত, মনুয়া কি চায়, কি ভাবে তার মা কতটুকু খবর রাখে। বলতে গেলে মনুয়াকে সে একেবারেই চেনে না, আরও দূরের মানুষ স্বরূপ লাহিড়ী, বাবা আর মেয়ের মধ্যে কোনরকম কোমল সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি। আগে ও বাড়িতে ছিল দুজন প্রাণী একজন শিশু, এখন সেখানে বাস করছে তিনজন প্রাণী। সম্পর্কবিহীন তিনটে আলাদা জগতের মানুষ, তবে আজ হঠাৎ বাবার হুকুম শুনে মেয়ে ভয় পাবে কেন? মোহনচাঁদ তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছে, নতুন জীবনটা তার ভালোও লেগেছে। কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, কতরকম ব্যবসার কথা শুনছে, ঠিকমত চলতে পারলে মনুয়া যথেষ্ট রোজগার করতে পারবে, মনুয়াকে সে আশ্বাস দিয়েছে। বাবা-মার তিক্ত দাম্পত্য জীবন আশৈশব দেখে সংসারের উপর বিতৃষ্ণা জন্মেছে মনুয়ার, ঠিক মনের মতন মানুষ না পেলে বিয়ে করার তার ইচ্ছে নেই। ভাল রোজগার করতে পারলে নিজেই ফ্ল্যাট নিয়ে থাকবে। ক্ষতি কি?

মোহনচাঁদের গাড়ি মনুয়াকে সোজা নিয়ে গেল নির্দিষ্ট হোটেলে। উপরে উঠে গিয়ে মোহনচাঁদের টেবিল খুঁজে পেতে দেরি হলো না। সুদৃশ্য কার্পেট-মোড়া স্বল্প-আলোকিত কক্ষের যেখানে ক্যাবারে নাচ হয় সেইখানে মোহন-চাঁদ এক যুবকের সঙ্গে বসে গল্প করছিল, মনুয়াকে দেখে তারা দু'জনেই উঠে দাঁড়াল, হেসে বলল, মিস লাহিড়ী তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।

মনুয়ার অপ্রস্তুত প্রশ্ন, আমার কি আসতে দেরি হয়েছে?

—না, তা ঠিক নয়, আমরাই বোধ হয় একটু আগে এসেছি। পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি আমার তরুণ বন্ধু শেঠিয়া, আর ইনি—।

শেঠিয়া সহাস্যে পাদপূরণ করে দিল, আপনার সুন্দরী পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেন্ট।

তারা তিনজনেই হাসল, মনুয়া ভাল করে চেয়ে দেখল শেঠিয়াকে, বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, ফর্সা রঙ, মাথায় কোঁকড়ান কালো চুল, ঠোঁট দুটো পুরু, ভুরু জোড়া। ঝুলফির সঙ্গে মানানসই সরু গোঁফ, তার ওপর কৌতুকভরা দুটো চোখ। এরকম চেহারা হঠাৎ চোখে পড়ে না। একবার তাকালে যে কোন মেয়ের দৃষ্টি এরা আকর্ষণ করতে পারে, আর পুরুষরা ইচ্ছে করে এদের এড়িয়ে যায়, হয়তো বা হিংসের জ্বালায়।

শেঠিয়ার কথা বলার ধরন অতি সহজ। মোহনচাঁদের উদ্দেশ্যে বলল, আপনার ভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি, এমন সুন্দরী পি এ পেলে আমিও দেখতেন সারাদিন কাজ করছি। আর বাউণ্ডুলের মত রেসের মাঠে কিংবা ঘোড়ার আস্তাবলে ঘুরে বেড়াচ্ছি না।

মোহনচাঁদ মন্‌য়াকে জানায়, এত কম বয়েস হলে কি হবে মিঃ শেঠিয়ার সাত আটটি দামী দামী ঘোড়া আছে, প্রায়ই দেখবে বাজী জেতে।

মন্‌য়া খ্‌শী হবার ভান করে বলল, তাই নাকি? আপনার তো এদিকে খ্‌ব শখ আছে দেখছি।

শেঠিয়া হেসে উত্তর দিল, এটা ঠিক শখ নয়, এ থেকে পয়সাও রোজগার করি, একরকম ব্যবসা বলতে পারেন। আমার বাপ দাদারা পাট আর চটের ব্যবসা করে টাকা রেখে গেছে, আমি তাই খাটাচ্ছি ঘোড়ার রাজত্বে। আপনি একদিন রেস কোর্সে আস্‌ন না।

মন্‌য়া উৎসাহ প্রকাশ করে, যাব একদিন।

মোহনচাঁদও সায় দেয়, মিস লাহিড়ী ঠিক পারবে, সকলের সঙ্গে অবাধে মিশতে পারে, কথা বলতে জানে, তোমাদের কাছ থেকে ঘোড়ার টিপস ও নিয়ে আসতে পারবে, আবার আমাকে জ্যাকপট-এর জেতা টিকিটও কিনিয়ে দিতে পারবে।

শেঠিয়ার মন্তব্য, তা পারবে। মিস লাহিড়ী, রেসের মাঠে তোমার বসকে ছেড়ে সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ঘ্‌রবে, এক সীজন-এ তোমাকে বড়লোক করে দেব।

মোহনচাঁদ এক সময় অন্‌যোগ করল, শেঠিয়া, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আসা উচিত ছিল, এত ভাল মেয়ে।

—কি করব, সে জানে আপনি বিপত্নীক, তাই আসতে চাইল না। নিজে ড্রিঙ্ক করে না বলে হোটেল, ক্লাব, পার্টি, এড়িয়ে চলে। অবশ্য মিস লাহিড়ী আসবেন জানলে—শেঠিয়া সকৌতুকে মন্‌য়ার চোখের ওপর চোখ রাখল। সঙ্গে সঙ্গে মন্‌য়ার ধারাল জবাব, স্ত্রী সঙ্গে থাকলে আমার সম্বন্ধে বোধ হয় এতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারতেন না।

—কেন?

—প্‌র্‌ষ মান্‌ষরা ভারি দ্‌ষ্ট্‌।

এ কথায় যদিও তারা তিনজনেই হাসল, কিন্তু মোহনচাঁদের ব্‌ঝতে বাকি রইল না প্রথম আলাপেই এদের দ্‌জনেরই দ্‌জনকে পছন্দ হয়েছে। বয়েসের টান, চেহারার আকর্ষণ, তাছাড়া কথাবার্তাতেও যেন কোথায় একটা মিল আছে। অভিজ্ঞ মোহনচাঁদ এদের কথা বলার স্‌যোগ দিয়ে কোন এক অছিলায় টেবিল থেকে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শেঠিয়া ম্‌খর হয়ে ওঠে, মিস লাহিড়ী, এত চমৎকার তুমি ইংরিজী বল, কোথায় লেখাপড়া শিখেছ?

—কনভেন্টে।

—আশ্চর্য, সাধারণত বাঙালীর মেয়েরা তোমার মত কম বয়েসে চাকরি করে না। বিয়ের জন্যে তৈরি হয়ে বসে থাকে।

মনুয়া লঘু গলায় বলে, আমি বিয়েই করব না।

—একলা থাকবে?

—ক্ষতি কি?

—কিছু না, ওদেশে কত মেয়ে এরকম থাকে, আমাদের দেশের মেয়েদের মনের জোর নেই তাই।

মনুয়া প্রতিবাদ করে, আমার কিন্তু খুব মনের জোর।

—দেখা যাবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কোথায়? টেলিফোন নম্বর কত? বাড়ির ঠিকানা?

মনুয়া দুষ্টুমি করে, উঁহু বলব না।

—আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না, আমি ঠিক বার করে নেব।

মোহনচাঁদ এসে পড়ায় ওদের এ আলোচনা থেমে যায়।

সে সন্ধ্যায় মোহনচাঁদ কত টাকা খরচা করেছিলেন কে জানে, প্রথমেই শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হলো। ফেনিল উচ্ছল শুভ্র তরল পদার্থ, বিশেষ করে মেয়েদের কাছে যা স্বর্গীয় সুখ এনে দেয়। আজকাল আমাদের দেশে এসব জিনিস বড় একটা দেখা যায় না। খাবারের সঙ্গে 'ওয়াইন'-এর অর্ডারও দেওয়া ছিল, মাছের সঙ্গে হোয়াইট ওয়াইন, মাংসের বেলায় রেড ওয়াইন। কফির আগে 'ঘমারে'—কাঁচা সোনার রঙের যে তরল পদার্থ জ্বলতে জ্বলতে গলা বেয়ে বুকে নেমে যায়। মনুয়া কোনদিনই এ ধরনের ভোজসভায় আসেনি, খাদ্য ও পানীয়ের গুণে নিজেকে তার রানীর মত মনে হলো।

অন্যদিকে ক্যাবারে নাচ চলছে। একটি সুন্দরী বিদেশী তরুণী—দেহটা চাবুকের মত—বাজনার তালে তালে যেখানটা যেমন খুশি নাচাচ্ছে আর দেহ থেকে এক একটা আবরণ খুলে ফেলে নগ্নতাকে ক্রমশ প্রকাশ করছে। দর্শকদের মধ্যে শিহরণ—মৃদু গুঞ্জন, বাহবার হাততালি।

শেঠিয়া নীচু গলায় বলল, মেয়েটার নাম সোফিয়া, ওকে আমি চিনি। নাচে ওর জুড়ি নেই।

মনুয়া একটা ভুরু উঁচু করে বলল, ওর চেয়ে আমি ভাল নাচতে পারি।

—তাই নাকি।

—একদিন মে ফ্লাওয়ারে এস, দেখিয়ে দেব।

শেঠিয়া মুখ নীচু করে মনুয়ার কানে কানে বলল, তাহলেও ওই ভাবে জামা খুলতে তো পারবে না।

মনুয়ার মাথায় তখন নেশা চেপে ধরেছে, বলে ফেলল, খুলে দেখিয়ে দেব, তবে শুধু তোমার সামনে, এরকম এক ঘর লোকের সামনে নয়।

শেঠিয়া চোখ মারে, বেশ, এই কথা রইল, পরে কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভুলে যেও না।

মোহনচাঁদ ইচ্ছে করেই এদের কথাবার্তা শুনছিল না, অন্যদিকে নাচ দেখছিল, তবে নিজের ব্যবসার কথাটা বলে নিতে ভোলেনি—শেঠিয়া, বড় অঙ্কের গোটা তিনেক 'জ্যাকপটে'র জেতা টিকিট আমাকে যোগাড় করে দিও ভাই।

শেঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, মোহনচাঁদজী, একথা দু'বার আমাকে বলতে হবে না। এমন সুন্দরী পি. এ-কে ভিড়িয়ে দিয়েছেন, দেখবেন আপনার কত কালো টাকা সাদা করে দেব।

মোহনচাঁদ মনে মনে হাসল, বুঝল, দাওয়াই ধরেছে। সেইজন্যে খাওয়া-দাওয়ার পর শেঠিয়া যখন বায়না ধরল নিজের গাড়ি করে মনুয়াকে তার বাড়িতে ছেড়ে দেবে, মোহনচাঁদ কোন আপত্তি করেনি। শুধু এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিল, মিস লাহিড়ী, তুমি ওর সঙ্গে যেতে রাজী আছ তো?

মনুয়া সম্মতি দিয়েছে, নিশ্চয়।

শেঠিয়া তার বিরাট ওপেল গাড়ির সামনের সিটে মনুয়াকে বসিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল। অসম্ভব জোরে চালায় গাড়ি, ডানদিক বাঁদিক কোন গ্রাহ্য করে না, যখন তখন ওভারটেক করে, লাল-নীল আলোর হুমকি গ্রাহ্য করতে চায় না; গাড়ি তো নয় যেন তেজী ঘোড়া, সারাক্ষণ দৌড়বার জন্যে পা ঠুকছে।

মনুয়া এক সময় মন্তব্য করল, এত জোর গাড়ি চালাও কেন?

শেঠিয়ার উত্তর, আমি স্পীড ভালবাসি। যদি জোরেই না চলব, গরুর গাড়ি চড়া ভাল। আমি কখনও ট্রেনে চড়ি না, প্লেনে যাই। আমাদের জীবন এমনিতে এত মন্থর যে একঘেঁয়ে লাগে, তাই আমি চাই স্পীড, চাই অ্যাডভেঞ্চার, যদি তুমি চাও আমি সোজা তোমাকে নিয়ে এখন ডায়মণ্ডহারবার চলে যেতে পারি।

—সে কি, এত রাত্রে!

—রাত ভাবলেই রাত। ডায়মণ্ডহারবারে যাব, জলের ধারে খানিকটা পায়চারী করব, আবার গাড়ি ছুটিয়ে চলে আসব, তখনও দেখবে ভোর হয়নি।

—বাড়িতে চেঁচাবে।

—এদেশের মেয়েরা বড় ভীতু, অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসে না।

গাড়ি হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরতে দেখে মনুয়া জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ?

শেঠিয়ার সহজ উত্তর, যখন ডায়মণ্ডহারবারে যাবেই না, চল আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাই।

—পাগল হয়েছ, আজ বড় বেশি ড্রিঙ্ক করা হয়ে গেছে, এ অবস্থায় কিছুতেই আমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারব না।

শেঠিয়া হাসে, ও ফ্ল্যাটে কেউ থাকে না, শুধু নিজের জন্যে রেখেছি।

আমার দুর্বলতা তেজী ঘোড়া আর নতুন মেয়ের ওপর। ফ্ল্যাটটা দেখে যাও, যখন খুশি আসতে পার, দরকার হলে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দেব, আমি না থাকলেও ক্ষতি নেই, বয় ফ্রেন্ডকে নিয়ে এসে 'এনজয়' করতে পার।

তবু মনুয়া আপত্তি করল, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে।

আরে বাবা পনের মিনিটের ব্যাপার, দুজনে দুটো বড় পেগ হুইস্কি খাব, তারপর তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসব বাড়িতে।

—প্লীজ শেঠিয়া, আজ আর ড্রিঙ্ক করব না, এমনিতেই মাথাটা কিরকম ঘুরছে।

শেঠিয়া আর জোর করল না, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে তার ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে দিল, বলল, আমার নিমন্ত্রণ রইল, যখন খুশি আসবে। এই আমার কার্ড সঙ্গে রেখে দাও, ঠিকানা, ফোন নম্বর সব পাবে।

আবার গাড়ি ছুটল।

মনুয়ার বাড়িতে পৌঁছে শেঠিয়া মনুয়ার হাতটা টেনে নিয়ে নরম গলায় বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় খুব ভাল লেগেছে, আমার পছন্দ অপছন্দ জ্ঞান মারাত্মক, যাকে ভাল লাগে না তার সঙ্গে কথাই বলি না। বিশ্বাস কর, প্রথম দেখাতেই আমি তোমাকে একরকম ভালবেসে ফেলেছি।

মনুয়া না বলে পারল না, তুমি বড় অদ্ভুত কথা বল।

—কবে আবার দেখা হবে? কাল সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্রে—

—মনুয়া হাসল, আমি ফোন করব।

—ভুলে যেও না, আমি ছটফট করব ফোনের জন্যে। বাই বাই।

—বাই বাই।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে শেঠিয়া হুস করে ফিরে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মনুয়া বুঝতে পারল, শুধু তার মাথাই ঘুরছে না, পাও টলছে। এতটা পান করা তার উচিত হয়নি। দরজায় নক্ করারও দরকার হলো না, খোলা রয়েছে। সোফায় স্বরূপ লাহিড়ী স্বয়ং বসে, বোঝা গেল মেয়ের ফেরার প্রতীক্ষা করছিল। মনুয়া ঘরে ঢুকতেই বাবার ব্যঙ্গ স্বর শুনতে পেল, এতক্ষণে ফেরবার সময় হলো মেয়ের, বাকি রাতটুকু কাটিয়ে এলেই তো পারতে।

মনুয়া ছোট্ট জবাব দিল, একটু দেরি হয়ে গেছে, পার্টি ভাঙ্গল এই মাত্র।

—একজনের গাড়িতে গেলে, আর একজনের গাড়িতে ফিরলে দেখছি। মদ খেয়েছ মনে হচ্ছে, সোজা হয়ে তো দাঁড়াতে পারছ না। ছিঃ, ছিঃ!

—কি করব, চাকরি করতে গেলে ওরকম—

স্বরূপ লাহিড়ীও এতক্ষণ শুধু শুধু বসে থাকেনি, সেও পান করেছে অতিরিক্ত মাত্রায়। ঝাঁঝের মাথায় বলে, চাকরি? মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা

পাওনি, ইউ আর এ কল্ গার্ল, টেলিফোনে ডাকলেই তোমাদের পাওয়া যায়। বড়লোকের নষ্ট ছেলেগুলো তোমাদের নিয়ে স্ফূর্তি করে।

—আঃ, কি যা তা বলছ।

—ঠিকই বলছি, আমার বাড়িতে থেকে ওসব বাঁদরামি চলবে না।

মনুয়াও রেগে জবাব দেয়, বেশ, এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব। নিজেই ফ্ল্যাট ভাড়া নেব।

স্বরূপ লাহিড়ী ক্ষেপে যায়, কোথায়, বেশ্যাপাড়ায়?

—সে যেখানেই হোক, এই নরকে আর থাকব না। যেমনি মা, তেমনি তুমি, ছোটবেলা থেকে আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ তোমরা, এখন আবার শাসন করা হচ্ছে। শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।

—খুব বড় বড় কথা শিখেছ। উঠে দাঁড়িয়ে স্বরূপ লাহিড়ী টলতে টলতে মনুয়ার দিকে এগিয়ে যায়।

মেয়ের ব্যঙ্গ প্রশ্ন, কি, গায়ে হাত তুলবে নাকি? তুমি সব পার, অসভ্য জানোয়ার। মার গায়ে কম কালশিরে ফেলেছ?

বাবার গর্জন, শাট্ আপ্, আর আমি কোন কথা শুনতে চাই না, কাল সকালে তুমি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে।

—তাই যাব।

নিজের ঘরে গিয়ে মনুয়া খাটের ওপর বসে পড়ল, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত তিনটে বাজে। চেঁচামেচির ফলে নেশার ঘোর অনেকটা কেটে গেছে, অন্যদিন হলে হয়তো মনুয়া কাঁদত, কিন্তু আজ চোখে জল এল না। কিছু দিন বাদে এ বাড়ি থেকে তাকে চলে যেতেই হতো, এখানকার পরিবেশ ক্রমশঃ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। একপক্ষে ভালই হলো, বিচ্ছেদের দিন ত্বরান্বিত হওয়ায়। মোহনচাঁদ তাকে নিশ্চয় সাহায্য করবে, থাকবার ব্যবস্থাও করে দেবে, হয়তো কয়েকদিনের জন্যে হোটেলে ওঠা যেতে পারে। হাতে পয়সা থাকলে কলকাতার শহরে থাকবার ভাবনা কি। মনে পড়ল ববির কথা, ছেলেটা দার্জিলিং থেকে আর ফিরল না, এ সময় কাছে থাকলে মনুয়া আরও ভরসা পেত। রত্না কুশারী আর অনুভা, ওই ডাইনী দুটো ছেলেটার সর্বনাশ করেছে। তাছাড়া ছেলেটার একেবারে মনের জোর নেই, তাই পা হড়কে গেল। মনুয়া নিজে কিন্তু অনেক শক্ত। আজকের রাত্রের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কাল সকালে বাবা ওঠার আগেই সে বাড়ি থেকে চলে যাবে। হঠাৎ মনে হলো শেঠিয়ার ফ্ল্যাটের কথা, লোকটা বার বার তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, ক'দিন সেখানে থাকলেই বা ক্ষতি কি? হয়তো লোকে বদনাম দেবে, দিক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এরা শুধু বদনামই দিতে পারে, আর অন্য কিছু দিয়ে সাহায্য করতে পারে না।

এতরকম চিন্তা করেও ভোর রাতে মনুয়া ঘুমিয়ে পড়লো—চোখ দুটো যেন টেনে আসছিল। যখন ভাঙলো তখন বেলা দশটা। স্বরূপ লাহিড়ী অফিসে চলে গেছেন—মনুয়া খবর নিয়ে জানলো মা-ও বাড়িতে নেই, বাজার করতে গেছে মার্কেটে।

কাল রাত্রে স্বরূপ লাহিড়ী যে কুৎসিত ভাষায় তাকে গালমন্দ করেছে তা মনে পড়তেই মনুয়ার ভেতরটা বিদ্রোহ করে উঠল—আর এখানে থাকা চলে না; ভালোই হয়েছে, বাবা মা কেউ বাড়ি নেই—এই বেলা বিদায় নিতে হবে।

মোহনচাঁদকে জানাতে তার সাহস হলো না, কারণ চাকরি নেবার সময় সে বলেছিল বাবার সঙ্গে থাকে না, সেইজন্যেই গার্জেন হিসাবে খাড়া করেছিল অনাদিপ্রসাদকে; এখন আবার উল্টো কথা বলা ঠিক হবে না। একবার ভাবল, অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করবে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো লোকটা বড় ভালো মানুষ, এসব ব্যাপারে সাহায্য করতে ভয় পাবে। শেষপর্যন্ত ফোন করল শেঠিয়াকে।

—হ্যালো—আমি মনুয়া কথা বলছি।

অন্যদিক থেকে শেঠিয়ার ঘুমজড়ানো কণ্ঠস্বর, কে মনুয়া?

—বাঃ কাল রাত্রে মোহনচাঁদজীর সঙ্গে—

ব্যস আর বলতে হলো না, শেঠিয়ার উচ্ছ্বাস শোনা গেল। আরে মিস লাহিড়ী তুমি! আমি যে এতটা আশা করতে পারিনি—ও ডার্লিং, তুমি আমার আকাশের তারা। তুমি আমার রাতকী রাণী। তুমি, তুমি আমার—

মনুয়া থামিয়ে দিয়ে বলে, আমি বড় বিপদে পড়েছি। কাল অত রাত করে বাড়ি ফিরেছি বলে বাবা-মা রেগে গেছেন—

—কুছ পরোয়া নেই। এঞ্জেল, তুমি তৈরি থাকো আমি এখুনি আসছি। কোন সুন্দরী তরুণী বিপদে পড়েছে শুনলেই আমার 'সিভালরি' জেগে ওঠে পুরোনো দিনের নাইটদের মত। স্যর শেঠিয়া এখুনি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়বে—হাজার হাজার চুমু নিও ডার্লিং—আমি এলাম বলে।

॥ তেত্রিশ ॥

কবিতা যে মায়ের সখী বকুলফুলের নবদ্বীপের বাসায় যেতে রাজী হয়েছিল—সে ওই একঘেঁয়ে দিনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার আশায়। প্রতিদিন ট্রেনে করে বিনা টিকিটে রানাঘাট-কলকাতায় যাতায়াত করা, বিরামহীন ছাপাখানা মেশিনের জন্যে অক্ষর জুগিয়ে যাওয়া, নয়তো বসে বসে শুধু

ফর্মা ভাঁজাই করা, এতে ক্রমশ তার জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। এত খেটেও তো দু' বেলা পেট ভরে খাওয়া যায় না, বাড়ির কারুর জন্যেই কিছু করা যায় না। ছোট বেলায় স্বপ্ন দেখত, নিজে রোজগার করে বাড়ির লোককে খাওয়াবে, রোজগেরে হয়ে অভাব পূরণ করবে, এখন বুঝতে পেরেছে ওসব অলীক চিন্তায় কোন লাভ নেই। অভাবের মধ্যেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতে হবে। নিজে স্বার্থপর হতে পারলে হয়তো এ থেকে মুক্তির পথ ছিল, মিতার পথ অনুসরণ করলে। কোনো বাবুর রক্ষিতা হয়ে থাকলে মোটামুটি জীবনটা সুখে কাটত, অবশ্য মিতারও ভবিষ্যৎ কি আন্দাজ করা খুব কঠিন। কোন দিক থেকেই আলো দেখতে না পেয়ে কবিতা ভেবেছিল নবদ্বীপে গেলে হয়তো কিছুটা শান্তি পাবে। সেই আশা নিয়ে একদিন মায়ের সঙ্গে এসে নামল নবদ্বীপে।

তীর্থক্ষেত্র নবদ্বীপ। প্রেমধাম। স্টেশনের নাম নবদ্বীপধাম। ব্রাহ্মণপ্রধান যুগে যখন জাতিভেদের বাঁধনে ক্ষত্রিয়-শূদ্রেরা অন্ত্যজের মত ব্যবহার পেতে লাগলেন, বেদ মন্ত্র কেবলমাত্র টিকি-পৈতাধারীদের সর্বস্বত্বরূপে পরিগণিত হলো—তখন উদ্ভব ঘটল তান্ত্রিক দলের। তাদের সাধনা পঞ্চ ম'কারে; মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুনের বিচিত্র আচরণে তাদের হ্লাদিনী রূপের প্রকাশ। বাংলার বুকে সতীদাহের সঙ্গে শুরু হলো শবসাধনার বীভৎস ধর্মাচরণ।

এহেন সময় এক নবধর্মের স্রোতে স্বস্তি পেলো আচণ্ডালদ্বিজ শান্তি-কামী জাতি—নব-উদ্ভাবিত বৈষ্ণব ধর্মে, যে ধর্মে ভেদাভেদ নেই, দ্বেষ-হিংসা নেই, যার মন্ত্র প্রেম, যার ভক্তি প্রেম, যার ক্ষমা প্রেমে।

জয়দেব গীতি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলী গীত হতে থাকলো ঘরে ঘরে। পল্লীর নিভৃত শান্তিছায়ে 'কৃষ্ণ ধামালী'র গানে আম-কাঁঠালের পত্র-পল্লব শিহরিত হলো, আর নবদ্বীপে বেজে উঠল প্রেমের মৃদঙ্গ—শ্রীচৈতন্যের জন্মলগ্নে। পিতা জগন্নাথ মিশ্রের নিবাস ছিল শ্রীহট্টে, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা ওড়িষ্যার জাজপুরের অধিবাসী—শেষে এই নবদ্বীপের কোলে এসে 'নিমাই' জেলা ও দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে হয়ে রইলেন সর্বজনীন প্রেমমূর্তির জীবন্ত বিগ্রহ। তাই নবদ্বীপ নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই একীভূত হয়ে যান প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ—যিনি করেছিলেন পাষণ্ড দলন—বিধর্মী হুসেন শাহকেও করেছিলেন মুগ্ধ; মুচি রুইদাসও পেয়েছিলেন তাঁর প্রেমের স্পর্শ।

কবিতাদের স্টেশন থেকে নিতে এসেছিল গোপাল। হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা জানাল, ভক্তিভরে কবিতার মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল, নমস্কার বিনিময় করল কবিতার সঙ্গে। মিহি গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনাদের সব কুশল তো?

কবিতার মা বললেন, হ্যাঁ বাবা, আমার সই বকুলফুল ভাল আছে তো?
—শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আমাদের সব মঙ্গল, চলুন বাসায় যাওয়া যাক।

যে কোনও নতুন জায়গায় গেলে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বদলের জন্য প্রথমটা সকলেরই ভাল লাগে। কবিতারও তাই মনে হলো, মনে হলো রানাঘাটের চেয়ে নবদ্বীপ অনেক ভাল জায়গা; মনে হলো, শহর কলকাতার কৃত্রিমতা এখানে নেই, মনে হলো এখানকার মানুষ অনেক সহজ, অনেক সরল।

কিন্তু এ মনে হওয়া বেশিদিন টিঁকলো না। প্রথম প্রথম দুই বকুলফুল সই-এর গল্প শুনতে তার খুব ভাল লাগত, নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত ফেলে আসা দিনের সেই কল্পরাজ্যে—সহজ গ্রাম্য জীবন, বৃষ্টি ঝড়ের দিনে আম কুড়োবার ধুম, গ্রীষ্মের বৈকালী রৌদ্রঝলমল টোপাকুলের বন, শীতে বংশী নদীর পাড়ে বসে ছেলেদের মাছ ধরা, আরও কতরকম ছবি—মায়েদের কত সুখস্মৃতি। কিন্তু ক'দিন পরেই কবিতার মনে হলো, ওই 'ছিলেন বাবুর দেশে' বাস করার সার্থকতা কি। সবই তো 'ছিল', কিন্তু এখন তো কিছু নেই। যা ছিল তার জন্যে হা হুতাশ করে যেমন কোন লাভ হয় না, তেমনি 'ছিল'র রাজ্যে উটপাখির মত মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকলেই বা চলবে কেন। 'নেই'টা সত্য, কারণ তা 'বর্তমান'। 'ছিল'টা মিথ্যে না হলেও তার কোন সার্থকতা নেই, কারণ তা 'অতীত'।

মায়েদের গল্পের কথা ভুলে কবিতা দেখতে লাগল নবদ্বীপের চলমান জীবন—এখানে, ওখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কৃষ্ণ-রাধার মন্দির—আখড়া। প্রতি সন্ধ্যায় এই আখড়াগুলিতে বুড়োবুড়ি, নেড়ানেড়ি, যুবা-শিশুর সমারোহ। বহু দূরাগত প্রবাসী, শ্রান্ত ভক্ত সকাল-বিকালে আশ্রয় নেয়, বিশ্রাম করে এই সব আখড়ার স্নিগ্ধ সুশীতল মেঝের ওপর। তুলসীর বায়ে কখন অজান্তে ঘুম নেমে আসে নিদ্রাতুর চোখে, তারপর বিকেল চারটের পর শুরু হয়ে যায় মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনের ভীড়, শহরের দ্রষ্টব্য স্থল পরিক্রমা, মায়াপুরী যাত্রা।

কবিতাও এদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে, হৃদয়ে ভক্তি আনার চেষ্টা করেছে, আশা করেছে তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে কীর্তনের সুর বাজবে, কিন্তু কেন জানা নেই সেই সহজিয়া সুর বাজেনি।

গোপাল জিজ্ঞেস করেছে, এ জায়গা তোমার কেমন লাগছে?

কবিতা ঘুরিয়ে উত্তর দিয়েছে, অন্য রকম।

—ভাল না মন্দ?

—জানি না।

এ উত্তর খাঁটি শহরের মেয়ের। প্রশ্নের বেড়াজালে নিজেকে ধরা দিতে অনিচ্ছুক।

গোপাল চেষ্টা করেছে কবিতাকে নিয়ে কোন অছিলায় বেড়াতে যাবার, কিন্তু মেয়েটির দিক থেকে খুব বেশি সাড়া পায়নি। বরং কবিতার কথাবার্তা শুনে বিস্মিত হয়েছে।

কবিতার গম্ভীর প্রশ্ন, গোপালদা, এর পর আপনি কি করবেন?

গোপালের সহজ উত্তর, নাম কীর্তন করাই আমার কাজ, আর নতুন কি করব?

—এভাবে চলবে কি করে?

—গৌরাঙ্গের কৃপায় ঠিকই চলে যাবে।

—আজকালকার দিনে এ বিশ্বাস রাখা কি সম্ভব?

গোপাল অসহায় বোধ করে, আমি এর কি জবাব দেব, কিন্তু চলে তো যাচ্ছে। সংসারে তো শুধু আমি আর আমার মা।

—তারপর সংসার যখন বাড়বে?

গোপাল নির্বোধের মত প্রশ্ন করে, কেন?

কবিতা না হেসে পারে না, লোকটা অসম্ভব বোকা। শরীরটা শুধু বেড়েছে, সে অনুপাতে একটুকু বুদ্ধি বাড়েনি। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, কেমন যেন মেয়েলী ভাব। পুরুষমানুষ বলে বিশ্বাস হতে চায় না।

কবিতার মা বোধ হয় মেয়ের মতিগতি দেখে শঙ্কিত হয়েছিল। তাই রাত্রে শোবার সময় চুপিচুপি এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, গোপালকে তোর ভাল লাগেনি? বেশ তো বিনয়ী, ভদ্র—

কবিতার শুকনো উত্তর, হ্যাঁ ভালই তো!

—তবে?

—তবে কি?

—যে জন্যে এসেছি তা তো জানিস, মানে গোপালের সঙ্গে তোর—

কবিতা এড়িয়ে গেল, বড্ড ঘুম পেয়েছে মা, এখন আমি শুয়ে পড়ছি।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তোদের কিছুই আমি বুঝতে পারি না।

কবিতার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে গোপাল তার এক বন্ধুকে ধরে এনেছিল। বলেছিল, এর নাম মাধব সখা, এ তোমার কথার ঠিক জবাব দিতে পারবে কবিতা।

এ ছেলেটিকে কবিতা গোপালদের আখড়ার আগেই দেখেছে, বেশ ভাল গান করে। ময়লা রং, কিন্তু চোখ দুটো টানা টানা, চুল ছোট করে ছাঁটা। গোপালের মত মেয়েলী ধাঁচের নয় মোটেই, কথাবার্তায় পটু, দেখলেই বোঝা

যায় চালাক এবং চতুর।

কবিতার প্রশ্নের জবাবে সে বলল, টাকা রোজগার করাই যদি বড় কথা হয়, তাহলে এখানেও তার যথেষ্ট সুযোগ আছে ঠাকরুণ।

কবিতা বলল, কই আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—বেশ তো, আমার সঙ্গে অন্য আখড়ায় চলুন, দেখিয়ে দেব কেমন করে লোকে রোজগার করছে। বলুন, যাবেন আমার সঙ্গে?

—নিশ্চয় যাব।

মাধব সখা জিজ্ঞেস করে, গোপাল, তোর কোন আপত্তি নেই তো?

গোপালের মেয়েলী কণ্ঠস্বর, গৌর-এর যা ইচ্ছে, আমি তাতে বাধ সাধব কেন?

সেই সন্ধ্যায় কবিতা বের হলো মাধব সখার সঙ্গে।

সুখের বিষয়, এই নবদ্বীপে ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থানের মত পাণ্ডা মহাপ্রভুদের দাপট অনেক কম, নেই বললেই চলে। বোধ হয় কারণটা বৈষ্ণব পীঠস্থানের মাহাত্ম্যের জন্যে—বিনয়-বিগলিত, সৌজন্যে-সুভাষিত এহেন প্যাণ্ডাদের কয়েকজন আবার খুবই জনপ্রিয়।—তাদের নামডাকে শহরের আখড়াগুলিও মুখরিত। পাণ্ডাদের বদলে এখানে গাইড পাওয়া যায়, বৃদ্ধ, যুবক, নানা বয়েসের। হয়তো ইলেকট্রিকের দোকানে একটা প্যাকিং বাক্সের উপর কোন বৃদ্ধ বসে, কিন্তু যেই ট্যাক্সী বা সাইকেল রিকশা চড়ে কোন যাত্রীকে আসতে দেখেন, অমনি কোঁচান ধুতিটা এক হাতে ধরে এগিয়ে যাবেন তাদের দিকে—জোড়ে দেখলে মোলায়েম স্বরে আমন্ত্রণ জানাবেন, জামাই নেমে এস, তোমাদের দেখিয়ে দেব সোনার গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভুর খড়ম আর মায়াপুরী। সম্বোধন শুনে যাত্রীদম্পতি বিস্মিত হবে, কিন্তু বৃদ্ধ ততক্ষণে পাতানো মেয়ে-জামাইকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেলেছেন, তাদের নিয়ে ঘুরবেন বিভিন্ন আখড়ায়। তীর্থ পরিক্রমা সেরে দু' এক টাকা যা পাবেন তাতেই খুশী।

বেশী পয়সা এঁরা পান না, কারণ অনেক আখড়াতেই তীর্থযাত্রীদের ভেট দিতে হয়। গৌরাঙ্গের রূপোর খড়ম দেখতে গেলে শুধু যে তার ইতিহাস শুনতে হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে আখড়াবাসী চেয়ে বসবে ভেটের পয়সা। এক দিনে কবিতা সব কিছুই লক্ষ্য করেছে, বাকি ছিল বোধ হয় কোন যুবক গাইডের সঙ্গে অভিযান। সে অভিজ্ঞতাও হয়ে গেল মাধব সখার সঙ্গে বেরিয়ে।

মাধব সখা প্রথমে যে দুটো একটা আখড়ায় গেল কবিতা সেখানে নতুনত্বের কোন সন্ধান পেল না। একই রকম পরিবেশ, একই রকম কীর্তন। কোথাও নাম গান—বহু কণ্ঠে গাইছে, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে'।

'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে,
—যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে, সে যে আমার প্রাণ রে।'

কবিতা জিজ্ঞেস না করে পারল না, আমাকে কি দেখাতে এনেছিলেন মাধব সখা?

ছেলেটি উত্তর দিল, দেখাতে ঠিকই পারি, তবে সংশয় জাগছে যদি আপনি ভয় পান।

—কিসের ভয়? আমি তো কলকাতার মেয়ে—

মাধব সখা হাসে, সেই ভরসাতেই তো আপনাকে নিয়ে এসেছি। আসুন আমার সঙ্গে।

মাধব সখা কবিতাকে নিয়ে গেল আখড়ার পেছনে নির্জন ঘরে। মেঝের ওপর একটা মাদুর পাতা রয়েছে, তার ওপর একটা বালিশ। হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে, ঘরের কোনায় রাখা জলের কুঁজো আর গেলাস।

কবিতার প্রশ্ন, এখানে কেন?

—আপনি বসুন, আমি এখুনি আসছি।

কবিতার অদ্ভুত লাগল। ফাঁকা ঘরে বসে কীর্তনের সুর সে শুনতে পাচ্ছে, আখড়ার গান, মানুষের কলরব। অথচ এ ঘরটি অতি নির্জন। অল্প আলোয় ভালো করে সব দিক দেখা যায় না।

একটু পরে মাধব সখা ফিরে এল, কিন্তু একা নয়, সঙ্গে একটি মোটা-সোটা দোহারা চেহারার মানুষ। সরু তরোয়ালের মত গোঁফ, মাথার ওপরে টাক পড়েছে। লোকটা বলতে বলতে ঢুকল, আর নাকে দড়ি দিয়ে কত ঘোরাবে মাধব সখা, কেত্তন শুনে শুনে ভক্তিভাব জেগে উঠছিল আর কি, কোন রকমে চেপে রেখেছি। কোথায়, তোমার বিদ্যেধরীকে একবার দেখি।

কবিতা মাদুরে বসেছিল, চট করে উঠে দাঁড়াল। ওর বুঝতে বাকি রইল না, যে-মানুষটা মাধব সখার সঙ্গে আসছে তার উদ্দেশ্য খুব সাধু নয়। লোকটা মাতাল। লোকটি বলল, আহা, আমাকে দেখে উঠলে কেন, বোস। তোমার খবর পেয়ে আমি নৌকা ভাড়া করে ওপার থেকে আসছি। যদিও স্ফূর্তি করতে প্রায়ই আমি এ অঞ্চলে আসি, কিন্তু আজকাল আর কোন মজা পাই না। আখড়া মারফত যারা আসে তারা সব পিঁজরাপোল ফেরত।

কথা শুনে কবিতার মনে পড়ে গেল হলধরবাবুর কথা, এ মানুষগুলোর এক জাত, একই ধরনের কথাবার্তা, একই চাহিদা, একই রকম উচ্ছ্বাস। না বলে পারল না, জন্তু, জন্তু!

লোকটার হেঁচকি উঠল, ও মাধব সখা, এ কাকে ধরে এনেছ, কি সব বলছে?

কবিতার তীক্ষ্ম স্বর, কেন, কানের মাথা খেয়েছ, শুনতে পাচ্ছ না? বলছি তুমি একটা জানোয়ার, আর তোমার ওই দালালটা ইতর।

—তা হলে তুমি কে?

—তোমাদের যম।

লোকটার নেশা ছুটে যাবার জোগাড়; মাধব সখা, চল, কেটে পড়ি। এ বড় বেয়াড়া ঘোড়া।

কবিতার চটপটে উত্তর, পিঁজরাপোলের নয়, রেসের মাঠের।

অপমানটা বোধ হয় মাধব সখারও গায়ে লাগে। বলে, নাচতে নেমে আবার ঘোমটা কেন, তুমি তো টাকা রোজগার করতেই চেয়েছিলে।

—এ রোজগারের জন্যে নবদ্বীপে আসার দরকার নেই।

মাধব সখা একটা চোখ ছোট করে বলে, তোমার বুদ্ধি ছিল, এ জায়গায় লেগে থাকলে কিন্তু অনেক পয়সা বানাতে পারতে, ঐ বুদ্ধু গোপালটাকে স্বামী সাজিয়ে সামনে রেখে দিব্যি কারবার চালাতে। বদনামও হতো না, টাকাও পেতে।

—থাক, ঢের হয়েছে, দরজা ছাড়, আমি এখন বাড়ি যাব।

কবিতা ভেবেছিল, হয়তো মানুষ দুটো গায়ের জোর ফলাতে পারে, কিন্তু সে অভদ্রতাটুকু করতে বোধ হয় সাহস পেল না। বাইরে বেরিয়ে এসে মিতার বাসার সেই কালরাত্রির কথা মনে পড়ল, হলধরবাবুকে কি মারাত্মক ভয় পেয়েছিল, অথচ আজ এ লোক দুটো তাকেই ভয় পেল। ঠিক যে চাকা ঘুরেছে তা নয়, এই হলো অভিজ্ঞতার দাম। জীবন দিয়ে কবিতা বুঝেছে, নিজে নষ্ট হতে না চাইলে কেউ কাউকে খারাপ করে দিতে পারে না। আরও বুঝেছে, গোপাল নির্বোধ হলেও সে সৎ, তার বিশ্বাসের মধ্যে কোন ভেজাল নেই। সে ভক্ত, সে মনে করে ভক্তের ভগবান। তার সঙ্গে কবিতার কোন জায়গায় মিল নেই, মিল হতেও পারে না। গোপালের মত লোকও যেমন এখানে আছে, তেমনি আছে ঐ মাধব সখারা, যারা ধর্মের ভেক নিয়ে মেয়ে-মানুষের দালালী করে। এরা চিরকালই মানুষকে ঠকায়, অন্যের বিশ্বাস ভেঙ্গে দেয়, এরা সমাজের শত্রু। তবু এদের বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না।

তাই কবিতা যখন ফিরে এল, গোপাল জিজ্ঞেস করল, মাধব সখা তোমায় কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?

—নদীর ধারে একটা আখড়ায়।

—ভাল লেগেছে?

—না।

—তা হলে?

—কাল আমরা রাণাঘাটে ফিরে যাব।

—এত তাড়াতাড়ি?

—কলকাতায় যেতে হবে, অনেক দিন কাজে যাইনি। প্রেসের থেকে মাত্র দু'দিনের ছুটি নিয়েছিলাম, জানি না চাকরিটা আছে কিনা। কাজ যখন করতে হবে ফিরে যাওয়াই উচিত। আপনি ভালো লোক, আপনার ভক্তি আছে, এ পথে নিশ্চয় শান্তি পাবেন। তবে মাধব সখার মত লোককে বন্ধু বলে প্রশ্রয় দেবেন না।

আর কিছু খুলে বলেনি কবিতা। এ থেকে গোপাল কি বুঝেছিল সেই জানে।

বিছানায় শুয়েও কবিতার চোখে ঘুম এল না। তার পাশে ঘুমচ্ছে মা—বকুলফুলের অতিথি। আতিথ্যের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটেনি। মনে পড়ছে ট্রেনে করে কলকাতায় প্রথম কাজ করতে আসার কথা, কত হইচই, আনন্দ। গান করতে করতে মেয়েরা দল বেঁধে আসত। কিন্তু ক্রমশ সে দল ভেঙে গেল, এখন সকলেই বিচ্ছিন্ন, যে যার ধান্দায় ঘুরছে। আরও গান বাঁধার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু হলো না। অনাদিপ্রসাদ মানুষটা ভাল, তাকে লেখবার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু ও সবই তো পিঠ-চাপড়ানি। অনাদিপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত তার জন্যে কিইবা করতে পারেন? অদৃষ্ট তাকে জীবনের এই সামান্যতম ক্ষুদ্রাংশে কত কি দেখিয়েছে, জানিয়েছে—দেখেছে মিতার ঐ উচ্ছৃংখল জীবন, রাতের পর রাত দেহবুভুক্ষার শিকার হওয়া, দেখেছে গড়ের মাঠে 'মরুতীর্থ হিংলাজে'র আসরের বেলেল্লাপনা—চরম ধ্বংসের সিংহদ্বার খুলে উদাত্ত মত্ত আহ্বানের পদধ্বনি। তারপর এই আজকের এই ছোট্ট ঘরে শুয়ে থাকা, নবদ্বীপের বিনিদ্র রজনী, বিশ্রী, একঘেঁয়ে, বিরক্তিকর, অসহ্য। অথচ মা কত আশা নিয়েই না এসেছিলেন—কবিতার মনেও কি ছিল না কিছুটা কৌতূহল? মায়ের যেমন, তেমনি তারও স্বপ্নভঙ্গ। যেন সব কিছু অক্ষর গেঁথে, প্রুফ রেডি করে, চেসে এঁটে মেশিনে চড়াতে যাবার আগেই হঠাৎ ঝুর ঝুর করে একের পর এক টাইপ খসে পড়া—সব কিছু নতুন করে শুরু, ভঙ্গুর এক-ঘেঁয়েমির পুনরাবৃত্তি।

তবু তো বেঁচে থাকতে হবে। কাজ করতে হবে।

হঠাৎ একটা মুখের ক্লোজাপ ভেসে উঠল মনের পর্দায়। সে নিরঞ্জন। আশ্চর্য, এর কথা আগে কোনদিনই কবিতা বিশেষ করে ভাবেনি। আজ এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে মনে হলো তার জীবনের কোন এক চোরাগলিতে—কতদিনের

কত গোপন অভিজ্ঞান তিল তিল করে সঞ্চিত হয়েছে যার খবর কবিতা আগে রাখেনি—যে জুগিয়েছে তাকেও সে বুঝতে পারেনি।

কবিতার মনে হলো, হয়তো আবার চলতে পারা যাবে। প্রেসের চৌহদ্দির বাঁধা জীবনে একঘেঁয়েমিকে অগ্রাহ্য করে, যদি মেশিনম্যান নিরঞ্জন সুখে-দুঃখে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কবিতা নিজের মনেই বলে, নবদ্বীপ আর নয়, কাল সকালে উঠেই প্রথম ট্রেন ধরে কলকাতা।

॥ চৌত্রিশ ॥

রাজনীতির ক্ষেত্রে তখন মহা দুর্দিন। এলোমেলো হাওয়া বইছে, বলা নেই কওয়া নেই বৃষ্টি পড়ছে, কখনও বন্যা কখনও দুর্ভিক্ষ। শকুন উড়ছে—রাজনীতি নিয়ে জুয়োখেলা। নূতনের অভিষেকে জনগণের যে উল্লাস তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল, তারা বুঝতে পারল ধোঁকা খেয়েছে। যে নেতারা নির্বাচনের আগে হাজারো রকম প্রতিশ্রুতির প্রলোভন দেখিয়েছে, গদীতে বসে তার কোনটাই কাজে পরিণত করতে পারল না। তখনও বক্তৃতা—বক্তৃতা নিজেদের অক্ষমতাকে চাপা দেওয়ার জন্যে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবার অছিলা। স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ এতগুলো বছর এদেশের লোক শুধু বক্তৃতাই শুনেছে, আর কত শুনবে। ভেবেছিল নেতৃত্ব বদলের ফলে হয়তো কিছুটা ভাল ফল পাওয়া যাবে, অথচ দেখা গেল কিছুই হলো না। ইংরাজ আমলের অভিশপ্ত আমলাতন্ত্র স্বাধীনতার ইতিহাস কলঙ্কিত করে ঠিক আগের মতই আজও বয়ে চলেছে, আরও কতদিন চলবে কে জানে। কালান্তক লালফিতে, অচল ফাইলের পাহাড়, কর্মবিমুখ সরকারী কর্মচারী, চুরি, ঘুষ, কালোবাজার, ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রা, অসহায় বেকার জীবন, মুমূর্ষু নাগরিক, অক্ষম কর্পোরেশন, রাস্তার আবর্জনা, দুর্নীতিগ্রস্ত হাসপাতাল, বিদ্রোহী ছাত্রসমাজ, সর্বহারা জনতা। সবই আগের মত রইল, কিছুই বদলালো না, মানুষের মন হতাশায় ভরে গেল। এ সমাজের অবক্ষয় কে রোধ করবে? চারদিকে দম বন্ধ করা অন্ধকার, ক্রমশ নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

জনপ্রতিনিধিদের চিনে নিতে আর দেরী হলো না, গদীতে বসার জন্যে তাড়াহুড়ো পড়ে গেল, খাওয়াখাওয়ি, মারামারি, দল ভাঙ্গাভাঙ্গি। ভুঁইফোঁড় নেতাদের সৃষ্টি, যে যত এম. এল. এ. পুষতে পারবে তার তত কদর, মেয়েমানুষ আর মদের হররা ছুটল।

এই নোংরামির কারবারে জিতল শশধর বোসের মত লোকেরা। ক'দিন আগেও এরা ছিল সম্পূর্ণ গাঁইয়া, কলকাতায় আসতে ভয় পেত। চৌরঙ্গী

অঞ্চলে যেতে হলে সঙ্গে লোক নিত, সেই মানুষটা এই ক'মাসের মধ্যে লায়েক হয়ে উঠেছে। গ্রামে বড় একটা যায় না বললেই হয়, কলকাতায় বালিগঞ্জ স্টেশনের হোটেলে তার পাকাপোক্ত আস্তানা। হাতে সিগারেটের টিন, সবসময় গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়, রাত্রে ভেট পায় মদের বোতল। ক'দিন আগে মেয়ে-মানুষ জোটাতে শশধর বোসকে লম্বুর কাছে ধর্না দিতে হয়েছিল, লম্বু পর্দাঢাকা স্টেশন ওয়াগন করে এই জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে যায় একটি কলেজের সামনে। দূরে গাছের তলায় হাতে বই খাতা নিয়ে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল লম্বুর ইশারায় সুড় সুড় করে গাড়িতে উঠে পড়ল, বসল শশধর বোসের পাশে। উত্তেজনায় শশধরের তখন বুক ধড়ফড় করছে, ভাল করে মেয়েটার দিকে তাকাতে সঙ্কোচ বোধ করল, কত বয়েস, সত্যি কলেজের মেয়ে কিনা জানবার চেষ্টাও করল না।

মেয়েটার কিন্তু কোন লজ্জা নেই, বরং শশধরের হাবভাব দেখে হাসল; বলল, কই, কথা বলবেন না।

শশধর হাঁফাতে থাকে, বলব বইকি, মানে তাই তো ভাবছি—আপনার নাম?

—নাম জেনে কি হবে?

—না মানে কি বলে ডাকব?

—নাইবা ডাকলেন। দূরে কেন, কাছে আসুন।

লম্বু তখন গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, কান কিন্তু খাড়া, পেছনের প্রেমালাপ শুনছে। মনে মনে হাসছে শশধরের বোকামী দেখে, একেবারে বাজারের মেয়ের হাতে দুখানা বই ধরিয়ে দিয়ে কেমন কলেজ গার্ল বলে চালিয়েছে, তা না হলে কি পদীর জন্যে কেউ এতগুলো টাকা দেয়!

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার পর হোটেলের ঘরে ফিরে এসে শশধর বোস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর এসব ঝামেলার মধ্যে যাবে না, কোথায় কে দেখে ফেলবে, তখন কি কেলেঙ্কারী হবে কে বলতে পারে। কিন্তু শশধর বোস এ প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি, মেয়েমানুষের নেশা মদের চেয়েও কড়া। ক'দিন বাদেই আবার সে ছোঁকছোঁক করতে শুরু করেছে। লম্বু এইটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল. বলল, লজ্জা যখন ভেঙ্গে গেছে আর কোন চিন্তা নেই স্যার. এ হলো কলকাতার শহর, কোন জাতের মেয়ে চান, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, পাঞ্জাবী, বাঙালী, ফিল্মস্টার, যেমন যেমন খরচা করবেন। আর গাড়ি করে ঘুরতে হবে না, তাদের আস্তানায় নিয়ে যাব। কেউ কিছু জানতে পারবে না, আপনার কোন ভয়ের কারণ নেই।

—সত্যি বলছ লম্বু! যদি কোন বিপদ হয়!

—আরে তার জন্যে তো আমি আছি।

সে সন্ধ্যায় লম্বু শশধর বোসকে নিয়ে গিয়েছিল এক চীনে রেস্তরাঁয়। কেবিনের মধ্যে ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মদ খাওয়াল, বুঝল নেশা যখন বেশ জমাট হয়েছে সাজিয়ে-গুজিয়ে মতিকে এনে বসিয়ে দিল তার পাশে, পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, এর নাম মতি বিবি, এককালে থিয়েটারে খুব নাম ছিল।

শশধর-এর তখন নেশা ধরেছে, বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কতবার আমি ওকে স্টেজে নাচতে দেখেছি।

মতি না হেসে পারে না, শুধু নাচ দেখেছ, কেন আমার গান শোননি?

—নিশ্চয় শুনেছি কিন্তু ঠিক ঠাওর করতে পারছি না।

ঠাওর করবার উপায়ও ছিল না শশধর বোসের, মতিকে সে যে দেখেছিল সরস্বতী পুজোর হাঙ্গামায় ফটিকদের পাড়ায় নিখোঁজ পুলিস খুঁজতে গিয়ে তা সে বেমালুম ভুলে গেছে। নেশার ঘোরে মুখখানা আবছা ভেসে উঠছে, কিন্তু আর কিছুই মনে পড়ছে না।

চটুলা মতি চট করে জিজ্ঞেস করল, আমার সেই গানটা মনে নেই? গুন গুন করে গাইলো, ছেলে ধরার ভয় ধরেছে বেরিও না রাস্তায়—

মাতাল শশধর বোস বাহবা দেয়, বাঃ বাঃ, তোফা গান, আবার গাও।

—শুধু গানই শুনবে, নাচ দেখবে না?

শশধরের কথা জড়িয়ে যায়, বেশ, তাহলে নাচো, গাও—

—এখানে কোথায় নাচব, আমার বাসায় চল।

—তাই চল, লম্বু আমাকে নিয়ে চল।

লম্বু মৃদু স্বরে মতিকে ভর্ৎসনা করে, তুই একেবারে বোকা, তোর ঐ বস্তির ঘরে ঢুকলে এ মালের নেশা ছুটে যাবে।

মতিও চোপা দেয়, আমি তোর মত বোকা নই, শ্বশুর বাড়ির চাবি যোগাড় করে এনেছি, ব্যাগের মধ্যে আছে।

লম্বুর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, গলা আরও নামিয়ে বলে, তাহলে তো এ শালাকে বিদেয় করে ঐ ঘরেই দুজনে রাত কাটাতে পারব।

মতি চোখ মেরে সায় দেয়।

এই শ্বশুর বাড়িগুলোর কিছু ইতিহাস আছে। দেশ ভাগের পর কলকাতার অনেকগুলো বাড়ি ফাঁকা হয়ে যায়, কারণ মালিকরা চলে যায় বিদেশে। যাদের ওপর এ বাড়িগুলোর দেখাশুনো করার ভার থাকে তারা কিন্তু খলিফা লোক। বাড়ির বেশির ভাগ অংশটাই কম ভাড়ায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ভাড়া দিয়ে দেয়, কিন্তু দু'একখানা ঘর নিজেদের তাঁবে রাখে। ভাড়াটেদের সঙ্গে কড়ার থাকে তারা ঐ ঘরগুলোর দিকে নজর দেবে না, কে আসছে কে যাচ্ছে তা নিয়ে যেন তারা মাথা না ঘামায়। ভাড়াটেদেরও হাবা-কালা সেজে থাকতে আপত্তি নেই, কারণ তারা যে কম টাকায় বাসা পেয়েছে। ঐ বিশেষ ঘরগুলো

ঘণ্টা বা রাত হিসেবে ভাড়া পাওয়া যায়, টাকা জমা দিয়ে ঘরের চাবি নিয়ে আসতে হয় যেমন আজ মতি নিয়ে এসেছে। সাধারণত ঘরে একটা খাটপাতা থাকে, একটা আলনা, মুখ দেখার আয়না, কোথাও বা ড্রেসিং টেবিল, জলের কুঁজো গেলাস, আর দু' একটা টুকিটাকি জিনিস। বলাই বাহুল্য, এর সঙ্গে লাগোয়া কলঘর থাকে। এ ঘরগুলো থেকে আয় হয় প্রচুর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন খদ্দের। হয় ছেলেরা মেয়ে নিয়ে আসে, নয়তো মেয়েরা ছেলে। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রয়োজনেও এ ঘরগুলোর প্রয়োজন হয়। তখন ভাড়া যোগায় পার্টি। হঠাৎ কোন কর্মী বা নেতাকে গা ঢাকা দিতে হলে এইসব ঘরে আশ্রয় নিতে হয়, দিনের পর দিন ঘরের মধ্যে তারা বন্ধ থাকে, পার্টির লোক এসে খাবার যুগিয়ে যায়, কিন্তু কাকপক্ষীও কোন খবর পায় না। হয়তো তাদের জন্যে পুলিস হন্যে হয়ে ঘুরছে, কাগজ তোলপাড় করছে, তারই মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে এইসব ঘরের খাটে শুয়ে ঘুমোয়। আবার প্রয়োজন হলে এদের বর্ডার পার করে দেওয়া হয় যাতে অন্য দেশে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। এইসব কারণেই যাদের হাতে এইসব বাড়িগুলি দেখাশোনা করার ভার, আজকের সমাজে তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি।

শশধর বোস অবশ্য যখন মতির সঙ্গে শ্বশুর বাড়ির ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল তখন আর তার বিশেষ হুঁশ নেই, অনেক কষ্টে চোখ দুটো টেনে খুলে রেখেছে, কিভাবে কোন রাস্তা দিয়ে যে ও বাড়িতে পৌঁছল তার খেয়াল রাখতে পারেনি। কোনরকমে খাটের ওপর বসে পড়ে জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করে, বাঃ, এ তো খাসা বাড়ি, এটা কি তোমার?

—তবে আর কার?

—আমি কিন্তু মাঝে মাঝে আসব।

—যখন খুশি আসবে।

—আজ বোধহয় বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছি, শরীরটা ভাল লাগছে না।

—কোন ভয় নেই, তুমি জুতো খুলে খাটের ওপরে শোও, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

শশধর ছটফট করে, না, আমি হোটেলে ফিরে যাই, কষ্ট হচ্ছে। আমার জামার পকেটে টাকা আছে, তোমার যা ইচ্ছে নিয়ে নাও। লম্বু কোথায় গেল, আমায় একটা ট্যাক্সি করে নিয়ে চলুক।

লম্বু ঘরের কোণ থেকে সাড়া দিল, আমি এখুনি ট্যাক্সি ডেকে আনছি শশধরদা, আপনি ঘাবড়াবেন না।

শশধর তখনও বিড়বিড় করে, মতিবিবি, তুমি টাকা তুলে নাও।

মতি অভিনয় করে, তাই কখনও হয়, তোমার শরীর খারাপ আর আমি টাকা নেব?

শশধর বোস নিজেই পাঞ্জাবীর পকেটে হাত চালিয়ে খান কয়েক দশ টাকার নোট বের করে আনে, মতির হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলে, কমবেশি কি আছে জানি না, এগুলো লক্ষ্মীটি তোমার কাছে রেখে দাও।

মতি এবার আর আপত্তি করে না, নোটগুলো ব্লাউজের মধ্যে ভরে ফেলে। মুখে বলে, আবার আসবে তো?

শশধর বোসের প্রতিশ্রুতি, নিশ্চয় আসব। তোমাকে ভাল লেগেছে, তোমার বাড়ি ভাল লেগেছে, শুধু শরীরটা কিরকম করছে, এখনও ট্যাক্সি আনছে না কেন?

সে রাত্রে ট্যাক্সিতে বমি করতে করতে আর সর্দারজীর গালাগাল শুনতে শুনতে শশধর বোস কোনরকমে বালিগঞ্জ স্টেশনের হোটেলে এসে পেঁছয়। মিটারের ভাড়ার ওপর করকরে দশ টাকার নোট দণ্ড হিসেবে দিতে হয়।

ঠিক এইভাবে শহর কলকাতার মাইফেলীবাবুদের মত শশধর বোস যখন ক্রমশ লায়েক হয়ে উঠছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে দল ভাঙ্গা-ভাঙ্গির হুজুগ পড়ল। শশধরের মত নির্দলীয় এম. এল. এ-দের পোয়া বারো। নানা দল থেকে নানারকম প্রস্তাব আসছে—মন্ত্রিত্ব, টাকা, মেয়েমানুষ যা চায় তাই পাবে, শুধু তাদের দলে নাম লেখাতে হবে, ভোটের সময় সরকারকে চিৎপাত করে দিতে হবে। অনেকেই অনেক দলে ঢুকে পড়ল, কিন্তু শশধর বোসকে কেউ ভেড়াতে পারল না। এই ক'মাসে বুদ্ধু লোকটা শেয়ালের মত চতুর হয়ে পড়েছে, চালাক মেয়েরা যেমন কুমারী থেকে বহু পুরুষের কাছ থেকে প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ উপহার আদায় করে, তেমনি শশধর বোস নির্দলীয় থেকে সব পার্টির কাছ থেকেই ডালি আদায় করতে থাকল। এ ডালি শুধু ফল, তরকারি, মাছ, মাংস, মদের নয়, তার সঙ্গে টাকার খামও আসত। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে শশধর বোস ফেঁপে ফুলে উঠল। সাজে শৌখিনতা এল। গিলে করা পাঞ্জাবী, কোঁচান ধুতি। যে সে সিগারেট নয়, একেবারে ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ; আর বাজারের ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট ট্যাক্সি; আর শ্বশুরবাড়ি নয়, মেয়েদের আনতে লাগল তার হোটেলে।

শহর কলকাতায় মেয়েছেলে পাওয়া যে এত সহজ শশধর বোস কিন্তু একথা আগে কল্পনাও করতে পারেনি। যে পার্টির দালালরাই তাকে ভজাতে আসে, দরদস্তুর সেরে যাবার সময় নীচু গলায় মেয়েমানুষের লোভ দেখাতে ভোলে না। এ তাদের মিথ্যে বড়াই নয়, সত্যি এ ক'দিনের মধ্যে অনেক মেয়ে শশধর বোস দেখল। বিবাহিতা, অবিবাহিতা, ষোড়শী, বিংশোত্তরী, আবার চল্লিশের উপর বয়সীও, নানা জাতের, নানা ভাষার, নানা রূপের।

আজ যাকে নিয়ে শশধর বোস ঘরের আলো কমিয়ে বিছানায় শুয়েছিল সে কিন্তু ফিল্মস্টার। বয়েস কম, মাথায় হাল ফ্যাশানের চুড়ো করে বাঁধা

খোঁপা। প্রসাধনে পটু, পঁচিশটা মেয়ের মধ্যে সহজেই সে পুরুষ মানুষের চোখে পড়বে।

বিগলিত শশধর বোস চোখ দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে এই সুন্দরীকে দেখে, জিজ্ঞেস করে, আপনার কোন্ ছবি দেখেছি বলুন তো?

মেয়েটির সপ্রতিভ উত্তর, এখনও দেখেননি, তবে দেখবেন। যে দুটো ছবিতে কাজ করছি, তার এখন আউটডোরের শুটিং চলছে। শেষ হতে দেরী আছে।

এতটুকু বয়সে এ লাইনে গেছেন, বাড়িতে কেউ আপত্তি করেনি?

মেয়েটি হাসল, বাঃ, আপত্তি করবে কেন? আমি তো রোজগার করছি।

শশধর বোস নেশা জমাবার জন্যে গ্লাসের পানীয় এক চুমুকে শেষ করে দেয়, বলে, তা সত্যি, তবে এ লাইনটা শুনেছি—

মেয়েটির পাল্টা প্রশ্ন, ভাল নয়, এই তো? তা মেয়েদের পক্ষে কোন লাইনটা ভাল শুনি? বাড়ির থেকে বেরলেই আমাদের বাইরের শিকার হতে হয়। রোজগার করতে গেলেই শুতে হয় কারুর না কারুর সঙ্গে, ছবির জগতে ডিরেক্টার, হিরো, প্রোডাকশন ম্যানেজার, তা ছাড়া প্রডিউসার তো আছেই। আমাদের মত এক্সট্রাদের কেউই রেহাই দেয় না। তাদের খুশী রাখতে না পারলে আমাদের ছবি উঠবে কেন? তবে হ্যাঁ, একবার যদি এ লাইনে নাম হয়ে যায়, তখন এই লোকগুলোই চাকরের মত আমাদের বাড়িতে বসে থাকবে।

—আপনার মনে হয় আপনি এরকম নাম করতে পারবেন?

মেয়েটির দৃঢ় উত্তর, তা না হলে এ লাইনে এসেছি কেন? আজকের দিনে বড় হওয়াটাই আসল কথা, কিভাবে বড় হলাম তার খবর কেউ রাখতে চায় না। এই ধরুন আজ আপনার সঙ্গে শুচ্ছি, ক'দিন বাদেই শুনছি আপনি নাকি মন্ত্রী হবেন তখন—

শশধর বোস আনন্দে ডগমগ করে, এ খবর আপনাকে কে বলল?

—সব খবর নিয়ে তবে এসেছি। বলেছি টাকাও নেব না। আপনি শুধু কথা দিন, যদি মন্ত্রী হন আমাকে দেখবেন।

মাতাল শশধর মেয়েটিকে কাছে টেনে নেয়, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, নিশ্চয় দেখব, যেমন আজ দেখছি তেমনি দেখব। তোমাকে আমি হিরোইন বানাব, তোমাকে গাড়ি কিনে দেব, বাড়ি কিনে দেব, তোমার আমি—

উচ্ছ্বাস শেষ হতে পেল না, দরজায় কে টোকা মারছে। প্রথমটা শশধর শুনতে পায়নি, কিন্তু মেয়েটি সজাগ ছিল, বলল, কে যেন দরজায় ধাক্কা মারছে।

শশধর বিরক্ত হয়, কোন শালা আবার মাঝরাতে জ্বালাতন করতে এল।

গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কে?

দরজার বাইরে থেকে চাপা গলায় উত্তর এল, আমি লম্বু।

—এখন দেখা হবে না, কাল সকালে এস।

—খুব জরুরী দরকার স্যার, শিগগীরি একবার বাইরে আসুন।

—কেন, কি হয়েছে?

—পুলিস, বাড়ি ঘেরাও করেছে।

পুলিস শব্দটা যেন ইলেকট্রিক ছুঁচোবাজীর মত শোঁ শব্দ করে ঘরের মধ্যে চক্কোর কেটে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি বিহ্বল হয়ে পড়ে, তাহলে কি হবে, শিগগীরি বাইরে যান। পুলিসকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না।

মেয়েটি ততক্ষণে জামা কাপড় পরতে শুরু করেছে।

শশধর বোস কোনরকমে টলতে টলতে দরজা খুলে বাইরে আসে, এসব কি ব্যাপার, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

লম্বু মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দেয়, আর বোঝাবুঝির কিছু নেই, এখন পুলিস এসে যদি ঐ মেয়েটির সঙ্গে আপনাকে হাতেনাতে ধরতে পারে, ব্যাস, ক্যারিয়ার ফিনিশ্ড্, জেল তো বটেই, কাগজের নোংরা মন্তব্য, তা ছাড়া লোকে থুথু দেবে যে?

—তাহলে কি করি লম্বু?

—এ ইচ্ছে করে কেউ আপনার সর্বনাশ করেছে। যারা আপনার কাছে মেয়ে পাঠিয়েছে তারা সঙ্গে সঙ্গে পুলিসেও খবর দিয়েছে, ওই ওরা এল বলে, নীচের ঘরে ঢুকে খানাতল্লাশ করছে, আমি পালাই। বলেই লম্বু হাওয়া।

বিভ্রান্ত শশধর বোস কি করবে বুঝতে পারে না, একে নেশার ঘোর তার উপর এই রহস্যময় উত্তেজনা, ভয়ে ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে। কিন্তু মেয়েটিও তখন কান্নাকাটি শুরু করেছে, দোহাই আপনার আমাকে রক্ষে করুন, আমি ফিল্ম লাইনের মেয়ে, আপনার চেয়েও বেশি লোক আমাকে চেনে, এখন থানা পুলিস করতে হলে লজ্জায় কোথাও মুখ দেখাতে পারব না।

—কি যে করি, কি যে করি, শশধর প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থায় লম্বুকে খুঁজতে আবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এবার লম্বুর বদলে যাকে দেখতে পেল সে স্বয়ং বাস্তুঘুঘু। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে শশধর ডুকরে কাঁদে, আমাকে রক্ষে করুন দাদা, মান ইজ্জত সব গেল।

বাস্তুঘুঘু কিন্তু অচঞ্চল, খাদের গলায় বলল, অত ঘাবড়াবেন না, বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, আমি লম্বুর কাছে সব শুনেছি। চলুন, ঘরের মধ্যে যাই।

ঘরে ঢুকে বাস্তুঘুঘু একটা স্যুটকেস টেবিলের উপর রাখল, এটা সে সঙ্গে করেই এনেছিল। শশধর বোস জিজ্ঞেস করল, ওতে কি আছে।

শাড়ি, ব্লাউজ, মেয়েদের জামা কাপড়, কাঁটা ফিতে চিরুনি, সিঁদুরকোটো—।

—কেন?

—পুলিস যদি এ ঘরে ঢোকে, বুঝিয়ে দেবেন মেয়েটি আপনার স্ত্রী, তাহলেই ঝামেলা চুকে যাবে।

মেয়েটি কিন্তু শিউরে ওঠে, এ কি বলছেন?

বাস্তুঘুঘুর শান্ত উত্তর, ঠিকই বলছি মা, সিঁদুরকৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে লাগিয়ে নাও, একটা টিপও পরতে পার, এ সব মেক-আপ নেওয়া তো তোমাদের অভ্যেস আছে। তবে আমি বাইরে থাকছি, চেষ্টা করব যাতে পুলিস এ ঘরে না ঢোকে।

বিগলিত শশধর বোস বাস্তুঘুঘুর হাত দুটি ধরে সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে, তা যদি পারেন আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। ভাগ্যিস আপনি এ সময়ে এসে পড়েছিলেন!

বাস্তুঘুঘুর সহজ উত্তর, এ হোটেলটা আমারই। বেনামে আছে, কেউ বিপদে ফেলার জন্যে পুলিস পাঠিয়েছে, তবে সামলে নিতে পারব, ঘুষের টাকা সঙ্গে রেখেছি, আর রেখেছি এই চিঠিটা, নীচে সই করে দিন—

—কিসের চিঠি?

—আপনার স্বীকৃতি, আমার দলে যোগ দিলেন বলে।

শশধর বোস অবাক হয়ে চিঠিটা দেখল, তাকাল মেয়েটির দিকে, লক্ষ্য করল বাস্তুঘুঘুর গম্ভীর মুখ, শুনল বাইরে পুলিসের বুটের আওয়াজ। আর কথা না বাড়িয়ে সই করে দিল চিঠির তলায়।

রাজনীতির হাঁড়িকাঠে বলি হলো শশধর বোস, নির্দলীয় এম. এল. এ.।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

কোলাহলমুখর কলকাতা স্তব্ধ হয় গভীর রাত্রে।

তখন আর গাড়ি ঘোড়া ছোটে না, জনতার কলরব শোনা যায় না, পশু-পাখি সকলেই কিছুক্ষণের জন্য অন্তত বিশ্রাম করে, রেডিও চুপ করে থাকে, বিশেষ কোন আওয়াজও শোনা যায় না।

কিন্তু ক'দিন থেকে অনাদিপ্রসাদ এই স্তব্ধ রাত্রে একটি নারীকণ্ঠের গান শুনতে পাচ্ছেন। প্রথম দু'-এক দিন নিজের মনের ভুল ভেবে উপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিদিন ওই একই সময়ে ওই একই গানের সুর তাঁকে বিস্মিত করল। উনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন, গানের সুরের অনুসরণ করে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠলেন উপরের ছাদে। ঝলমলে তারা ভরা বিরাট নীল আকাশ, বিশুদ্ধ হাওয়া, বোধহয় এই দু'-এক ঘণ্টা মাত্র কলকাতা শহরের

হাওয়া ধূলোমুক্ত হয়। হাওয়ার তরঙ্গে সেই পরিচিত গানের সুর কাঁপছে। অনাদিপ্রসাদ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন, দেখতে পেলেন পাশের বাড়ির ছাদে একটি ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন ও আর কেউ নয়, আত্মশ্লাঘায় উন্মত্ত সাধনবাবুর হতভাগিনী মেয়ে মীনা। অন্ধকারে চোখ মুখ দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে এলো চুল, নিজের মনে সারা ছাদে পায়চারী করছে আর গান করছে। কি গান তাও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না, শুধু একটা সুরের বিলাপ, হয়তো বা দম-ফাটা কান্না।

অনাদিপ্রসাদ না থাকতে পেরে ডাকলেন, মীনা, মীনা—

মীনার কাছ থেকে কোন সাড়া পেলেন না, বাইরের জগতের আর বোধহয় কোন দাম নেই তার কাছে। নিজের মনোজগতে সে বাসা বেঁধেছে, সেইখানেই নিজেকে নির্বাসন দিয়েছে।

অনাদিপ্রসাদের কাছে এ দৃশ্য অসহ্য, কতটুকু বয়েস থেকে তিনি মীনাকে দেখেছেন। ফুটফুটে মেয়ে ফ্রক পরে স্কুলে যেত, সামনের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করত, এক পা তুলে চৌকো চৌকো ঘর কেটে ঢিল ছুঁড়ে লাফাত, সময়ে অসময়ে সাধনবাবুর মেজাজ গরম দেখলে পালিয়ে আসত অনাদিপ্রসাদের বাড়িতে। রমলা বউদির পেছন পেছন ঘুরে বেড়াত। সেই মীনা বড় হলো, শাড়ি পরল। ঘন ঘন আসা যাওয়া কমল, সেও চলতে লাগল নিজের পথে। তারপর হঠাৎ একদিন সেই নাটকীয় পরিস্থিতিতে সমীরের সঙ্গে অনাদি-প্রসাদের প্রথম আলাপ, যখন তাকে তিনি সাধনবাবুর রোষদৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারপর এই ক' মাসের মধ্যে সবকিছু যেন গোলমাল হয়ে গেল, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে নিজেরা ঘর বেঁধে সুখী হতে পারল না। সে সময় অনাদিপ্রসাদ তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন, বুঝতে পারলেন সাধনবাবুকে খবর দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই, ভেবেছিলেন পিতার হৃদয় শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় কন্যাকে ক্ষমা করবে, এই চরম বিপদের মুহূর্তে তাকে ভালবেসে কোলে তুলে নেবে।

কিন্তু এ কি হলো। নির্বোধ সাধনবাবু গাড়ি নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন সমীরদের গড়িয়ার বাসায়। মীনা তখন বিছানায় শুয়ে, সমীর তার পাশে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় ক্ষ্যাপা কুকুরের মত পিতার প্রবেশ। কোনরকম বিবেচনা না করে লোকটা রাগে ফেটে পড়ল, এতদিনে আমি তোমাদের পেয়েছি। ভদ্রলোকের মেয়েকে ফুসলিয়ে বার করে এনে এই ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে খুব বেলেল্লাপানা শুরু করেছ, হারামজাদা শুয়োর।

মীনা তখনও বোধহয় স্বপ্নরাজ্যেই ছিল, সাধনবাবুর গলা শুনে উঠে বসল, খুশী হয়ে ডাকল, বাবা।

সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কার, আমাকে আর বাবা বলে ডেকো না। তুমি আমার মুখে চুনকালি মাখিয়েছ।

সমীর সাবধান করার চেষ্টা করে, ওকে বকবেন না, মীনা খুব অসুস্থ—

—অসুস্থ তো মরলেই পারত, বেঁচে থেকে ঢলাঢলি করার কি দরকার ছিল। তোমার দরদ দেখানো বার করছি। আগে মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে যাই তারপর তোমায়—

সমীর বিরক্ত হয়ে বলে, যা ইচ্ছে করবেন, শুধু মীনাকে কষ্ট দেবেন না।

—কষ্ট দেবেন না, কষ্ট দেবেন না, বলতে বলতে সাধনবাবু এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে এক চড় মারলেন সমীরের গালে, উল্লুক বাঁদর, কচি মেয়েটার দফারফা করে আবার লোক-দেখানো চোখের জল ফেলা হচ্ছে!

তারপরেই মেয়েকে হুকুম করেন, মীনা ওঠ, চল আমার সঙ্গে।

মীনা ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকায়, মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়, জিনিসপত্র—

—কোন জিনিস ছোঁবে না, গাড়িতে গিয়ে বোস।

—আর সমীর?

—তার ব্যবস্থা আমি করছি, তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, বেটাচ্ছেলেকে দিয়ে যদি জেলের ঘানি না টানাই তাহলে মিথ্যে আমার এতদিনের নাম প্রতিপত্তি।

মীনা তখনও কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, কিন্তু উনি যে আমার স্বামী—

সাধনবাবু প্রচণ্ড ধমক দেন, তুমি কুমারী মেয়ে, তোমার বিয়ে হয়নি, তা যদি তুমি মানতে না পারো, আমি জানব, তুমি বিধবা।

গড়িয়ার ছোট্ট বাসা নিষ্ঠুরভাবে ভেঙ্গে দিয়ে একটা পাখি খাঁচায় পুরে সাধনবাবু বিজয়গর্বে বাড়ি ফিরে এলেন। বাবার সঙ্গে মেয়েকে নামতে দেখে বাড়ির সবাই ছুটে এসেছিল, কিন্তু মীনার অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়াল। ক্রোধে উন্মত্ত সাধনবাবু বুঝতে না পারলেও অন্যদের বুঝতে বাকি রইল না, মীনা প্রকৃতিস্থ নয়। সে সোজা মার কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল, বলল, তুমি আমার বিয়েতে আশীর্বাদ করনি কিনা, তাই এই রকম হলো।

মায়ের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন, কি হলো মীনা?

মীনার অসংলগ্ন উত্তর, কিছু তো হয়নি, কিন্তু অনেক কিছু হয়েছে। জানো, আমার বিয়ে হয়েছে, আমার স্বামী আছে, গড়িয়ায় ঘর আছে, কিন্তু বাবা বলছে আমি বিধবা হয়ে গেছি, তবে কি সমীর মরে গেছে? কিন্তু আসবার সময় আমি তো তাকে দেখলাম, সে কি তবে সমীর নয়, তার আত্মা?

আর কোন কথা বলার প্রয়োজন হলো না। এই প্রথম সাধনবাবুও ভয়

পেলেন, স্ত্রীকে আদেশ করলেন, হাঁ করে কি দেখছ সব, মীনাকে ওপরের ঘরে নিয়ে যাও, আমি এখুনি ডাক্তার ডাকছি।

ডাক্তার এলো, কিন্তু খুব একটা ভরসা কিছু দিতে পারলো না। কতকগুলো ঘুমের ওষুধ, নানা রকম বিধি-নিষেধ, সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা, এই সবের নির্দেশ দিয়ে গেলেন। কিন্তু মীনা নিজের মনের মধ্যে ক্রমশ যেন তলিয়ে যেতে লাগল, কিছুতেই নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে পারল না। যত বার শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতে চায় ততবার মনে হয় পা দুটো অতি দুর্বল, তাকে ফেলে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে যায়।

মীনাকে ফিরিয়ে এনে বাড়ির জানালা দরজা খুলে রাখার হুকুম দিয়েছিলেন সাধনবাবু, যাতে সবাই দেখতে পায় তার মেয়ে বাড়িতেই রয়েছে। কিন্তু আবার সেগুলো বন্ধ করে রাখার হুকুম দিতে হলো। পাড়াপড়শীর কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে অপ্রকৃতিস্থ মীনাকে সরিয়ে রাখা ছাড়া উপায় রইল না। সকলের সজাগ দৃষ্টির পাহারায় মীনা সারা দিন তার ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে, শুধু রাত বাড়লে, যখন পাহারাদাররা সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, মীনা উঠে আসে ছাদে, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়, গভীর আবেগে গান করে, কি কথা বলতে চায় সে-ই শুধু জানে। হয়তো দেখে ওই নীল আকাশ, দেখে ওই তারা, হয়তো খোঁজে সমীরকে, সে বেঁচে আছে না মারা গেছে, এ ধারণাও হয়তো তার কাছে স্পষ্ট নেই।

অন্য ছাদে অনাদিপ্রসাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, এই বাচ্চা মেয়েটার ট্র্যাজেডীর জন্যে দায়ী কে? সমীরকে দোষ দেওয়ার কোন মানে হয় না, সে তো মীনাকে সত্যিই ভালবেসেছিল, ঘর বেঁধেছিল, বেঁচে থাকার জন্যে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না, হেরে গেল। কার কাছে? এই সমাজ-ব্যবস্থা, এই সংস্কারের কাছে। চরম স্বার্থপর হলে মানুষ কত নীচে নামতে পারে তারই জলজ্যান্ত উদাহরণ সাধনবাবু। তাঁর ব্যবহারে হিংস্র জন্তুদেরও হার মানিয়েছেন, নিজের মেয়ের চরম সর্বনাশ করেও মানুষটা খাচ্ছে, পরছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোজগার করছে, অন্যদের বকছে, উপদেশ দিচ্ছে। অদ্ভুত দুনিয়া, লোকে আবার তা শুনছেও, কেউ তার বিচার করছে না।

ইতিমধ্যে সমীরও একদিন এসেছিল অনাদিপ্রসাদের কাছে। চোখের তলায় কালি পড়েছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হঠাৎ দেখলে আগের সে সুশ্রী, সুন্দর সমীর বলে চেনা যায় না। সন্ধ্যের পর অন্ধকারের মধ্যে এসেছিল সে, তাকে দেখে অনাদিপ্রসাদ চমকে উঠেছিলেন, কি ব্যাপার সমীর?

সমীরের বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর, একটু খবর নিতে এসেছিলাম।

—ও বাড়িতে যাওনি?

—গিয়েছিলাম, দেখতে পাইনি। চাকর দিয়ে বার করে দিয়েছে, তাছাড়া

এ পাড়ায় ঢোকারও অনেক বিপদ, সাধনবাবু কতকগুলো ছোঁড়াকে লেলিয়ে রেখেছেন, আমাকে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে।

অনাদিপ্রসাদ নিজের মনেই মাথা নাড়েন, বলেন, আমিও মীনার খবর বেশি কিছু দিতে পারব না, তবে শুনেছি খুব ভালো নেই।

সমীর নিজের চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালায়, অসহায়ভাবে বলে, কি যে করি।

—কিছু করবার নেই।

—তাই মনে হচ্ছে, শুধু আমার বোকামীর জন্যে মীনার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। কাউকেই আমি বুঝতে পারিনি, মীনাকেও না, তার বাবাকেও না, বোধহয় নিজেকেও না। ছি, ছি, ভাবতেই বড় নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে, এ আমি কি করলাম?

অনাদিপ্রসাদ ভরসা দেবার চেষ্টা করেন, ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, মনের জোর কর সমীর।

—ওসব কথা আমাকে বলবেন না, অসম্ভব মনের জোর বলে আজও আমি টিঁকে আছি, অন্য কেউ হলে আত্মহত্যা করতো। মেয়েটাকে একবার দেখতে পর্যন্ত দেয় না। একটু থেমে কি যেন ভেবে বলে, হয়তো এতে ওর ভালই হবে, আমিই বোধহয় ওর জীবনের দুষ্ট গ্রহ।

অনাদিপ্রসাদ সমীরের কাঁধে হাত রাখেন, এখন কোথায় আছ, গড়িয়াতে?

—মাসের শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে।

—মীনার যদি কোন খবর পাই তোমাকে জানাব।

সমীর ইতস্তত করে বলে, যদি আপনাদের বাড়ি থেকে ওকে একবার দেখতে পেতাম, জানালা দিয়ে, কিংবা ছাদ থেকে, সেই জন্যেই আজ এখানে এসেছি।

—বেশ চল। অনাদিপ্রসাদ সমীরকে নিয়ে ঘুরলেন, কিন্তু কোথাও কোন ফাঁক দিয়ে মীনাকে দেখতে পেলেন না, সাধনবাবুর বাড়ির জানালা দরজা সব বন্ধ, এমন কি ছাদের দরজাও খোলা নেই।

—না, ভাই, উপায় নেই।

সমীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হতাশ হয়ে বলে, জানি না আর কখনও ওর সঙ্গে দেখা হবে কিনা। মেয়েটাকে না ওরা মেরে ফেলে।

অনাদিপ্রসাদ ভাবেন, সেদিন চেষ্টা করেও সমীর মীনার দেখা পায়নি, কিন্তু আজকের এই অবস্থায় দেখলে সমীর কি নিজেকে সামলে রাখতে পারত! ফুলের মত নরম একটা মেয়ে, বাস্তবের সংস্পর্শ পাবার আগেই

অফিলিয়ার মত ট্র্যাজেডীর শিকার হলো। মীনা হয়তো মনের স্বপ্নরাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে সুখী না দুঃখী বাইরে থেকে বলা শক্ত। কিন্তু যে বাইরে থেকে তাকে দেখবে, সে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করবে, ভাববে তারই জন্যে মীনার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে; সে কি করে আত্মগ্লানির নরক থেমে মুক্তি পাবে।

সমীর যে এ দৃশ্য দেখেনি তার পক্ষে ভালই হয়েছে।

জীবন-সন্ধানী লেখক অনাদিপ্রসাদ, নিজের অভিজ্ঞতার উপর যার ক্রমশ বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল, ক'দিন বাদে পার্ক স্ট্রীটের রাস্তায় সমীরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় নিজেকেই আত্মজিজ্ঞাসার সামনে পড়তে হলো, কে বলবে এ সেই সমীর। মদ খেয়ে টলতে টলতে বার থেকে বেরিয়ে এসেছে, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, সেটাকেও সামলাতে পারছে না।

অনাদিপ্রসাদের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে, নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে সমীর। বলে, কাকাবাবু আপনি এ পাড়ায়? কোন বারে যাচ্ছেন বুঝি?

অনাদিপ্রসাদের ছোট্ট উত্তর, না। এ রাস্তায় এসেছিলাম চৌরঙ্গী থেকে এক জায়গায় যাবার শর্টকাট হবে বলে, তা তুমি কেমন আছ?

—দেখতেই তো পাচ্ছেন। ভোলবার চেষ্টা করছি।

—কাকে?

—সবাইকে। মীনা, তার বাবা, তার গুষ্টি—

—চাকরি-বাকরি কিছু পেয়েছো?

—কে দেবে?

—তাহলে? খরচা চালাচ্ছ কি করে? এ পাড়ায় মদ খেতে পয়সা অনেক লাগে শুনেছি।

সমীর হাসল, পয়সা আমি দিইনি, আমার এক বড়লোক বন্ধু দিয়েছে, আমার কাজ তাকে 'কম্পানী' দেওয়া, ব্যস্, তাহলেই যত ইচ্ছে মদ খাওয়ার ঢালাও হুকুম। এতে অনেক ভাল আছি। একেবারে শরৎ চাটুজ্যের 'দেবদাস'।

অনাদিপ্রসাদ এতক্ষণ অবাক হয়ে সমীরকে দেখছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কই, মীনার কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করলে না?

—কি হবে জিজ্ঞেস করে, সে তো আমাকে চায় না, আমাকে ভালবাসে না, তার সব কিছু জুড়ে আছে ওই বাপের বাড়ি। তাই ঠিক করেছি এইভাবে মোসাহেবী করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। আমার বন্ধুটি একের নম্বর বুদ্ধু, কিন্তু খুব দিলদরিয়া মেজাজ। কোন রকম নোংরামি নেই, ক'দিন বেশ ভালই লাগছে, এই জীবনই তো ভাল, কি বলুন? এখন মদ, এর পরে বোধহয় মেয়েমানুষ,—হাঃ হাঃ। হাসবার চেষ্টা করলেও সমীরের গলা জড়িয়ে যায়।

অনাদিপ্রসাদ তাড়াতাড়ি সে জায়গা থেকে সরে যান, বুঝতে পারেন সমীরের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই। ছেলেটা মাতাল—ওদিকে মীনা পাগল। ভালই হয়েছে, ওরা কেউ কাউকে দেখতে পায় না, নয়তো পাগল আরও পাগল হতো, আর ওই মাতাল হতো আরও মাতাল।

একেই বলে ভাগ্য-বিধিলিপি।

অনাদিপ্রসাদের ইচ্ছে ছিল পার্ক স্ট্রীট অতিক্রম করে ময়দানের মধ্যে ঢুকে পড়ার। নির্জন অন্ধকার ময়দানে নরম ঘাসের ওপর দিয়ে একলা হাঁটতে তবু ভাল লাগে, শহরের এই গ্লানি এই কৃত্রিমতার হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্যেও অন্তত রেহাই পাওয়া যায়। তার ওপর এই বিরক্তিকর অথচ নিষ্ঠুর সত্য ঘটনাগুলোকেও তো মন থেকে মুছে ফেলা চাই, নয়তো মনের শ্লেট যে হিজিবিজিতে ভরে যাবে, সেখানে সুস্থ সবল চিন্তার জায়গা থাকবে কোথায়।

কিন্তু অনাদিপ্রসাদ পার্ক স্ট্রীট পেরতে পারলেন না, তার আগেই মনুয়ার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল। মেয়েটা আজ দারুন সেজেছে, বুক পিঠ হাত কাটা একটা ঝিকমিকে ব্লাউজ, ততোধিক আধুনিক চক্রা-বক্রা দামী শাড়ি। মাথার চুলটাও ফাঁপিয়ে ফোলান, মুখে অপর্যাপ্ত রং। এ মোহিনী বেশে মনুয়াকে অনাদিপ্রসাদ আগে কখনও দেখেননি। তাই বোধহয় কিছুটা বিস্মিত হয়ে থেমে গিয়েছিলেন।

মনুয়া হেসে জিজ্ঞেস করল, কি দেখছেন?

অনাদিপ্রসাদের সহজ উত্তর, তোমাকে।

—আপনাদের নিয়ে পারা যায় না, এত বয়েস বাড়ছে কিন্তু সুন্দরী মেয়েদের দিকে না তাকিয়ে পারেন না।

এ কথা শোনার জন্যে অনাদিপ্রসাদ প্রস্তুত ছিলেন না, বললেন, তা নয়, তোমাকে তো ঠিক এ সাজে আগে কখনও দেখিনি।

—এবার থেকে দেখবেন, বড় হচ্ছি তো, তা কোথায় গিয়েছিলেন? মে ফ্লাওয়ারে আমাকে খুঁজতে?

—কেন?

—বা, আপনি আমার লোকাল গার্জেন, মেয়েটা ঠিক আছে কিনা তার খোঁজ খবর নেবেন না?

অনাদিপ্রসাদ হাসেন, ও, সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, তবে তোমার গার্জেন হওয়া আমার সাজে না, বরং তুমি আমার গার্জেন হতে পার।

মনুয়া হাসতে হাসতে বলল, চলুন, আমার ফ্ল্যাটটা আপনাকে দেখিয়ে দি।

—তুমি আজকাল ফ্ল্যাটে থাকো?

—হ্যাঁ, খুব কাছেই। জায়গাটা দেখে রাখুন, ইচ্ছে করলে আসতে পারবেন।

পার্ক স্ট্রীটের খুব কাছেই একটা বাড়ির দোতলায় মনুয়া অনাদিপ্রসাদকে নিয়ে গেল। ব্যাগের থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল, খুব বড় না হলেও দু'খানা খুব সাজানো ঘর, একটা শোবার আর একটা বসবার। খুব রুচিসম্মত আসবাবপত্র। অনাদিপ্রসাদ প্রশংসা না করে পারলেন না, চমৎকার জায়গা, তুমি কত দিন এখানে এসেছ?

—দিন পনের।

—এমন সুন্দর জায়গা পেলে কি করে?

মনুয়ার রহস্যময় হাসি, যোগাড় করতে হয়।

অনাদিপ্রসাদ কি যেন ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি একাই থাকো?

—আর কে থাকবে?

—তোমার বাবা মা?

—তাঁদের তো বাড়ি আছেই।

—তা নয়, মানে এতটুকু বয়েসে এইরকম জায়গায় একলা থাকা—

—বয় ফ্রেণ্ডদের জ্বালায় একলা আর কতক্ষণ থাকতে পারি বলুন, বিরক্ত করে মারে।

—তোমার ভয় করে না?

মনুয়ার চোখে কৌতুক, কিসের ভয়, ভূতের? ছোটবেলায় হয়তো ভয় পেতাম, ঠিক মনে নেই। তবে আজকাল ভূতের সংখ্যা বোধহয় কমেছে, বড় একটা জ্বালাতন করে না। আর যদি বলেন পুরুষের ভয়, এখন দেখছি তারাই আমাদের ভয় করে। যেমন আপনি, কিরকম আড়ষ্ট হয়ে বসেছেন, কি, আমাকে ভয় করছে?

অনাদিপ্রসাদ শব্দ করে হাসলেন, নাঃ তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পেরে উঠবে না।

মনুয়া কিন্তু হাসিতে যোগ দিল না, বলল, শুধু কথা নয়, আমার মত কেউ ভাবেও না। মানে আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের কথা বলছি। আমি বুঝেছি এ জীবনে দাঁড়াতে হবে, টাকা রোজগার করতে হবে, নয়তো চিরকাল অন্য লোকের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে। আমার এক বন্ধু ছিল ববি, কিছুতেই বুঝল না, ফলে এখন কাটা ঘুড়ির মত কোথা থেকে কোথায় ভেসে বেড়াচ্ছে। মার্জারি, আমাদেরই এক বান্ধবী, ভালবাসল একটি বিবাহিত পুরুষকে, তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাল, নিজে বিয়ে করল। কিন্তু কোথায় হিসেবের গোলমাল হয়ে গেল। ওরা সুখী হয়নি।

অনাদিপ্রসাদ বললেন, তোমাকে দেখলে কিন্তু মনে হয় না তুমি এত কথা ভাবো।

—ছোটবেলা থেকেই ভাবছি, আমার বাবা-মার অসুখী জীবনটা দেখে

দেখে কেমন যেন 'পেসিমিস্ট' হয়ে পড়েছিলাম, মনে হতো কোথাও সুখ নেই, কিন্তু এখন মনে হয়, সুখ দুঃখ সব নিজের ওপরে।

অনাদিপ্রসাদের গম্ভীর প্রশ্ন, তুমি কি সুখী হয়েছ মনুয়া?

ঠিক এই সময় টেলিফোনটা বাজল ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

মনুয়া হাসতে হাসতে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলে, দেখলেন তো, উত্তরটা দিতে দিল না।

—হ্যালো, মনুয়া কথা বলছি, না না, কিছু করছি না, বাড়িতেই আছি। এই তো ফিরলাম। আমি তো জানি তুমি আসবে! না একলা নই, আমার সামনে একজন পুরুষ মানুষ বসে আছে, খুব সুন্দর দেখতে, তোমার চেয়ে ছেলেমানুষ, কি, হিংসে হচ্ছে? শিগগিরি ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়। স্যার শেঠিয়ার হাতে আবার তলোয়ার নেচে উঠুক। আমি তোমাদের দুজনকে লড়বার জন্যে উৎসাহ দেব। বাই বাই।

এ ধরনের কথাবার্তায় অনাদিপ্রসাদ অস্বস্তি বোধ করছিলেন, উঠে পড়ে বললেন, আমি তা হলে এখন চলি।

মনুয়া তখনও হাসছে, সে কি, ভয় পেয়ে গেলেন? আপনাকেও একখানা তলোয়ার দেব। মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু, ভুলে যাবেন না আপনি আমার গার্জেন।

অনাদিপ্রসাদ নীচে নেমে এলেন, দুজনের মুখ চোখের ওপর ভাসতে লাগল —একজন মীনা, আর একজন মনুয়া, দুজনেই প্রায় একবয়সী অথচ দুজনের জাত একেবারে আলাদা। জীবনযুদ্ধে একজন তলিয়ে গেল, আর একজন নিজেকে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা করছে।

॥ ছত্রিশ ॥

মনুয়া আর মীনার প্রায় সমবয়সী অন্য মেয়েটি কবিতা। এরও সমাজ আলাদা, অবস্থা আলাদা, জাত আলাদা।

অনেকদিন বাদে অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে আবার কবিতার দেখা হলো অশোক জানার প্রেসে। মেয়েটা এক কোণে একটা বিজ্ঞাপনের কপি কম্পোজ করছিল, অনাদিপ্রসাদকে দেখে শুকনো হাসল, আসুন, বসুন, বাবু বাইরে গেছেন।

অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, অনেক দিন তোমায় দেখিনি কবিতা।

—ক'দিন ছুটি নিয়েছিলাম।

—লিখছ?

—না।

—কেন?

—ও আমাদের হবে না। যাদের পেটের ভাবনা নেই তারাই লিখতে পারে। আগে তবু দু' একটা গান-টান বাঁধতাম, আজকাল তাও পারি না, এখন শুধু অন্যের লেখা কম্পোজ করি।

কথা বলার কিছু ছিল না, তবু অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, ছুটি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?

কবিতা হাসল, নবদ্বীপে। ভেবেছিলাম যদি বোষ্টুমী হওয়া যায়, তাও দেখলাম বেশ কঠিন, তাই ফিরে এসেছি। আজকাল কোথাও গিয়ে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। আপনি ওখানে গেলে কিন্তু অনেক কিছু লিখতে পারতেন।

নিজের মনেই কবিতা বক বক করে যায়, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা কেন এরকম বলুন তো? যারা কিছু পেলো না, সারা জীবনই তাদের ফাঁকি পড়তে হবে। আমাদের কিছু আশা করাও অন্যায়, কোন রকম ইচ্ছে থাকা পাপ।

কবিতার কথাবার্তা শুনে অনাদিপ্রসাদ বুঝতে পারলেন মেয়েটা আগের চেয়ে অনেক শক্ত হয়েছে, জীবনের কড়া ইস্কুল তাকে শিখিয়েছে সেণ্টিমেণ্ট ছেঁটে ফেলে দিতে। বুঝিয়েছে স্বপ্ন দেখার কোন দাম নেই। আগে আগে অনাদিপ্রসাদকে দেখলে কবিতা এসে ভক্তিভরে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতো, কথা বলতো অনেক সমীহ করে, কিন্তু আজ সে আলাপ করছে সমান তালে।

—এখানকার কাজে তুমি আনন্দ পাও না?

—হয়তো পেতাম যদি পেট ভরতি থাকত, অথচ উপায় নেই। কোন না কোন কাজ তো করতেই হবে। এমন একটা যাঁতাকলের মধ্যে আমরা পড়েছি যার থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই।

অনাদিপ্রসাদ মনে মনে কবিতার সঙ্গে তুলনা করতে লাগলেন মীনার, মেয়েটার সমস্যা একেবারে অন্যরকম। তেল, নুন, লকড়ির চিন্তা তাকে করতে হয়নি, তার ওপর পেল একটা পুরুষ মানুষের ভালবাসা, তবু নিজেকে সামলাতে পারল না, জীবনযুদ্ধে কোথায় তলিয়ে গেল। ওদিকে মনুয়া, মুখে রুপোর চামচে নিয়ে যে জন্মেছে, সমাজের বিরুদ্ধে তারও কি প্রচণ্ড বিক্ষোভ। বাপ-মাকে ছেড়ে অন্য একজনের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠে পড়েছে, কোনরকম স্তুতি-নিন্দাকে সে ভয় করে না। নিজের স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে সে বেঁচে থাকতে চায়, জীবনটাকে উপভোগ করতে চায়।

কবিতা বলল, আমার বন্ধু মিতার কথা আপনার মনে আছে? আমরা

একসঙ্গে একই ট্রেনে রানাঘাট থেকে আসতাম, মেয়েটা শেষ পর্যন্ত হলধরবাবুর রক্ষিতা হয়েছিল, সে গল্প আপনাকে বলেছি। নবদ্বীপ থেকে ফিরে মেয়েটার খবর নিতে গিয়েছিলাম। হলধরবাবুর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, কিন্তু রাজাবাজারের ঘরটা সে ছাড়েনি, দখল করে বসে আছে। বুঝলাম অনেক বাবুই আসা যাওয়া করে। ভালই রোজগার, দিব্যি আছে।

—তার মানে?

—মিতা পুরোপুরি বেশ্যা হয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই, যে হতে পারে হোক না, তার রুচিতে না বাধলে আমার আপত্তি করার কি আছে। কিন্তু মেয়েটা কি সুখী হয়েছে? ঠিক বিশ্বাস হয় না।

অনাদিপ্রসাদ না বলে পারলেন না, আমি কিন্তু তোমার বয়সী আরও দুটি মেয়েকে জানি, তারাও সুখী নয়।

কবিতা শব্দ করে হাসল, এই বোধহয় আমাদের সান্ত্বনা, কেউই আমরা সুখী নই। যাক গে, থাক, কি হবে ওসব ভেবে। পকেটে টাকা থাকে তো দিন, কষা মাংস আর রুটি কিনে আনি, খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

অনাদিপ্রসাদ পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে দিলেন।

—এ তো অনেক টাকা, অত খাবার কে খাবে! অবশ্য—

কবিতাকে থেমে যেতে দেখে অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেন, কি হলো?

—যদি আপনার আপত্তি না থাকে এই টাকায় নিরঞ্জনকেও খাইয়ে দিই। মানুষটা প্রায়ই আমাকে খাওয়ায়, পয়সার অভাবে আমি তো খাওয়াতে পারি না।

অনাদিপ্রসাদ এতক্ষণে নিরঞ্জনকে লক্ষ্য কবলেন, লোকটা মেশিন চালাচ্ছে, কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে চুরি করে দেখছে কবিতাকে, চোখে চিরকেলে পুরুষমানুষের দৃষ্টি। এইটুকুই হয়তো এদের দেওয়া নেওয়া, কাজের অবসরে পাশাপাশি বসা, গল্প করা, সমস্যাভরা জীবনে কিছুটা সহানুভূতি, এর পরিণতি কিছু আছে কিনা বলা শক্ত। দিনের পর দিন কবিতা অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে কম্পোজ করে যাবে, আর নিরঞ্জন মেশিন চালিয়ে সাদা কাগজের ওপর অক্ষর ফোটাবে। এই যে দু'জনের প্রতি দু'জনের আকর্ষণ তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এই প্রেসে এদের আসতে হবে, পাশাপাশি বসে কাজ করতে হবে, কিন্তু তারপর!

একটা বিরাট হাতুড়ি অনাদিপ্রসাদের মাথার উপর যেন আঘাত করল, একটা নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসা, এরা মেশিন হয়ে যাবে না তো?

অনাদিপ্রসাদ চমক ভেঙ্গে উঠলেন, বললেন, না, না, তোমরা খাবার আনিয়ে আনন্দ করে খাও, অশোককে ব'লো আমি এসেছিলাম।

—আপনি খেয়ে যাবেন না?

—আজ নয়, বাড়িতে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।

অনাদিপ্রসাদ আর কথা না বাড়িয়ে প্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন, চোখের সামনে ভাসছে তিনটে মুখ—তিনটে মেয়ে—তিনটে জীবন।

অনাদিপ্রসাদ যখন বাড়িতে ফিরলেন তখন ওপরের ড্রইং রুমে সরব আলোচনা চলেছে। বক্তা প্রকাশক সুনীল রা.়, শ্রোতা রমলা বউদি আর তার দুই ছেলে। অনাদিপ্রসাদ ইচ্ছে করে সে ঘরে ঢুকলেন না, বারান্দা পেরিয়ে চলে গেলেন অন্ধকার শোবার ঘরে, কিন্তু সেখান থেকেও ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সুনীল রায় যেন তৃতীয় শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উৎসাহী ক্যানভাসার। গলায় সেই একঘেয়ে সুর, খেয়ে দেখুন, চেখে দেখুন, এমন আজব গুলি আর পাবেন না। এ গুলি যে দেখে তার চোখের ব্যথা আরাম পায়, এ গুলি যে খায় সে লোহা চিবিয়ে হজম করতে পারে, পেট এ'টে গেলে এ গুলি দাস্ত পরিষ্কার করিয়ে দেয়। বেশী পায়খানা হলে এ অব্যর্থ গুলি থামিয়ে দেবে। কলেরা বসন্ত মহামারী, এমন কি ক্যানসারেও এ গুলি আশ্চর্য ফল দেয়, খেতে না পারলে প্রলেপ করে গায়ে লাগিয়ে দিন, তাতেও আপত্তি থাকলে মাদুলির মধ্যে ভরে দেহে ধারণ করুন, কোন গ্রহ-উপগ্রহ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না, চোর বাড়িতে ঢুকতে ভয় পাবে, পাড়ার ছেলেরা চাঁদা চাইতে আসবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি, আরও কত গুণ, অথচ এক শিশির দাম মাত্র দেড় টাকা।

ট্রেনে আর কিছু করার না থাকলে অনেকেই এদের বকবকানি শোনে, কিছুটা কৌতুকও বোধ করে, কিন্তু রমলা, বড় খোকা, ছোট খোকা, এদেরও কি আর কোন কাজ নেই? কি করে ধৈর্য ধরে সুনীল রায়ের আত্মপ্রচার শুনছে। কত লেখককে সে দাঁড় করিয়েছে, মুহুর্মুহু যে তাদের বই-এর সংস্করণ শেষ হয়ে যাচ্ছে তারও কৃতিত্ব নাকি সুনীল রায়ের। বই-এর কভার, বিজ্ঞাপনের চমক, তাই দিয়ে বাজারে সে ভেল্কি খেলিয়ে দিয়েছে। যখন যাকে খুশি রাজহাঁস বানিয়ে সে নাকি সোনার ডিম পাড়াতে পারে।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই, অনাদিপ্রসাদও সোনার ডিম পাড়ুন, নতুন উপন্যাস লিখুন, আর তা না হলে অন্য লেখক সুনীল রায়কে তৈরি করতে হবে, ব্যবসা তো এভাবে ফেলে রাখলে চলবে না। শেষ পর্যন্ত তার অনুরোধ, বউদি, আপনারা ভাল করে বোঝান, জোর করে ওঁকে দিয়ে লেখান। নয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।

রমলা বউদির উত্তর, আমি তো বলি, শোনেন কই?

ছেলেদের গর্জন, না, না, আর এভাবে ছেড়ে দিলে চলবে না। কাকাবাবু ঠিক বলেছেন, বাবাকে দিয়ে লেখাতেই হবে।

সুনীল রায় খুশী হন, এই তো চাই, তোমরা একটু চেষ্টা করলে সব ঠিক হবে। একটা উপন্যাস লিখতে অনাদিপ্রসাদের ক'দিন লাগবে, এক সপ্তাহ, দশদিন, বড় জোর এক মাস, অনেকদিন লিখছেন না তাই হাতটা সড়গড় করতে একটু সময় লাগবে।

দুই ছেলেই প্রতিশ্রুতি দেয়, ঠিক আছে, আমরা এবার উঠে পড়ে লাগছি।

সুনীল রায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে, তা হলে আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি। এই চেকটা রেখে গেলাম, আগের বই-এর সংস্করণের দরুন অনাদিপ্রসাদের পাওনা হয়েছে।

এর পর অনাদিপ্রসাদ অনেকক্ষণ কিছু শুনতে পেলেন না। বোধহয় সুনীল রায় চলে গেল, ছেলেরাও ভদ্রতার খাতিরে ওর সঙ্গে নীচে নামল, রমলা নিশ্চয় চেকটা যত্ন করে কোথাও রাখছে। অনাদিপ্রসাদ মন দিলেন মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামের দিকে। অক্সিজেন বুদবুদ কাটছে, যে কাঁচের বাটিটায় কেঁচো দেওয়া হয়েছিল, শূন্যগর্ভ হওয়া সত্ত্বেও মাছগুলো তাকে ঠোকরাচ্ছে।

কিন্তু বেশীক্ষণ অনাদিপ্রসাদ একলা থাকার সুযোগ পেলেন না। রমলা বউদি ও দুই ছেলে তাঁকে আবিষ্কার করে ফেলল। গলায় তাদের বিস্ময়, আরে, তুমি কখন এলে?

—এলাম কিছুক্ষণ আগে।

—সুনীলকাকা এসেছিল।

অনাদিপ্রসাদ শুকনো হাসেন, সেই ভয়ে তো তোমাদের ড্রইং রুমে ঢুকিনি।

—সুনীলকাকা বলছিল—

—আমাকে জেলে ভরে জোর-জবরদস্তি করে লেখাতে, এই তো?

—কেন, তুমি এমনিতে লিখবে না?

—কি লিখব?

—যা তোমার ইচ্ছে।

—যদি লিখি ঐ সুনীল রায়ের মত ব্যবসাদারের জন্যে তার রাজহাঁসরা শুধু পচা ডিম পাড়ছে যার ফলে পাঠকরা বদহজমে ভুগছে আর বাংলা সাহিত্য যাচ্ছে রসাতলে; যদি লিখি যারা একদিন সত্যিকারের লেখক ছিল তারা নতুন করে লিখতে গিয়ে নিজেদের পুরোনো লেখা থেকে চুরি করছে; যদি লিখি এতদিন ধরে যেসব কথা শুনে আসছি, প্রেম স্নেহ মহত্ত্ব একনিষ্ঠতা গুরুভক্তি অধ্যবসায় এসব ফাঁকা বুলি, অন্যকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা; যদি

লিখি যত আমরা সভ্যতার বড়াই করছি ততই মুখোশ এ‍ঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমরা নিজের চেহারা দেখতে ভয় পাই, কারণ তা হলেই মুখোশের তলা থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বীভৎস জন্তুগুলো বেরিয়ে পড়বে; যদি লিখি—

রমলা বউদি হাঁফিয়ে ওঠে, বলে, তাই না-হয় লেখ, তবু তো—

অনাদিপ্রসাদ হা হা করে হাসেন, তবু তো হাতটা সড়গড় হবে, তাই না?

ছেলেরা ধুয়ো তোলে, শুধু তাই কেন, বই ছেপে বার হবে।

—তাহলেই টাকা রোজগার হবে, চেক আসবে।

সকলের আবদার, তাহলেও তুমি লেখ।

—লেখবার কিছু না থাকলেও লিখতে হবে?

—হ্যাঁ তবু।

অনাদিপ্রসাদ অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে কেঁচোশূন্য কাঁচের পাত্রটা দেখিয়ে বলেন, আমার অবস্থা হয়েছে ঠিক ঐ রকম, দেবার কিছু নেই, তবু মাছেরা ঠোকরাচ্ছে, দিতে হবে, লিখতে হবে, কারণ প্রয়োজনটা তাদের।

ছেলেরা এবার বিরক্ত হয়, আমরা বলছি তোমার ভালোর জন্যেই।

অনাদিপ্রসাদ আবার হাসলেন, কেউ কারুর ভালো করতে পারে না। দেখ তোমাদের তো আমি বিরক্ত করি না, নিজেদের মতই তোমরা আছ, আমাকে সেইভাবে নিজের মত থাকতে দিচ্ছ না কেন? যদি লেখবার জন্যে ভেতর থেকে কোন তাগিদ পাই তাহলে হয়তো আবার লিখব, নয়তো আর জোর করে কলম চালাব না। এখন শুধু দেখছি আর ভাবছি, বেশ ভাল লাগছে। কিন্তু একদিন যদি তাও একঘেঁয়ে মনে হয় তখন অন্য কিছু করব, বাগানে ফুল ফোটাব, নিজের হাতে রান্না করব, কলেজের ছেলে পড়াব। আমার জন্যে তোমরা ভেবো না। যে যার নিজের চরকায় তেল দাও।

এ কথা শুনে ছেলেদের স্থির বিশ্বাস হলো, বাবাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।

রমলা বউদির খালি মনে হতে লাগল, সদ্য পাওয়া চেকটার কথা। পুরোনো বই ভাঙিয়ে আর কতদিন এই ধরনের বড় অঙ্কের চেক পাওয়া যাবে।

অনাদিপ্রসাদ তখন জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে আকাশের গায়ে জমাট মেঘের ল্যান্ডস্কেপ দেখছেন, ফিকে নীল, নীল, ঘন নীল রঙের কি বিচিত্র সমাবেশ! কোন নিপুণ শিল্পীর অজ্ঞাত অভিজ্ঞতার নিখুঁত প্রকাশ।

অনাদিপ্রসাদ হাত জোড় করে প্রণাম করলেন, কার উদ্দেশে তা তিনিই জানেন।

পরের দিন শহর পরিক্রমায় বার হয়ে অনাদিপ্রসাদ পরিচিত গণ্ডির মধ্যে থামলেন না। এগিয়ে চললেন ক্রমশ উত্তরে—আরও উত্তরে—দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে হাজির হলেন সাধুজীর আশ্রমে। আশ্রমের চেয়ে একে কুটির বলাই উচিত, গঙ্গার পাড়ে অল্প কিছুটা জমির ওপর ছোট একখানি পাকা ঘর, কোন ভক্ত নিশ্চয় বাঁধিয়ে দিয়েছে। পাশে একটা বিরাট বটগাছ অনেকখানি ছায়া করে আছে। কয়েকটা গেরুয়া কাপড় শুকোচ্ছে, বাঁশের বেড়া, আগল খুলে ভেতরে ঢুকতে হয়। অনাদিপ্রসাদ যখন পেঁাছলেন ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন সাধুজী নিবিষ্ট মনে বই পড়ছেন। কোন দিকে তাঁর খেয়াল নেই। বেশ অনেকক্ষণ পরে বই থেকে চোখ তুলতে অনাদিপ্রসাদকে দেখতে পেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কে?

অনাদিপ্রসাদ উত্তর দিলেন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম।

—যদিও এ সময় আমি কারুর সঙ্গে দেখা করি না তবু যখন এসে পড়েছ, ভেতরে এস। দরজা খোলা আছে।

বাইরে জুতো খুলে অনাদিপ্রসাদ ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, হাত তুলে নমস্কার করলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হলো। সাধুজী বসেছিলেন কম্বলের ওপর, অনাদিপ্রসাদ তাঁর সামনে মেঝের ওপরে বসে পড়লেন। ঘরটি শীতল, ভারী হাওয়া, ধূপের গন্ধে ভরপুর।

সাধুজী হেসে বললেন, আমি জানতাম তুমি আসবে।

অনাদিপ্রসাদের বিস্ময়, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

—পারব না! তোমার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়েছিল, জোর করে ডুব দেওয়ালাম, দেশসুদ্ধ লোকের কথা ভেবে ভেবে তোমার কপাল কুঁচকে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম এর আগেই তুমি আসবে।

অনাদিপ্রসাদ বললেন, আমি কিন্তু এখানে আসব বলে বাড়ি থেকে বার হইনি, কিন্তু কে যেন এখানে টেনে নিয়ে এল।

সাধুজী শব্দ করে হাসলেন, খবরদার এসব কথা স্বীকার করে ফেলো না, তাহলে বুদ্ধিজীবীরা তোমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে, ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাবে।

—এখন আমার সেই অবস্থাই হয়েছে, বাড়ির লোকেরাও ভাবছে মাথার গোলমালে ভুগছি।

—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই বাবা, যে মানুষটাই ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে চলে না তাকেই অন্যরা ভাবে সৃষ্টিছাড়া। বিজ্ঞানী, ডাক্তার, লেখক, এমন কি সাধু-সন্ন্যাসী, এদেরও জীবনের একটা ছক আছে, তারই মধ্যে যারা চলাফেরা করে, জীবনে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে বিজ্ঞানী নাওয়া খাওয়া ভুলে সৃষ্টির রহস্য খোঁজার চেষ্টা করে, যে ডাক্তার প্রতিনিয়ত

রোগের সঙ্গে লড়াই করে, শুধু দুটো প্রেসক্রিপ্‌শন লিখে দিয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকে না, যে লেখক বা শিল্পী নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না বলে অক্ষমতার কান্নায় ভেঙে পড়ে, এদের বাইরের লোক বুঝবে কি করে? তোমাকে প্রথমদিন দেখেই তাই বলেছিলাম, যে জীবন তুমি দেখতে চাইছ তা নাই-বা দেখলে। এর তো কোন শেষ নেই। বলেছিলাম, বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করার চেষ্টা ক'রো, নয়তো নিজেকে হারিয়ে ফেলবে, বিভ্রান্ত হবে, তখন আর সুতোর খেই খুঁজে পাবে না, মিছিমিছি জট পাকিয়ে যাবে।

অনাদিপ্রসাদ অকপটে স্বীকার করলেন, আমারও ঠিক তাই হয়েছে সাধুজী। যত ঘুরছি, যত দেখছি, ততই যেন মনে হচ্ছে এ একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা। কত মানুষ দেখলাম, কতরকমের জীবন, কিন্তু কি লাভ হলো তাতে? বুঝতে পারছি আমরা ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকব, যত চিন্তা করছি তত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি সমাজ থেকে, কারুর সঙ্গেই ঠিকমত মিশতে পারছি না। কি করব, কারুর সঙ্গেই যে মিল নেই! ভেবেছিলাম ভাল করে জীবনটাকে দেখে তারপর লিখব, কিন্তু এখন এমন হয়েছে, কি লিখব তাই বুঝতে পারছি না। কত কথা লেখবার আছে, অথচ লিখেই বা হবে কি?

সাধুজী একদৃষ্টে অনাদিপ্রসাদকে লক্ষ্য করছিলেন, ঠিক যেন ভবিষ্যৎবাণী করলেন, এইবার তুমি লিখতে পারবে।

—কি করে বুঝলেন?

—তোমার সময় হয়েছে।

—কিসের?

সাধুজী কিন্তু এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিলেন না, বললেন, আমরা বিশ্বাস করি সময় না এলে কিছুই করা যায় না। সেই পরম লগ্ন তোমার জীবনে আসছে, নিজেকে প্রস্তুত কর, যা আসছে তা যেন নিতে পার। একটা বিরাট কিছু আসছে, কোন দিক দিয়ে তা ঠিক বুঝতে পারছি না—

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি পারবে। বোধহয় মনে আছে, সেদিন গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে তোমাকে রামায়ণের কথা বলেছিলাম। আজ বলছি, ভাল করে মহাভারতটা পড়। জান তো কথায় বলে, 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে'। মহাভারতে সবকিছু পাবে, বিশেষ করে শেষের দিকটা খুব মন দিয়ে পড়ো। কখনও কি ভেবে দেখেছ কেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল, কেন তাকে আমরা বলি ধর্মযুদ্ধ? যেখানে ভাই ভাইকে মেরে ফেলছে সেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কি করে এক পক্ষে যোগ দিলেন, নিজে পার্থসারথি হলেন? কেন? কেন?

অনাদিপ্রসাদ বললেন, তখন যে রাজা অন্ধ, রাজসভায় পাপাচার, দেশে

দুঃশাসন, মানুষের হাহাকার।

—তবে? সেই দুঃসময় কি আজ আবার আসেনি? মানুষের অবস্থা দেখে তোমার চোখে জল আসছে না? দুর্যোধনদের দেখে তুমি শিউরে উঠছ না, লক্ষ্য করছ না দুঃশাসনের কি বিষময় ফল? তবে বাবা লিখছ না কেন? ভগবান যদি তোমায় লেখবার শক্তি দিয়ে থাকেন, প্রাণ ভরে লেখ। জেনো, অসির চেয়ে মসীর দরকারই এখন সবচেয়ে বেশী।

অনাদিপ্রসাদ নিজের মনেই অস্ফুট উচ্চারণ করেন, কুরুক্ষেত্র!

সাধুজী দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, তাতে ভয় কি। ভুলে যেও না ঐ কুরুক্ষেত্রেই গীতার জন্ম।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে অনাদিপ্রসাদের মনে হলো ঘরের মধ্যে যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল, কি দারুণ আওয়াজ! ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেল, ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে সাধুজীকে দেখা যাচ্ছে না। রথের চাকার ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, মুমূর্ষু সৈনিকের কান্না, ঘন ঘন শর নিক্ষেপের শব্দ, তীব্র শঙ্খধ্বনি, এ কি পাঞ্চজন্যের আহ্বান—না, এ সেই পরমপুরুষের অমোঘ নির্দেশ—নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচী।

অনাদিপ্রসাদ নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে সাধুজীর দেখা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অনাদি-প্রসাদ নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু দিক নির্ণয় করতে পারছিলেন না। এলোমেলো হাওয়ার মধ্যে কিভাবে পাল তুলবেন, কোন পথে বয়ে চলবেন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। সাধুজী সেই নিশানা দেখিয়ে দিলেন। কুরুক্ষেত্র।

ছেলেবেলা থেকে অনাদিপ্রসাদ রামায়ণের চেয়ে মহাভারত পড়তে ভাল-বাসতেন, কারণ মহাভারতের চরিত্রগুলোকে অনেক কাছের মানুষ বলে মনে হতো। হাতের কাছে কাশীরাম দাসের সংস্করণ পেলেই উনি প্রথমেই উল্টে দেখতেন সেই লাল রং-এর ছবিটা, যেখানে ভীমসেন দুঃশাসনের রক্তপান করছে, কি বীভৎস, অথচ বীরশ্রেষ্ঠ মধ্যম পাণ্ডবের জন্য বাহবায় মন ভরে যেত, কারণ, সে নরপিশাচ দুঃশাসনকে উচিত শাস্তি দিয়েছে।

কিন্তু কোথায় আজ সেই ভীমসেন? দুঃশাসনে মানুষ যখন জর্জরিত, বেঁচে থাকার অর্থ কেউ খুঁজে পাচ্ছে না, নিরাপত্তার সংজ্ঞা যখন লোপ পেয়েছে, সতীর লাঞ্ছনা যেখানে প্রতিনিয়ত ঘটনা—কোথায় সেই দেব ঔরসজাত

পবননন্দন? কেন আজ সে পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছে না? কেন আবার দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করছে না?

সেই দিন থেকে অনাদিপ্রসাদ বাড়ি ফিরে নতুন করে মহাভারত পড়া শুরু করলেন। সকাল, দুপুর, বিকেল, কখনও বা আলো জ্বালিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজীতে মহাভারতের শ্লোক আর ব্যাখ্যা পাঠ করছেন। যে মানুষটা গত ক'মাস ধরে শুধু বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে, বাড়ির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কই রাখেনি, সেই লোকটা দিনের পর দিন স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে রইল পড়ার ঘরে।

রমলা বৌদির এ আর এক অস্বস্তি। জিজ্ঞেস করল, এত মন দিয়ে কি পড়াশুনো করছ?

অনাদিপ্রসাদের ছোট্ট উত্তর, মহাভারত।

—সারাদিন বাড়িতে বসে থাক, একবারও বাইরে বার হও না, দেখ শরীর খারাপ না হয়।

অনাদিপ্রসাদ হাসেন, আমাকে নিয়েই তোমার যত ভাবনা, তাই না রমি? বাইরে বেরলে দুশ্চিন্তা, আবার বাড়িতে বসে থাকলেও চিন্তার অন্ত নেই।

—তা নয়, তোমার সব কিছুই হঠাৎ হঠাৎ কিনা, তাই ঠিক বুঝতে পারি না। এমন আদাছোলা খেয়ে মহাভারত পড়তে শুরু করেছ যেন এ-বই আর আগে কখনও পড়নি।

—পড়েছি বৈকি, তুমিও তো পড়েছ। আচ্ছা বল তো দ্রৌপদীকে তোমার সতী মনে হয় কিনা? পাঁচজন স্বামী নিয়ে কেমন সুখে ঘরকন্না করে গেল।

রমলা বৌদি সত্যি কথা বলে, কেন যে দ্রৌপদীকে সতী বলে আমি বুঝি না।

—তাহলে কে সতী, কুন্তী? কুমারী অবস্থায় তার ছেলে হলো কর্ণ, লোকলজ্জার ভয়ে তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে যদিও বা রেহাই পেল, বিয়ে হলো এমন এক স্বামীর সঙ্গে যে সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম। ফলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে তিন দেবতার পূজা করল, তাঁদের ঔরসে তিন পাণ্ডবের জন্ম হলো। তুমি কি বল? কুন্তী একজন সতী?

—আগেকার দিনে কত কি হতো ভাবতে গেলে মাথা গোলমাল হয়ে যায়।

অনাদিপ্রসাদ এবার চোখের চশমাটা খুলে অল্প হেসে বললেন, অথচ গান্ধারী যে মহাসতী তা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে, অন্ধ স্বামীকে নিয়ে যে সারাজীবন কাটিয়েছে?

রমলা বৌদি বলে, নিশ্চয়।

—কিন্তু সেই সতী গান্ধারী এমন একশ'টি সন্তানের জন্ম দিল যাদের প্রধান হলো দুর্যোধন, দুঃশাসন। যাদের অত্যাচারে সারা দেশ শিউরে উঠল,

যাদের পাপে কুরুদের রাজ্য টলমল করে উঠল, শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হলো। তাহলেই বোঝ, কে সতী আর কে অসতী বাইরের আবরণ দেখে বোঝা যায় না। বোঝা যায় ফল থেকে। সেদিন একজনের কাছে শুনছিলাম, সে যেত কোন একটি মেয়ের কাছে, অল্পবয়সী, তাকে উপভোগ করতে। পঁচিশ টাকা করে দক্ষিণা দিত। একদিন সে মেয়েটির শরীর খারাপ হলো।। লোকটি সেখান থেকে ফিরে আসছিল, মেয়েটির মা কিন্তু তাকে যেতে দিল না। কোন অছিলায় মেয়েকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়ে এই প্রস্তাব রাখল, আপনি যে পঁচিশ টাকা করে দেন, তাতে আমাদের সংসারে অনেক সাশ্রয় হয়, মেয়ের অসুখ বলে ফিরে যাবেন কেন, আমি তো আছি। ভদ্রলোক সে সন্ধ্যায় মেয়ের বদলে মাকে নিয়ে শুলো, যথারীতি পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে।

রমলা বৌদি শিউরে ওঠে, ছি ছি, কি অসভ্য!

—কিন্তু এ সত্য, এ বাস্তব।

—না, না, আমি বিশ্বাস করি না।

—এই হলো অবক্ষয়ের চিত্র, এইভাবেই এক একটা সমাজ ভেঙে পড়ে, সভ্যতার সংকট দেখা দেয়—ক্রমশ পচ ধরে দুর্গন্ধ পুঁজে ভরে যায়।

—তখন উপায়?

—হয় সে অংগটাকে কেটে ফেলে দিতে হবে, আর যদি সেটা ফোঁড়ার আকার নেয় কাটিয়ে দিতে হবে, পুলটিশ দিয়ে চেপে রাখলে চলবে না, তাতে বিষ ক্রমশ সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়বে, যেখানে সেখানে বিষ ফোঁড়া বেরুবে। সমাজের যখন এই অবস্থা হয় তখনই আসে বিপ্লব।

রমলা বৌদি ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করে, বি-প্ল-ব।

—এতে ভয় পাবার কিছু নেই, রক্তপাত হবে হোক, তাতে বদরক্ত বেরিয়ে যাবে, সুস্থ সবল সমাজ বেঁচে থাকবে। সেইজন্যেই তো কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল, অন্ধ রাজার রাজত্বে, দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। এ তো ধর্মযুদ্ধ। আমি বলছি তোমায়, আর বেশি দেরি নেই। কোন সভ্যতা, কোন সমাজ বেশিদিন মুখ বুজে এই নির্মম অত্যাচার সহ্য করে না। তুমি কি মনে কর এইভাবে প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে? তুমি কি মনে কর যুবসমাজ নিজেদের যন্ত্রণায় এই রকম নিষ্ফল মাথা কুটে মরবে? চোরেরা সমাজের মাথায় বসে বাহাদুরি নেবে, সৎ মানুষ এইভাবে লাঞ্ছনা ভোগ করবে, অসতীরা সতীত্বের ঢাক পিটিয়ে জয়মালা পরে বেড়াবে। আর গৃহস্থ বধূকে শুধু বেঁচে থাকার জন্যে নিজের লজ্জা বিক্রী করতে হবে। যুগে যুগে সভ্যতার এই সঙ্কট মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু বেশিদিন সে টেঁকে না, বিপ্লবের মুগুর তার মাথা গুঁড়িয়ে দেয়, সব দেশে তাই হয়েছে। ইওরোপ, আমেরিকা, কোথাও তার

ব্যতিক্রম হয়নি। এদেশেই বা তা হবে না কেন? তাছাড়া এ বিপ্লব যে এদেশে আগেও ঘটেছে—পান্ডব ও কুরুর যুদ্ধ, সুর ও অসুরের লড়াই, ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ব।

রমলা বৌদি স্বামীকে ক্রমশ উত্তেজিত হতে দেখে কথা না বাড়িয়ে বলে, আজ অনেক রাত হয়েছে, শুতে চল।

—তুমি শুয়ে পড়, আমি যাচ্ছি।

—এখন কি করবে?

—মুষল পর্বটা পড়ে নিই, বড় অদ্ভুত ঘটনা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যদু বংশ ধ্বংস হওয়ার কাহিনী। মুনির অভিশাপে যে ছেলেটি মুষল প্রসব করেছিল, সেই মুষলই যদু বংশ ধ্বংসের কারণ। বয়োজ্যেষ্ঠরা উপদেশ দিয়েছিলেন, মুষলটাকে ঘষে ঘষে শেষ করে ফেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পারেনি, একটা ছোট অংশ রয়ে গিয়েছিল, যার ফলে যদু বংশ আত্মকলহে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সেই ছোট্ট অংশটা গেল কোথায়? হাজার হাজার বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সেই মুষলের অবশিষ্ট অংশটুকু নিশ্চয় কোথাও রয়ে গেছে। আমি সেইটেই খুঁজছি।

রমলা বৌদি কি বলবে ভেবে পায় না।

—বলছি তো, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়। ঘণ্টাখানেক বাদেই আমি ঘরে যাচ্ছি।

—তাই এস।

সে রাত্রে অনাদিপ্রসাদ কিন্তু একেবারেই বিছানায় শুতে যাননি। সারারাত পড়ার ঘরে কাটিয়েছেন, কখনও বই পড়ে, কখনও আধঘুমন্ত অবস্থায়, কখনও বা জেগে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন, না অতীতের ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক। পর্দার ওপর একটার পর একটা ছবি ফুটে উঠেছে, এও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

অনাদিপ্রসাদ দেখতে পেলেন, যদু বংশ ধ্বংসকারী মুষলের অবশিষ্ট অংশ মাটির কবর ফুঁড়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠল, সন্তর্পণেই চারদিক দেখে নিয়ে হঠাৎ ছুটতে শুরু করল, ঠিক যেন কার্টুন চিত্রের কোন এক সচল জড়পদার্থ, যার হাত-পা গজিয়েছে, যে আর চলৎশক্তিহীন নয়, যার মুখে অভিব্যক্তির প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, সেই মুষল জল ঝড়ের মধ্যে দিয়ে তার অপ্রতিহত অভিযান চালিয়ে আয়তনে আরও ছোট হয়ে পেঁৗছল এসে আজকের সমাজে। ঐতিহাসিকদের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে রাতারাতি নাম পাল্টে ফেলল—এখন আর সে মুষল নয়—তার নাম কালো টাকা।

অনাদিপ্রসাদ ধড়মড় করে উঠে বসলেন, মনে হলো এই গভীর রাত্রে

বাইরে অনেকগুলো কাক ডাকছে, গর্দভের চীৎকার, নানারকম অশুভ ধ্বনি, বোধহয় এই রকমই শোনা গিয়েছিল দুর্যোধনের জন্মলগনে।

যদিও নাম তার কালো টাকা কিন্তু রং কালো নয়। রুপোলী চকচকে ঠিক অন্য টাকার মতই, তফাৎ শুধু এ টাকার জন্যে ট্যাক্স দিতে হয় না, এ টাকা সহজে চলে ফিরে বেড়ায় না, বেশির ভাগই ঢুকে থাকে সিন্দুকে। এরই লেনদেনের জন্যে কালো বাজারকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে। সমাজের সব স্তরে কালো টাকা ঢুকছে—অভিশপ্ত মুষল তার কাজ করে যাচ্ছে ঠিকই, সকলের অজান্তে আস্তে আস্তে সে সমাজকে পঙ্গু করে ফেলবে।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশ ব্যাকে ছবি ফুটে উঠছে—সেই পার্কে আলাপ হওয়া ময়লা রং ভুরে-চুলের আফিম মিত্তির, খনখনে গলায় হাসছে, বলছে, সেদিন বাজারে এক মেছো এক জোড়া ইলিশের দাম হাঁকলো তিরিশ টাকা, আমি শুনে হাসলাম, এত দাম দিয়ে কে মাছ কিনবে। ওমা, কিছুক্ষণ বাদে দেখি এক ভদ্রলোক করকরে তিনখানা দশ টাকার নোট দিয়ে দুটো মাছ নিয়ে চলে গেল। তবেই বুঝুন, টাকাওয়ালা লোক নিশ্চয় আছে।

আফিম মিত্তির সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু যা সে বোঝেনি এ হলো কালো টাকার খেলা—যে টাকা খরচা করতে অত মায়া হয় না, এরই যাদু-স্পর্শে তরিতরকারী মাছ মাংস, সব কিছুর দাম হুহু করে বাড়ছে। স্বচ্ছন্দে কেনা.. করছে তারাই যাদের পকেটে কালো টাকা আছে। যাদের নেই তারা থলি হাতে মুখ শুকিয়ে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাড়ি ফিরছে বিনা পয়সায় কয়েক কিলো ঈর্ষা কিনে।

মনে পড়ছে সংবাদপত্রের শিরোনামা—পুলিশ কালো টাকার সন্ধানে বাড়িতে বাড়িতে অনুসন্ধান করছে। কোন ব্যবসায়ীর লেপের ভেতর থেকে টাকা বেরিয়েছে, কোন ডাক্তারখানায় প্যাকিং বাক্সর মধ্যে ভরা কালো টাকা। কোন ফিল্মস্টারের বাথরুমে পাওয়া গেছে কয়েক লক্ষ টাকার নোট। পুলিশের চেয়ে বুদ্ধিমান কালো টাকা, মুষলের অভিজ্ঞতার সে উত্তরাধিকারী, আর সে চুপচাপ ধনীর সিন্দুকে বসে রইল না, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কালো টাকা ঢুকে পড়ল জমিতে। সঙ্গে সঙ্গে জমির দাম ফেঁপে ফুলে উঠল, হাজার টাকার জমি বিকোলো দশ হাজারে, সাধারণ লোককে সাধারণ রোজগার নিয়ে আর জমি কিনতে হলো না। রাতারাতি কালো টাকা বড় বড় শহরের সব জমি দখল করে নিল। কিন্তু এতেও তার শান্তি নেই, ধাপে ধাপে উঠতে লাগল বাড়ি, একতলা দোতলা ছাড়িয়ে ক্রমে তেরো-চোদ্দ তলা। জমি কিনতে যে বাড়তি কালো টাকা দিতে হয়েছে তা উশুল করার জন্যে জমির ওপরের শূন্য স্থান যতখানি উঁচু সম্ভব দখল করা শুরু হলো, তার জন্যে তো আর নতুন করে টাকা দিতে হবে না। অতএব উঁচু বাড়ি, অনেক ফ্ল্যাট, যথেষ্ট ভাড়া, তার

উপর পাগ্ড়ীর টাকা অর্থাৎ সেলামী। কালো টাকা একজনের পকেট থেকে আর এক জনের পকেটে চলে গেল। উঠিয়ে দেওয়া হলো বস্তী, ভাঙ্গা হলো মধ্যবিত্ত গৃহস্থের একতলা আর দোতলা বাড়ি, উঠল স্কাইস্ক্রেপার। অগণিত মানুষের চাপা দীর্ঘশ্বাস কিন্তু উঁচু তলার ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কোনরকম অস্বস্তির কারণ হলো না।

আর একটা ছবি ফুটে উঠল—ফিল্ম ডিরেক্টার সৌরভ সেন, তখনও তার এরকম পড়তি অবস্থা হয়নি, ছবির জন্যে কিনতে এসেছিল অনাদিপ্রসাদের একটা বই। মুখ শুকিয়ে বললে, গল্পটা কিনে রাখছি, তবে ছবি তুলতে পারব কিনা জানি না।

অনাদিপ্রসাদের বিস্মিত প্রশ্ন, কেন?

—কালো টাকা ঢুকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সর্বনাশ করে দিয়েছে। স্টারদের দাম চড়েছে আশী হাজার, এক লাখ, তার বেশির ভাগই কালো টাকা দিতে হবে, কারণ ট্যাক্সের ভয়ে তারা সই দেবে না। যদি স্টার না নিয়ে ছবি করি সিনেমার মালিকরা দেখাবে না, তারাও কালো টাকা চেয়ে বসবে। ফলে হয় স্টারদের, নয় সিনেমা মালিকদের কালো টাকা দিতে হবে। অতএব এমন প্রযোজক চাই, যার কালো টাকা আছে। এখন তাদেরই খেলা চলছে, আমাদের মত ছাপোষা মানুষের এ লাইনে বেঁচে থাকার কোন উপায় দেখছি না।

সৌরভ সেন সেদিন মিথ্যে কথা বলেনি। অনাদিপ্রসাদের সেই গল্পের চিত্ররূপ আজও ওঠেনি, খবর নিয়ে জেনেছেন সেদিনের নামকরা পরিচালক সৌরভ সেন হারিয়ে গেছে, লজ্জায় ঘৃণায় ক্রমশ তলিয়ে গেছে দিশী মদের স্রোতে।

অনাদিপ্রসাদ উঠে পায়চারী করতে লাগলেন, এ-ঘর থেকে ও-ঘর, বাইরের বারান্দা, ওপরের ছাদ। রমলা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমচ্ছে, পাশের বাড়ির পাগলীটা গান করছে, দূরে একটা প্রেসে মেশিন চলার ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে, দুটো পয়সা পাবার জন্যে তারা রাত জেগে কাজ করছে। প্রেসের কথা থেকে মনে পড়ল লেখার কথা, সেই সঙ্গে ভেসে উঠল প্রকাশক সুনীল রায়ের মুখ। অন্ধকার আকাশে স্কন্ধকাটার মতো জীবনে সার্থক সুনীল রায়ের বিরল-কেশ মুখখানা হাসছে, যেন বলছে, আরে ভাই আজকের দিনে শুধু ব্যবসা করে কিছু চলে না। কত রকম ট্যাক্সের ফন্দী বার করছে, যা রোজগার করব সব গভর্নমেন্ট কেড়ে নেবে, সেই জন্যে ঠিক করেছি বেশি বই আর ছাপাবো না।

অনাদিপ্রসাদের প্রশ্ন, তাহলে কি করবেন?

—শোনেননি, আমি বারাসাতের দিকে প্রায় পঁচাত্তর বিঘে ধানজমি কিনেছি।

—আপনি চাষ করবেন?

—তাছাড়া গভর্নমেণ্ট শস্য ফলাবার জন্যে ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছে, আরে, ভাই শস্য হোক আর নাই হোক কাগজে কলমে দেখিয়ে দাও, এত ধান হলো এত পাট হলো, বিক্রী করে এত টাকা হলো। দিব্যি আমার কালো টাকা সাদা হয়ে ঘুরে আসবে অথচ ট্যাক্স দিতে হবে না।

অনাদিপ্রসাদ এ খবর জানতেন না, সত্যিই আশ্চর্য হন, বলেন কি সুনীলবাবু, আজকাল এইসব চলছে?

সুনীল রায় মুরুব্বী চালে হাসে, এর চেয়েও বেশি লাভ পোলট্রিতে, মুরগীর চাষ করুন, তাতেও ট্যাক্স লাগবে না। বেশি জমিরও দরকার নেই, খানকয়েক বড় বড় খাঁচা, কতগুলো মোরগ আর মুরগী, ক্রমান্বয়ে তারা ডিম পাড়বে আর বাচ্চা দেবে। ডিম বিক্রী করুন, মুরগী বিক্রী করুন, আর কিছু নাই বিক্রী করুন, আপনার কালো টাকা সাদা হয়ে যাবে।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আরে মশাই, কাগজপত্রে মুরগী ডিম পাড়ুক, হিসেবের খাতায় বিক্রী হোক, আসলে মুরগী নাই বা রইল, জানেন রাজস্থানে এখন পোলট্রি ফার্ম সবচেয়ে বেশি! সবই কাগজের মুরগী, কাগজের ডিম—কালো টাকা সাদা বানাবার আজব কল।

অনাদিপ্রসাদ আপত্তি করেন, তাই কখনও হয়, সরকার এ সবের খবর রাখে না? ইনেস্‌পেক্টর পাঠিয়ে তো খোঁজ নিলে পারে।

—খোঁজ ঠিকই নেয় তবে ইনেস্‌পেক্টার না বলে কয়ে গিয়ে হাজির হয় না, যেদিন গিয়ে পেঁছয়, তার আগের দিন কিছু পালক ছড়িয়ে রাখা হয় খাঁচাগুলোর মধ্যে, বোঝান হয় দু'দিন আগে 'রানীক্ষেত জ্বরে' পাখিগুলো সব একসঙ্গে মরে গেছে। তবে এসব কথা আপনাকে বলে তো লাভ নেই, আপনি নিজেই যখন সোনার ডিম পাড়তে পারেন, তবে আর কাগজের মুরগী, কাগজের ডিম নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন?

সুনীল রায়ের মুখটা ফেড্‌ আউট করে গেল। ঠাণ্ডার মধ্যেও অনাদি-প্রসাদ ঘামতে লাগলেন, কোথায় আমরা নেমেছি, শুধু মিথ্যে আর মিথ্যে! কাগজে কলমে ধান ফলছে, পাট হচ্ছে, মুরগীরা ডিম পাড়ছে, শুধু ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া, সবাই যদি ট্যাক্স ফাঁকি দেবে তাহলে গভর্নমেণ্ট চলবে কি করে?

বিরাট গম্বুজের মধ্যে কে যেন চীৎকার করে বলল, চলছে না, চলছে না।

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল, দূরে বহু দূরে হাওয়ার তরঙ্গে ক্রমশঃ যেন মিলিয়ে যাচ্ছে আর বলছে, চলছে না, চলছে না।

অনাদিপ্রসাদ ছাদ থেকে নীচে নেমে এলেন, আবার কতগুলো কাগজের হেডলাইন—'টাকার অভাবে চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ অচল।' 'ভারতে উৎপন্ন

স্টীলের চাহিদা বাইরে তত নেই, তাই কম দামে বিক্রী করে রপ্তানী বাড়াতে হচ্ছে।' 'চিনি আমরা খেতে পাচ্ছি না কিন্তু অর্ধেক দামে বাইরে পাঠানো হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার জন্যে।'

অনাদিপ্রসাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সব পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে যদি লোকে ট্যাক্স না দেয়, যদি কালো টাকার অঙ্ক বেড়েই চলে। কিন্তু এ থেকে তো রেহাই পাবার কোন উপায় নেই, সেই অভিশপ্ত মুষল যে সমাজের সব স্তরে ঢুকে পড়েছে, ক্রমশঃ তা সমাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, দেবে। কোন মানুষের শরীরের সব জায়গায় যদি চর্বি বাড়ে তাতে দেহের তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু ঐ চর্বি যদি জমা হয় হার্টের ওপর কিংবা ব্রেনে, মানুষটাকে সুস্থ থাকতে দেয় না। টাকার সারকুলেশান যত হয় তত দেশের পক্ষে মঙ্গল, কিন্তু কালো টাকা যে হার্টের ওপরে জমা চর্বির মত সমাজের হৃৎপিণ্ডকে ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে, মুমূর্ষু সমাজ কত দিন যুঝতে পারবে!

মনোকষ্টে, হতাশায় ভোরের দিকে অনাদিপ্রসাদ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। যদি আর কিছুক্ষণ জেগে থাকতেন দেখতে পেতেন, সেই সচল মুষল গুটি গুটি পায়ে কার্টুন-চিত্রের যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে পা ফেলে ঢুকছে রেস-কোর্সে।

ঘোড়ার বাজী খেলার রীতি আজকের নয়, বহুদিনের প্রচলিত প্রথা। পুরাকালে ঘোড়ার সঙ্গে রথ ছুটত, সারথিরা বাহাদুরি দেখাত। এখন শুধু ঘোড়ারাই দৌড়য়, কেরামতী দেখায় জকিরা। হাজার হাজার টাকার বাজী হয়, কেউ জেতে কেউ হারে, পাওয়া না-পাওয়ার একটা উত্তেজনা, সব রকম অবস্থার মানুষই ঘোড়দৌড়ের মাঠে যায়, বাজী ধরে কপাল যাচাই করে। এ এক ধরনের জুয়োখেলা, তার সঙ্গে কিছুটা রোমাঞ্চ আছে।

কিন্তু এখানে কালো টাকা ঢোকার পর থেকে বাজী ধরার পদ্ধতিটা বদলে গেছে। সেদিনের রেসে ছ'টা ঘোড়া দৌড়বার কথা। মনুয়া হাতে বই নিয়ে ঘুরছে. ভাবছে তিন নম্বর ঘোড়াটার নামে 'উইন' খেলবে কিনা, এমন সময় এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লোকটা শান্ত চোখে হাসল, হ্যালো মনুয়া, কেমন হচ্ছে আজ, কিছু জিতেছ?

মনুয়া বলল, সুবিধে করতে পারছি না, বলুন না এই রেসে কি খেলব?

—আমি তো সব ক'টা ঘোড়ার নামেই পাঁচশো টাকা করে লাগিয়ে দিয়েছি।

মনুয়া চমকে ওঠে, সে কি? তিন হাজার টাকা খেলেছেন?

—হ্যাঁ, যদি কোন 'ফেবারিট' ঘোড়া না জেতে আমি তিন হাজারেরও অনেক বেশি পাব, আর 'ফেবারিট' জিতলেও হাজার দুই নিশ্চয়। হয় কিছু লোকসান, না-হয় অনেক লাভ, তাছাড়া এই সুযোগে আমার তিন হাজার কালো টাকা ট্যাক্স-ফ্রি সাদা টাকা হয়ে ফিরে আসবে। কিছু মন্দ করেছি?

মনুয়া সব কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারল না। তাই শেঠিয়ার সঙ্গে দেখা হতে ঐ প্রসঙ্গই তুলেছিল। শেঠিয়া বলল, আজকালকার খেলা ঐরকমই হয়েছে, কালো টাকা সাদা বানাবার জন্যেই এত বড়লোকের ভিড়। তারপর কি খবর, মোহনচাঁদজী আজ আসবেন না?

—বললেন শরীর ভাল নেই, তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

—বুড়ো খুব সেয়ানা, বুঝেছে তুমি একলা থাকলে আমার মন বেশি ভেজাতে পারবে, তাই নিজে আসেনি।

মনুয়া বায়না ধরল। যাই হোক স্যার শেঠিয়া, আজ আমাকে জেতা জ্যাক্‌পটের টিকিট কিনিয়ে দিতেই হবে, নয়তো মোহনচাঁদজীর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

শেঠিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, দু' তিন দিন ধরে চেষ্টা তো খুব করেছি, কিন্তু শালা দালালগুলো ঈগল পাখীর মত বসে থাকে, রেজাল্ট বেরতে না বেরতে ছোঁ মেরে টিকিটগুলো তুলে নেয়।

—সে আমি জানি না, আজকে আমার চাই।

—দেখি কি হয়।

বরাত ভাল ছিল মনুয়ার, শেঠিয়াও চারদিকে চর ছেড়ে রেখেছিল তাই আজকের জ্যাকপটের টিকিট সে বেহাত হতে দেয়নি, পঁচাশি হাজারের টিকিট নব্বুই হাজারে কেনার ব্যবস্থা করে দিল। মনুয়া সঙ্গে সঙ্গে মোহনচাঁদকে খবর দিল। বুড়োর প্রচণ্ড উল্লাস, খুব ভাল সওদা করেছ মিস্ লাহিড়ী, মাত্র পাঁচ হাজার প্রিমিয়ামে পঁচাশি হাজার কালো টাকা সাদা করে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়। আমি খাতায় দেখিয়ে দেব দশ টাকার টিকিট কিনে এত টাকা পেয়েছি, কেউ ধরতে পারবে না। আজ থেকে তোমার দুশো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলাম।

মনুয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে, আমার মাইনে তা হলে সাত শো টাকা!

কিন্তু মনুয়ার উচ্ছ্বাস টিকল না, অদূরে দেখতে পেল স্বরূপ লাহিড়ী দাঁড়িয়ে। দৃঢ় পদক্ষেপে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। গম্ভীর গলায় ডাকল, এদিকে এস।

এ আদেশ মনুয়া উপেক্ষা করতে পারল না।

—শেষ পর্যন্ত তোমাকে রেস-কোর্সে ধরতে হলো।

—ধরবার কি কোন দরকার ছিল।

—কোথাও তো আর মুখ দেখাবার উপায় রাখনি, তোমার বিষয় কি না শুনতে হচ্ছে। কত রাত পর্যন্ত হোটেলে, রেস্তোরাঁয় মদ খেয়ে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে মাতলামী করছ, পার্ক স্ট্রীট এখন তোমার ঘরবাড়ি, তার উপর রেসের নেশা ধরেছে, প্রথমটা বিশ্বাস করিনি, তাই নিজের চোখে দেখতে এলাম।

—দেখে খুশী হয়েছো, আর কিছু বলবার আছে? আমি এখন যেতে পারি?

—কোথায় থাক আজকাল?

—তা জেনে কি হবে?

—শুনলাম কোন এক অবাঙালীর রক্ষিতা হয়েছ?

—সেইটুকুই বাকি আছে।

—তবে এখন কি, বাজারের বেশ্যা?

—ভাবতেও ঘেন্না হচ্ছে যে-লোক এরকম নোংরা কথা বলে সে আমার বাবা!

—তাতেও আমার সন্দেহ আছে, তোমার মা তো জীবনে কম কেলেঙ্কারী করেনি, জানি না তুমি—

—আঃ চুপ কর।

হঠাৎ শুনলে বোঝা যায় না এ হলো আধুনিক সমাজের পিতা ও কন্যার কথোপকথন। ভাষা অবশ্য ইংরাজী, রেস-কোর্সের সভ্যদের 'ওয়াইট স্ট্যান্ডে'র ওপরের তলায় এক কোণে দাঁড়িয়ে স্বরূপ লাহিড়ী আর মনুয়া। মনুয়ার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে, স্বরূপ লাহিড়ীর চোখে মুখে পুঞ্জীভূত ঘৃণা, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না।

মনুয়ার তীক্ষ্ম প্রশ্ন, তুমি কি চাও? কেন আমার কাছে এসেছ? মাকে তো সারা জীবন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মেরেছ, এখন আমার সর্বনাশ না করলে বুঝি তোমার শান্তি হচ্ছে না!

স্বরূপ লাহিড়ীর স্বরে হায়নার আর্তনাদ, তোমার এসব বাঁদরামী আমি সহ্য করব না। এখুনি আমার সঙ্গে বাড়ি চল, তারপর আমি বোঝাপড়া করব।

মনুয়ার কঠিন উত্তর, আমি যাব না।

—এত বড় স্পর্ধা? বেশ আমিও তোমাকে দেখে নেব।

—যা ইচ্ছে তাই কর, তোমাদের নরকে আমি ফিরে যাব না।

আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মনুয়া দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এল, মোহনচাঁদ ইতিমধ্যেই তাকে খুঁজছিল, জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে মিস লাহিড়ী?

মনুয়া সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

—উনি কে?

মনুয়া স্বরূপ লাহিড়ীর পরিচয় গোপন করে জবাব দিল, আমাদের পরিচিত জন।

—তোমাকে একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে মিস্ লাহিড়ী।

—কই না, চলুন এবার ফেরা যাক।

মোহনচাঁদের সঙ্গে গাড়িতে ওঠবার সময়ও মনুয়া লক্ষ্য করল, দূর থেকে স্বরূপ লাহিড়ী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাদের দেখছে।

ফ্ল্যাটে ফিরে এসেও মনুয়া নিশ্চিন্ত হতে পারল না, কেন জানা নেই। কোন এক অজানা আশঙ্কায় তার মন বার বার শিউরে উঠল, মনে হলো থমথমে আকাশ, হঠাৎ যে কোন সময় ঝড় উঠতে পারে। সে ঝড় কালবৈশাখীর রুদ্র রূপ নেবে কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এ চিন্তার পেছনে এমন একটা অনিশ্চয়তার ঘূর্ণী আছে যাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া কারুর পক্ষেই বোধ-হয় সম্ভবপর নয়।

সন্ধ্যেবেলা শেঠিয়া এল টগবগিয়ে আনন্দের ঘোড়া চড়ে, চল ডার্লিং আমরা বাইরে খেতে যাই। বুড়ো মোহনচাঁদ তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে, আজ আমরা সেলিব্রেট করব।

মনুয়া কিন্তু সাড়া দিতে পারল না, বলল, আজ থাক, ভাল লাগছে না।

—কেন?

মনুয়া সংক্ষেপে স্বরূপ লাহিড়ীর কথা বলল। শেঠিয়া কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেয়, দূর দূর, ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করতে আছে, বাবারা চিরকাল ঐরকম বলে।

—তা নয়, আমার মাও তো কখনও সুখী হয়নি, আমিও হয়তো হব না।

—নাঃ, তোমরা বাঙালী মেয়েরা বড় সেন্টিমেন্টাল। তোমার মা, তার মা, কি করে দিন কাটিয়েছে তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? তাদের তো শেঠিয়ার মতো বন্ধু ছিল না, মোহনচাঁদের মতো মালিকও ছিল না, কি বল?

মনুয়া হাসবার চেষ্টা করল, তবু ভাল লাগছে না, আজ আর বেরব না।

—তাহলে এখানে বসেই ড্রিঙ্ক করা যাক। দু' পেগের পর দেখবে তোমার মন ভাল হয়ে গেছে।

—আমি বেশি ড্রিঙ্ক করতে পারি না।

—অভ্যেস কর, দেখবে এর চেয়ে ভাল বন্ধু আর কেউ নেই।

ওরা অনেকক্ষণ বসে পান করল। মনুয়ার উচ্ছ্বাস, ফেলে আসা দিনের ছোটখাট নানারকম ঘটনা, বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন, সকলের গল্প। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত কান্না-ভেজা গলায় আত্মজিজ্ঞাসা, শেঠিয়া, আমি কি কোন অন্যায় করেছি? আমি তো শুধু নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই, স্বাধীনভাবে থাকতে চাই।

শেঠিয়া মদত দিয়ে বলে, কুছ পরোয়া নেই, আমি তোমার সঙ্গে আছি, ঢের ঢের স্বরূপ লাহিড়ী দেখেছি, তোমার কোন ভয় নেই।

রাত্রে কিন্তু মনুয়া ভাল করে ঘুমতে পারেনি। দুঃস্বপ্ন দেখে বার বার ঘুম ভেঙে গেছে। স্পষ্ট কিছু নয়, তবে দুর্যোগের ছবি। হালভাঙ্গা নৌকোর মত কোথায় যেন সে ভেসে যাচ্ছে, প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে যেন তার প্লেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে। জনাকীর্ণ রাস্তায় তার মোটরের ব্রেক কাজ করছে না। মনুয়া যেন চীৎকার করে কাঁদছে, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না। তার চারদিকে কাঁচের ঘেরাটোপ, কাঁচে আঘাত করছে কিন্তু কাঁচ ভাঙছে না। দুমদুম করে শুধু শব্দ হচ্ছে, কে বলতে পারে, এ হয়তো হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ।

অনেক সময় মনের আশঙ্কা যে স্বপ্নে মূর্ত হয়ে ওঠে আর মাঝে মাঝে তা যে ভিত্তিহীন নয়, মনুয়া তার প্রমাণ পেল পরদিন সকালে মে ফ্লাওয়ারে গিয়ে। মোহনচাঁদ গম্ভীর হয়ে বসেছিল, মনুয়াকে দেখে আরও গম্ভীর হয়ে বলল, বসো মিস্ লাহিড়ী, তোমার সঙ্গে কতগুলো খুব জরুরী কথা আছে।

মনুয়া কথামত বসল, ভেবেছিল কালকের জ্যাকপটের টিকিট সম্বন্ধে মোহনচাঁদ কোন কথা বলবে। কিন্তু তার বদলে সরাসরি প্রশ্ন করল, কাল রেসকোর্সে তোমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক দেখা করেছিলেন, তিনি তোমার বাবা, এ কথা আমার কাছে গোপন করলে কেন?

মনুয়া অবাক হয়ে মোহনচাঁদের দিকে তাকায়, স্বরূপ লাহিড়ীর প্রসঙ্গ এভাবে উঠবে সে বুঝতে পারেনি।

মোহনচাঁদ স্থির গলায় বলে, উনি কাল সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি সব শুনেছি। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না মিস্ লাহিড়ী, তুমি আমাকে এতগুলো মিথ্যে কথা বলেছিলে কেন। তোমার বাবা আছেন, মা আছেন—

মনুয়া তেতো গলায় বলে, তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

—তাহলে যাকে গার্জেন বলে পরিচয় দিয়েছো তার সঙ্গেই বা তোমার কিসের সম্পর্ক?

মনুয়া চুপ করে যায়।

—তুমি এখন বাড়িতে থাক না? তাহলে আছ কোথায়?

—শেঠিয়ার ফ্ল্যাটে।

—ও গড্, মোহনচাঁদ মাথা চাপড়ায়, আমি তো ভাবতে পারছি না, তোমার মত একটা ছোট্ট মেয়ে ওই লম্পট শেঠিয়াটার সঙ্গে আছ? এ কথা আমাকে বলনি কেন?

—বলার তো কখনও দরকার হয়নি। আপনি মাইনে দেন, আমি আপনার হয়ে কাজ করি, কাজ ঠিক করছি কিনা সেইটুকুই আপনি দেখবেন, আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে তো আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

মোহনচাঁদ মাথা নাড়ে, তা হয় না মিস্ লাহিড়ী। তোমার বাবা শাসিয়ে গেছে, যদি না তুমি বাড়ি ফিরে যাও উনি আমাদের নামে কেস্ করবেন। তুমি নাকি এখনও মাইনর।

মনুয়া প্রতিবাদ করে, না, আমি মেজর।

—সে ফয়স্‌লা তো কোর্টে হবে, কিন্তু মামলা মকদ্দমার মধ্যে পড়ে আমাদের ফার্মের কোন বদনাম হয় এ আমি চাই না।

—তাহলে?

—বাবার সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেল।

—তা যদি সম্ভব না হয়?

—আমার কাছে কাজ করতেও তুমি পারবে না। মিস্ লাহিড়ী, আমাকে ভুল বুঝো না, তোমাকে আমি পছন্দ করি, তোমার উন্নতি হয় তাও আমি চাই। কিন্তু আমরা ব্যবসাদার, মিছিমিছি কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না। আজ তোমায় ছুটি দিলাম, আশা করবো দু'একদিনের মধ্যেই বাবাকে নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে, আবার আগের মত কাজ করবে।

অনাদিপ্রসাদ তখন খুব মন দিয়ে মহাভারত পড়ছিলেন। শান্তিপর্বের কাহিনী। ক'দিন বাড়ি থেকে বার হননি, ডায়েরীর পাতায় অনেক কিছু লিখে রাখছেন। খাওয়াদাওয়া, কিছুক্ষণ ছাদে পায়চারী করা, আর বাকি সময়টা গভীর মনোযোগে মহাভারত পাঠ করা।

রমলা বৌদি এসে জানাল, তোমাকে টেলিফোনে ডাকছে।

অনাদিপ্রসাদের সহজ উত্তর, নিশ্চয় কোন প্রকাশক, বলে দাও আমি বাড়ি নেই।

—একটি মেয়ে।

—কি নাম?

—তা বলছে না, তার বিশেষ দরকার তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাদিপ্রসাদ উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। অন্যদিকে কান্নাভেজা গলা, আমি মনুয়া কথা বলছি, খুব বিপদ হয়েছে, শিগ্‌গীরি একবার আসুন।

—আমি ব্যস্ত আছি।

—তাহলেও একবার আসুন, বড় দরকার। টেলিফোনে সব কথা বলতে পারছি না। আজ আমার পাশে কেউ নেই, কিছু নেই, প্লীজ আসুন।

শেষ পর্যন্ত অনাদিপ্রসাদকে বলতে হয়, আচ্ছা যাব।

টেলিফোনে মনুয়ার গলা শুনেই অনাদিপ্রসাদ বুঝতে পেরেছিলেন, যে-কোন কারণেই হোক মেয়েটা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু কি এমন ঘটতে পারে? যে মেয়ে বাড়ির গণ্ডী কাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর, তার জীবনে কি এমন বিপদ আসতে পারে! অনাদিপ্রসাদ ভেবে কোন কূলকিনারা পেলেন না। মনে মনে ঠিক করলেন সন্ধ্যের সময় গিয়ে মনুয়ার খোঁজ নেবেন।

॥ আটত্রিশ ॥

কথামত অনাদিপ্রসাদ যখন মনুয়ার ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছলেন তখন সবে সন্ধ্যা নেমেছে। কিন্তু মেয়েটাকে দেখেই মনে হলো অত্যন্ত ক্লান্ত, অবসন্ন। অনাদিপ্রসাদকে দেখে দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, যাক্, এসেছেন তাহলে। আপনিও তো পুরুষমানুষ, তার ওপর লেখক, নিজের চোখে দেখে যান পুরুষ-চালিত এই সমাজে মেয়েদের কি দুরবস্থা।

অনাদিপ্রসাদ সহজ গলায় বলেন, তুমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়েছ মনুয়া, সব ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও।

—বোঝবার তো কিছু নেই, আমার বাবা এক চরম স্বার্থপর পুরুষমানুষ, ঠিক পাথর যুগের বুনো মানুষদের দলপতির মত নিজের সুখের জন্যে বউ, মেয়ে সকলের সর্বনাশ করে ছাড়ছে। লোকটা চায় না আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকি। সে গিয়ে লাগাল মোহনচাঁদের কাছে। সেও তো পুরুষমানুষ, ফলে আমার চাকরি গেল, এর পরের জীবনটা কি বুঝতে পারছেন?

অনাদিপ্রসাদ চুপ করে থাকেন।

মনুয়া গেলাসে ঢক ঢক করে অনেকখানি হুইস্কি ঢালে, তাতে নামমাত্র সোডা মিশিয়ে পান করে। অনাদিপ্রসাদের সামনে সে আগে কখনও ড্রিংক করেনি, কিন্তু আজ সে-বিচারবোধ তার নেই। আবেগভরা কণ্ঠে বলে, এরপরের জীবন এই, মদ খাও, নষ্ট হয়ে যাও, পুরুষমানুষদের ক্ষিদে মেটাও। আমি জানি, জন্তুগুলো তখন আমার পেছনে লাগবে না, মাথায় তুলে নাচবে।

অনাদিপ্রসাদ বোঝাবার চেষ্টা করেন, এতটা মাথা গরম না করে তোমার বাবার সঙ্গে একদিন কথা বলতে আপত্তি কি? হয়তো ভাল করে বোঝালে—

মনুয়া চেঁচিয়ে ওঠে, লোকটা বোঝবার মত মানুষ নয়, সে নিজেই আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাতেও শান্তি পায়নি। যখন দেখল আমি

তাকে গ্রাহ্য করছি না, তখন থেকে বোধহয় ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঘুরছে আমাকে কামড়াবার জন্যে।

নেশা ক্রমশঃ মনুয়াকে জড়িয়ে ধরছিল, বড় সোফার ওপর সে নেতিয়ে পড়ে। নিজের মনেই বলে, যার যা মূলধন সে তাই ভাঙিয়ে খায়, যার টাকা আছে সে ব্যবসা করে, যার বিদ্যে আছে সে ছাত্র পড়ায়, যে চিকিৎসক সে রুগী দেখে রোজগার করে, আমাদের কি আছে, শুধু এই দেহটা। তাই নিয়ে কত বিপদ, কত হাঙ্গামা, তবু যখন কিছুই আর আশা করার থাকে না তখন ওই দেহটাকেই মূলধন করতে হয়!

অনাদিপ্রসাদ ধমক দেন, আঃ, কি যা তা বলছ! তোমার আজ মাথার ঠিক নেই।

—কি করব, আমি যে তখন থেকে বসে বসে মদ খাচ্ছি।

—কেন খাচ্ছ?

মনুয়ার চোখ বুজে আসে, কিছু তো করবার নেই। বাবি যখন মদ খেত আমি বকতাম, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি ও সে-সময় কত দুঃখ পেয়েছে। ওকেও যে দেহটাকেই মূলধন করতে হয়েছিল। আমাকেও তাই করতে হবে।

—তুমি এখন শুয়ে পড়, আমি কাল সকালে তোমার খবর নেব।

—না, আপনি যাবেন না, বসুন।

—কি হবে?

—আমার যে খালি কান্না পাচ্ছে। উঃ কি গরম। বলতে বলতে মনুয়া কোচের ওপরেই পাশ ফিরে শোয়। চোখ বন্ধ হয়ে আসে।

অনাদিপ্রসাদ ওঠবার জন্যে প্রস্তুত হন, এমন সময় বাইরের দরজায় কে টোকা মারে। মনুয়ার দিকে তিনি তাকালেন, সে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অগত্যা নিজে গিয়ে দরজা খুলে দেন, দেখলেন নিখুঁত স্যুট-পরা একজন ভদ্রলোক, যোয়ারীভরা গলায় জিজ্ঞেস করল, মনুয়া আছে?

—আছে।

—আমি দেখা করব।

ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেন, আপনার নাম?

—স্বরূপ লাহিড়ী।

অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও ও-নামটা তিনি মনুয়ার কাছে এতবার শুনেছেন যে আর তাকে বাধা দেবার দরকার মনে করলেন না। ভদ্রলোক খট খট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল, লক্ষ্য করল মনুয়াকে, দেখল হুইস্কির বোতল আর গেলাস, বুঝল তার মেয়ে মাতাল অবস্থায় পড়ে আছে। ঘুরে ঘুরে ফ্ল্যাটের চারপাশটা দেখে নিল, তারপর এসে অনাদিপ্রসাদের সামনাসামনি দাঁড়াল। বিষমাখান গলায় প্রশ্ন করল, আপনার নাম?

—অনাদিপ্রসাদ।

—ও, আপনিই বুঝি সেই লেখক, আমার মেয়ের পাতানো গার্জেন? চমৎকার! কতদিন এসব কারবার ধরেছেন?

অনাদিপ্রসাদ বলতে গিয়েছিলেন, আপনি ভুল বুঝছেন—

—বেশ তো, সেটা কোর্টে প্রমাণ করবেন।

স্বরূপ লাহিড়ী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে চলে গেল। অনাদিপ্রসাদ বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন, আশ্চর্য মানুষ, একটা কথা বলবারও সুযোগ দিল না। মনুয়ার ক্ষতি করতে গিয়ে লোকটা নিজে হাস্যাস্পদ হতেও প্রস্তুত। সাধনবাবুর বিলিতি সংস্করণ। পাশের ঘর থেকে একটা চাদর এনে মনুয়ার গায়ের ওপর বিছিয়ে দিয়ে, বাইরের দরজাটা টেনে লক্ করে অনাদিপ্রসাদ আস্তে আস্তে ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলেন।

আদালতে মামলার জন্যে আর অপেক্ষা করতে হলো না, অচিরে কোন এক সংবাদ সাপ্তাহিকে 'বিখ্যাত লেখকের ভীমরতি'—শিরোনামায় অনাদি-প্রসাদের কেচ্ছা কাহিনী ছাপা হয়ে গেল। সত্যি মিথ্যে মেশানো এক আজগুবী গল্পের চাটনী। স্বরূপ লাহিড়ী, মোহনচাঁদ, শেঠিয়া, কারুর আসল নাম প্রকাশ করা না হলেও পরিচিত লোকের বুঝতে বাকি রইল না, অনাদিপ্রসাদ আর মনুয়াকে জড়িয়ে একটা নোংরা ইতিবৃত্ত পরিবেশন করা হয়েছে।

অনাদিপ্রসাদ নিজে এ সাপ্তাহিক কখনও পড়তেন না, ঠাট্টা করে এর নাম দিয়েছিলেন 'নর্দমা'। প্রগতির নামে এরা অনবরত মিথ্যে নোংরা সংবাদ কাহিনী প্রচার করে। বহু পত্রিকা থেকে বিতাড়িত সাংবাদিক পরিচালিত এই সাপ্তাহিক নর্দমা। এদের কথা লোকে বিশ্বাস না করলেও পরনিন্দা পরচর্চাপ্রিয় পাঠকরা অনেক সময়ই সরব আলোচনায় মেতে ওঠে।

অনাদিপ্রসাদের এই কুৎসাকাহিনীও চাপা রইল না—সমাজের কাকেরা কা কা করে সারা শহরে চেঁচাতে লাগল। পাছে এদের নজর এড়িয়ে যায় তাই অনাদিপ্রসাদ, মনুয়া, স্বরূপ লাহিড়ী সকলের কাছে পত্রিকা অফিস থেকে সরাসরি পোস্টে কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে।

প্রথমটা অনাদিপ্রসাদ অতটা খেয়াল করেননি, কিন্তু একে একে টেলিফোন আসতে লাগল, লোকদেখানো শুভানুধ্যায়ীর উদ্বেগ, ছি ছি দেখেছেন, কি যা তা লিখেছে, আপনি কাগজের নামে মানহানির মকদ্দমা করুন, সম্পাদক ব্যাটাকে জেলে দেওয়া উচিত।

আবার কারুর সতর্কবাণী, খুব সাবধান অনাদিবাবু, মনে হচ্ছে আপনার পেছনে একটা চক্রান্ত চলছে, নিশ্চয় এর মধ্যে অন্য লেখক বা প্রকাশকরা

আছে, আপনি মাথা গরম করে ফস করে কিছু করে ফেলবেন না।

আবার সুনীল রায়ের মত লোকের মুরুব্বীয়ানা মন্তব্য, এরকম হবে আমি আগে থেকেই জানতাম। কিছু দিন থেকে মানুষটার সত্যিই ভীমরতি হয়েছে, নয়তো ছেলে বউ ছেড়ে বুড়োবয়সে কেউ ওইটুকু ছুঁড়ির পাল্লায় পড়ে। ওই মেয়েটার কথা কিন্তু আমাকে আগে বলেছিল, ভিক্টোরিয়ার মাঠে দেখা হয়েছিল ওর জন্মদিনে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত সরব আলোচনা, সে মানুষটা নির্বিকার। পড়ার ঘরে বসে আপনমনে মহাভারতের পাতা উল্টে যাচ্ছে।

ওদিকে মনুয়া কিন্তু এই মিথ্যা কাহিনীকে সহজভাবে নিতে পারেনি। শেঠিয়ার কাছে বলেছে, এই ক'টা দিনের মধ্যে আমি কত কি শিখলাম জানো? সত্যি মিথ্যে কেউ যাচিয়ে দেখে না, মিথ্যের ঢাক জোরে পেটাতে পারলে সেই মিথ্যেকেই লোকে সত্যি ভাবে। আর কোন সেণ্টিমেণ্ট আমার নেই। আত্মীয়তার বন্ধন আগে থেকেই কেটে গেছে, সামাজিক বন্ধনও কেটে যাবে। নোঙর আমার ছিঁড়ে গেছে, এখন যেখানে খুশী ভেসে বেড়াব।

শেঠিয়া সমবেদনা জানায়, ভেসে বেড়াবে কোন দুঃখে।

—কি করব? আমার বাড়ি নেই, চাকরি নেই—

—বাড়ি না থাকলেও ফ্ল্যাট তো আছে, এই তো তোমার ফ্ল্যাট, আর চাকরি, শুধু মোহনচাঁদের পি. এ. থাকার দরকার কি, তুমি আমার হয়ে কাজ কর, সমান মাইনে পাবে।

—তারপর? আমার বাবা যখন তোমাকে কাঠগড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে?

—অত ভয় পেলে চলে না মনুয়া, এর আগেও অনেকবার আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি। বলেই হা হা করে শেঠিয়া হাসে, আমার দিক থেকে ভাবনার কিছু নেই, তুমি ভয় না পেলেই হলো।

মনুয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আজ আমিও নির্ভয় শেঠিয়া, মিথ্যে লজ্জার বড়াই আর করব না। চাকরি করতে বল চাকরি করব, রক্ষিতা হয়ে থাকতে বল তাই থাকব, কি আসে যায় তাতে! শুধু আমার জন্যে মিছিমিছি অনাদি-প্রসাদের নামটা জড়িয়ে পড়ল, সেইটে ভাবতেই যা খারাপ লাগছে।

এই কুৎসা কাহিনী একজনকে আরও উন্মত্ত করে তুলল, সে স্বরূপ লাহিড়ী। কাগজওয়ালাদের অফিসেও সে ধাওয়া করেছিল, শাসিয়ে এসেছিল তাদের নামে কেস করবে বলে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয়নি। অনেকে ভয় দেখাল, এসব করলে কাগজওয়ালারা আরও নোংরা কথা লিখবে, স্বরূপ লাহিড়ীর আরও মানহানি হবে।

অগত্যা সে আপোসের চেষ্টা করল, সাংবাদিকদের টাকা খাওয়াল যাতে

আর না কাদা ঘাঁটাঘাঁটি হয়। মনুয়ার কাছে স্ত্রীকে পাঠাল, যদি মেয়ে এই দুঃসময় বাড়িতে ফিরে আসে।

মা গিয়ে মেয়ের সামনে দাঁড়াল কিন্তু কথা বলতে পারল না, মনুয়ার চোখে মুখে উপেক্ষার হাসি। জিজ্ঞেস করল, কেমন আছি তাই নিজের চোখে দেখতে এসেছ?

—তোমার বাবা পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে যাবার জন্যে।

মনুয়া মাথা নাড়ে, তার দরকার হবে না। বাবাকে বলো, তিনি যা চেয়েছিলেন আমি তাই হয়েছি, একজনের রক্ষিতা। যদি আরও টানাটানি করেন পুরোপুরি বেশ্যা হয়ে যাব, তখন আর কেউ আমার হদিশ পাবে না। মনুয়ার মা মাথা নীচু করে ফিরে আসে।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে মনুয়ার সঙ্গে অনাদিপ্রসাদেরও একদিন আলোচনা হয়েছিল। মনুয়া অনুতাপ করে, আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, কেন মিছিমিছি এর মধ্যে টেনে আনলাম।

অনাদিপ্রসাদের সহজ উত্তর, কিন্তু এসব তো মিথ্যে।

—লোকে কি তা বিশ্বাস করবে?

—লোকে তো অনেক কিছুই বিশ্বাস করে না, তাতে কি যায় আসে। যা সত্য তা চিরকালই সত্য। মিথ্যা কোনদিনই তার জায়গা দখল করতে পারবে না, যদি কোথাও গলদ থাকত তাহলে হয়তো ভয়ের কারণ ছিল।

মনুয়া জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের সীতার জীবনেও তো কোন গলদ ছিল না, তবে তাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হলো কেন?

অনাদিপ্রসাদ উত্তর দিতে গিয়েও চুপ করে গেলেন। এই তাঁর মনে প্রথম সংশয় জাগল, উনি যেভাবে মিথ্যেকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, অন্যরা কি সেভাবে দেয়নি, দেয়নি তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন। দেয়নি তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেরা, দেয়নি বাড়ির ঝি-চাকর, পাড়াপড়শী। ক'দিন থেকে সন্দেহ হচ্ছিল ফিসফিস করে কারা যেন কথা বলে। কারা কথা বলে, কি বলতে চায় তারা, দেয়ালও কি কান পেতে শোনে? অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছগুলো ড্যাব ড্যাবে চোখে অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকায়, সে চোখেও কি কৌতূহল? এখন মনে হচ্ছে, রাস্তা দিয়ে যখন উনি হাঁটেন অনেকেই যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো নিজেদের মধ্যে মুখরোচক আলোচনা করে।

মনুয়ার ফ্ল্যাট থেকে বাড়িতে টেলিফোন করতে গিয়ে তিনি আরও বিপদে পড়লেন, 'ক্রশ কানেকসানে' কারা কথা বলছে।

পুরুষ কণ্ঠ, বাড়ির দলিল, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র, ইন্সিওরেন্সের পলিসি সব গুছিয়ে রাখ, আমি নিজে একবার দেখে নিতে চাই, এসব বড় বিশ্রী ব্যাপার। মেয়েরা ফাঁদে ফেলে সব কিছু বাগিয়ে নেয়, তা হতে দিলে চলবে না।

এ কণ্ঠস্বর অনাদিপ্রসাদের অতিপরিচিত—তাঁর শ্যালক, ব্যারিস্টার
'.রেশচন্দ্র, বোনকে বৈষয়িক উপদেশ দিচ্ছে।

বিহ্বল অনাদিপ্রসাদ। রিসিভার রেখে দিলেন।

টেলিফোনে ওই কথা শোনার পর অনাদিপ্রসাদের আর ইচ্ছে ছিল না বাড়ি ফেরার। তবু ফিরতে হলো। স্ত্রী, পুত্র, সংসার-এর স্বীকৃতি না দিয়ে তো সমাজে থাকার উপায় নেই। অথচ জীবনে আঘাত যে সবচেয়ে বেশি ঐখান থেকেই আসে। যেখানে ভালোবাসার সম্পর্ক, যেখানে প্রেম প্রীতি, সেখানে যখন সন্দেহের ফণিমনসা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, ঈর্ষার কালো মেঘ জমা হয়, কিংবা কলহের ঘায়ে পুঁজ জমে ওঠে, তখনই স্পর্শকাতর মন বিমুখ হয়। ভেতরে ভেতরে সে শুকিয়ে যায়, আর কোন ব্যাপারেই নিজেকে জড়াতে ইচ্ছে করে না।

অনাদিপ্রসাদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ি ফিরলেন। চাকর এসে খবর নিয়ে গেল কিছু দরকার আছে কিনা। অনাদিপ্রসাদ শুকনো জবাব দিলেন, না। জিজ্ঞেস করলেন, মা কোথায়?

—বড় দাদাবাবুর ঘরে।

—ওনারা জানেন আমি ফিরেছি?

—হাঁ।

—ঠিক আছে, তুমি যাও।

আর কথা না বাড়িয়ে অনাদিপ্রসাদ অন্যমনস্কভাবে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। মনে পড়ছে, এখানে বাড়ি তৈরি করার কথা, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, সারাজীবন ভাড়া-বাড়িতেই কেটেছে, এখানে আসার আগে পর্যন্ত তিনখানা ঘরের বাসা নিয়ে মধ্য কলকাতায় ছিলেন। দীর্ঘ দশ বছর। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে রমলা, অনাদিপ্রসাদের অসচ্ছল সংসারে এসে পড়ে প্রথমটা তার অসুবিধেই হয়েছিল। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে বউ হয়ে এসে সবকিছুই সহ্য করে নেয়। রমলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একে একে দুটি ছেলে হলো, সংসার চালাবার জন্যে অনাদিপ্রসাদকে মাঝে মাঝে চাকরি করতে হয়েছে, কখনও বা টিউশানী। কিন্তু কোনদিনই বই পড়া এবং লেখার অভ্যাস ছাড়েননি। কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে এক একটা উপন্যাস লেখার জন্যে। অভাবের তাড়না কত সময় অনাদিপ্রসাদকে বাধ্য করেছে ভাল ভাল বই-এর কপিরাইট বিক্রি করে দিতে। না করে উপায় ছিল না, টাকার প্রয়োজন। বড় খোকার টাইফয়েডের সময় বড় ডাক্তার ডাকার মত হাতে পয়সা নেই, রমলা

হাতের দু'গাছা চুড়ি বিক্রি করতে চেয়েছিল। অনাদিপ্রসাদ তা করতে দেননি। এক ধনী লোকের হয়ে বেনামে উপন্যাস লিখে দেবার স্বীকৃতি জানিয়ে দেড় শ'টি টাকা নিয়ে এসেছিলেন। সেই উপন্যাস এখনও বাজারে চলে, তবে অন্যের নামে। নিজের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর মানস-কন্যাকে তার পিতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ছোট ছোট কত ঘটনা। জীবন-সংগ্রামের ছবি, কিন্তু সে জীবনে আনন্দ ছিল। প্রতি দিনের বেঁচে থাকার লড়াই-এ প্রত্যেককে চেনা যেত। অনাদি-প্রসাদের তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজেকে সাহিত্য-জীবনে প্রতিষ্ঠা করা, তার জন্যে প্রাণপাত করে খেটেছেন। রমলা চেয়েছিল, ঝড়-ঝাপটার হাত থেকে ছোট্ট সংসারটিকে বাঁচিয়ে রাখতে। তখন হাসিমুখে সে সংসারের সমস্ত কাজ করেছে, ছেলেদের মানুষ করেছে, স্বামীকে উৎসাহ দিয়েছে। ফুটফুটে দুটি ছেলে মা বাবার স্নেহচ্ছায়ায় ক্রমশ বেড়ে উঠেছে।

ক্রমে অনাদিপ্রসাদের নাম হলো, টাকা হলো, গাড়ি হলো, বাড়ি হলো। এখানে গৃহপ্রবেশের দিন কত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রকাশক ও ভক্তদের ভিড়। সেদিন হয়তো অনাদিপ্রসাদের মনে হয়েছিল তিনি খুব সুখী, কারণ যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন!

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এ তাসের ঘর, যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে। নিশ্চয় নীচে বসে রমলা ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করছে, পরেশচন্দ্র যে উপদেশ দিয়েছেন কিভাবে তা কার্যকরী করা যায়। অথচ এ-বাড়ি না থাকলে এত সব দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আশ্চর্য মানুষের মন। বাড়ি যখন তৈরি হয়, প্রায় প্রতিদিন অনাদিপ্রসাদ স্ত্রীকে নিয়ে আসতেন, ছাতা মাথায় ঘুরে ঘুরে দেখতেন মিস্ত্রীরা ঠিকমত কাজ করছে কিনা। ছোটখাট পরিবর্তন, কত মাজা ঘষা, তবে না মনের মত করে বাড়িটি তৈরী হয়েছিল, তারপর ঘুরে ঘুরে আসবাবপত্র কেনা, যাতে বেশি খরচ না হয় অথচ মানানসই হয়। প্রতিটি নক্সা নিজের হাতে করা।

ক্লান্ত অনাদিপ্রসাদ হাতমুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কেন জানা নেই তাঁর দু'চোখে জল ভরে এল। কোন একটি বিশেষ চিন্তা যে তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে তা নয়। অতীতের অনেক কথাই মনে পড়ছে, স্নেহ ভালবাসায় ভরা একটা নিবিড় সম্পর্কের কথা। সবই যে আজ আলগা হয়ে গেছে। এ অশ্রু বোধহয় তারই জন্যে।

অনাদিপ্রসাদের তন্দ্রা এসেছিল, খুটখাট আওয়াজে চোখ মেলে তাকালেন, দেখলেন রমলা বউদি আলমারী খুলে অন্ধকারে কি যেন হাতড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি খুঁজছ রমি?

রমলা বউদি চমকে ওঠেন, কিছু না তো! তুমি জেগে আছ বুঝি?

—এখুনি ঘুম ভেঙে গেল।

—খেয়েছিলে?

অনাদিপ্রসাদ মিথ্যা বললেন, হ্যাঁ। তারপর আস্তে আস্তে গম্ভীর গলায় বলেন, এ বাড়ির দলিল? বাঁদিকের দেরাজে পাবে। ইনসিওরেন্সের পলিসি-গুলো আছে আমার টেবিলের দেরাজে। আর ব্যাঙ্কের চেকবই, পাশবুক সে তো সব তোমার কাছেই আছে।

রমলা বউদির গলা শুকিয়ে যায়, তুমি কি করে জানলে যে আমি এই-গুলো খুঁজছি।

—যদি কখনও খোঁজ তাই বলে রাখলাম। আজ আমি আছি, কিন্তু কাল নাও তো থাকতে পারি।

—তার মানে?

অনাদিপ্রসাদ মৃদু হাসলেন, মানুষের জীবনের কথা কেউ কি কিছু বলতে পারে।

এরপর রমলা বউদি আরও দু-একটা কথা বলেছিল কিন্তু অনাদিপ্রসাদের কাছ থেকে কোন উত্তর পায়নি, ভাবল বোধহয় আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সে রাত্রে অনাদিপ্রসাদ ঘুমাননি। স্ত্রী শুয়ে পড়ার পর উনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছেন। আস্তে আস্তে নেমে গেছেন নীচে, হাজির হয়েছেন ছেলেদের ঘরে। দেখতে দেখতে এরা বড় হয়ে গেছে, সেদিনের শিশু আজ যুবক। সামনে তাদের নতুন জীবন, নিজেদের ভাল করে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাই চায় না অহেতুক কোন বাধা-বিপত্তি এসে পড়ে সামনে। অনাদিপ্রসাদ ওদের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে প্রার্থনা করলেন এরা যেন সুখী হয়। কপালে হাত দেবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সে লোভ সামলালেন পাছে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারের মধ্যে ফিরে আসছিলেন, ধাক্কা লেগে একটা ছোট টেবিল উল্টে গেল। বড় খোকা সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল খাটে, সভয়ে প্রশ্ন করল, কে, কে ওখানে।

অনাদিপ্রসাদ ছোট্ট উত্তর দিলেন, আমি।

ছেলের গলায় বিস্ময়, এত রাত্রে এখানে কি করছ?

—কিছু না, এমনি।

অনাদিপ্রসাদ কিন্তু বুঝতে পারলেন, বড় খোকার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা, কিসের যেন ভয়, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কিছু খুঁজছ?

—কি খুঁজব?

আর কথা না বাড়িয়ে অনাদিপ্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলেন বড় খোকা ব্যস্ত ভাবে ছোট ভাইকে ঘুম থেকে তুলল। হঠাৎ কেন বাবা ওদের ঘরে গিয়েছিলেন তাই নিয়ে ভীতত্রস্ত

আলোচনা। অনাদিপ্রসাদ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ছেলেরা তাঁকে ভয় পাচ্ছে কেন, কি এমন তিনি করেছেন যাতে তাদের মনে সংশয় জেগেছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছিলেন, পিছন ফিরে দেখলেন দুই ছেলেই দরজায় দাঁড়িয়ে। হাসবার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল? তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল, কোন জবাব দিতে পারল না।

অনাদিপ্রসাদ উপরে উঠে এলেন, বুঝতে পারলেন ছেলেরা তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সমাজের কাকেরা তাঁর নামে যে কুৎসা রটাচ্ছে তারা তা বিশ্বাস করছে, হয়তো ভয় পেয়েছে যদি অনাদিপ্রসাদের শেষ পর্যন্ত ভীমরতি হয়, যদি তারা বঞ্চিত হয় পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে। নয়তো চোখেমুখে কেন ওই বিহ্বল আশঙ্কা।

অনাদিপ্রসাদের মন যখন এইভাবে ক্ষত-বিক্ষত তখন তাঁর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলেন সাধনবাবু। সম্পাদককে লেখা তার একটা চিঠি বার হলো সাপ্তাহিক নর্দমায়। সাধনবাবু সম্পাদককে ধন্যবাদ দিয়েছেন অনাদিপ্রসাদের মত সাধুর মুখোশ-পরা লম্পটের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছে বলে। এ থেকে সমাজ উপকৃত হবে, শিক্ষা পাবে, কারণ তিনি নিজে ভুক্তভোগী। ভদ্রলোক অকপটে লিখেছেন, তার বিংশোত্তরী কন্যা মীনার সর্বনাশের কারণও নাকি ওই অনাদিপ্রসাদ। মেয়েটা আজ পাগল অবস্থায় বিধবার জীবন যাপন করছে, নয়তো তাকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে সাধনবাবু প্রমাণ করে দিত, বিয়ের লোভ দেখিয়ে মেয়েকে তার বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাবার মূলে আছেন ওই ভণ্ড লেখক অনাদিপ্রসাদ।

আহা, চচ্চড়িতে যেন ফোড়ন পড়ল, জিভে শান দিয়ে সকলেই প্রায় এই নোংরা আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল।

—বাবা যা রটে তার কিছু বটে, কি ভদ্রলোক সেজে থাকত, যেন হাফ সন্ন্যাসী। তার তলায় তলায় এত ছিল।

—লোকটা রসিক, মেয়েগুলোর বয়েস দেখছিস না, কুড়ির নীচে, তবে না পিরীত।

—যত শালা বাস্তববাদী সাহিত্যিক, সব শালার চরিত্র খারাপ।

পথেঘাটে রেস্তরাঁয় সর্বত্র এই আলোচনা। ছেলেরা লজ্জায় বাড়ি থেকে বার হওয়া বন্ধ করল। রমলা বউদি ঢুকলেন পুজোর ঘরে, কিন্তু কৌঁসুলী পরেশচন্দ্র হুঁশিয়ার হয়ে রইলেন পাছে না সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়। বোন আর ভাগ্নেদের সঙ্গে নানারকম শলা-পরামর্শ, ফন্দি-ফিকির।

সকলের আস্থা, তুমি যা করবে তাই হবে, তোমার ওপরই ভরসা করে আছি। পরেশচন্দ্র সদম্ভে ঘোষণা করেন, আমি ওসব সাহিত্যিক-টাহিত্যিক

মানি না। সমাজে বাস করতে গেলে মানুষকে মানুষের মত থাকতে হবে, এসব কি নোংরামি। বাচ্চা বাচ্চা সব মেয়ে নিয়ে ছি, ছি।

ছেলেদের প্রস্তাব, মামা তুমি একবার বাবার সঙ্গে কথা বল না।

—তাই বলতে হবে দেখছি।

॥ উনচল্লিশ ॥

অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে পরেশচন্দ্রর সাক্ষাৎ হয়েছিল, অপ্রত্যাশিতভাবে নয়, আগে থেকেই পরেশচন্দ্র সময় ঠিক করে নিয়েছিলেন। দেখা হতেই বললেন, অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

অনাদিপ্রসাদ মৃদু হাসলেন, আমি তো ভেবেছিলাম বিষয় একটাই!

—কি?

—যা নিয়ে সবাই আলোচনা করছে, যা নিয়ে কাগজে লেখালেখি চলছে, যা আপনারা সবাই বিশ্বাস করছেন।

পরেশচন্দ্র থতমত খেয়ে যান, তা ঠিক নয়।

—কেন কথা ঘোরাবার চেষ্টা করছেন, আমি তো বোকা নই। বুঝতে পারছি আমি একঘরে হয়ে গেছি। নর্দমায় ছাপা নোংরা কাহিনী শুধু আপনার কেন, রমলার, ছেলেদের মনও বিষিয়ে দিয়েছে।

—তুমি এ সবের প্রতিবাদ করলে না কেন?

—তাতে কি লাভ হতো।

—তবু তো আমাদের মুখ থাকত। প্রতিবাদ না করার অর্থ সবকিছু সত্যি বলে তুমি মেনে নিলে।

অনাদিপ্রসাদ উদাস গলায় বললেন, যা ঘটবার ঘটে গেছে, কাঁচে ফাটল ধরেছে আর জোড়া লাগাবার উপায় নেই।

পরেশচন্দ্র শঙ্কিত হন, তাহলে তুমি এখন কি করতে চাও?

অনাদিপ্রসাদের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি জাগল, বললেন, ভাবছি, যে মেয়েটিকে নিয়ে এত কেলেঙ্কারি তার নামেই আমার বিষয় সম্পত্তি সব লিখে দেব।

ব্যস্, আগুনে যেন ঘি পড়ল। পরেশচন্দ্র দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন, সত্যিই দেখছি তোমার ভীমরতি হয়েছে। নয়তো এরকম পাগলামী কেউ করে! তবে এইটুকু জেনে রেখ, তুমি যত চেষ্টাই কর, আমার বোন, ভাগ্নেদের বঞ্চিত হতে আমি দেব না; যদি তুমি উইলও কর আমি কোর্টে প্রমাণ করে ছাড়ব তুমি পাগল, মাথার ঠিক নেই, তাই পাগলামির ঝোঁকে এইসব করেছ।

অনাদিপ্রসাদ হো হো করে হাসলেন, বলিহারি আপনাদের, এতদূর পর্যন্ত

ভেবে ফেলেছেন। সামান্য এই সম্পত্তির জন্যে আমার স্ত্রী, আমার ছেলেরা আমাকে পাগল সাজাতে চায়। চমৎকার, আর তো কিছু বলার নেই, এবার উঠি।

—সে কি, কোন কথাই তো হলো না।

—নাই বা হলো। অনাদিপ্রসাদ আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত পায়ে রাস্তায় নেমে গেলেন। থামলেন না, চললেন। পথ চলার নেশা আজ তাঁকে পেয়ে বসেছে, কত রকম ছবি ফুটে উঠছে। সে-সবদিকে খেয়াল না করে তিনি শুধু এগিয়ে চললেন। যখন খুব শ্রান্ত মনে হলো, উঠে বসলেন ট্যাক্সিতে; বললেন, চলুন, দক্ষিণেশ্বর।

গেটের কাছে সাধুজী দাঁড়িয়েছিলেন, সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন, কি, কাক চিল সবাই মিলে তাড়া করেছে বুঝি, তাই পালিয়ে এসেছ?

অনাদিপ্রসাদ সমর্থন জানান, ঠিক বলেছেন সাধুজী।

—ওদের নজর কিন্তু তোমার হাতে যে খাবারভরা শালপাতার ঠোঙা আছে তার দিকে। ছুঁড়ে ফেলে দাও না ভাই, ল্যাঠা চুকে যাবে। কেউ আর তোমায় বিরক্ত করতে আসবে না, তখন মন দিয়ে কাজ করতে পারবে।

অনাদিপ্রসাদ বললেন, আমিও তাই ভাবছি।

—দেখছ না আমার ঐ আশ্রমের ওপর আকাশ পরিষ্কার, কাক চিল, কারুর উপদ্রব নেই, আর ঐ দেখ গৃহস্থের বাড়ির ওপরে ওরা পাক খাচ্ছে। যদি কোন সুযোগে বড়িটা, মাছটা, মাংসটা নিয়ে পালাতে পারে।

সেদিন অনেক কথা হলো। বিদায় নিয়ে অনাদিপ্রসাদ যখন চলে আসছেন, সাধুজী স্নিগ্ধ হেসে বললেন, অনেকের বাড়ির দরজা তোমার জন্যে বন্ধ হলেও এ আশ্রম সব সময় খোলা থাকবে, যখন খুশী চলে এসো। আমার যে ভাবে চলে যাচ্ছে তোমারও চলে যাবে।

চেষ্টা করেও অনাদিপ্রসাদ চোখের জল সামলাতে পারলেন না।

সেইদিন থেকে অনাদিপ্রসাদ আর বাড়ি ফেরেননি। কোন আত্মীয়স্বজনের কাছেও যাননি। প্রথমটা খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে সবাই চিন্তিত হয়েছিল মানুষটা সত্যিই যদি উইল বদলায়, মামলা মকদ্দমা এড়ানো যাবে না। তাতে শুধু হাঙ্গামাই বাড়বে না, খবরের কাগজে পারিবারিক কেচ্ছাকাহিনী বেরতে থাকবে।

রমলা বউদি হাউ মাউ করে কেঁদেছে, তাহলে আমাদের কি হবে দাদা? পরেশচন্দ্র উপদেশ দিয়েছেন, ধৈর্য হারাসনি, দু'দিন শক্ত হয়ে থাক, দেখি না শেষ পর্যন্ত কি হয়।

দু'দিনও তাদের অপেক্ষা করতে হয়নি, অনাদিপ্রসাদের অ্যাটর্নী খবর দিল অনাদিপ্রসাদ এ-বাড়ি স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছেন, ইন্সিওরেন্সের পলিসির 'নমিনি'ও রমলা বউদি, ব্যাঙ্কের টাকা জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টে আছে, অতএব এখন থেকে রমলা বউদি চেক কাটতে পারবে। এ সবের উপর কোন স্বত্বই অনাদিপ্রসাদ রাখেননি।

উৎকণ্ঠিত পরিবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। যাক্, কিছুই তাহলে হাতছাড়া হয়নি।

কিন্তু হুঁশিয়ার পরেশচন্দ্র জিজ্ঞেস করতে ভোলেননি, অনাদিপ্রসাদের বই-এর রয়্যালটি কে পাবে, সেই তো আসল টাকা।

অ্যাটর্নী জানাল, সে ব্যবস্থাও উনি করছেন, পরে আপনাদের জানাব।

—কিন্তু অনাদি এখন আছে কোথায়?

—তা তো জানি না। এর মধ্যে দু'দিন আমাদের অফিসে এসেছিলেন। আবার কবে আসবেন তাও বলেননি।

—আশ্চর্য।

অনাদিপ্রসাদ কিন্তু আগের মতই শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছেন। পরিচিত জনের কাছে যাননি, অপরিচিতের ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন, একদিন খেয়াল হয়েছিল গিয়েছিলেন আফিম মিত্তিরের খোঁজে। পার্কের কাছে বস্তি, খোঁজখবর করতে একজন প্রৌঢ় লোক বেরিয়ে এল, প্রশ্ন করল আফিমদা কি আপনার আত্মীয়?

অনাদিপ্রসাদ জানালেন, না। ঐ পার্কে পরিচয় হয়েছিল।

—আমরা খুঁজছি, যদি ওঁর আত্মীয়স্বজন কেউ এসে পড়ে।

—কেন?

—আফিমদা মারা গেছে। দিব্যি লোক মশায়, রাত্রিবেলা আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে শুয়ে পড়ল, সকালে আর ঘুম থেকে উঠল না। আমার পাশে চৌকিতে শুয়ে ছিল, ডাকতে গিয়ে দেখি শক্ত কাঠ শুয়ে আছে। এতটুকু কষ্ট পায়নি।

—তারপর?

—শুনেছিলাম হাওড়ায় আফিমদার বাড়ি, বউ ছেলে সব আছে, খবরও পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ আসেনি। যাক, তবু আপনি খোঁজ নিলেন। লোকটা মশাই পুণ্যাত্মা ছিল, মরেছে তখনও মুখে হাসি।

ওখান থেকে চলে আসার পথে অনাদিপ্রসাদ সেই পার্কে ঢুকলেন। সেই গাছের ছায়া, সেই বেঞ্চি, সেই লোকটা যে গেটের কাছে বসে চা বানাচ্ছিল।

অনাদিপ্রসাদের মনে হলো, আফিম মিত্তিরের আবৃত্তি শুনতে পাচ্ছেন, দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার।

পরিচিত জনের মধ্যে মনুয়ার সঙ্গে একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন অনাদিপ্রসাদ। মনুয়া তখন কোন পার্টিতে যাবার জন্যে সাজছিল, তবু অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে প্রসাধন না সেরেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

—কি ব্যাপার বলুন তো আপনার, কোথাও খোঁজ করে পাচ্ছি না, কোথায় ছিলেন এতদিন?

অনাদিপ্রসাদ পাল্টা প্রশ্ন করলেন, হঠাৎ আমার খোঁজ পড়লই বা কেন?

—বাঃ, আপনি যে আমার লোকাল গার্জেন।

এ কথায় হাসবার চেষ্টা করেও দুজনে পারল না। এই একটা সহজ সম্পর্ককে নিয়ে কম প্রহসন তো হয়নি।

মনুয়া বললো, আমি অনেকবার আপনার বাড়িতে ফোন করেছি, বাড়ির লোকেরা তো কিছুই বলতে চায় না, তবে ঝি-চাকররা ধরলে বলে ফেলে আপনি বাড়িতে নেই, থাকেন না।

—সত্যি, অনেকদিন যাইনি।

—তাহলে এখন কোথায় থাকেন?

—এত বড় কলকাতার শহরে আবার থাকার ভাবনা। হোটেল আছে, ধর্মশালা আছে, দুটো বড় বড় স্টেশন আছে, গড়ের মাঠ আছে, ফুটপাথ আছে।

মনুয়া রাগের ভান করে বলে, ওসব কথা আমি শুনব না, আপনাকে এইখানে এসে থাকতে হবে, আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

অনাদিপ্রসাদ হাসলেন, অসুবিধা আমার হবে কেন, এই দু'খানা ঘরের মধ্যে আমাকে রাখতে গেলে তুমিই হাঁফিয়ে উঠবে।

—মোটেও না। কালই গিয়ে আপনার জিনিসপত্র সব নিয়ে আসব।

—জিনিসপত্র তো আমার কিছু নেই।

মনুয়া গম্ভীর হয়ে বলে, তাও আমি শুনেছি। আপনি সবকিছু অন্যদের লিখে দিয়েছেন।

অনাদিপ্রসাদ বিস্মিত হন, তুমি কি করে জানলে?

—বাঃ, আজকাল তো এই নিয়ে খুব আলোচনা হয়। আগে লেখক হিসেবে যত না নাম ছিল এখন কিন্তু এই ব্যাপারের জন্যে আরও বিখ্যাত হয়ে গেছেন। আমারও কি এখন কম খাতির! কত লোক আসছে, এমনকি কাগজ-ওয়ালারাও। আপনার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছে।

—তা তুমি কি বল?

মনুয়া দুষ্টুমী করে বলে, তা বলব কেন? তবে এইবার আপনাকে আটক করে রাখব, জোর করে লেখাব।

—এসব বুদ্ধি কে তোমার মাথায় ঢোকাল?

—আপনার প্রকাশক, সুনীল রায়।

অনাদিপ্রসাদ অবাক না হয়ে পারেন না। সুনীল সত্যিই নাছোড়বান্দা, রমলাকে ছেড়ে এখন মনুয়াকে ধরেছে, অনাদিপ্রসাদকে দিয়ে সে সোনার ডিম পাড়াবেই।

অনাদিপ্রসাদ উঠে পড়েন, এসেছিলাম তোমার কাছে বিদায় নিতে।

মনুয়া এ কথা শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। জিজ্ঞেস করে, সে কি, কোথায় যাচ্ছেন?

—কিছু ঠিক করিনি। অনেকদিন তো কলকাতায় কাটানো গেল, তাই ভাবছি—

মনুয়া ব্যস্ত হয়ে বলে, না, না, এ ভাবে আমি আপনাকে চলে যেতে দেব না। যাচ্ছেন অভিমানে, কিন্তু দোষ তো আমার।

অনাদিপ্রসাদ মাথা নাড়েন, দোষ কারুর নয়। দরকার ছিল। নিজেকে এখন খুব হাল্কা মনে হচ্ছে। অনেকদিন লিখিনি, এবার বোধহয় লিখতে পারব। আজ চলি মনুয়া, আবার হয়তো দেখা হবে।

মনুয়ার চোখ ছল ছল করে উঠল, কিন্তু অনাদিপ্রসাদকে বাধা দিতে সাহস করল না।

॥ চল্লিশ ॥

স্বেচ্ছায় একটা জলজ্যান্ত মানুষ হারিয়ে গেল।

প্রতিদিনই তো কত লোক এই রকম হারিয়ে যায়, জীবন থেকে সরে যায়, পথ চলতে খসে পড়ে—কে আর তার খবর রাখে! ব্যস্ত শহর কলকাতার ব্যস্ততা তার জন্যে এতটুকু কম-বেশি হয় না। আগের মতই ভোরবেলা শহর জেগে ওঠে, ফুটপাথের বাসিন্দারা বিছানা গোটায়। গৃহস্থেরা উনুনে আগুন দেয়, খবরের কাগজের হকারদের চেঁচামেচি। ক্রমে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম-বাস-মোটরগাড়ির প্রতিযোগিতা, স্কুল কলেজ, অফিসের ভীড়। সবকিছুই সমান তালে চলতে থাকে। অনাদিপ্রসাদকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কে? কবিতার মত মেয়েরা আজও রানাঘাট লোকালে চেপে রুজি-রোজগারের জন্যে শেয়ালদায় অসে, মিতারা নিত্য নতুন বাবুদের আশায় ঘরের দরজা খুলে রাখে, সৌরভ সেনেরা আজও চিত্র প্রযোজকের মরীচিকা

দেখে, সাধনবাবুরা মিথ্যা আস্ফালন করে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে। শশধর বোসরা রাজনীতির নেশায় মত্ত, বাস্তুঘুঘুরা নানারকম ফরমুলার কক্‌টেল অনবরত যুগিয়ে যায়, সুনীল রায়েরা খুঁজছে রাজহাঁস যারা সোনার ডিম পাড়বে। অনাদিপ্রসাদ গেল তো কি হলো—নতুন অনাদিপ্রসাদ তার চাই। মিস্‌ কলকাত্তারা রাজত্ব করছে, সদা ব্যস্ত তাদের ছিন্‌তাই পার্টি। এখনও টিন-এজাররা মে ফ্লাওয়ারে বিলিতি বাজনার সঙ্গে ঝমঝমিয়ে নাচছে। ছিট্‌কে পড়া মনুয়ারা দেহকে মূলধন করা ছাড়া উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। মীনারা অন্ধকার ছাদে কাঁদছে, সমীরা দেবদাস। স্বরূপ লাহিড়ীদের বাড়িতে অবজ্ঞার নাটকের একঘেঁয়ে অভিনয়। মোহনচাঁদরা ব্যবসা করে টাকার মিনার তুলছে, শেঠিয়ারা দৌড়চ্ছে ঘোড়ার পিছনে; আর যাদুকাঠির স্পর্শে কালো টাকাকে সাদা বানাচ্ছে।

দিনের বেলা কলকাতার ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়, হাওড়া আর শেয়ালদা স্টেশনে অজগর ট্রেনগুলো মানুষ বমি করে। আবার সন্ধ্যেবেলা তারাই প্রচণ্ড নিঃশ্বাসের টানে জনতাকে পেটে পুরে উধাও হয়ে যায়। এই ভয়ঙ্কর ডামাডোলের মধ্যে অনাদিপ্রসাদের কথা চিন্তা করার মতো বাড়তি সময় কার হাতে আছে? হয়তো রমলা বউদি আর বাড়ির ছেলেরা প্রথমটা চিন্তিত হয়েছিল, কিন্তু অনুসন্ধান করার সাহস হয়নি। শেষ পর্যন্ত যদি মানুষটা মনুয়া না কি নাম, যাকে নিয়ে এত বিপত্তি, সেই ছুঁড়িটার ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠে থাকে, তাহলে যে সমাজে আর লজ্জায় মুখ দেখানো যাবে না। পরেশচন্দ্র বুঝিয়েছেন, ভীমরতি ধরলে মানুষের নাকি এই রকমই হয়, অনেক মেয়ে নাকি এখনও বশীকরণের মন্ত্র জানে, পুরুষ মানুষদের তারা ভেড়া বানায়। সত্যি মিথ্যে যাই হোক, এটর্নী মারফৎ টাকাকড়ি সম্পত্তি সবকিছু পেয়ে গিয়ে অনাদিপ্রসাদ সম্বন্ধে বাড়ির লোকেরা নীরব হয়ে রইলেন। বাইরের লোক কেউ ফোন করলে বা খবর নিতে এলে ওরা জানাত অনাদিপ্রসাদ চেঞ্জে গেছেন।

এ উত্তরে কিন্তু অশোক জানা সন্তুষ্ট হয়নি। জিজ্ঞেস করেছে, ঠিকানা? ওরা বলেছে, জানি না।

অশোক জানা মাসখানেক ধরে এদিক ওদিক অনাদিপ্রসাদের খোঁজ নিয়েছিল কিন্তু কেউই বিশেষ কোন খবর দিতে পারেনি। প্রকাশক মহলও নয়, সাপ্তাহিক 'নর্দমা'ও নয়, কি মনুয়া লাহিড়ীও নয়।

কিন্তু আশ্চর্য! হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় প্রেস থেকে বেরুতে গিয়ে অশোক জানা দেখল রাস্তার অপর ফুটপাথে অনাদিপ্রসাদ দাঁড়িয়ে। প্রথমটা চিনতে অসুবিধে হয়েছিল, একমুখ দাড়ি গোঁফ, রুক্ষ চুল, গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা। অশোক জানা সসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করে, অনাদি না?

মানুষটা হাসল, কেন, চিনতে পারছ না?

—তা নয়, অত বড় দাড়ি গোঁফের জন্যে ঠিক বুঝতে পারিনি। এতদিন কোথায় ছিলে, কেউ তোমার খবর দিতে পারছে না।

—খুব ঘুরছিলাম, দেশটাকে দেখছিলাম। কখনও ট্রেনে, কখনও বাসে, সাইকেল রিকশায়, নৌকোয়, গরুর গাড়িতে; অবশ্য সবচেয়ে বেশি পায়ে হেঁটে।

অশোক জানা ব্যস্ত হয়, বড্ড রোগা লাগছে, শরীর খারাপ হয়নি তো?

—তা জানি না। তবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কিছুদিন বিশ্রাম করতে হবে। আর তাছাড়া—

—কি?

—একেবারে হাতখালি, কিছু টাকার দরকার।

অশোক জানার আরও বিস্ময়, কার কাছে যেন শুনেছিলাম তুমি বাড়িঘর সব বউ-ছেলের নামে লিখে দিয়েছ, কিন্তু নিজের জন্যে কি কোন ব্যবস্থাই রাখোনি?

অনাদিপ্রসাদের সহজ উত্তর, তুমি ভুলে যাচ্ছ, একজন অনাদিপ্রসাদ মারা গেছে, তার যা কিছু ছিল স্বাভাবিক কারণেই দিয়ে গেছে নিজের পরিবারকে, আমি তো আর একজন মানুষ। আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। টাকা ধার চাইবার জন্যে আর কারুর কাছে না গিয়ে তোমার কাছে এলাম। পরে শোধ করে দেব।

অশোক জানার মাথাটা ঠিক কাজ করে না, তাড়াতাড়ি বলে, এসো ভেতরে এসো। নিশ্চিন্ত হয়ে বসো দেখি, তারপর আমি সব করছি।

অনাদিপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললেন, তুমি ভাবছ বাড়িতে একটা ফোন করে খবর দেবে, ভাবছ সুনীল রায়ের কাছে আমাকে ধরিয়ে দেবে, কিন্তু খবরদার কোন রকম কৌশল করার চেষ্টা করো না, তাহলেই আমি আবার পালিয়ে যাব। হয় টাকা ধার দাও নয়তো কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার মতো একটা জায়গা করে দাও। এটুকু বলতে পারি এতে তোমার লোকসান হবে না, কারণ আমি আবার ডিম পাড়ছি। সুনীল রায় যাকে বলে সোনার ডিম।

অশোক জানার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তুমি আবার লিখছ অনাদি! কি, উপন্যাস!

—হ্যাঁ, এবারের প্রকাশক হবে অশোক জানা।

—ব্যস, ব্যস, ঠিক আছে। প্রেসের ওপরেই তোমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কোন অসুবিধে হবে না, নিজের মনে তুমি শুধু লিখবে।

অনাদিপ্রসাদ শর্ত করে নেন, কেউ যেন জানতেও না পারে যে আমি এখানে আছি, এ হবে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। কি, রাজী?

রাজী।

প্রেসের উপরতলায় যে ঘরে অনাদিপ্রসাদের থাকার ব্যবস্থা করল অশোক জানা, সে ঘরটা আগে প্রেসের গুদাম ঘর হিসেবে ব্যবহার হতো। অবশ্য মাল বেশি মজুত ছিল না, তাই সরিয়ে ফেলতে দেরী হলো না। ঘরের কোণায় একটা চৌকি পেতে বিছানা করা হলো, কেঠো টেবিল-চেয়ার প্রেসের থেকে ওপরে তোলা হলো। এক কোণায় নড়বড়ে একটা আলনা, একটা টুলের ওপর মাটির কুঁজো আর জলের গেলাস। ঘরের সংগে লাগোয়া এক টুকরো ছাদ, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে রাজাবাজারের বিস্তীর্ণ বস্তির খোলার চাল দেখা যায়। উপরে খানিকটা আকাশ, বাঁদিকে দম বন্ধ করা একটা উঁচু বাড়ি, বোধহয় মেয়েদের হোস্টেল।

প্রথম দুটো দিন অনাদিপ্রসাদ বেশির ভাগ সময়টাই ঘুমিয়ে কাটালেন। খাবার সময় উঠে অল্পকিছু খেয়ে আবার শুয়ে পড়তেন। ভয় পেয়ে অশোক জানা জিজ্ঞেস করেছিল, কোন ডাক্তার ডাকব নাকি?

—না, না, এ শুধু পথ চলার ক্লান্তি, দু' দিন জিরোলেই ঠিক হয়ে যাবে। তারপর আবার লিখতে শুরু করব। প্রায় শেষ করে এনেছি, শেষের কয়েকটা পরিচ্ছেদ বাকী আছে।

—কি লিখছ?

—বানানো কোন গল্প নয়, মিথ্যে উপন্যাসও নয়। কতগুলো রক্ত-মাংসের গড়া মানুষের কথা, তার মধ্যে তুমি আছ, আমি আছি, কবিতা আছে, স্বরূপ লাহিড়ী আছে, ববি-মনুয়া আছে, আরও অনেকে আছে। আছে আজকের সমাজের কথা, দেশের অবস্থার কথা। মা কি ছিলেন, মা কি হইয়াছেন। লিখতে শুধু বাকী মা কি হইবেন।

—উপন্যাসের কি নাম দিয়েছ?

—এখনও কিছু ঠিক করিনি, পরে দেব।

অশোক জানা কৌতূহল সামলাতে পারে না, বলে, যদি তোমার আপত্তি না থাকে যতটা লেখা হয়েছে আমাকে দাও না, পড়ে দেখি।

অনাদিপ্রসাদ অসম্মতি জানান, এখন থাক। একেবারে ছাপা হলে পড়ো।

সত্যিই ক'দিন বাদ থেকে অনাদিপ্রসাদ পুরোদমে লিখতে শুরু করলেন। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত এক নাগাড়ে টেবিলে বসে লেখেন, দিস্তের পর দিস্তে কাগজ শেষ হয়ে যায়। পাছে কেউ বিরক্ত করে তাই প্রায় সব সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখেন। দুপুর বেলা একবার কবিতা ঢোকে খাবার দিতে, লেখার মেজাজ থাকলে তখন কোন কথাবার্তা হয় না। তবে মাঝে

মাঝে কবিতার প্রশ্নের উত্তর দেন।

কবিতা বলে, সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। মাঝে মাঝে ফাঁকা হাওয়ায় বেড়িয়ে এলে পারেন।

অনাদিপ্রসাদ খেতে খেতে বলেন, ফাঁকা হাওয়া তো কলকাতার শহরে নেই, তা ছাড়া এক মাস এত হেঁটেছি যে, এখন কিছু দিন না হাঁটলেও চলবে।

মেয়েলী সহানুভূতি, এখানে নিশ্চয় আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। এরকমভাবে তো থাকা অভ্যেস নেই।

—আমি কিন্তু মহা আনন্দে আছি। আমার এই নতুন বইতেও এমন কয়েকজনের কথা লিখছি যারা ডানলোপিলোর নরম গদীতে শুয়েও সারা রাত ছটফট করে, ঘুমতে পারে না। আবার তাদের কথাও লিখছি যারা ফুটপাথে ইঁট মাথায় দিয়ে ঘুমচ্ছে। সব রকম জীবনই তো দেখলাম, বিভিন্ন পরিবেশে নিজেও কাটালাম। সার কথা হলো, আনন্দ না থাকলে বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না।

কবিতার অতি সহজ প্রশ্ন, আপনি আনন্দে আছেন?

অনাদিপ্রসাদের স্পষ্ট উত্তর, না থাকলে তো নতুন করে লিখতে পারতাম না, নতুন কিছু সৃষ্টি করতেও পারতাম না।

এরই মধ্যে একদিন অশোক জানার প্রেসে মিঃ দত্ত এসেছিল মোটর সাইকেল চড়ে, সঙ্গে স্ত্রী পুত্র, আর একঝুড়ি ফল মিষ্টি।

অশোক জানা জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, অনেক দিন বাদে যে?

মিঃ দত্ত হাসতে হাসতে বলে, এলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে। বুঝতেই পারছেন ইনি মিসেস দত্ত আর এটি আমার ছেলে।

অশোক জানা বসবার জন্যে চেয়ার এগিয়ে দেয়। মিঃ দত্ত বলে, ওরা এসেছে প্রেস দেখতে, কি রকম করে মেসিনে ছাপা হয় তা একটু দেখিয়ে দিতে বলুন।

—বেশ তো চলুন, আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি।

দত্ত বাধা দেয়, আহা আপনি কষ্ট করবেন কেন, কাউকে বলুন না ওদের নিয়ে যাবে, তা ছাড়া আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

অশোক জানা কবিতাকে ডেকে বলল, ওদের প্রেস দেখিয়ে দিতে।

অশোক জানাকে একা পেয়ে মিঃ দত্ত সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে, আমার উপর আপনি খুব রেগে গিয়েছিলেন অশোকদা, কিন্তু আজ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন

আমি নিরুপায় হয়েই ওই জাল সার্টিফিকেটটা ছাপিয়ে ছিলাম। দেখুন আবার আমি ভাল চাকরি পেয়েছি, স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে সুখে ঘর করছি, অথচ ওই জাল কাগজটা না থাকলে আমরা খড়কুটোর মত ভেসে যেতাম। আপনার জন্যে এই সামান্য ফল মিষ্টি নিয়ে এসেছি। সেদিন টাকা নেননি কিন্তু আজ আশা করি এটি ফিরিয়ে দেবেন না।

অশোক জানা দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, তা আবেগে ভরে রয়েছে। সেই অবস্থায় ধরা গলায় বলে, অশোকদা, এই সঙ্গে অনেকগুলো ছাপার অর্ডারও এনেছি, এগুলো কিন্তু মিথ্যে নয়। আমার নতুন কোম্পানীর কাজ। আমাকে কোন কমিশনও দিতে হবে না, ন্যায্য বিল করবেন।

এরপরও দত্তরা আরও কিছুক্ষণ প্রেসে ছিল, নানারকম গল্প তারা করল। অশোক জানা তাদের চা মিষ্টি আনিয়ে খাওয়াল কিন্তু আলোচনায় বিশেষ যোগ দিতে পারল না, বেশির ভাগ সময়ই রইল চুপ করে।

দত্তরা চলে যাবার পর অন্যমনস্ক অশোক জানা আস্তে আস্তে দোতলায় উঠল। অনাদিপ্রসাদ তখন প্রায়-অন্ধকার ছাদে দাঁড়িয়ে। অশোক জানাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কারা যেন এসেছিল, বাইরে মোটর সাইকেল দেখে মনে হলো সেই দত্ত, আবার কোন সার্টিফিকেট ছাপার আবদার নাকি!

অশোক জানা সংক্ষেপে মিঃ দত্তর পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলে জিজ্ঞেস কবল, এর কি ব্যাখ্যা করবে বন্ধু? অন্যায়ের পথ ধরে গিয়ে ফল হলো শুভ, তবে কোনটা আসল,—ফলটা না পথটা? দত্ত লোকটাকে ভাল বলব, না খারাপ বলব। আমি জাল সার্টিফিকেট ছাপিয়ে দিয়ে ঠিক করেছি, না অন্যায় করেছি?

অনাদিপ্রসাদ গম্ভীর গলায় বলেন, প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা, তাদের জীবনের প্রতিটি ঘটনাও আলাদা। এর ভাল-মন্দের বিচার আলাদাভাবেই করতে হবে, একটার সঙ্গে আর একটা মিশিয়ে ফেললে কিন্তু আমরা ভুল করব। দত্ত মানুষটা সৎ বলে মিথ্যার আশ্রয় নিলেও সে শুভ ফল পেয়েছে। কিন্তু তাই বলে মোটেও ভেব না একজন অসৎ লোক ওই মিথ্যার প্রশ্রয় পেলে অন্যকে প্রতারণা করবে না। আজকের এই মিথ্যের দুনিয়ায় তোমার এই দত্ত একটি ব্যতিক্রম। এদের দেখলে তবু খানিকটা আশা হয়, ভরসা হয়, হয়তো শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধির জয় হবে।

অশোক জানা মাথা নাড়ে, কি জানি ভাই, তোমার মতো আমি দার্শনিক নই, বড় কথা ভাবতেও পারি না, তাই কেমন যেন ধাঁধা লাগে, কাকে বিশ্বাস করব কাকে করব না, ঠিক বুঝতে পারি না।

অনাদিপ্রসাদের উপদেশ, আমি কি বলি জানো, মানুষকে বিশ্বাস করে

ঠকাও ভাল, কিন্তু অবিশ্বাস করে যদি সত্যকে চিনতে না পারি তাহলে যে ক্ষ্যাপার নুড়ি কুড়োনর মত হবে, পরশ পাথর পেয়েও ফেলে দেবে।

অশোক জানা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, অনাদিপ্রসাদ থামিয়ে দেন, এবার যাই, গিয়ে লিখতে বসি।

—কথা শুনেই মনে হচ্ছিল তুমি এখনও লেখার রাজ্যে।

—হ্যাঁ, উপন্যাসটা শেষ করতে পারলে তবেই আমার মুক্তি, অনাদিপ্রসাদ যেন স্বগতোক্তি করেন।

ঘটনাটা ঘটল সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে।

ওই অঞ্চলেরই কোন এক পানের দোকানে হাজির হয়ে তিনজন লোক আবদার জানাল এক্ষুনি পঞ্চাশটা টাকা তাদের চাই। বলাই বাহুল্য, গরীব পানওয়ালা অযথা সে টাকা দিতে অস্বীকার করল। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে মিলে সেই পানওয়ালাকে দোকান থেকে রাস্তায় টেনে বার করল, তিনটে ছোরা বার করে মারল তার চোখে, মুখে, বুকে, স্থানে-অস্থানে। আর্তনাদ করতে করতে পানওয়ালা রাস্তার মাঝখানে পড়ে ছটফট করতে লাগল। অকুস্থলে পুলিস আসবার আগেই দুর্বৃত্তরা উধাও হয়ে গেল। জনতা অদূরে দাঁড়িয়ে নির্বাক বিস্ময়ে এই ভয়াবহ পৈশাচিক দৃশ্য দেখল, কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারল না, সাহস করে এগিয়ে গিয়ে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে কোন রকম সাহায্য করল না। গোলমাল শুনে অশোক জানার প্রেসের লোকেরাও ঘটনাস্থলে গিয়েছিল, ভয়ে শিউরে উঠে প্রেসে ফিরে এসে কলরব করতে শুরু করে।

অনাদিপ্রসাদ ওপর থেকে সব কথাই শুনতে পাচ্ছিলেন। ধীর পদক্ষেপে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন, একটা নিরপরাধ লোক খুন হলো, অথচ কেউ প্রতিবাদ করতে পারল না?

—কে করবে, তখনও যে পুলিস আসেনি।

—পুলিস কি করবে, অন্যরা তো সেখানে উপস্থিত ছিল।

—ছিল বই কি, অন্তত শ' পাঁচেক লোক, যারা ভয়ে ভয়ে দূর থেকে এই নৃশংস হত্যা দেখছিল।

অনাদিপ্রসাদ চীৎকার করে ওঠেন, তবু তারা বাধা দিতে পারল না, একদিকে পাঁচ শ' লোকের জনতা আর অন্য দিকে তিনজন মাত্র দুর্বৃত্ত, থাকুক ছোরা তাদের হাতে, কিন্তু যদি ওই পাঁচ শ' জনের জনতা ইচ্ছে করত তবে

কি তিনজন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করতে পারত না?

অশোক জানা বলল, হয়তো পারত, কিন্তু ওদের সাহসে কুলোয়নি।

অনাদিপ্রসাদের সরাসরি প্রশ্ন, তবে ওদের বেঁচে থেকে লাভ কি? ওই যে ক্লীব জনতা, নপুংসক, যারা শুধু মুখে সমালোচনা করে কিন্তু জীবনের সামনাসামনি দাঁড়াতে পারে না, তাদের বেঁচে থাকার কি অধিকার আছে? এরপরও যদি এ অহমিকা থাকে আমরা বাঙালী, আমরা মানুষ, আমাদের থুথু ফেলে ডুবে মরা উচিত। আমরা মিথ্যেবাদী, আমরা শঠ, যেখানে রুখে ওঠা প্রয়োজন সেখানে কিছু না করে আমরা হাজারো রকম শ্লোগান দিয়ে মিছিল বার করি, জিন্দাবাদের ধ্বনি তুলে মানুষকে বধির করে দিই। অথচ সত্যকে আঁকড়ে ধরার সাহস আমাদের হয় না, আমরা নূতন যুগের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছি। আমাদের শাস্তি পাওয়া উচিত।

প্রেসের সকলে সবিস্ময়ে অনাদিপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেই প্রশান্ত মানুষটা হঠাৎ আজ ক্ষেপে উঠেছে। চোখ মুখ উত্তেজনায় রাঙা, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে যায়, মানুষ যখন সাহস হারায়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না, তাকে আর মানুষ বলা উচিত নয়। এই বিশ বছরে আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়েছি। যদি বাঘ সিংহ হতাম তবু ভরসা ছিল, বুঝতাম আমাদের পরাক্রম আছে, কিন্তু হয়েছি শেয়াল, গায়ে শক্তি নেই, শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে বাজিমাৎ করতে চাই।

অনাদিপ্রসাদ পায়চারি করতে করতে হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে বলেন, নিজেদের দেশটাকেও চিনতে পারলাম না। কার দেশ, কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়, তাই তো সুবিধেবাদী নেতারা দেশটাকে নিয়ে ফাটকাবাজী খেলতে পারছে। ইংরেজরা চলে গেল, দলিল করে দান করে গেল স্বাধীনতা, দেশটা যেন বারোয়ারী সম্পত্তি, কে কতটা ভাগ হাতিয়ে নিতে পারবে তারই চেষ্টা। জাতীয় সংহতির নামে বড় বড় বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কোথায় সংহতি? দিন দিন প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, বিশ বছর ধরে তাদের ইন্ধন যোগান হয়েছে। যে ধর্ম এ দেশের সংহতি এত যুগ ধরে টিকিয়ে রেখেছিল তাকে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া হলো। ভারতের চার কোণে চারটি ধাম, সর্বত্র ছড়ানো একান্ন পীঠ, ভক্তেরা তীর্থ করতে গিয়ে সারা দেশ পরিক্রমা করত। এক জায়গার জল এনে আর এক জায়গায় দিত, তাদের পরিচয় তারা ভক্ত, কে কোন প্রদেশের লোক তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কে কোন ভাষায় কথা বলে তা নিয়ে ঝগড়া করেনি। কিন্তু আজ ভাষাচক্র চক্রান্ত করে সতীদেহের মত ভারতকেও খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে, শুধু বিভেদ আর বিচ্ছেদ, কোথায় সংহতি?

অনাদিপ্রসাদ একটু চুপ করে থেকে যেন নিজের মনেই বলেন, একেই

বলে সভ্যতার সংকট। এই সব দুর্লক্ষণ আর সামাজিক ব্যাধি প্রকট হয়ে ওঠে, অন্ধ রাজার রাজত্বেও তাই হয়েছিল। দুঃশাসনের ফলে দেশ-জোড়া তখন অশান্তি। পুরুষ বীর্যহীন, নারী অসতী। রাজনীতি নিয়ে শকুনি তখন পাশা খেলছে। সভ্যতার সেই চরম সংকট এড়াবার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ গৃহযুদ্ধের উপদেশ দিয়েছিলেন। সেদিনের সেই অশুভ লক্ষণগুলো আজ আবার দেখা দিয়েছে, আবার সেই সংকট, অতএব—

অনাদিপ্রসাদ কথা শেষ করলেন না, নীচু গলায় বললেন, যাই, লেখাটা শেষ করে ফেলি, আর সামান্য বাকি আছে। আজ তোমাদের যা বললাম তাই লেখবার চেষ্টা করছি, তাতে যদি কোন কাজ হয়, যদি আমাদের শুভবুদ্ধি জাগে।

অনাদিপ্রসাদ উপরে উঠে গেলেন, আলো জ্বালিয়ে লিখতে বসলেন। সে রাত্রে আর কিছু খেলেন না। লেখা শেষ করার জন্যে ভেতর থেকে কে যেন তাগাদা দিচ্ছে। আর দেরী হলে চলবে না, উপন্যাসের পরিণতি টানতে হবে।

অনেক রাত পর্যন্ত অনাদিপ্রসাদের ঘরে আলো জ্বলতে দেখা গেল।

তেমনি আলো জ্বলছিল বাস্তুঘুঘুর বাড়িতে। সেখানেও নিদ্রাবিহীন খেলা চলেছে—রাজনীতির নামে শকুনির পাশা খেলা। একঘর জনগণের আস্থা-ভোটে জয়ী জনপ্রতিনিধি, তারাই বাস্তুঘুঘুর প্রস্তাবে স্বাক্ষর দিচ্ছে।

পাশের ঘরে তীর্থের কাকের মতো বসে আছে সাংবাদিকরা। কে আগে খবরটা বার করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা।

কলকাতার বাসিন্দারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমচ্ছে, তারা জানে না গভীর রাতের অন্ধকারে তাদের ভাগ্য নিয়ে জুয়াখেলা চলছে—রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

পরের দিন ভোরবেলা নির্লজ্জ সংবাদপত্রে শকুনির ছবি ছাপা হলো—বাস্তুঘুঘু হাসছে, আজ তার জয়জয়কার।

বড় বড় হরফে শিরোনামা, 'সরকারের পতন ঘটল'।

॥ একচল্লিশ ॥

সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সারা শহর জুড়ে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। প্রথমে যা ছিল শহরের সামান্য অংশে সীমায়িত, যতই বেলা বাড়ে ততই তা হয়ে ওঠে বিস্তৃত। গুজবের কল্যাণে ঘটনা ও রটনা একীভূত হয়ে বিভীষিকা এনে দেয় শহুরে যাত্রীদের মনে। প্রথমে ট্রাম বন্ধ হয়, তারপর

বাস, তারপর ছোঁড়াদের ইট-পাটকেলের আক্রমণে ট্যাক্সিও বন্ধ হয়ে আসে। এখানে-ওখানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ছাদের ওপর থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে।

জটলা রাস্তার মোড়ে, বাড়ির রকে, ঘরে-বারান্দায়, আবার ছাদেও। রমলা বউদিরা ছেলেদের সাবধান করে দিলেন কেউ যেন আজ বাড়ির বাইরে না যায়, কখন কোথায় কি ঘটবে কে বলতে পারে। সাধনবাবুরা গলার শির ফুলিয়ে তর্ক করছে সরকারের পতন ঘটানো উচিত হয়েছে না হয়নি। পাগলী মেয়েটার মনে গোপন উল্লাস, হয়তো এই গোলমালের মধ্যে সমীরের সঙ্গে আবার মিলন হবে। মনুয়ারা ভয় পাচ্ছে একলা ফ্ল্যাটে থাকতে, কত জনকে ফোন করছে তাদের কাছে চলে আসার জন্যে, কিন্তু সকলেরই মনে শঙ্কা রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলছে না, কেমন করে তারা বেরুবে। মোহনচাঁদরা দারোয়ানদের হাতে বন্দুক ধরিয়ে দিয়েছে, তেমন গোলমাল বুঝলে আকাশের দিকে মুখ করে গুলী চালাও, শব্দ শুনে গুণ্ডারা পালিয়ে যাবে। স্বরূপ লাহিড়ীরা হুজুগে কলকাতা শহরকে অভিশাপ দিচ্ছে, যার মর্মার্থ : এখানে কাজকর্ম চালানো অসম্ভব। সুনীল রায়রা ভয়ে মুরগীর মতো কাঁপছে, যদি দপ্তরীপাড়ায় আগুন লাগে, হাজার হাজার টাকার বই-এর ফর্মা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মিতার ঘরে কাল রাত্রে যে বাবু ঢুকেছিল, আজও তাকে সে ছাড়েনি। অনুনয় করে জানিয়েছে, পয়সা দিতে হবে না, শুধু কাছে থাকলেই হবে। মানুষটার মনে আতঙ্ক, আজকেও বাড়ি না ফিরলে বউ ছেলেমেয়ে কি ভাববে!

অনাদিপ্রসাদ এতক্ষণ ছাদেই দাঁড়িয়েছিলেন, দেখছিলেন কলকাতার বুকে একটার পর একটা চিতা জ্বলছে। কি ভেবে নামলেন নীচে। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় প্রেস ছুটি হয়ে গিয়েছিল, নিরঞ্জন কবিতা দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে গেছে। বাকি যারা ছিল, তারা এমন একটা ছুটির মওকা পেয়ে কালকে যাতে আসতে না হয়, সেজন্যে আগে থেকেই যুক্তি খাড়া করার অজুহাতে অশোক জানাকে শুনিয়ে যাচ্ছে কোথায় কি ঘটছে, কোন রেল স্টেশনে হাঙ্গামা ক্রমশ বাড়ছে ইত্যাদি। অশোক জানা বোঝাবার চেষ্টা করছে, প্রচুর কাজ জমা হয়ে আছে প্রেসে, সেগুলো শেষ করে না ফেললে চলবে কেন। তাছাড়া, এই গণ্ডগোলের মধ্যে বাইরে না বেরিয়ে প্রেসের মধ্যে থাকাই তো অনেক নিরাপদ। সকলের জন্যে রান্না এখানেই করা হবে। এদের সবাইকে পাশ কাটিয়ে নীরবে, চিন্তিত মুখে অনাদিপ্রসাদ বাইরের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

অশোক জানা শঙ্কিত মুখে ছুটে আসে, তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ অনাদি?

অনাদিপ্রসাদের উদাস উত্তর, দেখে আসি কি সব হচ্ছে।

—পাগল হয়েছ, কোথায় বিপদে পড়ে যাবে! একে তুমি রোগা মানুষ—

—তাতে কি হলো? সারা রাত জেগে উপন্যাসটা শেষ করে ফেলেছি, আর আমার ভাবনা নেই।

অশোক জানা খুশী হয়, তবে তো কাজের কাজ করেছ হে, নাম কিছু ঠিক করেছ?

—কুরুক্ষেত্র।

বলেই অনাদিপ্রসাদ বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। অশোক জানা বার দুই পিছন থেকে ডাকল, অনাদি, অনাদি। উনি কিন্তু ফিরে তাকালেন না, সোজা এগিয়ে চললেন।

এখানে-ওখানে জটলা, একটা চক্রের ব্যূহে একগাদা মাথা ঝুঁকে পড়েছে। কোথাও একজন বলছে, অন্যরা কৌতূহলী হয়ে শুনছে। কোথাও একসঙ্গে বহু লোকের বক্তব্যে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তবে কলকাতার কোথায় কি ঘটছে তার খবর চলাচলের বিরাম নেই।

—জানেন মশাই, এইমাত্র শ্যামবাজার থেকে আসছি, ওখানে তিনটে বাস জ্বলছে।

—শুনেছেন যদুবাবুর বাজারের সামনে গুলী চলেছে, চার-চারটে লাশ শুয়ে।

—আর হাওড়ায়? দেখুন গিয়ে—রেঞ্চ দিয়ে ছোঁড়াগুলো অর্ধেক পুলটাই খুলে ফেলেছে, বলিহারী!

শেয়ালদার কাছে বেজায় ভীড় ও ব্যস্ততা। ট্রাম বন্ধের আশঙ্কায় ছেলে বুড়ো অফিস-ফেরত বাবুরা উদ্বিগ্ন, চোখে-মুখে শঙ্কার ছাপ স্পষ্ট। একটি মাত্র চিন্তা, বাড়িতে কি করে পৌঁছনো যাবে, সেখানে কে কি ভাবছে।

রকে বসে আড্ডা মারার দলে সে ভাবনা নেই, কারণ তাদের জন্মের সময়ই বাবা মা'রা ভেবেছিল শুধু। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্কুল কলেজ পালানো শুরু হলো, তখন থেকে মা বাবা আর ওদের জন্যে ভাবে না, যেটুকু ভাবে—হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলেই বুঝি সে ভাবনাটুকুও লোপ পেয়ে যাবে। কারুর হাতে থান ইঁট, কারুর হাতে সোডার বোতল, কেউ কেউ রাস্তার মোড়ে ট্র্যাফিক পুলিসের অনুপস্থিতিতে পাশের ফলের দোকান থেকে একটা খালি বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে সাইকেল, রিকশা, ঠ্যালা কণ্ট্রোল করছে। যেন অতঃপর সারা কলকাতার ভার তারাই বহন করতে বদ্ধপরিকর। সরকারের, পুলিসের কারুরই প্রয়োজন নেই।

শেয়ালদা পেরিয়ে অনাদিপ্রসাদ এগোতে লাগলেন। সিনেমা ঘরগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, তবু যারা টিকিট কেটে তাদের প্রিয় চিত্র-তারকাদের গান আর

অভিনয়ের জন্যে এসেছিল—হতাশ হয়ে এখনও টিকিট ঘরের সামনে এমন পোজে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন এখনি কি এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যাবে।

আলিবাবার চিচিং ফাঁক বলার সঙ্গে সঙ্গে যেমনি করে গুহার দরজা ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, তেমনি বুঝি বা অশান্ত কলকাতা এক মুহূর্তেই শান্ত হবে; আবার ট্রাম বাস চলার সঙ্গে সঙ্গে—দরজা খুলবে সিনেমারও।

চলেছেন অনাদিপ্রসাদ, বাধা পেলেন একটু এগিয়েই। লম্বা লাইটপোস্ট ভেঙ্গে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে বড় রাস্তার উপর, তার উপর ফেলা হয়েছে গাছের তাজা ডালপালা, কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনেছে কে জানে! এক ঠেলাওয়ালা যাচ্ছিল, কতগুলো ছেলে জোর করে তার ঠেলাটা ছিনিয়ে এনে উল্টে দিল সেই ডালপালার উপর, হো হো করে হেসে উঠল কোরাসে। তাদের দেখেশুনে-ছাত্র বলেই মনে হয়েছিল অনাদিপ্রসাদের। একটা গভীর আশঙ্কায় তাঁর মন দুলে উঠল।

প্রতিশোধ?—রক্তের বদলে রক্ত?

প্রতিবাদ?—আইনের বদলে বেআইনি কাজ?

নিজের অজান্তে কাঁধের ঝুলিটা অনাদিপ্রসাদ শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। এই ক' মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল—নতুন এক মহাভারত। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের যুদ্ধ, ন্যায় আর অন্যায়ের লড়াই। আজও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রেরা আছেন যাঁরা রাষ্ট্রের মুঠিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে চান, দেহে মনে অশক্ত হওয়া সত্ত্বেও। রাষ্ট্রকে, সিংহাসনকে, গদীকে আঁকড়ে ধরার এই যে লোভ, এই তো ধৃতরাষ্ট্রের ট্র্যাজেডীর কারণ। অন্যায় কাজ করছে জেনেও পুত্রদের প্রতিটি দুষ্কার্যকে সমর্থন করে গেছেন। নীরব হয়ে থেকেছেন ভীষ্ম-দ্রোণের মতো মহারথীরাও, শুধু মাত্র কৌরবদের দাপটে। আজকের এই যে শহরের উচ্ছৃঙ্খলতা—এও তো সহ্য করে যাচ্ছে সৎ নাগরিকেরা, কই, কেউ তো এসে প্রতিবাদ করছে না। কোথায় সেই সুবিধেবাদী নেতারা, কেন তারা বোঝাচ্ছে না এই বাউণ্ডুলে ছেলেদের—তোমরা যা করছ তা ধ্বংসের কাজ, অন্যায় কাজ। তবে কি অনাদিপ্রসাদ একলা এগিয়ে যাবেন, সোচ্চার প্রতিবাদ জানাবেন—বলবেন, এ অন্যায়, এ পাপ।

একটা হৈচৈ শব্দ শোনা গেল। সবাই ছুটতে লাগল, পুলিস আসছে। শুরুতেই যদি পুলিসের ভয়ে ছুটে পালাও, তবে কি করে তোমরা নতুন সমাজ গড়বে? কই, ক্ষুদিরাম-যতীন-সুভাষের দল তো পুলিসের ভয়ে ছুটে পালাননি! নির্ভীক, নিষ্কম্প্র বক্ষে এগিয়ে গেছেন বীরের মতো, প্রতিবাদ করেছেন অন্যায়ের। তোমাদের এত ভয় কেন? তোমরাই না বক্তৃতা দাও, দিগন্তের দ্বার খুলে দেবে এই জীর্ণ, পচা, পুরাতন, সব কিছু ব্যবস্থার

বিরুদ্ধে? ছি, ছি, এত ভীতু, এত
শাসিয়ে, তাদের জীবনযাত্রা তছনছ করে
পুলিসদের ঠেকাতে!

এক গলির ভেতর থেকে এক ঝাঁক ইঁট-পাটকেল
উপর পড়ে। সবাই ছুটছে এদিক-ওদিক। অনাদিপ্র
চললেন কলেজ স্কোয়ারের দিকে।

আজ কলেজ স্কোয়ার সত্যিই ফাঁকা। অন্য দিন এখানে একটা
পাওয়া যায় না। অনাদিপ্রসাদ এখানে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন।
বিদ্যাসাগর, ওই তো প্রফুল্লচন্দ্র, ওই তো অনতিদূরে বিপ্লবী বীর স
বাংলার তিন দিকপাল বিপ্লব এনেছেন তিন দিকে—শিক্ষায়, নিজে
দাঁড়াবার প্রচেষ্টায়, দেশমাতৃকার সাধনায়। আর আজ? শিক্ষাগৃহে
আলকাতরার ছোপ, বাঙালী ব্যবসাক্ষেত্রে কোণঠাসা, দেশসেবার নামে
সম্পত্তি সংহার। এ প্রগতি, না অধোগতি!

হঠাৎ কলেজ স্কোয়ারের হকার্স স্টলের দিকে কিছু লোকের
শুরু হলো, একটু পরেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল গৃহহারা সং
তিল তিল সঞ্চিত অর্থে গড়া ছোট ছোট স্টল।—যেখানে ওরা সকাল
ভাতে ভাত খেয়ে এসে বসে, আবার সেই রাত দশটায় ঝাঁপ বন্ধ করে
চলে যায়। সারা দিনের হিসেব মিলিয়ে যতটুকু পাওনা—তার উপর
শীল একটা পুরো সংসার।—স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চা, বৃদ্ধ বাবা মা, ছেলের পড়
মেয়ের বিয়ে। হায় হায় রব উঠলো দোকানদারদের, আমরা তো কো
করিনি, তবে কেন আমাদের ক্ষতি করছ। আমরাও তো তোমাদের
ভাই। তোমাদের জয়ে, আমাদের জয়। তোমাদের পরাজয়ে আমাদের
তবে কেন এই সর্বনেশে আগুন?

কে কার কথা শোনে! একটা তাজা কণ্ঠ শোনা গেল, তোমরা কে
খুলে বসে রয়েছ?

—এদিকে তো গোলমাল নেই।

—নেই, এই তো শুরু করে দিলাম। হ্যাঁ, তোমাদের দিয়েই শুরু

অনাদিপ্রসাদ আর থাকতে পারলেন না, দেহে যেন হাজার
বৈদ্যুতিক শক্তি বয়ে গেল। ছুটলেন স্টলগুলোর সামনে, রুখে
অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। বললেন, খবরদার, এ তোমরা কি করছ!
দোকানীদের উপর এ কি অত্যাচার! শিগ্‌গীরি জল এনে এই ধ্বংসের
নেভাবার চেষ্টা কর।

ছেলেগুলো প্রথমটা থমকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তার পরেই
তুমি কে চাঁদ? বাণী দিচ্ছ?

গীরি দমকলে খবর দাও, এখুনি আগুন নেভাতে

কল আমরা ঢুকতে দেব না।

পুড়ুক, ছাই হয়ে যাক। তবেই না নতুন সমাজ গড়ে

মধ্যে বলাবলি করে, এ শালা কার দালালি করতে এসেছে
দোকানগুলোও জ্বালিয়ে দিই।
দপ্রসাদ দু' হাত তুলে বাধা দিয়ে বলেন, এ অন্যায় আমি হতে দেব
তোমরা আমাকে মার।
সঙ্গে উন্মত্ত কোরাস শোনা গেল, দে ব্যাটাকে শেষ করে।
প্রসাদ মাথায় আঘাত পেলেন, পড়ে গেলেন মাটিতে, তবু ওঠবার
লেন। চারদিক থেকে কিল, ঘুষি, চড়। মুখ ফেটে রক্ত পড়ছে
চেঁচাচ্ছেন, এ অন্যায়, এ পাপ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে
।
ই যে করছি, বলেই একটা ছেলে আহত অনাদিপ্রসাদকে বিবস্ত্র করে

্যদের পৈশাচিক উল্লাস। কিন্তু আশ্চর্য, যাদের বাঁচাতে অনাদিপ্রসা
এসেছিলেন, তারাও কেউ এগিয়ে এল না এই চরম দুর্দশার মুহূর্তে
সাহায্য করতে। ভীষ্ম, দ্রোণের মতো তারা সবাই নীরব হয়ে রইল
ঘৃণায়, লজ্জায় অনাদিপ্রসাদ কঠিন রাজপথের উপরে শয্যা নিলেন
অত্যাচারে রক্তগঙ্গায় প্লাবিত অনাদিপ্রসাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যা
াগে গভীর বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, কুরুক্ষেত্রের গ ধ
বোধহয় এ সমাজ পুঞ্জীভূত পাপের হাত থেকে রেহাই না
শর আমরা সৃষ্টি করেছি তা বোধহয় শেষ পর্যন্ত লো াবে।
অষ্টাবক্র মুনির মতো অভিশাপ?

প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় এ াবহ মৃত্যুর খবর
...র ঢেউ তুলল। বিখ্যাত সাহি াদিপ্রসাদের শোচনীয়
সঙ্গে ছাপা হয়েছে তাঁর জীবনী, -কীর্তি, প্রকাশিত গ্রন্থের

পরে নিশ্চয় পাঠকের সংগ্রহে আরও একটি উপন্যাসের নাম